আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৪

অনুবাদ
মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
চিন্তাশীল আলেম, অনুবাদক ও প্রকাশক

সম্পাদনায়
হাফেয মাওলানা আবু নায়ীম
সম্পাদক, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

বই ঘর **বইঘর**
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৪
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এম এম তাশফি

© সংরক্ষিত

তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১৬

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৩

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0057-3

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by S M Aminul Islam
Published by : M M Tashfi, BhoiGhor : 43 Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : August 2013 © by the pablisher

Price : 500 Taka only

অর্পণ

সৃষ্টিজগতের রহমত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) পর্যন্ত আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসারে যাঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ– আখেরাতে তাঁদের দরওয়াজা বুলন্দীর লক্ষ্যে নিবেদিত হোক অনূদিত খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড প্রকাশনার সবটুকু পরিশ্রম ও কুরবানী। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক আমাদের দান করুন। আমিন!

দুটি কথা

প্রিয় বন্ধু আবু সাকী মাহবুবের সাথে আমাদের প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন অনাচার, সংকট এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়ে থাকে। তবে আলোচনা পর্যন্তই। কেননা এ শিল্প (যদিও আমাদের দেশে এখনও প্রকাশনা পূর্ণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত নয়) এমনই এক জটিল জালে আটকে আছে, যা থেকে বের করে আনা আমাদের মতো চুনোপুঁটির পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যাদের সামর্থ দিয়েছেন তাদের সাধ দেননি; আর আমাদের মতো কাউকে হয়তো সাধ দিয়েছেন তবে সামর্থ দেননি। প্রকাশনা শিল্পের এ দুরবস্থার কারণেই সবচে' বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত লেখালেখিকে আমাদের দেশে এখনও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একই কারণে আল্লাহমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা দুনিয়া-প্রত্যাশীদের নানা রকম বাহারী সজ্জার আবরণে আরও বেশি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পেশা গ্রহণ করতে হচ্ছে একটা; আর বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিশীল চর্চা করা লাগছে বিবেক ও আবেগের তাড়নায় অবসরে। এ থেকে বেরিয়ে আসার আশু কোনো উপায় আমাদের জানা নেই।

আবু সাকী মাহবুবকে বার বার তাকাদা দিচ্ছিলাম খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-এর সবগুলো খণ্ড যত দ্রুত সম্ভব পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। কারণ পাঠকদের তাকাদা তো সব আমাদেরকেই শুনতে হয়। কিন্তু চাইলেই কতটা দ্রুত তিনি তা করতে পারবেন? সংসারের নানা ঝামেলা, মাদরাসার খেদমত– এসবের পরই না কেবল অবসরটুকু এ কাজে ব্যয় করতে পারছেন। ফলে

পরামর্শ করেই তিন ও চার নম্বর খণ্ডটির ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। লেখক, প্রকাশক ও অনুবাদক স্নেহভাজন আমিনুল ইসলাম এ দুটি খণ্ডের কাজ প্রবীণ সম্পাদক, অনুবাদক হাফেজ মাওলানা আবু নায়ীম সাহেবের মাধ্যমে সম্পাদনা করিয়ে আমার হাতে তুলে দেন। দক্ষ হাতের সম্পাদনার ফলে আশা করি অনুবাদকর্মের দুর্বলতাগুলোও ঢাকা পড়ে গেছে অনেকাংশে। তবুও যে কেউ আমাদের ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেয়া হবে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদ আবু সাকী মাহবুব ভাই যত দ্রুত আমাদের হাতে দেবেন তত দ্রুতই পাঠকদের হাতে তুলে দেবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দিন।

বিনীত–

সমর ইসলাম
পরিচালক (সার্বিক), বইঘর

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানীং ভিন্ন ভাষার মনীষীদের অনূদিত বক্তৃতা প্রকাশের প্রবল জোয়ার বইছে। বাংলা ভাষাভাষীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন যথেষ্ট। সেই তুলনায় উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. অনেকটা উপেক্ষিতই রয়েছেন বলা চলে। অথচ উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে প্রচুর লেখা ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি ও মেধা এবং বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ নসীহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সুললিত বক্তৃতা ও আলোচনা শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরাও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলীগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রণ করে প্রকাশও করা হয়। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায়– নিখিল ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি পৌঁছায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানতাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো এখনো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে অনুপস্থিত। আমরা সীমিত সাধ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্বপ্ন দেখার তাওফিক যিনি দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডারে তো কমতি নেই। সেই ভরসা আর দীন প্রসারের অদম্য বাসনাকে পুঁজি করে এই মনীষীর সেরা সংকলন হিসেবে বিবেচিত 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিও বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। প্রাজ্ঞ আলেম আবু সাকী মাহবুব অনূদিত প্রথম খণ্ডটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার পাশাপাশি পরবর্তী খণ্ডগুলোর জন্য আমরা পাঠকদের অনবরত তাকিদ পাচ্ছি। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলোও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো। আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ :
১ ডিসেম্বর ২০১১ ঈ.

দুআর মুহ্তাজ
এম এম তাশফি

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে তিনটি ঐতিহাসিক মন্তব্য

এক.

তাসাউফ ও সুলুকের ইতিহাসে যে স্বাতন্ত্র্য মহা সৌভাগ্য কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ.-কে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন তা এই যে, তাঁর মুরশিদ শায়খুল আলম হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত, তখন তাঁকে দেখার জন্য হযরত কারী সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হলে হযরত থানভী রহ. তাঁর হাতকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুমু খেলেন এবং স্বীয় বক্ষ মোবারকের উপর রেখে বললেন– এ হাত দ্বারা আমি আমার অন্তরে আশ্চর্যজনক এক প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছি। তারপর হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী, আমলী ও রূহানী ফয়েজ এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও জীবনে বরকতের জন্য মাকবুল দোয়া করে বিদায় দিলেন।

দুই.

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে বলেন– মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়ব আমার স্নেহভাজন, স্বীয় বুযুর্গগণের ইলমী বৈশিষ্ট্যাবলী এবং রূহানী নেসবতসমূহ আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে একত্র করে দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক ফয়েয ও বরকতময় করে তুলেছেন।

তিন.

খতীবে আযম, আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ভারত বিভাগের পূর্বে মুলতানের খায়রুল মাদারিস-এর বার্ষিক সভায় হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেবের আন্তরিক দাওয়াতে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর এ সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন বয়ান এ জলসার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আমীরে শরীয়ত হযরত শাহ সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে নিজের গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা এবং তাঁর ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলতেন– আমি এ জলসায় শুধু তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি। তিনি আরো বলতেন– তাঁর এক তাকরিরে আমার সারা বছরের অসংখ্য তাকরিরের বিষয়াদি তৈরি হয়ে যায়।

رحمهم الله رحمة واسعة

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত সম্পর্কে তাঁর খলিফাগণের মন্তব্য

এক

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত ও বক্তৃতার ফয়েযের প্রকাশ 'দারুল উলুম দেওবন্দ'। যিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক দীনি কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরতের কামালাত ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে ঐসব খলিফার দ্বারা যারা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি ব্যক্তির নিকট হযরতের ফয়েয ও বরকত পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ ঐ সকল খলিফা যাঁরা ধর্মনীতি, চরিত্র নীতি, ইবাদত, ইলম ও আমল অনুযায়ী হযরতের বক্তৃতা ও তারবিয়াত অনুসারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একমাত্র দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী, দেওবন্দ

দুই

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর বক্তৃতার ইলমী আমলী ও তরবিয়তী ফয়েজ ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এসবের কারণে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-কে দেওবন্দী জামায়াতের মধ্যে অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন বলা অতিরঞ্জন হবে না এবং বাস্তবতা পরিপন্থীও হবে না।

–হযরত আল্লামা রফিক আহমাদ, মুজাফফরনগর

তিন

এ বাস্তবতার মধ্যে কোন অতিরঞ্জনতার সম্ভাবনাই নেই যে, কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর একটিমাত্র বয়ান নাস্তিকতার নিকটবর্তী সীমায় অবস্থানকারী দ্বিধা-সংশয়ের মরিচা ধরা আত্মাগুলোর সকল সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেয়। এ এক অসীম আমলে সালেহ।

–হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ ইসলাম, মিরাঠ

চার

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী মাহাত্ম্য কোন পরিচয় দানের মুখাপেক্ষি নয়। তাঁর ওয়াজ ও বাণীগুলো রূহানী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য মহান পুঁজির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং তাঁর অবর্তমানে এগুলো তাঁর সাহচর্য ও সঙ্গলাভের স্থলাভিষিক্ত।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ, জালন্ধর, মুলতান

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

নবী প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য / ২৩

মানব-সত্তায় কোন জ্ঞান ও ইলম নেই / ২৬

ইলম ছাড়া সংযত চরিত্র সম্ভব নয় / ২৭

সবরের মূল তত্ত্ব / ২৮

বিনয়ের মূল তত্ত্ব / ৩০

ইত্তেবায়ে শরীয়ত / ৩১

চারিত্রিক গুণাবলী ও জন্মগত স্বভাব ঠিক রাখে ইসলাম / ৩৩

চারিত্রিক ও স্বভাবগত শক্তিকে সংরক্ষণ করে ইসলাম / ৩৪

মানবীয় গুণ ও শক্তি প্রয়োগে শরীয়তের নির্দেশই গ্রহণযোগ্য / ৩৬

উস্তাদের প্রতি সম্মান / ৩৮

ইলম ও জ্ঞান বিতরণ মহাদান ও দয়া / ৩৮

ইলম ও সম্পদের পার্থক্য / ৩৯

ইলম ছাড়া সম্পদ / ৪০

ইলম ছাড়া নফসের আবেগ / ৪২

মানুষের প্রবৃত্তির উদাহরণ / ৪৩

পার্থিব ইলমের উপকারিতা / ৪৪

শরীয়তের ইলম / ৪৬

শরীয়তের বিধান কী করে পৌঁছবে / ৪৮

মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা / ৪৯

বয়ান : ২

ইয়াদে হক বা আল্লাহর যিকির / ৫১

কায়েনাতের প্রাণ বা জগতের রূহ / ৫৩

সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত / ৫৫

সৃষ্টির তাসবীহ সম্পর্কে সুফিদের অনুভূতি / ৫৯

রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে জীব-জন্তুর কথা বলা / ৬০

মানুষ ছাড়া জগতের সব সম্প্রদায়ের ভাষা এক / ৬১

মানুষের উদাসীনতা / ৬৩

সমগ্র বিশ্ব মানব জাতির খোরাক / ৬৩

জগতের সব কিছু মানুষের বাহন / ৬৩

দানের প্রতিদান / ৬৪
জীবনের মূল তত্ত্ব / ৬৪
যিকিরকারীর মর্যাদা / ৬৫
জীবনের প্রকৃত আহার / ৬৫
প্রিয়জনের মিলন ও বিচ্ছেদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া / ৬৬
যিকরুল্লাহর বিস্ময়কর ফলাফল / ৬৯
আল্লাহর স্মরণের অনুভূতি / ৭১
আল্লাহকে স্মরণ করার সঠিক নিয়ম / ৭২
সাময়িক যিকির / ৭৩
অনির্দিষ্ট যিকির / ৭৪
অনির্দিষ্ট যিকিরের ফলাফল / ৭৫
তাসবীহ স্মরণকারী / ৭৭
সংশয় মোচন / ৭৭
পূর্ণাঙ্গ প্রেম ও ভালোবাসায় দোষারোপ অর্থহীন / ৭৮

বয়ান : ৩
নবুওয়াত ও বাদশাহী / ৮১
জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সীমা / ৮৩
জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব / ৮৪
নবুওয়াত ও মুলুকিয়াতের প্রকৃতিগত পার্থক্য / ৮৬
ক্ষমতা লাভ এবং রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি / ৮৭
ওলী-আল্লাহরা নেকীর প্রতি লোভী / ৯২
দুর্বল-অসহায়কেও নবুওয়াত উঁচু স্তরে পৌঁছায় / ১০০
বিশ্ববাসীর চোখে নারী-সমাজ / ১০৩
স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার / ১০৫
বাবার চেয়ে মায়ের হক বেশি / ১০৭
নারীর সেবা ও পরোপকারে উৎসাহ-উদ্দীপনা / ১০৮
এতিমদের প্রতি স্নেহ-মমতা / ১১০
দাস-দাসীর প্রতি ভাল আচরণের নির্দেশ / ১১১
ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃতদাসদের সঙ্গে বর্বরতা / ১১৩
শুরুতেই দাসপ্রথা বিলোপ না করার কারণ / ১১৩
জীবজন্তুর প্রতি দয়াবান হওয়ার নির্দেশ / ১১৪
ফেরাউনী শক্তির উপর দুর্বল বনি ইসরাইল জয়ী / ১১৫
জাতির মূল্যবোধ রক্ষা আমিরের দায়িত্ব / ১২১
ধর্মীয় বিষয়েও নেতৃত্ব দেয়া আমিরের দায়িত্ব / ১২২

আলেম সমাজ খেলাফতের স্থলবর্তী / ১২৭
খেলাফত যুগের পর উলামা ও সুফি-সাধকদের ইসলাম প্রচার / ১২৯
রাসূল (সা.)-এর নীতি অনুসরণ করতে হবে / ১৩০

বয়ান : ৪
জ্ঞানের সুফল / ১৩৩
সামান্য আত্মপরিচয় / ১৩৫
দারুল উলুম সম্পর্কে হযরত নানুতবীর স্বপ্ন / ১৩৭
দারুল উলুম দেওবন্দ ইলহামী প্রতিষ্ঠান / ১৩৮
দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার আসল কারণ / ১৪০
নবীর শিক্ষা গ্রহণ না করায় বনি ইসরাইলের পরিণতি / ১৪৩
বনি ইসরাইলের পুনরায় সহজে রাজ্য লাভ / ১৪৬
নবীদের বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ থাকে / ১৪৮
বুখতে নসরের স্বপ্ন / ১৫৩
হযরত দানিয়াল (আ.)-এর তাবির / ১৫৪
ইলমে নবুওয়াতের মাধ্যমে বনি ইসরাইলের পুনঃসমৃদ্ধি / ১৫৫
বাইরের সৌন্দর্য পূর্ব-লক্ষণ / ১৫৬
মূর্খতা মন্দ ও অকল্যাণের কারণ / ১৫৭
ইলম কামালাত ও মহৎ গুণের উৎস / ১৫৯
সংশোধিত আত্মার দ্বারা বিপ্লব সম্ভব / ১৬১
সত্যিকার বুদ্ধিমান ওলী-আল্লাহরাই / ১৬৩
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বন্দেগি ও দাসত্বের / ১৬৫
অনুগতকে সব আর দাবিদারকে কিছুই না / ১৬৮
যে ইলমে আল্লাহর পরিচয় মিলে না, তা মূর্খতা / ১৭৪
পরিচয় লাভের উপায় / ১৭৬
অধিক ধন-সম্পদ ইলম থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ / ১৭৮
আহলে হক পরিচয় লাভের যোগ্য / ১৭৮
নারীর দ্বারা পরিবারে শিক্ষা আসতে পারে / ১৮০
নবীদের শিক্ষাই প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে / ১৮৩

বয়ান : ৫
সৎকাজ / ১৮৫
উদাহরণ সুস্পষ্ট প্রমাণ / ১৮৭
হাদীসে তিন ভাইয়ের উদাহরণ / ১৯৪
বড় ভাইয়ের আচরণ / ১৯৭

আত্মা পরকালের অঙ্গ বিশেষ / ১৯৯
মেজো ভাইয়ের আচরণ / ২০৪
ছোট ভাইয়ের আচরণ / ২০৫
পুণ্য সবখানে উপকারী / ২০৯
নেক আমলের প্রয়োজনীয়তা / ২১১
দৈনন্দিন কাজের হিসাব-নিকাশ করা উচিত / ২১৩
নেকীতে আশা আর পাপে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয় / ২১৪
পৃথিবীতে পাপ-পুণ্যের প্রকাশ / ২১৮
আমলী জিন্দেগি গ্রহণ করা দরকার / ২১৯

বয়ান : ৬
মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য / ২২২
সবচেয়ে বড় নেয়ামত / ২২৩
চিরস্থায়ী জীবন / ২২৪
ঐচ্ছিক উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব / ২২৫
অনন্ত উদ্দেশ্য / ২২৬
সম্পদ ও খাবার উদ্দেশ্য নয় / ২২৭
সম্মান ও প্রতিপত্তি উদ্দেশ্য হতে পারে না / ২২৮
সত্যিকার সম্মান / ২২৯
মান-সম্মান বিষয়ে অমূল্য বিধান / ২৩১
মানুষের ইলম ও জ্ঞান / ২৩১
মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য / ২৩৩
ধন-সম্পদ দিয়েও আল্লাহ মিলে / ২৩৪
গরীবানাতেও আল্লাহ মিলে / ২৩৪
সুস্থ-অসুস্থ উভয় অবস্থায় আল্লাহ মিলে / ২৩৬
ধৈর্যের ফল / ২৩৭
জীবন-মরণেও আল্লাহ পাওয়া যায় / ২৩৯
প্রকৃতিগতভাবে ধন-সম্পদ মন্দ নয় / ২৪৩
ধন-সম্পদের উদাহরণ / ২৪৫
স্বভাবগত মহব্বতের প্রতি অনুগ্রহ / ২৪৫
মানুষ সর্বদা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে / ২৪৭
এ যুগের জুনায়েদ ও শিবলী / ২৪৭
আমাদের সম্পদের আসল অবস্থা / ২৪৮
দেশ চালনার সঙ্গে ইবাদত / ২৫০
কবরে ইবাদত / ২৫১

হাশরের মাঠে ইবাদতের আবেগ-উৎসাহ / ২৫৪
বেহেশতে ইবাদত / ২৫৫
ঈমানের ফলে সবকিছু পবিত্র হয়ে যায় / ২৫৫
জীবনের সঠিক মূল্যায়নের উপায় / ২৫৭
নেক নিয়ত / ২৫৮
ইবাদতের অর্থ / ২৫৯
একটি মূল্যবান পত্রের জবাব / ২৬১

বয়ান : ৭
অবয়ব ও চরিত্র / ২৬৯
বাস্তব ঘটনাসমূহ / ২৭০
গোপন হাকিকতের জন্য শারীরিক কাঠামো প্রয়োজন / ২৭১
প্রকৃতির উপযোগী অবয়ব / ২৭২
সুন্দর শরীরে কদাকার ও মন্দ হাকিকত / ২৭৩
কদাকার শরীরে পবিত্র আত্মা / ২৭৪
অবয়ব হাকিকতের ভাষ্যকার / ২৭৪
বাইতুল্লাহিল করিমের হাকিকত / ২৭৫
কাবার কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা / ২৭৬
হাকিকত প্রকাশের লক্ষণ / ২৭৭
হাকিকত লাভের মাধ্যমগুলোর সম্মান / ২৭৮
কুরআনী হাকিকতের পরকালীন অবয়ব / ২৮১
ইলমী কালাম ও পূর্ণতার লক্ষণ / ২৮২
হাকিকত পরিবর্তনের কাজ / ২৮৩
কৃত্রিমভাবে হাকিকত লাভ / ২৮৫
বাইরের অবস্থার প্রতিক্রিয়া অন্তরে / ২৮৭
কথা ও কাজের প্রতিক্রিয়া / ২৮৮
ঈমানের প্রতিক্রিয়া / ২৯০
স্বভাব চরিত্রের প্রতিক্রিয়া / ২৯১
পোশাকের প্রতিক্রিয়া / ২৯২
ইলমের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী / ২৯৩
নিসবতের প্রতিক্রিয়া / ২৯৭
গন্তব্যে পৌঁছার পথ / ২৯৮

বয়ান : ৮
ঈমানের শাখা-প্রশাখা / ৩০১
ঈমানের দুটি মূল-ভিত্তি / ৩০৩
বুদ্ধি-বিবেচনার ফজিলত আলাদাভাবে বর্ণিত / ৩০৬
ইসলামের আলোকে কে বুদ্ধিমান / ৩০৭
নাজাত লাভের একমাত্র উপায় / ৩০৮
অপারগতা স্বীকার করাই ইবাদতের প্রাণ / ৩০৯
ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর / ৩১৫
ঈমানের পূর্ণতা লাভের উপায় / ৩১৭
মুমিনের কোন মুহূর্ত যিকির-শূন্য থাকা উচিত নয় / ৩২২
যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন পড়বে / ৩২২
মুমিনের আত্মারও যিকির করা উচিত / ৩২৫
সমাজ জীবনের সব শাখায় আল্লাহর যিকির বিদ্যমান / ৩২৬
ওলীদের মধ্যে বুযুর্গির দু'টি অবস্থা / ৩২৭
সাহাবায়ে কেরামের বুযুর্গির দু'টি অবস্থা / ৩৩১
নবীগণের মধ্যেও বুযুর্গির দু'টি অবস্থা / ৩৩৪
বিনয় ও নম্রতা বুযুর্গির প্রধান লক্ষণ / ৩৩৫
শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার : কেবলই আল্লাহর শান / ৩৩৭
বিনয়-নম্রতা : মানবতার লক্ষণ / ৩৪০
লজ্জাশীলরাই ইবাদত ও খেদমত করতে পারে / ৩৪৪

বয়ান : ৯
শিক্ষা ও প্রচার / ৩৪৭
মক্কী জীবন / ৩৪৯
জেহাদে কবির বা মহান জেহাদ / ৩৫০
মহাবিপ্লব / ৩৫১
নাজাত ও মুক্তির উপায় / ৩৫২
ঈমানের শক্তি / ৩৫২
একটি সংশয় ও তার মোচন / ৩৫৩
সাধারণ তাবলীগ সবারই কর্তব্য / ৩৫৩
তাবলীগের জন্য জামাতবদ্ধ হওয়ার নিয়ম / ৩৫৪
তাবলীগ জামাত এবং মহাবিপ্লব / ৩৫৫
তাবলীগে বের হওয়ার উপকারিতা / ৩৫৫
তাবলীগের উদ্দেশ্য / ৩৫৫
নিঃস্বার্থ খেদমত / ৩৫৬

দু'টি আশ্রয় কেন্দ্র / ৩৫৬
শরীক হবার আহ্বান / ৩৫৬
দাওয়াতি কাজের মুনাফা / ৩৫৭

বয়ান : ১০
তাবলীগ জামাত ও সংশোধন / ৩৫৯
চিন্তাযোগ্য হাকিকত / ৩৬১
মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারক তার গুণাবলী / ৩৬৪
মানবতার আসল মাহাত্ম্য / ৩৬৬
মানুষের গুণাবলী ও পূর্ণতা / ৩৬৮
ওলী-দরবেশদের সাহচর্য / ৩৬৮
রাসূল (সা.)-এর মহব্বতের ফয়েয / ৩৭০
সত্যিকার ইলম / ৩৭১
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন আল্লাহর জন্য / ৩৭২
বন্ধু নির্বাচন / ৩৭৪
শত্রুর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি / ৩৭৫
প্রবৃত্তির হিসাব নেয়া / ৩৭৬
আত্মশুদ্ধির সব পথ তাবলীগ জামাতে / ৩৭৭
জামাতের খায়র ও বরকত / ৩৭৭
নেক নিয়তের ফল / ৩৭৮
জামাতী ভাই / ৩৭৮
জামাতে শত্রুদের থেকে উপদেশ নেয়া / ৩৭৯
তাবলীগে নফসের হিসাব-নিকাশ / ৩৮০
তাবলীগ ও আত্মশুদ্ধি / ৩৮০
কিছু সমালোচনা ও তার নীতিগত মৌলিক উত্তর / ৩৮০
তাবলীগের উদ্দেশ্য / ৩৮২
নিজে যোগ দিয়ে ভালমন্দ দেখা উচিত / ৩৮২
অকারণ সমালোচনা / ৩৮৩
সমালোচনার তাৎপর্য / ৩৮৪
আল্লাহ তায়ালার দান / ৩৮৫

বয়ান : ১১
দলবদ্ধ তাবলীগ / ৩৮৮
দীন একই ছিল; অবস্থাভেদে শরীয়ত ভিন্ন ছিল / ৩৮৯
উম্মতের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ / ৩৯৫

দীনে একত্ব ও শরীয়তের বিভিন্নতার দলিল / ৩৯৬
ফিকহের পথ ভিন্ন; তবে মূল একই / ৩৯৭
তাসাওউফে পথের বিভিন্নতা : মূল এক / ৩৯৯
তাবলীগ ও প্রচারের পদ্ধতি বিভিন্ন : উৎস এক / ৪০০
গণতান্ত্রিক যুগে তাবলীগ-জামাতই বেশি কার্যকর / ৪০৪
জামাতে জড় ও আধ্যাত্মিক শক্তি উভয়ই থাকে / ৪০৪
তাবলীগ জামাতের বরকতে আমলের পরিবেশ সৃষ্টি / ৪০৬
পরিবেশের প্রভাব / ৪০৮
জামাতে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন / ৪১০
তাবলীগ জামাত কবুলের লক্ষণসমূহ / ৪১১
তাবলীগ জামাতের কাজ প্রত্যাখান করা কঠিন / ৪১৩
তালিম ও তাবলীগের মধ্যে বিরোধ নেই / ৪১৩
এক আল্লাহওয়ালার এখলাছে পুরো বিশ্ব কর্মতৎপর / ৪১৪

বয়ান : ১২
নারীর শ্রেষ্ঠত্ব / ৪১৫
নারীর বিবেকশক্তি / ৪১৮
দীনি উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য পুরুষের পথ একটাই / ৪২০
নারীর উন্নতি লাভের অসাধারণ যোগ্যতা / ৪২২
নারীরা কামেল ওলীদের মুরব্বি হতে পারেন / ৪২৩
হযরত আয়েশা (রা.) উম্মতের শিক্ষাগুরু / ৪২৬
নারীদের ধৈর্যশক্তি অসাধারণ / ৪২৯
উম্মতের উপর হযরত খাদিজা (রা.)-এর এহসান / ৪৩১
নারীর ইলম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পুরুষই প্রতিবন্ধক / ৪৩৪
নারী সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর অন্তিম অসিয়ত / ৪৩৫
রূপের আসক্তি ক্ষণস্থায়ী : মহব্বত থাকে না / ৪৩৬
শারীরিক সৌন্দর্য চেতনা : নৈতিকতার সৌন্দর্য শান্তি / ৪৩৯
প্রাচুর্যে থেকেও নারীরা মুত্তাকী হতে পারেন / ৪৪০
জন্মের পর থেকেই সন্তান তরবিয়তের মুখাপেক্ষী / ৪৪৫
শিশুরা মা-বাবার অনুকরণকারী / ৪৪৬
মহিলাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা / ৪৪৭

বয়ান : ১৩
ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিক রূপায়ণ / ৪৫২
মানব জীবনে চিন্তা-গবেষণার গুরুত্ব / ৪৫৪
মানবীয় চিন্তাশক্তির কর্মদক্ষতা / ৪৫৭
বিবেকের কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সঠিক মাপকাঠি / ৪৫৯
কুরআনে মানব-জাতিকে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান / ৪৬০
ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল রাসূলের পথ / ৪৬৪
উম্মতের মন-মানসিকতায় নবী-আদর্শের প্রভাব / ৪৬৫
যুগের চাহিদা ও আধুনিকতা / ৪৬৭
ইসলামী জীবন-দর্শন আধুনিকরণে মূলনীতির গুরুত্ব / ৪৬৮
মূলনীতির সঙ্গে আংশিক বিষয় নিরূপণ সমস্যা / ৪৬৯
মুতাকাদ্দমীন ফকিহ্ সংকলিত আংশিক মাসাইলের উপকারিতা / ৪৭১
ইসলামে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা / ৪৭৪
ইসলামী নীতিমালা বিশ্বজনীন হওয়ার বাস্তব সাক্ষ্য / ৪৭৫
যুগের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের প্রভাব / ৪৭৭
দীনি প্রকৃতি অনুযায়ী আধুনিক করার পথ / ৪৭৭
রাজনৈতিক মতাদর্শ সংকলনের গুরুত্ব / ৪৭৯
নবীর আদর্শ ও ইসলামী মানসিকতার মূলনীতি / ৪৮০
নীতিসমূহের সার-সংক্ষেপ / ৪৮৫
আধুনিকীকরণের প্রধান কাজ লোক নির্বাচন / ৪৮৫

বয়ান : ১৪
ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি / ৪৮৯
ইলমের দুটি বিভাগ / ৪৯১
প্রত্যেক ধর্মের মৌলিকত্ব ও মেজায ভিন্ন / ৪৯২
জাহেলিয়াতের সভ্যতার ভিত্তি প্রবৃত্তির দাসত্বের উপর
আর ইসলামী তমদ্দুনের ভিত্তি হকের উপর / ৪৯২
যুগের ঘটনাবলীর প্রতি ইসলামের চোখ বন্ধ নয় / ৪৯৪
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন / ৫০১

বয়ান : ১৫
দরসে বুখারীর সমাপনী অনুষ্ঠান / ৫০৩
বুখারী শরীফের পবিত্রতা / ৫০৫
সূচনা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব / ৫০৬
ইলমের নূর বা জ্যোতি / ৫০৭

হাকিকতে মুহাম্মদিয়া / ৫০৮
নবুওয়তের কামালাত ও তার শেষ সীমা / ৫০৯
আখলাক ও চরিত্রের শ্রেণীবিন্যাস / ৫১০
আখলাকের সংজ্ঞা / ৫১০
রাসূল (সা.)-এর চরিত্র / ৪১১
তরতিব ও বিন্যাসের স্তর / ৪১২
প্রান্তিকতার মর্যাদা / ৪১৩
আনন্দ উৎসবের পূর্ণাঙ্গতা / ৪১৪
মৃত্যুতে আনন্দ-উল্লাস / ৪১৫
প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ / ৪১৬
প্রকৃত আনন্দ / ৪১৭
রাসূল (সা.)-এর আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক / ৪১৮
সনদের প্রয়োজন / ৪১৮
মুসালসালাত / ৪১৯
উচ্চ সনদ / ৪২০
মুহাদ্দিসীনের সতর্কতা / ৪২১
সনদহীন আলেম / ৪২২
সনদবিহীন আলেমের উদাহরণ / ৪২৩
বরকত হাসিলের মাধ্যম / ৪২৩
রেওয়ায়াতের গুরুত্ব / ৪২৪
সঠিক অনুভূতি / ৪২৫
কুরআন ও সুন্নাতের উদ্দেশ্য / ৪২৬
কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি, স্বরভঙ্গি ও উচ্চারণ ভেদ / ৪২৭
নবুওয়তের প্রয়োজন / ৪২৯
উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও সম্মান / ৪৩০
রিজালশাস্ত্র বা হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা / ৪৩১
দীনের প্রতিটি আংশিক বিষয়েরও সনদ রয়েছে / ৪৩২
আলেমগণের শ্রেণীবিন্যাস / ৪৩৩
হাদীসের ইজাযত বা অনুমতি প্রদান / ৪৩৩

পরিশিষ্ট

পয়গামে হেদায়েত : ১ / ৪৩৬
পয়গামে হেদায়েত : ২ / ৫৪২
আফ্রিকার সফর সমাপনী মাহফিলে বিদায়ী ভাষণ / ৫৪৬

বয়ান : ১

নবী প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালীম ও তরবিয়ত দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে যাতে ইলম ও জ্ঞান প্রসার ও বিস্তার লাভ করে। আর তরবিয়তের মাধ্যমে যাতে চরিত্র গঠন হয়, সংশোধন হয়– এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব বলা যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য হল দু'টি– ইলম বা জ্ঞানের আলো বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদের চরিত্র সংশোধন ও গঠন করা।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



https://t.me/islaMic_fdf



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّـــةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

اَمَّـــابَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا.

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلاَقِ. اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ، صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এ হচ্ছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি হাদীস, যা আমি এইমাত্র তেলাওয়াত করলাম। হাদীস দুটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমন ও প্রেরণ, নবুওয়ত ও রিসালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কেন তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো? কোন লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হলেন? এ বিষয়গুলো এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রেরণ ও আবির্ভাবের দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا.

দ্বিতীয় হাদীসে বলেছেন–

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ.

এখানে প্রথম হাদীসের অর্থ হচ্ছে– 'আমি পৃথিবীতে মুয়াল্লিম বা শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি, যেন জগতবাসীকে শিক্ষা দান করি।' আর দ্বিতীয় হাদীসে ইরশাদ করেছেন– 'আমাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি উন্নত ও পবিত্র স্বভাব-চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করি এবং নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে চরিত্রবান ও নৈতিকতার উচ্চ শিখরে পৌছে দিতে পারি।' প্রথম হাদীসের মূলকথা হলো– আমি এজন্য এসেছি যে, বিশ্ববাসীকে আলেম এবং বিজ্ঞ বানিয়ে দেবো। আর দ্বিতীয় হাদীসের মূলকথা হচ্ছে– আমি এ কারণে আগমন করেছি যাতে পৃথিবীবাসীকে চরিত্রবান ও উন্নত স্বভাবের অধিকারীরূপে গড়ে তুলতে পারি।

সারকথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালীম ও তরবিয়ত দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে যাতে ইলম ও জ্ঞান প্রসার ও বিস্তার লাভ করে। আর তরবিয়তের মাধ্যমে যাতে চরিত্র গঠন হয়, সংশোধন হয়– এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব বলা যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য হল দু'টি– ইলম বা জ্ঞানের আলো বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দেয়া এবং তাদের চরিত্র সংশোধন ও গঠন করা। এ দু'টি গুণ ছাড়া দুনিয়ার কোন জাতি কোন সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধিও অর্জন করতে পারে না।

একজন মানুষ যদি আলেম হন এবং খুব বড় মাপের আলেম হন কিন্তু চরিত্রবান না হন; বরং চরিত্রহীন হন তাহলে তার ইলম ও জ্ঞান কখনও মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কারো কোনো উপকার করতে পারবে না। অন্যদিকে কেউ যদি চরিত্রবান ও উন্নত স্বভাব বিশিষ্ট হন অথচ অশিক্ষিত ও মূর্খ হন, তাহলে কেবল চারিত্রিক গুণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তিনি তরবিয়ত দান করতে ও সংশোধন করতে পারবেন না।

মানব-সত্তায় কোন জ্ঞান ও ইলম নেই

ইলম এবং জ্ঞান মানুষের সত্তা বা প্রকৃতিতে নেই। এটা অর্জন করতে হয় অন্যভাবে। আর আখলাক বা স্বভাব-চরিত্র মানুষের মধ্যেই রয়েছে। তাহলে একে গঠন ও সংশোধন করতে হয়। সুতরাং একটি বিষয় মানুষের মধ্যে রয়েছে– যা কেবল সংশোধন করতে হয়। আর অন্যটি মানুষের মধ্যে মোটেই নেই। তা অন্য কোথাও থেকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়। বোঝা গেল, মানুষ অশিক্ষিত হয়েই জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে কোন ধরনের ইলম বা জ্ঞান থাকে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

আল্লাহ তোমাদেরকে যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ করেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন ছিল? তোমাদের মধ্যে সামান্যতম ইলম ও জ্ঞান ছিল না। তোমরা সর্বতোভাবে মূর্খ ও অবুঝ ছিলে। ভাল মন্দ, সাদা-কালোর কোন পার্থক্য তোমাদের মধ্যে ছিল না। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। সম্পূর্ণ মূর্খ ছিলে তোমরা। মায়ের গর্ভ থেকে কেউ কোন জ্ঞান বুদ্ধি, কলা-কৌশল নিয়ে আসেনি। আল্লাহ তায়ালা দয়া করেছেন, তাই তোমাদের মধ্যে শ্রবণশক্তি, কলা-কৌশল, বোধশক্তি এসব পয়দা করে দিয়েছেন; যাতে শুনে ও দেখে তোমরা কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পার। তারপর শোনা ও দেখা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে অনেক নতুন জিনিস জেনে নিবে। আল্লাহ তায়ালা এসব শক্তি তোমাদের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, যাতে তোমরা নতুন নতুন ইলম ও জ্ঞান সৃষ্টি করতে পার। তাই ইলমের মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর, ইলমও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। [সূরা নাহল : ৭৮]

এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা গেল, মানুষের সত্তা ও প্রকৃতিতে কোন ধরনের ইলম বা জ্ঞান নেই; বরং মানুষ জ্ঞানশূন্য জীব। তাহলে তার মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে, যদি সে জ্ঞানার্জন করতে চেষ্টা করে বা ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তার অন্তরে ইলম ও জ্ঞানের জ্যোতি প্রবেশ করতে পারবে। এ যোগ্যতা তার রয়েছে।

তাই মানুষকে জাহেল, মূর্খ বা অশিক্ষিত বলা হয়েছে। কারণ জাহেল তাকেই বলা হয় যার মধ্যে ইলম নেই; তাহলে ইলম অর্জন করার যোগ্যতা রয়েছে। একটি দেয়ালকে আমরা জাহেল বলতে পারি না। যেহেতু দেয়ালের মধ্যে আলেম হওয়ার যোগ্যতা নেই। আসমান, জমিনকে জাহেল বলা যাবে না। এগুলোর মধ্যে যেহেতু আলেম হওয়ার যোগ্যতা নেই। মানুষকেই জাহেল বলা যাবে। কারণ তার মধ্যেই আলেম হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

ইলম ছাড়া সংযত চরিত্র সম্ভব নয়

মানুষের মধ্যে এমনিভাবে আখলাক বা স্বভাব-চরিত্র রয়েছে; তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ইলম না থাকবে, ততক্ষণ তার স্বভাব চরিত্র মুতাদিল বা সংযত হবে না। বরং প্রকৃতির কোন না কোন অংশে মানুষ অবস্থান করবে। ইলমের জ্যোতি যে পর্যন্ত না আসবে, সে পর্যন্ত মানুষ সংযত ও সুশৃঙ্খল হবে না, হতে পারবে না। পরম উদারতা এবং চরম রক্ষণশীলতার জন্য ইলমের দরকার নেই। তাহলে স্বভাব-চরিত্রকে সংযত ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- মনে করুন, ধৈর্য একটি গুণ। এর খুব নিকটেই রয়েছে হা-হুতাশ। মানুষের উপর যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট, বালা-মসিবত আসে, তখন সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। শরীরের পোশাক-আশাক ছিঁড়ে ফেলে; কাপড়ের পশম উপড়ে ফেলে। নিজের চেহারা ও অঙ্গগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। এটা হচ্ছে ধৈর্যের বিপরীত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ চরম অধৈর্য প্রকাশ করা।

আর অন্যদিকের অবস্থাটা দেখুন। দেখবেন, যতই বিপদ-আপদ আসুক না কেন তার অন্তর কোনো রকম বিকারগ্রস্ত হয় না। কোনো ধরনের অস্থিরতার শিকার হয় না। কারণ তার অন্তরে রয়েছে অসাধারণ সহিষ্ণুতা। বড় কোনো ক্ষতি হয়ে গেলেও তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয় না। দুঃখ-কষ্টের প্রতি এমনই অবহেলা যে তার উপর যেন এসব মসিবতের কোনো ক্রিয়াই হয় না; ধৈর্যহারা হওয়া তো দূরের কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক অবস্থায় যেমন অধৈর্য নেই, অন্য অবস্থায় তেমনি ধৈর্য নেই। অর্থাৎ ধৈর্য থাকবে মধ্যবর্তী স্থানে। বিপদে ব্যথা পাবে, দুঃখেও আক্রান্ত হবে; তাহলে সীমার মধ্যে থাকবে। আত্মবিস্মৃত হবে না।

একেই ধৈর্য বলা যাবে। অতএব হা-হুতাশ করা যেমন ধৈর্য নয়; তেমনি সীমাহীন অনুভূতিহীনতা এবং কঠোরতাও ধৈর্য নয়; বরং মধ্যবর্তী পথ বেছে নেয়াই হলো ধৈর্য। এটা সীমার মধ্যে হবে। আর সীমা যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা না যাবে সে পর্যন্ত ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে সীমা রক্ষা করাও যাবে না। আখলাক ও চরিত্র গঠনের জন্য ইলমের অত্যন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যদি ধৈর্যের সীমা অজানা থাকে তাহলে মানুষ ধৈর্যশীল হওয়ার যোগ্য হতে পারবে না। কিন্তু অধৈর্য হওয়া, চেহারাকে আঁচড়ে খামচে ক্ষত-বিক্ষত করা, পোশাক ছিঁড়ে ফেলা এবং আত্মহারা হয়ে যাওয়ার জন্য কোনরূপ ইলম ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মূর্খতার। যত বেশি মূর্খ ও জ্ঞানহীন হবে ততই সে অধৈর্য হয়ে পড়বে, মাতম ও বিলাপ করবে। চিৎকার করে কান্নাকাটি করবে। কারণ সীমা সম্পর্কে সে অজ্ঞ। আর যদি এমন হয় যে যতই দুঃখ-কষ্ট আসুক বিপদ-আপদে তার চিত্তবৈকল্য হয় না, অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। একাধিক মানুষ মারা যাক, তবু সে নিশ্চিন্ত। তার কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। তার অন্তর শক্ত এবং হৃদয় কঠিন। তাহলে এর জন্য তো কোন প্রকার ইলম ও জ্ঞানের দরকার হয় না। মূর্খতাই যথেষ্ট। কিন্তু সীমার মধ্যে ধৈর্যধারণের জন্য প্রয়োজন ইলম ও জ্ঞানের। আর এ কারণেই নবী-রাসূল আগমন করেছেন। তাঁরা এসে আখলাক ও চরিত্রের মধ্যপন্থা কি তা বর্ণনা করেছেন, সংযত স্বভাব গঠনের উপায় বলে দিয়েছেন।

সবরের মূল তত্ত্ব

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহিমের ইন্তেকাল হলো। সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তখন বলেছিলেন–

وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

হে ইব্রাহিম! তোমার বিয়োগে, তোমার বিচ্ছেদে হৃদয় ব্যথিত, আমরা শোকাহত।

সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আপনি ধৈর্য ধারণের জন্য বলেন, অথচ আপনি কাঁদছেন, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে? জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কান্না করা, অশ্রু ঝরানো রহমত, দয়া ও কোমল হৃদয়ের আলামত। আমি যে বলেছিলাম, ধৈর্য ধারণ করা উচিত, তার অর্থ হচ্ছে– উচ্চৈঃস্বরে না কাঁদা, বিলাপ-মাতম না করা। নিজের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করবে না, পোশাক-আশাক ছিঁড়বে না। কারণ,

এসব হলো অধৈর্যের লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনাস্থার পরিচায়ক। معاذ الله আল্লাহ! আপনি এ কাজ ঠিক করেননি, অমুকের মৃত্যু দিলেন; এ কারণে আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। এজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার উপর অনাস্থা প্রকাশ করা থেকে বারণ করেছি। আমি তোমাদের অশ্রু বিসর্জন করার ব্যাপারে এজন্য নিষেধ করিনি যে, তোমাদের অন্তর থেকে দয়া ও মহব্বত উঠে যাক। এটা তো হচ্ছে রহমত ও দয়ার আলামত! যে মুমিনের অন্তরে রহমত ও দয়া না থাকবে, তার অন্তরে ঈমান কোথায়?

জাহেলিয়াতের যুগে এমন কুপ্রথা ছিল– মানুষ আপন কন্যাকে জীবন্ত কবরে পুঁতে ফেলতো। হাজার হাজার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হত শুধু এ লজ্জার কারণে যে আমাকে কারো শ্বশুর বলা হবে কিংবা কাউকে আমার জামাতা বলা হবে। হাদীস শরীফে আছে– এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এসময় অন্য এক ব্যক্তি এসে কারো মৃত্যু সংবাদ শুনালো। মৃত্যু সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ ভিজে গেলো। তা দেখে ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলো– হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কাঁদছেন! আমি আমার এগারজন মেয়ে জীবন্ত কবর দিয়েছি। তারা তখন চিৎকার করছিল, আব্বা-আব্বা! বলে ডাকছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে সামান্যতম দয়াও জাগেনি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন– তোমার ভেতর কি হৃদয় না পাথর রয়েছে? এটা হলো পাষাণ হৃদয়ের কথা। মুমিন এবং প্রকৃত মানুষ তো ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে দুঃখ-কষ্টের প্রভাব পড়লে ব্যথিত হয়। আর যার মধ্যে এসবের কোন ক্রিয়াই হয় না, সে মানুষ না, তার অন্তর অন্তর নয়; বরং পাথর।

তাই ধৈর্যশীল কেমন করে হতে হয় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন। দুঃখ-বেদনা প্রকাশ কর, তাহলে ভেতর থেকে। কিন্তু সীমালংঘন করো না। এ শিক্ষা গ্রহণ তখন সম্ভব হবে, যখন সীমা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইলম ও জ্ঞান থাকবে। কোন পর্যায়ে কান্নাকাটি করা আমাদের জন্য জায়েয এবং কোন পর্যায়ে নাজায়েয, কি পরিমাণ দুঃখ প্রকাশ করা জায়েয কি পরিমাণ নাজায়েয তা-ও বলে দেয়া হয়েছে। অতএব, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা বলে দেয়াকেই ইলম বলা যায়। সারকথা, যে পর্যন্ত সঠিক ইলম না হবে আখলাক দুরস্ত হবে না এবং চরিত্রও গঠিত হবে না।

বিনয়ের মূল তত্ত্ব

সব আখলাক ও স্বভাবেরই এই অবস্থা। যেমন- বিনয়ের উল্টোটা হচ্ছে অহংকার। এর কারণে মানুষ ফেরাউন হয়ে যায়। বড় বড় কথা বলে। গর্বের সঙ্গে চলাফেরা করে। আর বিনয়ের দ্বিতীয় দিক হলো, অপমানবোধ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। সাধারণ অসাধারণ সবার সামনে ঝুঁকে পড়ে মাথা নত করে দেয়াটাও বিনয় নয়। আবার অহংকার করাও বিনয় নয়। এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী। বিনয়ের মধ্যবর্তী পথ হলো লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করা; আবার গর্ব অহংকারও না করা। অবমাননা থেকে বাঁচার জন্য গাম্ভীর্য ও পদমর্যাদা বজায় রাখতে হবে। এতে অহংকার হবে না; বরং বিনয় হবে। অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কেবল আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে হবে। যদি কোনো মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয় তাহলে তাও আল্লাহর জন্য করবে। স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে খোশামোদ তোষামোদ করবে না। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে খোশামোদ করা হয়, সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়, এটা প্রকৃত অর্থে বিনয় নয়; বরং তোষামোদ। আর যদি কোন মহান ব্যক্তিত্বের সামনে আল্লাহর ওয়াস্তে নত হয়েও যায় তাহলে তা হবে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন। সুতরাং অহংকারও জায়েয নয়, নিজেকে লাঞ্ছিত করাও জায়েয নয়। এ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নামই বিনয়। বিনয় প্রদর্শনের সীমা রয়েছে। সে সীমা পর্যন্ত ঝুঁকতে পারা যাবে কিন্তু এ সীমার অতিরিক্ত ঝুঁকতে পারবে না। এসব সীমা শিক্ষা করতে হলে নবী-রাসূলদের তাবলীগ ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন- মনে করুন, সালাম করা একটি সুন্নত; যাকে মুসলমানের হক বা প্রাপ্য বলা হয়েছে। মুসলমানকে অবশ্যই সালাম করবে। কিন্তু সালাম প্রদানের সময় যদি এ পরিমাণ ঝুঁকে যাওয়া হয় যে, রুকু করার মতো দেখায়, তাহলে তা মাকরূহ তাহরীমি হবে। কারণ রুকু করা ইবাদতের একটি বিশেষ অংশ। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যায় না। আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে এই পরিমাণ নত হওয়া জায়েয নয়, যাতে রুকু বা ইবাদতের মতো হয়ে যায়।

সেজদা করা ইবাদত অথচ গায়রুল্লাহকে সেজদা করা জায়েয নয়। যেহেতু ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত, বান্দার জন্য নয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য সেজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীদের আদেশ দিতাম, নিজ নিজ স্বামীকে সেজদা করতে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয নয়। তাই আমি নিষেধ করে দিয়েছি।

হাদীসে রয়েছে– কোনো এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। এসে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তুমি এটা কি করলে?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাট-এর দরবারে দেখেছি, তারা প্রজাদের দিয়ে সেজদা করায়। মন্ত্রীগণ সম্রাটকে সেজদা করে। প্রজারাও সেজদা করে। হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্য সম্রাট সেজদা করাবে অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা অনেক অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বসেরা। কাজেই আপনিই মানুষের মধ্যে সেজদার সর্বাধিক যোগ্য, সর্বাধিক অধিকারী। এ কারণে আমরা আপনাকে সেজদা করব।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– সাবধান! ভবিষ্যতে কখনও এমন করো না। সেজদা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য, তাঁরই জন্য শোভনীয়, অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয নয়। যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা জায়েয হতো তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে আদেশ করতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করার জন্য। সুতরাং রুকু করা, সেজদা করা এবং অন্য এমন সব কাজ যা ইবাদতের অংশ, সবই গায়রুল্লাহর জন্য হারাম, নাজায়েয। কেননা এসব আকার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি ইবাদতের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তাই নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। আল্লাহর সৃষ্টির সামনে লাঞ্ছিত অপদস্ত হওয়াও জায়েয নয়। অহংকারী ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের উপর নিজের গর্ব গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে থাকে, এটাও নিষিদ্ধ। সুতরাং অহংকারও নিষিদ্ধ। আবার হীনমন্যতাবোধও নিষিদ্ধ। কাজেই অপদস্ত হওয়াও নাজায়েয, অহংকার করাও নাজায়েয। আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা হল বিনয়। অতএব মানুষ যদি কারও সামনে নত হয় তাহলে আল্লাহর জন্যই নত হবে। তাহলে এ পরিমাণ নত হবে না, যার দ্বারা ইবাদতের আকার আকৃতি প্রকাশ পায়। এসব বিষয়ের সীমা বর্ণনা করে দেয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছিলেন।

ইত্তেবায়ে শরীয়ত

বোঝা যাচ্ছে, অহংকার প্রকাশে যেমন আমরা স্বাধীন নই তেমনি তাওয়াযু, বিনয় ও মর্যাদাবোধেও স্বাধীন নই। আমরা শরীয়তের শিক্ষা ও বিধি-বিধানের অধীন। শরীয়ত আমাদের যতটা নির্দেশ করবে, ঝুঁকতে বলবে ঠিক সে পরিমাণ নত হব, ঝুঁকে যাব। শরীয়ত যে পরিমাণ মাথা উঁচু করতে নির্দেশ দিবে, সে পরিমাণ উঁচু করব। যে পরিমাণ বিনয় ও অপমান সহ্য করতে বলবে আমরা বিনাদ্বিধায় সে

পরিমাণ গ্রহণ করে নেব। যেখানে শরীয়ত বলবে অহংকারের রূপ ধারণ ক আমরা অহংকারের আকৃতি গ্রহণ করব। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

হে বান্দা! তুমি ভূপৃষ্ঠে গর্বভরে অহংকার করে চলো না। [বনি ইসরাঈল : ৩৭]

কাঁধ উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে অহংকারীদের মতো চলবে না। তুমি দুনিয়াতে বন্দেগী ও দাসত্ব করার জন্য এসেছ। খোদায়ী করার জন্য আসনি। প্রভুত্ব দাবী কর জন্য আল্লাহ একক সত্তাই যথেষ্ট। আমরা বান্দা, দাস। কাজেই বন্দেগী দাসত্ব করব। বান্দাদের মতো চলাফেরা করব।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.

তুমি যে অহংকারের সঙ্গে চলাফেরা করছ, তুমি ভূমণ্ডলকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না, আকাশ ও পর্বতশৃঙ্গ ধরতে পারবে না। [বনি ইসরাঈল : ৩৭]

যে পরিমাণ স্থানে তুমি রয়েছ সেখানেই থেকে যাও। অযথা কেন বিপদ টেনে আনছ? নিজ প্রাণ ও সত্তাকে কেন বিপদগ্রস্ত করছ? এ কারণেই অহংকার গর্বের সঙ্গে চাল-চলনে বাধা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং দীন হল এই– মানু শরীয়তের নির্দেশকে মান্য করে চলবে। তাহলে শরীয়ত যদি কোথা অহংকারের সঙ্গে গর্ব সহকারে চলার নির্দেশ প্রদান করে, আমরা শতবর সেভাবে চলব। যেহেতু আমরা আজ্ঞাবহ দাস। বলা হয়েছে, তাওয়াফের প সায়ী থাকে (বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণের পর সাফা মারওয়ার দৌড়)। তাহলে প্রথ ভাগের চার চক্করে গর্বভরে চলবে। বুক ফুলিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে চলবে, বীরের মতে চলবে। এখানে এটা করা শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব। যদি এভাবে কে না চলে তাহলে সে গুনাহগার হবে।

তাহলে সাধারণ অবস্থায় অহংকারের সঙ্গে চলাকে নিষেধ করা হয়েছে। যদি চলে তাহলে গুনাহগার হবে। এতে বোঝা গেল, মানুষকে সবসময় আজ্ঞাবহ থাকা উচিত। শরীয়ত যে আদেশ দিবে, তার-ই আনুগত্য করবে। যদি শরীয়ত বলে অহংকার কর, তাহলে করবে। যদি বলে ঝুঁকে যাও, নত হয়ে যাও তাহলে ঝুঁকে যাবে, নত হয়ে যাবে। ইসলামের অর্থই হলো এটা; অর্থাৎ আনুগত্য করা সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সীমা সরহদ বর্ণন

করার জন্য আগমন করেছেন। মূল জিনিস মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; কেবল এর সীমা বর্ণনা করার জন্যই তিনি এসেছেন।

চারিত্রিক গুণাবলী ও জন্মগত স্বভাব ঠিক রাখে ইসলাম

মানুষের মাঝে অহংকার হীনমন্যতা, অপমান ও লাঞ্ছনার বোধশক্তিও রয়েছে। শরীয়ত কোন শক্তিকেই নষ্ট ও ধ্বংস করেনি; বরং উভয় শক্তিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য বলেছে। আর বলেছে, যেখানে যে শক্তি ব্যবহার করার জন্য আমি নির্দেশ দিই সেখানে তার ব্যবহার কর। অহংকারও কাজে লাগবে, যখন কাফেরদের মোকাবেলা করতে যাও, তখন বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বাহু উঁচিয়ে অহংকার ও গর্বের সঙ্গে চল। যেন তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। আর যখন ঈমানদারদের সামনে আস, তখন নম্র হয়ে যাও। নত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে চল। যেন তোমাদের দয়া কোমলতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। তাই শরীয়ত উভয় শক্তিকে অক্ষুণ্ন রেখেছে, ধ্বংস করেনি। তাহলে ব্যবহারের স্থান নির্দেশ করে দিয়েছে মাত্র। পদ্ধতি বলে দিয়েছে– এর ব্যবহার এভাবে হবে। অতএব ইসলাম এ কারণে আসেনি যে, মানুষের অন্তর্নিহিত কোন শক্তি ধ্বংস করে দেবে।

যে শক্তি আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন, জন্মগতভাবে ও প্রকৃতিগতভাবে তাকে নষ্ট করে দিবে না; বরং সঠিক স্থান সঠিক পন্থায় ব্যবহারের শিক্ষা দিতেই ইসলাম এসেছে।

যেমন ক্রোধশক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন একজন সাহাবী (রা.) আরজ করলেন–

عِظْنِىْ يَارَسُوْلَ اللهِ وَاَوْجِزْ

হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দান করুন এবং সংক্ষেপে করুন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِيَّاكَ وَالْغَضَبْ

ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করো, বাস!

প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ থেকে উত্তেজনা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা যত বেশি পয়দা হবে, সে অনুযায়ী ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে। রাগের বশীভূত হয়ে মানুষ যখন জ্ঞানহারা হয়ে যায় তখন সে নিজেকে নিজ আয়ত্বে রাখতে ব্যর্থ

করার জন্য আগমন করেছেন। মূল জিনিস মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; কেবল এর সীমা বর্ণনা করার জন্যই তিনি এসেছেন।

চারিত্রিক গুণাবলী ও জন্মগত স্বভাব ঠিক রাখে ইসলাম

মানুষের মাঝে অহংকার হীনমন্যতা, অপমান ও লাঞ্ছনার বোধশক্তিও রয়েছে। শরীয়ত কোন শক্তিকেই নষ্ট ও ধ্বংস করেনি; বরং উভয় শক্তিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য বলেছে। আর বলেছে, যেখানে যে শক্তি ব্যবহার করার জন্য আমি নির্দেশ দিই সেখানে তার ব্যবহার কর। অহংকারও কাজে লাগবে, যখন কাফেরদের মোকাবেলা করতে যাও, তখন বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বাহু উঁচিয়ে অহংকার ও গর্বের সঙ্গে চল। যেন তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। আর যখন ঈমানদারদের সামনে আস, তখন নম্র হয়ে যাও। নত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে চল। যেন তোমাদের দয়া কোমলতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। তাই শরীয়ত উভয় শক্তিকে অক্ষুণ্ন রেখেছে, ধ্বংস করেনি। তাহলে ব্যবহারের স্থান নির্দেশ করে দিয়েছে মাত্র। পদ্ধতি বলে দিয়েছে– এর ব্যবহার এভাবে হবে। অতএব ইসলাম এ কারণে আসেনি যে, মানুষের অন্তর্নিহিত কোন শক্তি ধ্বংস করে দেবে।

যে শক্তি আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন, জন্মগতভাবে ও প্রকৃতিগতভাবে তাকে নষ্ট করে দিবে না; বরং সঠিক স্থান সঠিক পন্থায় ব্যবহারের শিক্ষা দিতেই ইসলাম এসেছে।

যেমন ক্রোধশক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন একজন সাহাবী (রা.) আরজ করলেন–

عِظْنِىْ يَارَسُوْلَ اللهِ وَاَوْجِزْ

হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দান করুন এবং সংক্ষেপে করুন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِيَّاكَ وَالْغَضَبْ

ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করো, বাস!

প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ থেকে উত্তেজনা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা যত বেশি পয়দা হবে, সে অনুযায়ী ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে। রাগের বশীভূত হয়ে মানুষ যখন জ্ঞানহারা হয়ে যায় তখন সে নিজেকে নিজ আয়ত্বে রাখতে ব্যর্থ

হয়। তখনই ঝগড়া-ফাসাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক কিছু ঘটে যায়। কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

হে নবী! কাফের মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রকাশ করুন। [তাওবা : ৭৩]

এখানে ক্রোধ দেখানোর জন্য বলা হয়েছে। তাই বলছি, শরীয়ত এজন্য আসেনি যে, ক্রোধশক্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্তর থেকে বের করে দিবে। বরং এজন্য এসেছে যে, ক্রোধকে সংরক্ষণ কর এবং যথাস্থানে এর ব্যবহার কর। আমি যেখানে বলি সেখানে ব্যবহার কর। যেখানে আমি নিষেধ করি সেখানে ব্যবহার করো না। তা থেকে বিরত থাক। এ ক্রোধ আমার দানকৃত একটি শক্তি, একে ধ্বংস ও নষ্ট করে দেয়ার অধিকার নেই।

এমনি এক শক্তি রয়েছে কামশক্তি। শরীয়ত বলে না যে, এ শক্তি নির্মূল করে দাও। যদি এ শক্তি নষ্ট ও ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে বংশ বিস্তার হবে কেমন করে? তাহলে শরীয়ত এটা বলেছে, এ কামশক্তিকে ব্যভিচারে ব্যবহার করো না। বিয়ে শাদী করে এর ব্যবহার কর। শরীয়ত ব্যবহারের স্থানও বলে দিয়েছে– কোথায় বিভাবে ব্যবহার করবে এবং কি পরিমাণ ব্যবহার করবে।

চারিত্রিক ও স্বভাবগত শক্তিকে সংরক্ষণ করে ইসলাম

সারকথা হলো, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বেশ কিছু শক্তি রেখেছেন এবং এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। এগুলোর ব্যাপারে মানুষ আমানদার। মানুষের এ অধিকার নেই, এসব শক্তিকে নিজ ইচ্ছা মতো নিজের খাহেশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবে। বরং যাঁর দেয়া আমানত তাঁরই নির্দেশানুযায়ী চলতে হবে।

আপনার কাছে যদি কোন লোক টাকা আমানত রাখে, তাহলে আপনার জন্য তা ব্যয় করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি অনুমতি না দেন। আর অনুমতি দানকারী মালিক যদি বলে, 'আপনি ব্যয় করতে পারেন কিন্তু অমুক খাতে' যেমন বাড়ি কিনতে পারেন, অন্য খাতে ব্যয় করার অনুমতি নেই; তাহলে যে স্থানে বা যে খাতে ব্যয় করার অনুমতি দেয়া হবে সে খাতেই ব্যয় করতে পারবেন। তার অনুমতি ছাড়া ব্যয় করার অধিকার আপনার নেই। মাসয়ালা হল, আমানত যখন রাখা হয় তখন ঠিক ঐ জিনিসটি ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

যেমন- আপনার কাছে একশ' টাকা আমানত রাখা হল। যে ধরনের টাকা রাখা হয়েছিল ঠিক ঐ টাকাই বুঝিয়ে দিতে হবে। এটা করা যাবে না যে, আপনি ঐ টাকা ব্যয় করে পরে সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দেবেন। এটা জায়েয হবে না। আমানতের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ জিনিসই ফেরত দেয়া ওয়াজিব। যদি আপনি ব্যয় করতে চান, তাহলে আপনাকে মালিকের অনুমতি নিতে হবে। যদি সে অনুমতি দান করে তাহলে ব্যয় করতে পারবেন এবং চাওয়া মাত্র তা ফেরত দিতে হবে। এ অবস্থায় মূল জিনিসকে পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ অনুমতি থাকলেই কেবল সমপরিমাণ অন্য জিনিস বা অন্য টাকা ফেরত দেয়া আপনার জন্য জায়েয হবে।

সারকথা, এই শরীর, রূহ বা আত্মা ও অন্তর্নিহিত শক্তি এবং গুণাবলী এসবের প্রকৃত মালিক ও অধিকারী আল্লাহ তায়ালা, আপনি নন। যদি আপনি মালিক হতেন তাহলে নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে যেতেন। আপনাকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করা, তৈরি করার প্রয়োজন হতো না। আপনি যখন আপনার সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী তখন মালিকও তিনিই। আল্লাহ তায়ালা যখন শরীরের মালিক, তখন শরীরের অভ্যন্তরে নিহিত যেসব শক্তি ও গুণাবলী রয়েছে, তারও তিনিই মালিক। আত্মার যেসব গুণাবলী শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে, এর সবকিছুরই মালিক তিনি। আপনার পক্ষে স্বাধীনভাবে এসব ব্যবহার করা জায়েয নয়। যে পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত না হন। সুতরাং আল্লাহ যেভাবে যেখানে তাঁর দেয়া আমানত আপনাকে ব্যয় ও ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তা ব্যবহার করবেন। আর যখন তিনি ফেরত দেয়ার জন্য তলব করবেন তখন ঠিক ঐ জিনিসই আপনাকে ফেরত দিতে হবে। তখন আপনার জন্য এমন বলা জায়েয হবে না, ঐ দেহ তো ব্যবহার করিনি। সে আত্মহত্যা করেছে, এখন আপনি অন্য দেহ তৈরি করে নিন– এটা হবে না; অবিকল ঐ দেহটাই ফেরত দিতে হবে।

এ কারণেই আত্মহত্যা করা হারাম বলা হয়েছে। আত্মহত্যা করা জায়েয নয়। এ হলো আল্লাহ তায়ালার আমানত। আপনার কি অধিকার আছে একে নষ্ট ও ধ্বংস করে দেয়ার? আপনি আমানতদার, আপনাকে আমানতের জিনিস অবিকল ফেরত দিতে হবে। যখন মৃত্যুর ফেরেশতা আসবেন, অবিকল, অবিকৃত অবস্থায় দেহমন ফেরত দিতে হবে। আমার প্রাণ, আমার শরীর, আমার নিজের নয়। আপনি যেহেতু শরীর মন কোনো কিছুরই মালিক নন, তাহলে এসবের ইচ্ছা মতো ব্যবহারের মালিক আপনি কেমন করে হবেন? আর এদের মধ্যে যেসব শক্তি ও গুণাবলী রয়েছে তারই বা মালিক ও অধিকারী আপনি হবেন কেমন করে? এসবের মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই।

সারকথা, আপনার মাঝে কামশক্তি রেখে দিয়েছেন, ক্রোধশক্তি রেখে দিয়েছেন, বিনয়ের শক্তি রেখে দিয়েছেন, গর্ব-অহংকারের শক্তি রেখে দিয়েছেন, আমানতদারীর শক্তি রেখে দিয়েছেন, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদ করার শক্তিও রেখে দিয়েছেন। এসবই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি। আপনাকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, কোথায় কোথায় এর ব্যবহার করবেন। কাম ও ক্রোধশক্তি কোথায় ব্যবহার করবেন। আমানতদারীর শক্তি কোথায় ব্যবহার করবেন। এর সবই আপনার জেনে নিতে হবে।

মানবীয় গুণ ও শক্তি প্রয়োগে শরীয়তের নির্দেশই গ্রহণযোগ্য

আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়েছেন কামশক্তিকে বিয়ের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে ব্যবহার করতে। তারপর বিয়ের পাত্রী কে হবে তা শরীয়তই বলে দিবে। যদি বিয়ে কর তাহলে মায়ের সঙ্গে তা জায়েয নয়, বোনের সঙ্গে নয়, ফুফুর সঙ্গেও বিয়ে জায়েয নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ اللّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ○

তোমাদের জন্য তোমাদের মাতাগণকে (বিয়ে করা) হারাম করে দেয়া হয়েছে, তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নিগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের আপন ভাতিজিগণ, তোমাদের স্ত্রীগণের মাতাগণ, তোমাদের দুধ প্রদানকারিনী দুধ মাতাগণ, দুধ সম্পর্কীয় ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীগণের মাতাগণকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। [নিসা : ২৩]

শরীয়ত যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে কামশক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির কথাও বলে দিয়েছে– অমুক অমুককে বিয়ে করো না। বিয়ে শুদ্ধ হবে না। শরীয়ত যে যাকে বিয়ে করতে বলবে আপনি সে ব্যক্তিকেই কেবল বিয়ে করতে পারবেন। [নিসা : ২৩]

ক্রোধশক্তির ক্ষেত্রেও তাই। এ শক্তি ব্যবহারেও আপনি স্বাধীন নন। স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনাকে এ শক্তি ব্যবহারের পূর্বে শরীয়তের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতে হবে– কোথায় এর ব্যবহার করবেন। অতএব পিতার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ জায়েয নয়। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

মা-বাবা যখন আসবেন, তখন বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করে দাও, অপারগ অসহায়ের ন্যায় তাদের সামনে ঝুঁকে যাও। আর কেবল ঝুঁকে যাওয়াই নয়; বরং মুখ থেকে এমন শব্দ বের করো না, যার কারণে তাদের হৃদয় ব্যথিত হয়, দুঃখিত হয়– এমন কোন কথা বলো না। [বনি ইসরাঈল : ২৪]

শুধু তাই নয়, এসব তো তখন করা হবে যখন মা-বাবা সামনে থাকবেন। আদবের সঙ্গে নত হয়ে যাবে। আদবের সঙ্গে কথা বলা, তারা যদি অনুপস্থিতও থাকেন, তখনও তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করো এবং বলো–

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার প্রতি দয়া করো, তাঁরা যেমন আমার প্রতি আমার শৈশবে দয়া করেছিলেন। [বনি ইসরাঈল : ২৪]

আমাকে লালন-পালন করে ছোট থেকে বড় করেছেন। ঐ সময় যখন আমি দুর্বল অসহায় ছিলাম, তাদের দয়া আর লালন পালনে আমি আজ চলাফেরা করার যোগ্য হয়েছি। নিজে কাজকর্ম করতে পারছি। কাজেই যাঁরা কষ্ট করে আমাকে যোগ্য করেছেন, অসহায় অবস্থায় আমার প্রতি দয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের অসহায় অবস্থায় তাদের প্রতি দয়া কর। মা-বাবার অনুপস্থিতিতেও তাদের জন্য দোয়া করা দরকার। যদি সামনে আসেন তাহলে মন্দ কথা বলো না। এমন কাজ করো না, যার দ্বারা তাঁরা মনে ব্যথা পান।

অহংকার, গর্ব, ক্রোধ প্রকাশ করার পাত্র মাতা-পিতা নন। এভাবে উস্তাদের সামনেও অহংকার করা জায়েয নয়।

উস্তাদের প্রতি সম্মান

হযরত আলী (রা.) বলেন–

اَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا ○ اِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ عَتَقَ

আমি ঐ ব্যক্তির ক্রীতদাস, যে আমাকে একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন; ইচ্ছে করলে তিনি আমাকে বিক্রিও করে দিতে পারেন আবার আজাদও করে দিতে পারেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) একটি ফিকহী মাসআলা 'শূকর' সম্পর্কে জানার প্রয়োজন বোধ করলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত মেথরদের চেয়ে বেশি আর কারো জানা ছিল না। কারণ, তারা শূকর লালন পালন করে। তাই হযরতের বাড়ির মেথর যখন আসল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– শূকরের অমুক বিষয়টি কেমন, বল তো? মেথর বলল– হুজুর! এ বিষয়টি এমন এমন। এরপর থেকে মাওলানার অবস্থা হলো এমন, মেথর যখন কাজে আসত, তিনি বসা থেকে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাকে হাদিয়া পাঠাতেন, তার খেদমত করতেন এবং বলতেন– অমুক মাসয়ালা সম্পর্কে সঠিক তথ্য ঐ মেথরের কাছে পাওয়া গিয়েছে। তাই সে আমার উস্তাদের মতো। তিনি সারাজীবন তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

ইসলাম উস্তাদের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে। যদি কারও কাছে তুমি একটি অক্ষরও শিখে থাক তবুও তার সামনে চোখ তুলে কথা বলার অনুমতি তোমার নেই।

ইলম ও জ্ঞান বিতরণ মহাদান ও দয়া

কেউ যদি আপনাকে পয়সা দান করে তাহলে আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে মানুষ তার সন্তানদের ওসিয়ত করে যায়, অমুক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হল। এর ফলে একটি মাসয়ালার উদ্ভব হল। ইলম পৃথিবীর সব কিছু থেকে উত্তম। ইলম হল আল্লাহ পাকের গুণ। অতএব এর চেয়ে বেশি মূল্যবান ও সম্মানের জিনিস আর কি হতে পারে? সুতরাং কেউ যদি অন্যকে ইলম শিক্ষা দেয় তাহলে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী হবে না কেন। ঐ ব্যক্তির চেয়ে মহৎ ও উপকারী আর কেউ আছে কি যে একটি মাসয়ালা শিখিয়ে দেয়। এই লোকটি ইহ-পরকালের পথ সহজ করে দিল, পরিষ্কার করে দিল।

পয়সা দিয়ে যদি কোন কাজ হয় তাহলে দুনিয়ার কাজ হবে। আর ইলম দিয়ে পরকাল তথা কবর, হাশর এবং দুনিয়াতেও উপকার হবে। জ্ঞান ও ইলমের মর্যাদা সবখানে চালু এবং বেশি। আখেরাতে সোনা-রূপা কোন কাজে আসবে না, কিন্তু ইলমের মর্যাদা থাকবে। তাছাড়া জান্নাতে যাওয়ার পরও মাসাইলের দরকার থাকবে। তাই সেখানেও আপনি ইলমের মুখাপেক্ষী থাকবেন।

যে ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞানের ধন দান করে, তার চেয়ে বেশি কল্যাণকামী আপনার আর কে হতে পারে? আপনি যদি চার পয়সা দানকারীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, তাহলে একটি মাসয়ালা শিক্ষাদানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না কেন? সে সর্বোত্তম দৌলত আপনাকে দান করেছে, ইলম ও জ্ঞানের দৌলত সোনা-রূপার চেয়েও বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

ইলম ও সম্পদের পার্থক্য

সাহাবী হযরত আলী (রা.) বলেন– 'ইলম ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– সম্পদ যত ব্যয় করা হবে, ততই কমতে থাকবে; আর ইলম যত ব্যয় করা হবে, ততই তা বাড়তে থাকবে।' যদি দানে ইলম কমে যেত, তাহলে কুরআনের হাফেযগণ যে পরিমাণ আয়াত ছেলেদেরকে শিক্ষা দিতেন সে পরিমাণ নিজে ভুলে যেতেন। তার ইলম অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যেত। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, যতই শিক্ষাদান করতে থাকেন উস্তাদ প্রবীণ হতে থাকেন আর ইলম উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। সারকথা, ইলম যতই ব্যয় করা হবে ততই তা বাড়তে থাকবে। আর ধন-সম্পদ যতই ব্যয় করা হবে ততই কমতে থাকবে।

এর দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে– সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ মালিককে করতে হয়। চার পয়সা হলেও আপনাকে ভাবতে হয়, চোর যেন তা নিয়ে না যায়। তালা লাগিয়ে রাখবেন। ব্যাংকে রাখবেন। ঘরের নিরাপদ জায়গায় রাখবেন। শুয়েও চিন্তায় থাকেন, রাতে কোনো চোর এসে নিয়ে যেতে পারে। খুবই সতর্কতার সঙ্গে আপনাকে সম্পদের হেফাজত করতে হয়। আর ইলম নিজেই আলেমের হেফাজত করে। আলেম কারো মুখাপেক্ষী নয়। তার ইলমই বলে দেবে, এ পথ মুক্তির, এ পথ ধ্বংসের আর এ পথ হচ্ছে বিপদ-সংকুল। ইলম নিজেই আলেমের হেফাযত করে; তাহলে সম্পদ তার মালিকের হেফাজত করতে পারে না। বরং মালিককে উল্টো সম্পদের হেফাজত করতে হয়। এখানে পরিষ্কার হয়ে গেলো– সম্পদ যদি আসে তাহলে সঙ্গে নিয়ে আসবে শত বিপদাপদ, চোর ডাকাত, ভয়ভীতি প্রভৃতি। অন্যদিকে ইলম যদি আসে তাহলে তা দান ও দয়া নিয়ে আসবে। সে তোমার রক্ষক, সে তোমার খেদমত ও সেবা করবে। ইলম

তোমাকে মুক্তির পথ দেখাবে। সুতরাং ইলমের মতো মূল্যবান জিনিস কেউ যদি দান করে তাহলে সে সর্বোত্তম মুহসিন ও কল্যাণকামী বলে বিবেচিত হবে। কারণ সে পরকালের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ইলম ছাড়া সম্পদ

সম্পদের মাধ্যমে জীবনধারা সুগম হয় না। বরং এর দ্বারা মানুষের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যদি ইলমের দেখানো পথে ধন উর্পাজন করা হয়, হালাল হারামের পার্থক্য না করা হয় তাহলে এ সম্পদ বিপদের কারণ হয়ে যাবে।

এই পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা হলে এ সম্পদ বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো দেখা যায়, যাদের কাছে অবৈধ উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদ থাকে তারা এখন কতই না অসহায় বিপদগ্রস্ত। তারা বলছে এসব অবৈধ ধন-দৌলত সরে যাক এবং প্রাণ রক্ষা হউক। কেউ পাহাড় পর্বতে সম্পদ লুকিয়ে রাখছে। কেউ সাগরে নিক্ষেপ করছে কিন্তু সরকার তালাশ করে করে এসব ধন-দৌলত সংগ্রহ করছে। বর্তমানে সম্পদশালীরা দারুণ মসিবতের সময় পার করছে।

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী, বর্তমানে আমাদের মত মানুষ, যারা বলতেন অল্প মালই (প্রয়োজন মতো) ভাল। আজ তারা সম্পদশালীদের বলতে পারবেন, আমরা নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করছি। তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের কোন উপকারে আসেনি। দারিদ্র্যই আমাদের উপকার করছে।

کس نیاید بخانہ درویش ☆ کہ خراج زمین وباغ بدہ

দরবেশদের ঘরে সরকারের কোন মানুষ যায় না ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় করতে।

যদি যায়, দরবেশ উত্তর দিবে, আমার হাতে কিছুই নাই। আমি দেব কোথা থেকে। তিনি শান্তিতে আছেন। আর যার হাতে অনেক বেশি ধন-সম্পদ রয়েছে, সে বিপদে নিমজ্জিত। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন–

ما پیچ نداریم غم پیچ نداریم ☆ دستاریم غم پیچ نداریم

আমাদের কিছুই নেই কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই, আমাদের পাগড়ি নেই, পাগড়ি বাঁধার চিন্তাও নেই। যার মাথায় পাগড়ি রয়েছে তার চিন্তা তো পাগড়ির প্যাচ ঠিক হল কিনা। এখানে তো পাগড়িই নেই–

جامہ ندارم ☆ دامن از کجا رم

কাপড়ই নেই, কলি এবং হাতার চিন্তা হবে কেন?

সারকথা, যাদের কাছে পরিমাণ মতো সম্পদ রয়েছে তারাই আজ নিরাপদ ও শান্তিতে আছেন, আর যাদের কাছে অনেক মাল-সম্পদ রয়েছে তারাই বিপদে আছেন।

কেন বিপদে আছেন? কেবল বেশি সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে? না, তা নয়। ইসলাম এ কথা বলেনি, তোমরা গরীব ও কমর্দকহীন হয়ে থাক। যেহেতু অবৈধভাবে অনেক সম্পদ কুক্ষিগত করছো, সে কারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছো। যার কাছে জায়েয ও বৈধ সম্পদ রয়েছে, সে আজ শান্তি ও নিরাপদে আছে। তার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই।

অতএব বোজা গেল, জায়েয ও বৈধ পথ অবলম্বন করে চলা সব সময় শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে থাকে। আর অবৈধ পথ ও পন্থাই আপদ-বিপদের কারণ হয়ে থাকে। তা শরীয়তের বিধানে অবৈধ হউক অথবা সরকারের বিধানে অবৈধ হউক। মানুষ যখন কোন অবৈধ কাজ করবে, তখন সে বিপদগ্রস্ত হবেই। জায়েয নাজায়েয বৈধ-অবৈধ সম্পর্কে অবহিত হবে কেমন করে? উত্তর হলো– ইলম ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। আইন ও বিধান এ কথা শিক্ষা দিবে যে, এ কাজ বৈধ এ কাজ অবৈধ। এভাবে ধন-দৌলত উপর্জন করো না, আইন তা সমর্থন করে না, অনুমতি প্রদান করে না। বরং এ কথাটি উলামায়ে কেরামই বলবেন– এভাবে উপার্জন হালাল, এভাবে উপার্জন হারাম। এভাবে সম্পদ সঞ্চয় করা জায়েয, এভাবে নাজায়েয। উভয় আইনের (শরীয়তের ও সরকারের) আইনজ্ঞ হলেন উলামায়ে কেরাম। তারা বর্ণনা করবেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। মানুষ যখন বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন, হৃদয়ঙ্গম করে নিবেন এবং ঐ আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন তখন তার কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। তার উপর সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবে না। আল্লাহ তায়ালাও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। বোঝা গেল, আত্মরক্ষার মাধ্যম হল ইলম। ধন-দৌলত নয়। সম্পদের সঙ্গে যদি ইলমও থাকে তাহলে তার হেফাজত হবে। আর যদি নীতিবহির্ভূত অবৈধ উপার্জন হয়, তাহলে বিপদের কারণ হবে। সুতরাং মুক্তি প্রদানকারী বস্তু হলো ইলম।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا.

আমি তোমাদেরকে ইলম দান করার জন্য এসেছি।

ইলমই মুক্তির দিশারী। দুনিয়াতে তোমরা যদি ইলম লাভে সমর্থ হও, তাহলে ইলমই বলে দিবে এ পথ ভুল, এ পথ সঠিক। আর তোমরা যদি সে অনুযায়ী জীবন যাপন করো তাহলে কখনও তোমাদের উপর বিপদাপদ আসবে না। না দুনিয়াতে, না কবরে, না পরকালে। কোথাও না। সারকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষক হিসেবে আগমন করেছেন। তিনি ইলম পৌঁছে দিয়েছেন। এই ইলমের মাধ্যমেই সম্পদ বিশুদ্ধ হয়, নফস সংশোধিত হয়, মান-সম্মানও রক্ষা পায়। আর যদি ইলম না থাকে, তাহলে ধন-দৌলত, নফস প্রবৃত্তি, মন-মানসিকতা কোন উপকারে আসে না।

ইলম ছাড়া নফসের আবেগ

মানসিক আবেগ-উদ্দীপনাকে যদি আপনি ইলমশূন্য অবস্থায় ব্যবহার করেন, তাহলে বিপদে পতিত হবেন। আপনি বাজারে গেছেন। মিষ্টির দোকানে নানা ধরনের টাটকা ও উত্তম মিষ্টি তৈরি আছে। আপনার আবেগের চাহিদা হবে– থাবা দিয়ে মিষ্টি মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া। কিন্তু ইলম যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে সে ইলম বলবে– অন্যের মালে হাত দেয়া জায়েয নয়। যে পর্যন্ত তার অনুমতি না পাওয়া যায়। আর যদি ইলম না থাকে, কেবল আবেগ আর আবেগই থাকে, তাহলে মানুষ হয়ত চুরি করবে, ডাকাতি করবে অথবা যে কোনো অন্যায় কাজ করে পালাতে চেষ্টা করবে। আর মানুষ তার পেছনে গালি দিতে দিতে ধাওয়া করবে। হাতে মিষ্টি থাকবে দুটি। আর পকেটে থাকবে দুটি– এভাবে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত দোকানদার পেছন থেকে ঘাড় ধরে ফেলবে। আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যাবে। তার সম্পর্কে ধারণা করা হবে– সে ডাকাতি করেছে, নয়তো চুরি করে মাল নিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাকে আদালতে চালান করবে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে। চারদিকে তার অপবাদ ছড়িয়ে পড়বে। যার সাথে দেখা হবে সে-ই তাকে ঘৃণার সঙ্গে থুথু দিবে। বলবে, লোকটি খুবই দুশ্চরিত্র ও জঘন্য।

মোটকথা, যত অপমান তার ভাগ্যে। সরকার তার উপর নাখোশ। লাঞ্ছিত হতে হবে তাকে। প্রশাসক পুলিশ তার উপর নাখোশ। জনসাধারণ তার উপর নাখোশ, দোকানদার তার উপর নাখোশ– সকলেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। সকলই তার প্রতি হবে নারাজ। তাকে গালি দেয়া হবে, অপমান করা হবে। এ সবের কারণ কি? কারণ হলো, প্রবৃত্তির তাড়নায় সে কাজটা করেছিল। ইলম তার কাছে ছিল না। সে মূর্খের মতো কাজ করেছিল।

ইলম যদি থাকতো, তাহলে মিষ্টির দাম জিজ্ঞেস করা হত। জিজ্ঞেস করা হতো– মিষ্টির দাম কত? দোকানদার একটি মূল্য অবশ্যই বলত; আপনিও বিবেচনা মত কিছু বলতেন– এত নিন, ইত্যাদি। এরপর যদি মিষ্টি নিতেন, তাহলে দোকানদারও মন্দ বলতো না, পুলিশও পাকড়াও করত না। সরকারও অসন্তুষ্ট হতো না। আপনারও কোন অসুবিধা হতো না, পেরেশানী হতো না। বোঝা গেলো, কেবল প্রবৃত্তিগত আবেগ মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি এ আবেগকে সঠিক ইলম অনুযায়ী সঠিক স্থানে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এসব আবেগ উপকারী হতে পারে। সুতরাং ইলম মুক্তিদাতা বলে প্রমাণিত হল। এ জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اَعْدٰى عَدُوِّكَ الَّذِىْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ

সবচে' নিকৃষ্ট প্রতারক শত্রু তোমার বাহুদ্বয়ের মাঝে রয়েছে।

তাকে বলা হয় নফস। একে আয়ত্তে আনা ও অনুগত করতে যদি তুমি সক্ষম হও তাহলে কোন বিপদ নেই। কোন আশংকা নেই। আর যদি নফস স্বাধীন থাকে তাহলে সব খানেই সে তোমাকে বিপদগ্রস্ত করবে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের নফস জন্মগতভাবে মূর্খ। মানুষ যদি ইলম হাসিল না করে, জ্ঞান অর্জন না করে, তাহলে সে জন্মগ্রহণ করেছে যেমন জাহেল হিসেবে তেমন জাহেলই থেকে যাবে। যেসব কাজকর্ম সে করবে জাহেলদের মতো করবে। সে আলেম ও জ্ঞানীর মতো কাজকর্ম করবে কেমন করে? সে মূর্খের মতো কাজ করবে, আবেগের তাড়নায় পরিচালিত হবে। তখন লজ্জিত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। এবার চিন্তা করা যাক, যার কারণে অপমান-লাঞ্ছনা আসে সে শত্রু না মিত্র। জঘন্যতম শত্রু সেই যার কারণে মানুষ অপদস্ত হয়, যার কারণে বিপদগ্রস্ত হয়। এজন্য মানব প্রকৃতি যদি ইলমের অলংকারে সজ্জিত করা না হয়, আবেগ উদ্দীপনাকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে প্রতি মুহূর্তে গর্তে পতিত হওয়ার ভয় থাকবে এবং বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকবে।

মানুষের প্রবৃত্তির উদাহরণ

এ কারণে মনীষীরা অবাধ্য দুষ্ট ঘোড়ার সঙ্গে প্রবৃত্তির উদাহরণ দিয়ে থাকেন। তারা বলেন যে, যখন তুমি অবাধ্য-দুষ্ট ঘোড়ার উপর আরোহণ কর, তখন শক্ত ও কঠোর হাতে লাগাম ধরে বসে থাকে। যদি লাগাম ঢিলা হয়ে যায়, তাহলে

ঘোড়া তীব্রবেগে আয়ত্তের বাইরে দৌড়াতে শুরু করবে। আর কোথায় নিয়ে নিক্ষেপ করবে তা কেউ বলতে পারে না। তখন প্রাণ রক্ষা করাই হবে কঠিন। অতএব মানব প্রকৃতি যে পর্যন্ত মূর্খ জাহেল থাকবে, সে পর্যন্ত অবাধ্য দুষ্ট থাকবে। তার লাগাম কঠোরভাবে ধরতে হবে। তবে কঠিন হাতে লাগাম ঐ ব্যক্তিই ধরতে পারে, যে জানে লাগাম কিভাবে ধরতে হয়, কিভাবে ঘোড়াকে বাধ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ইলমের কথাই এসে যায়। ইলম ছাড়া নফসের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করা যাবে না।

সুতরাং সব মানুষের নফসই যেন অবাধ্য ঘোড়া। যে পর্যন্ত এর মুখে লাগাম দেয়া না হবে ততক্ষণ মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না। ঐ লাগামই হলো শরীয়ত যা মানুষকে রক্ষা করে, পরিচালনা করে। যদি এ লাগাম খুলে ফেলা হয় আর নফসের উপর ভরসা করা হয়, তাহলে এ নফস তাকে কোন অন্ধকার কূপে, অপমানের কোন গহ্বরে নিক্ষেপ করবে তা জানা নেই। ইলম মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার পথে পরিচালিত করে, আর মূর্খতা অবমাননার পথে পরিচালিত করে। ইলম ঐ সম্পদ যা যতই দান করা যায় ততই বৃদ্ধি পায়, উপকারে আসে। আর মূর্খতা ও প্রবৃত্তির আবেগ এমন নিকৃষ্ট, যা মানুষকে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়।

সুতরাং নবী-রাসূলগণ থেকে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ হতে পারে না। তারা বিশ্ববাসীকে ইলম দান করার জন্য এবং মূর্খতা দূর করার জন্য আগমন করেন।

পার্থিব ইলমের উপকারিতা

পৃথিবীতে অনেক ধরনের ইলম রয়েছে এবং প্রতিটি ইলমের প্রয়োজনও মানব সমাজে রয়েছে। এমনকি জুতা সেলাই করার বিদ্যারও প্রয়োজন রয়েছে। কাপড় সেলাই করার বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন কাপড়ের প্রয়োজন থাকবে। জুতার প্রয়োজনও থাকবে। মানুষ দুনিয়াতে থাকলে কাজকর্ম করবে। প্রয়োজন হবে যানবাহনে একস্থান হতে অন্যস্থানে যাওয়ার। খাওয়ার প্রয়োজন হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল নিয়ে যাতায়াত করতে হবে। এজন্য রেলগাড়ির প্রয়োজন, জাহাজ প্রয়োজন এবং বিমানও দরকার। অতএব এসব জিনিসের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাও উপকারী। এই জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীতে চলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

এমনিভাবে মানুষের জন্য কারিগরের প্রয়োজন রয়েছে। যদি বাসনপত্র না থাকে, তাহলে আহার করবে কেমন করে? যদি চেয়ার না থাকে তাহলে বসবে কিসের

উপর? তখন বসার অভাব হবে। যদি খাট পালঙ্ক না থাকে তাহলে আরামে শোয়া যাবে না। সারকথা, এসব বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। তবে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান উপকারে আসবে শুধু দুনিয়াতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। যখনই মারা যাবে, তখন আর উড়োজাহাজ কোন কাজে আসবে না। খাট-পালঙ্ক, চেয়ার কোন কাজে আসবে না। সব বেকার অকেজো। এসব জিনিসের উপকারিতা মানব সমাজে দুনিয়াদারীর জন্য। উড়োজাহাজ আপনাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এখান থেকে করাচী যেতে চান তো করাচী পৌঁছে দিবে। রূহের জন্য বিমানের দরকার নেই। আপনি যদি আত্মাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেন তাহলে সে মুহূর্তে আরশে পৌঁছে যাবে। যানবাহন দেহের জন্য প্রয়োজন, দুনিয়াদারির জন্য দরকার। এ কারণেই এসব জিনিস আবিষ্কার করতে হয়েছে। জুতা আপনার পা হেফাজত করে। কাপড় আপনার লজ্জা নিবারণ করে, আরাম দান করে। সারকথা এসব জিনিসের প্রয়োজন তখন পর্যন্ত থাকবে যে পর্যন্ত শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন না হবে। যখন রূহ দেহত্যাগ করবে তখন দেহ ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায় সবই আপনার জন্য বেকার বা অদরকারি হয়ে যাবে।

উড়োজাহাজে উড়ে আপনি লন্ডনে বা করাচী যেতে পারেন, কিন্তু উড়োজাহাজে আরোহণ করে জান্নাতে পৌঁছে যাবেন, আরশ সফর করবেন, আকাশে ভ্রমণ করবেন, তা হবে না। এতে বোঝা গেল, এসব জিনিস উপকারী; তবে শরীরের মধ্যেই এ উপকার সীমাবদ্ধ, রূহের কোনো উপকারে আসবে না। এগুলো রূহের মধ্যে উন্নত ও পবিত্র স্বভাব চরিত্র সৃষ্টি করে দিতে পারবে না। উড়োজাহাজের কাজ এটা নয়। আপনি উত্তম পোশাক পরুন; তবে উত্তম পোশাক আপনার মধ্যে ধৈর্য ও লজ্জা পয়দা করে দিতে পারবে না। কাপড়ের কাজ এটা নয়। আপনি অত্যন্ত সুন্দর করে পাগড়ি বাঁধুন, উঁচু করে বাঁধুন। আপনাকে অত্যন্ত জ্ঞানী সম্মানী ও সভ্রান্ত ব্যক্তি মনে হবে, কিন্তু আপনার অন্তরে সম্মান পয়দা হবে না। অন্তরে সম্মান পয়দা করে দেয়া পাগড়ির কাজ নয়। কিংবা জুতা ও পাগড়ি প্রস্তুতকারক এসে আপনার চরিত্র গঠন ও সংশোধন করে দিবে, তাও হবে না। তার কাজ হলো জুতা তৈরি করা। জুতা তৈরির মাধ্যমে চরিত্রের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আর চরিত্রবান ব্যক্তিরাই প্রকৃত মানুষ। তাহলে চরিত্রের শুদ্ধি ও গঠন কেমন করে হতে পারে? এসব বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত জিনিস দ্বারা শরীরের আরাম আয়েশ বা অঙ্গ সৌষ্ঠব হয়। তবে আত্মার সংশোধন করবে নবীগণের ইলম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়। বরং মানুষ পশুর কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে যায়। ছাগল হয়ে যায়, কাক হয়ে যায়। সবকিছুই হয়ে যাওয়া

সম্ভব; তবে প্রকৃত মানুষ হওয়া আম্বিয়া (আ.)-এর শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন- আপনি উড়োজাহাজে বসে ষোল হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেলেন। কাক চড়ুই ইত্যাদিও উড়ে যায়। তাহলে আপনি উড়ে গিয়ে কী মহৎ ও বড় কাজ করে ফেললেন? বড়জোর আপনি কাকের মতো একটি কাজ করেছেন। এতে মানবতার কোন উন্নতি হয়নি; বরং পশুত্বের উন্নতি হয়েছে। আপনি উন্নত মানের আহার করে শরীর প্রতিপালন করেছেন। কুকুর বিড়ালও শরীর লালন পালন করে। বাঘ সিংহও শরীর পালে। এটা কোন গুণ ও পূর্ণতা নয়। বড়জোর আপনি উন্নত সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করলেন। কাক তা করতে পারে না। কিন্তু আপনার সুস্বাদু খাবারের দিকে কাক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে না যে, আহা! মানুষ পোলাও কোরমা খাচ্ছে, আর আমি হাড্ডি খাচ্ছি। সে আপনার খাবারকে এই পরিমাণ ঘৃণা করে, যে পরিমাণ আপনি তার খাবারকে ঘৃণা করেন। প্রতিটি প্রাণী তার উপযোগী এবং আপনি আপনার উপযোগী খাবার খাচ্ছেন। আহার গ্রহণে উভয়ে অংশীদার। ভাল আর মন্দ, তা হল গুণাগুণের কথা। খাবারে কিন্তু উভয়ই সমান। খাবার গ্রহণ করা প্রাণীকুলের বিশেষত্ব। কাজেই আপনি যত উন্নতমানের খাবার গ্রহণ করুন না কেন, আপনি প্রাণীই থাকবেন। আপনি যত উন্নত ভবনে বাস করুন না কেন, আপনার শরীর তাতে বাস করবে। শরীর একটি পদার্থ। তবে এসব পদার্থ দিয়ে চরিত্র গঠন ও সংশোধন করা যায় না।

শরীয়তের ইলম

আল্লাহ তায়ালা চরিত্র গঠন ও সংশোধনের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গঠন করা যায়। মানুষের জীবন ধারণের জন্য বিজ্ঞান উন্নতমানের সামগ্রী সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু উন্নত মানুষ তৈরি করতে পারে না। উন্নত মানুষ গঠনের উপায় হল নবীগণ (আ.)-এর শিক্ষা। ইলম সবই উপকারী কিন্তু এক ধরনের ইলম ব্যাপকভাবে উপকারী যা সর্বকালে সর্বযুগে সবখানে উপকারী। আরেক ধরনের ইলম হল স্থান বিশেষে উপকারী। যে ইলম এখানে অর্থাৎ দুনিয়াতে উপকার করবে তা ওখানে অর্থাৎ পরকালে কোনো উপকার করবে না। পার্থিব জ্ঞান উপকারী অপকারী নয়– তবে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত উপকারী। এ জগতে উপকার করবে অথবা দেহের উপকার করবে; তারপর কোনো উপকার অবশিষ্ট থাকবে না। তবে ইলমে দীন দুনিয়াতেও উপকার করবে; হাশর বা পরকালেও উপকার করবে। এজন্য এই ইলমের সম্পর্ক মানুষের নফসের সঙ্গে, আর নফস সর্বত্র বিরাজমান থাকবে। দুনিয়াতে

যেমন নফস বিদ্যমান তেমনি আলমে বরযখে বা পরকালে সবখানে নফস বিদ্যমান থাকবে। সবখানে নফসের জন্য ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। সুরতাং যে ইলম সবখানে উপকারী হবে, তা একমাত্র নবী-রাসূলগণের ইলম– যাকে দীন ও শরীয়ত বলা হয়। যে ইলম হারাম-হালাল বর্ণনা করে সে ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন।

একজন কারিগর যে বিদ্যা অর্জন করে তা হলো জড় পদার্থের জ্ঞান। এটা নবী আগমনের উপর নির্ভরশীল নয়। একজন নবীও যদি না আসতেন তবুও আপনারা চাষাবাদ ক্ষেত-খামার করতেন, ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারতেন। যেভাবেই হোক জীবজন্তু পশু-পাখি বাসা তৈরি করে জীবন যাপন করছে। তাদেরকে কোন নবী এসব শিখিয়ে দেননি। বাঘ তার নিজের জন্য গর্ত তৈরি করে, সাপ ছিদ্র তৈরি করে নেয়– এর জন্য তাদেরকে কোন শিক্ষাগারে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়নি। এটা ছিল তাদের স্বভাবজাত চাহিদা। স্বভাবজাত প্রয়োজন পূরণে প্রকৃতি তাদেরকে রাহনুযায়ী করেছে। এভাবে মানব প্রকৃতি ও মানুষকে রাহনুযায়ী করেছে। যদি কোনো নবী না আসতেন তবুও মানুষ তার উপযোগী বাসভন তৈরি করতে এবং ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারতো। এসব প্রাকৃতিক জ্ঞান। প্রাকৃতিক জ্ঞানের জন্য নবীদের শিক্ষা দানের প্রয়োজন নেই। নবীগণ শরীয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। শরীয়ত মানব প্রকৃতি থেকে বের হতে পারে না। এজন্য শরীয়তের অর্থ হল– 'আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।' আল্লাহ তায়ালা কোন্ কাজে সন্তুষ্ট কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট তা জানা দরকার। কারো সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি তার নিজস্ব বর্ণনা ছাড়া জানা যায় না। জানা সম্ভব নয়।

সহোদর দুই ভাই। একই মায়ের গর্ভে অবস্থান করে এসেছেন। দু'জন একত্রে সিনার সঙ্গে সিনা লাগিয়ে বসা আছেন। একজনের অন্তরের গোপন কথা অন্যের অন্তরে যাবে না, যে পর্যন্ত সে প্রকাশ না করবে, একে অপরকে বলে না দিবে। দুই সহোদর একে অন্যের অন্তরের গোপন কথা যখন জানতে পারে না যে পর্যন্ত সে নিজে না বলে দেয়, তখন আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে যেখানে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা কেবল নূর আর নূর আলো এবং জ্যোতি আর মানুষ কেবলই জুলমত, অন্ধকার। সে আল্লাহর মর্জি এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি কেমন করে জানবে মানুষ; যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা প্রকাশ না করে দেন?

শরীয়তের বিধান কী করে পৌঁছবে

প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এসে আল্লাহ তায়ালা যদি নিজে নিজের কথা প্রকাশ করে ঘোষণা দিতেন– স্মরণ রেখো, এই কাজে আমি সন্তুষ্ট; সুতরাং এ কাজ করো। আর এ কাজে অসন্তুষ্ট অতএব তা করো না। এমন করা আল্লাহ তায়ালার শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। একজন সাধারণ শাসক যেমন জেলা প্রশাসক বা থানার দারোগা– যিনি আমাদের মত মানুষ। আমাদের চেয়ে বেশি কোন বিশেষত্ব যাদের নেই তারা ঘরে ঘরে যেতে লজ্জাবোধ করেন। সরকারের কালেক্টার সাহেব ঘরে ঘরে গিয়ে বলেন না যে, এ হলো আমার আইন, আমার নির্দেশ; বরং তিনি তার প্রতিনিধি তহশীলদারকে আদেশ করেন। তারা তাদের অধীনস্ত দেরকে আদেশ করে। তারা ব্যাপকভাবে ঘোষণা করে দেয়। এভাবে আইন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

যিনি আহকামুল হাকিমীন সকল বাদশাহর বাদশাহ তাঁর জন্য মোটেই উচিত নয় যে, তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াবেন– এটা হলো আমার আইন। তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আইন জানিয়ে দিবেন। যারা তাঁর দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তারা তাদের অধীনস্তদের আদেশ করবেন। এভাবে আল্লাহর আইন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে।

হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বভাব-চরিত্র বা আখলাকের কারণে তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের যোগ্যতা তাদের মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে পাক পবিত্র অবস্থায় তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের স্বভাবে পবিত্রতা ভর্তি থাকে। তাঁরা পাক পবিত্র জামাত। আল্লাহ তায়ালার সত্তা পাক পবিত্র। তাঁর সঙ্গে তাঁদের নৈকট্য লাভের যোগ্যতা আছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কাছে তাঁর বাণী পেরণ করেন, ইলম ও জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। তাঁরা আল্লাহর বাণী তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবে ইলম প্রসার ও বিস্তার লাভ করে।

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে দীনের ইলম আসার কারণ তাঁরাই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত। তাঁরাই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, তাঁদের উপর ইলম অবতীর্ণ হয়। তাঁদের কাছে অবতীর্ণ বাণী বিভিন্ন ইলমরূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

সারকথা, এই ইলম অবশ্যই হাসিল করতে হবে। এ ইলম ছাড়া মানুষের আধ্যাত্মিকতা প্রস্ফুটিত হতে পারে না। রূহানী স্তরসমূহ অতিক্রম করা যায় না। স্বভাব-চরিত্র গঠন ও সংশোধন হতে পারে না। কারণ, সৎ চরিত্রের উৎসই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা। দীন ও মাযহাবে না থাকলে মানুষের চরিত্র গঠন হবে না। জড় পর্দাথ দিয়ে চরিত্র গঠন হয় না।

আমি হাদীস পাঠ করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا.

আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

–যাতে দুনিয়াবাসীকে মূর্খতা থেকে উদ্ধার করে তাদের অন্তরে ইলমের মশাল জ্বালিয়ে দেই। ইলম ছাড়া মানুষের জীনব সুন্দর হয় না, হতে পারে না।

বিশ্বে বর্তমানে দীন ও মাযহাব সম্পর্কে যে সব দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ করা হয়, প্রচার করা হয় তা সবই মূর্খতার ফসল। মানুষের অন্তরে যখন ইলমের জ্যোতি না থাকে; বরং মূর্খতা থাকে তখন যে কেউ মানুষকে প্রতারিত করতে পারে, যা ইচ্ছা বলতে পারে। আপনার মধ্যে কোন আলো না থাকায় আপনি অপারগ। সুতরাং প্রয়োজন আপনি ইলম হাসিল করে সামনে অগ্রসর হন, যাতে জায়েয নাজায়েয, আকিদা ও বিশ্বাসের ভাল-মন্দ আপনার মধ্যে এসে যায়। এজন্য আমি উপর্যুক্ত হাদীসে পাঠ করেছিলাম, সবচে' দরকারী বস্তু হলো ইলমে দীন। যদি ইলমে দীন অন্তরে মওজুদ থাকে তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যদি শিক্ষা না থাকে; বরং মূর্খতা থাকে তাহলে সব কিছু খারাপ হয়ে যাবে।

যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি আমার বক্তব্যও শেষ করে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ইলম ও আমলের তাওফিক দান করুন। আমিন!

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বয়ান : ২

ইয়াদে হক বা আল্লাহর যিকির

এ জগতের প্রাণ হল আল্লাহ্ পাকের যিকির। যে পর্যন্ত আল্লাহর যিকির স্মরণ থাকবে বিশ্বের অস্তিত্ব ও সে পর্যন্ত বজায় থাকবে। যখন যিকির বিদায় হয়ে যাবে তখন বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব আমাদের কারণে কর্মচঞ্চল রয়েছে, সজীব রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকিরকারীদের কারণে টিকে আছে। যে পর্যন্ত যিকিরকারীদের দল থাকবে, বিশ্বও থাকবে। যখন এ দল নিঃশেষ হয়ে যাবে, বিশ্বও ধ্বংস হয়ে যাবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّـةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا.

اَمَّـابَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

مَثَلُ الذَّاكِرِفِى الْغَافِلِيْنَ كَمَثَلِ الْحَىِّ فِى الْاَمْوَاتِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ.

বুযুর্গানে.মুহতারাম!

আগে থেকে জানা ছিল না যে, বয়ান করতে হবে। এমন ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু হযরত মাওলানা বললেন– নামাযের আগে কিছু বলতে হবে। তাঁর আদেশ পালনার্থে আমি আপনাদের সামনে বসে পড়েছি। এ সময় কোনো দীর্ঘ ওয়াজ বা বক্তৃতা হবে না; বরং আদেশ পালন করতে গিয়ে পঠিত হাদীসের আলোকে কয়েকটি কথা আরজ করব–

ভূমিকা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস–

مَثَلُ الذَّا كِرِفِى الغَا فِلِيْنَ كَمَثَلِ الحَىِّ فِى الْاَمْوَاتِ.

এ হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আগে সামান্য একটি কথা স্মরণ রাখুন, পৃথিবীতে সকল প্রাণীরই একটি দেহ আছে। আছে জীবন, জিন্দেগী ও আয়ু। আর আছে তার রূহ বা আত্মা। বাহ্যিক এই দেহ যা আপনাকে দান করা হয়েছে, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন মানুষ নয়। এটা হল মানুষের আকার বা আকৃতি এবং মানুষের আলামত। আত্মা দেহের ভেতর আত্মগোপন করে রয়েছে। এটা রূহ এবং হাকিকতের রূপে বিদ্যমান এবং ঐ হাকিকতের সঙ্গে সম্পর্কিত যা আমাদের ভেতর লুকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনুষ্যত্ব এটাই। আর এর নামই জিন্দেগী।

রূহকে যদি মানুষের শরীর থেকে বের করে দেয়া হয় তাহলে দেহের কোন অস্তিত্ব ও মূল্য নেই। পূর্বে থাকা রূহের প্রভাবেই শরীর দু'একদিন থাকবে বটে কিন্তু তিন দিন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট সামান্য প্রভাবও দূরীভূত হয়ে যাবে। এরপর ঐ সুন্দর শরীর পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মাটি মাটির সঙ্গে, পানি পানির সঙ্গে, আগুন আগুনের সঙ্গে, বাতাস বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবে। পরস্পরের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শরীরকে একই সূত্রে আত্মাই বেঁধে রেখেছিল। রূহ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর কোন মূল্য ও অস্তিত্ব থাকল না। নিঃশেষ হয়ে গেল, বেকার হয়ে গেল। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আকার আকৃতির নাম জীবন নয়। জীবন হলো হাকিকতের নাম। আকার আকৃতি এর বাহ্যিক রূপ ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কায়েনাতের প্রাণ বা জগতের রূহ

মনে করুন এই আকার বিশ্ব জগতের। এই যে আমাদের সংক্ষিপ্ত দেহজগত এটা আত্মা দ্বারা জীবিত ও সচল রয়েছে। এভাবে বুঝে নিন, এই বিশ্বজগত কোন রূহ, আত্মা বা প্রাণের কারণে সজীব রয়েছে। যে পর্যন্ত বিশ্বজগতে এই রূহ বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত বিশ্বজগতকে জীবিত বলা হবে। যখন এ রূহ প্রস্থান করবে বা তাকে বের করে নেয়া হবে, তখন সমগ্র জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে সব কিছু। এ রূহটি কি জিনিস? মানব শরীরে যে রূহ বিদ্যমান বিশ্বজগতেও সেই রূহ বিদ্যমান। এ কথা পবিত্র

কুরআনে বলা হয়েছে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ.

হে নবী! আপনার কাছে মানুষ রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে– রূহ জিনিসটি কি?

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

আপনি বলে দিন, রূহ হলো আল্লাহর একটি নির্দেশ, আল্লাহর দেয়া একটি সূক্ষ্মতম বস্তু। এর দ্বারা এই শরীর রক্ষা পাচ্ছে। যদি আত্মা বেরিয়ে যায় তাহলে দেহ ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে বিশ্বজগতের রূহ হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি। আর ঐ শক্তির নাম হল 'যিকরুল্লাহ'। আল্লাহর যিকির বা স্মরণে এ জগতে টিকে আছে। জগত থেকে যখন আল্লাহর যিকির বন্ধ হয়ে যাবে, তখন এ বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন–

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتىٰ يُقَالَ فِى الاَرْضِ اَللّٰهُ اللّٰه.

ঐ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এ বিশ্বে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকিরকারী একজন মানুষও অবশিষ্ট থাকবে।

একজনও থাকবে না, কেবল দুষ্ট পাপিষ্টের দল থেকে যাবে, যাদের অন্তরে না থাকবে আল্লাহর যিকির, না থাকবে আল্লাহর স্মরণ। না তাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকবে, আল্লাহকে ভুলে যাবে; বরং আল্লাহর যিকির হতে তাদের অন্তর শূন্য হয়ে যাবে। যিকির মিটে যাবে। অর্থাৎ দুষ্ট পাপিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা থেকে যাবে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لاَ يَعْرِ فُوْنَ مَعْرُوْفًا وَ لَا يَنْكِرُوْنَ مُكَرًا.

ভাল-মন্দের কোন ভেদাভেদ তাদের মধ্যে থাকবে না। পথে-ঘাটে প্রকাশ্যে ব্যভিচার অপকর্ম চলতে থাকবে। যেমন- চতুষ্পদ জন্তুরা করে থাকে। তাদের মধ্যে লাজ-লজ্জা আত্ম-মর্যাদাবোধ কিছুই থাকবে না। যখন সমগ্র মানব জাতি, সারা দুনিয়া এমন হয়ে যাবে, তখন কেয়ামত সংঘটিত হবে। এ জগতের অণু-পরমাণু সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার নাম হল কেয়ামত। আকাশ ভেঙ্গে পরবে, ভূমণ্ডল ফেটে পানির মধ্যে মাটি, মাটির মধ্যে পানি, বাতাসের মধ্যে

আগুন, আগুনের মধ্যে বাতাস মিশে গিয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। জগতের উপর সকল ধ্বংসলীলা এক সঙ্গে নেমে আসবে। যেভাবে রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর দেহের অবস্থা হয়। এভাবে সমগ্র জগত ঐ রূহের বেরিয়ে যাওয়ার কারণে ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এ রূহের নাম হলো 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর স্মরণ।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে জানা গেল, এ জগতের প্রাণ হল আল্লাহ পাকের যিকির। যে পর্যন্ত আল্লাহর যিকির স্মরণ থাকবে বিশ্বের অস্তিত্ব ও সে পর্যন্ত বজায় থাকবে। যখন যিকির বিদায় হয়ে যাবে তখন বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব আমাদের কারণে কর্মচঞ্চল রয়েছে, সজীব রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকিরকারীদের কারণে টিকে আছে। যে পর্যন্ত যিকিরকারীদের দল থাকবে, বিশ্বও থাকবে। যখন এ দল নিঃশেষ হয়ে যাবে, বিশ্বও ধ্বংস হয়ে যাবে। সারকথা, জগতের এ বিশাল অস্তিত্ব আল্লাহর যিকির ও স্মরণের উপর টিকে আছে।

সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত

ইসলামী শরীয়তে এ কারণেই বলা হয়েছে– জগতের সকল অণু-পরমাণু সব সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণে ব্যস্ত রয়েছে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করছে। যে মুহূর্তে যিকির বন্ধ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে ঐ অণু-পরমাণুর মৃত্যু হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– প্রতিটি গাছে ডালপালা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে থাকে। যিকির বন্ধ হয়ে গেলে ডালগুলো শুকিয়ে যায়, পাতাগুলো ঝরতে শুরু করে। তৃণলতারও প্রকৃত রূহ হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির। যে পর্যন্ত যিকির থাকবে তৃণলতা ও বৃক্ষও থাকবে। যিকির যখন থাকবে না তখন তৃণলতা ও বৃক্ষও থাকবে না, নিঃশেষ হয়ে যাবে। পাতাগুলো ঝরে যাবে। আর এটা হবে তার মৃত্যুকাল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– 'সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত।'

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.

দুনিয়ার এমন কোনো অণু-পরমাণু নেই যা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে ব্যস্ত নয়। কিন্তু তোমরা তাদের যিকির ও তাসবীহ বুঝতে পার না। [বনি ইসরাঈল : ৪৪]

তোমাদের ভাষা ভিন্ন, অণু-পরমাণুর ভাষা ভিন্ন। পশুপাখির ভাষাও আলাদা।

তারা তাদের ভাষায় যিকির করছে। আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করছে। তোমরা তাদের ভাষা বুঝো না। তোমরা তাদের ভাষা কি বুঝবে? তোমরা তোমাদের স্বজাতি ভাই বন্ধুদের ভাষাই তো বুঝো না। একজন পাঞ্জাবের অধিবাসী বাংলা ভাষা বুঝে না। বাংলার অধিবাসী পশতু ভাষা বুঝে না। পাখতুনি স্থানের অধিবাসী তুর্কি ভাষা বুঝে না। তুর্কিস্তানের অধিবাসী আরবি ভাষা জানে না। তাই যে সমাজ নিজের ভাইয়ের ভাষা বুঝে না, সে পশুপাখির ভাষা, কংকর পাথরের ভাষা কি করে বুঝবে? কিন্তু তাদের ভাষাকে অস্বীকার করা যাবে না। যদি আপনি না বুঝেন, তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে, বাংলাদেশে আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে না। আপনি যদি পশতু না জানেন তাহলে একথা বলা যাবে না পশতু ভাষায় কেউ আল্লাহর যিকির ও স্মরণ করছে না। সে যিকির করবে, আল্লাহর নাম জব করবে। আপনি কাছে বসে তার মুখ দেখতে থাকবেন, কেননা আপনি তার ভাষা জানেন না।

এর উদাহরণ হলো– আপনারা টেলিগ্রাম অফিসে গিয়ে থাকবেন। আপনি টেলিগ্রাম লিখে দিবেন। দু'তিন টাকা ফিস আদায় করবেন। টেলিগ্রামের বাবু পিতলের খুঁটির উপর আঙ্গুল রেখে খট-খট, খটা খট আরম্ভ করে দিবে। আপনি বলবেন– 'আমি যে বিষয়বস্তু লিখে দিলাম, আমি অমুক তারিখ আসছি'– এ বাবু বসে খট খট করছে। আমার বিষয়বস্তুর সঙ্গে খট খট-এর কি সম্পর্ক? কিন্তু আপনার সামনে খট-খট শব্দ হচ্ছে অথচ এ খট-খট-এর ভেতর দিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাথাবার্তা ইলম ও জ্ঞান সবই আদান প্রদান হচ্ছে। অথচ আপনি ঐ ভাষা না জানার কারণে বুঝতে পারছেন না। এ হলো একটি বিশেষ পরিভাষা। এ পরিভাষার মাধ্যমে কথা আদান প্রদান হচ্ছে। আপনিও যদি এ পরিভাষা শিখে নিতেন, তাহলে খট-খট শব্দের সঙ্গে বুঝে নিতেন যে করাচি থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে ঢাকা কি সব কথাবার্তা আদান প্রদান করা হচ্ছে। যেহেতু আপনি পরিভাষা জানেন না, তাই আপনার পেরেশানি হচ্ছে। বিস্মিত হয়ে দেখছেন এ বাবু খট-খট করছে। এর মাধ্যমে আমার লেখা বিষয়বস্তু ঐ স্থানে পৌছাবে কেমন করে? বিষয়বস্তু আপনার, ভাষা ডাক বিভাগের, আর ডাক বিভাগের ভাষাই অন্য স্থানে যাচ্ছে।

এভাবে একটি পাখি যখন শিস দেয়, আপনি মনে করবেন, সে শিস দিচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার যিকির করছে। আপনি তার ভাষা জানেন না। তোতা, ময়না পাখি কথা বলে। আল্লাহু আল্লাহু বলে। আপনি তার ভাষা জানেন না; যেমন আপনি আপনার ইউরোপীয় ভাইদের কথা বুঝেন না। সেও তার ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আপনি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন।

সারকথা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, হিংস্র অহিংস্র এমন কেউ নেই যে আল্লাহকে স্মরণ করে না। তাঁর যিকিরে ব্যস্ত থাকে না। কিন্তু তাদের ভাষা আপনি জানেন না।

وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

তোমরা এদের ভাষা বুঝো না; অথচ তারা তাসবীহ পাঠে সর্বদা ব্যস্ত।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– পরিষ্কার বস্ত্র আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। যখন বস্ত্র ময়লা বা অপরিষ্কার হয়ে যায়, তখন যিকির বন্ধ হয়ে যায়। আর যিকিরহীন সময়ই তার মৃত্যু ও ধ্বংসের সময়। আপনি ঘৃণাভরে শরীর থেকে তা খুলে রেখেছেন, যে পর্যন্ত ধোপা ধুয়ে পরিষ্কার করে না দেয়। যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন তা পুনরায় যিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

ফকীহগণ এ কারণেই লিখেছেন, যাকে মসজিদের ইমাম নিয়োগ করা হবে; সে অপরিষ্কার কাপড় পরে নামায পড়াবে না। অর্থাৎ এমন ময়লা অপরিষ্কার কাপড় পরিধান করবেন না, যে কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় দিনেই ময়লা হতে শুরু করে। আরবরা বলেন–

لَذَّةُ الثَّوْبِ يَوْم

পোশাকের স্বাদ ও অনন্দ একদিন, পরের দিন অপরিষ্কার হতে শুরু করে। পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হলেও ময়লা হয়ে যায়। কিন্তু এমন ময়লা যে ঘামে শুকিয়ে শুকিয়ে হলুদ বরণ হয়ে গেছে, দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে, কাপড়ের প্রকৃত রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাহলে এমন কাপড় পরিধান করে ইমামের নামায পড়ানো মাকরূহ।

এর প্রকাশ্য কারণ হলো, ইমাম আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুকতাদিদের উকিল বা প্রতিনিধি। তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মধ্যে ঘৃণা করার মতো এমন কিছু থাকবে না, যাতে তার মুকতাদিগণ তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করে। যদি ইমামের পোশাক অস্বাভাবিকভাবে অপরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে মুকতাদিদের মন পেরেশান হবে। আর বলতে থাকবে– কেমন অপরিষ্কার লোককে ইমাম বানানো হয়েছে বা সামনে দাঁড় করানো হয়েছে যে, মুকতাদিগণ ইমামের অপরিষ্কারের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় ন্যস্ত হবে। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক স্থাপিত হবে? তারা ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার পোশাক থেকে দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাবে কেমন করে?

ইমামের জন্য জরুরী, তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখবেন। এ তো গেলো বাহ্যিক দিক। তবে যদি চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তাহলে বাতেনী আরেকটি কারণ হলো এই পরিষ্কার ধবধবে কাপড় আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরে ব্যস্ত থাকে। ইমামের কাপড়ের যিকির স্বয়ং ইমামকে যিকিরের দিকে আকৃষ্ট করবে। তার আশপাশ থেকে যখন যিকিরের আওয়াজ আসতে থাকবে, যদিও কান দিয়ে ঐ আওয়াজ শোনা যায় না, তবুও ঐ আওয়াজ দ্বারা স্বয়ং ইমামের অন্তরে যিকিরুল্লাহর আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আল্লাহর যিকিরের কারণে তিনি আল্লাহ তায়ালার দিকে আরও বেশি মনোনিবেশ করবেন। তখন মুকতাদিগণও সে পরিমাণ আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হবেন।

আপনারা পরীক্ষা করে দেখে থাকবেন, মানুষ গোসল করে যখন পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার অন্তর থেকে الحمد لله 'আলহামদুলিল্লাহ' বের হয়। মন তখন পরিচ্ছন্ন হয়। আর যখন পোশাক অপরিষ্কার থাকে তখন মনে থাকে সংকোচ, এলোমেলো ভাব, আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে চাইলেও মুখ দিয়ে বের হতে চায় না। আসলে এটা হলো কাপড়ের যিকিরের প্রভাব, যা মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয়।

আপনি যদি সবুজ-শ্যামল জায়াগায় বসেন, তাহলে বেশি পরিমাণে যিকির করার তাওফিক হবে। যদি শুকনা মৃত ঘাসের উপর বসেন তাহলে যিকিরের তাওফিক কম হবে। যেহেতু সবুজ-শ্যামল ঘাস আল্লাহর তাসবীহে ব্যস্ত থাকে। অধিকাংশ ওলীকে দেখা যায় নদীর কুলে সবুজ ঘাসের উপর বসে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে থাকেন। এর কারণ আশপাশের যিকির তাদের অন্তরে রেখাপাত করে, প্রভাব বিস্তার করে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– প্রবাহমান পানি আল্লাহর যিকির করে। যখনই তা থেমে যায়, এর তাসবীহ ও যিকির বন্ধ হয়ে যায়। আর তাসবীহ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির তরলতা শেষ হয়ে যায়। প্রবাহমান পানি যিকিরের কারণে সজীব রয়েছে। থেমে যাওয়া পানিকে ماء راكد স্থির পানি বলা হয়। ঐ পানির মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে, পানি নষ্ট হয়ে যায়। তাসবীহ বন্ধ হয়ে যায়, পানির তরলতা নিঃশেষ হয়ে পানি গাঢ় হয়ে যায়। মোটকথা, প্রবাহমান পানি আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠ করে, সবুজ-শ্যামল ডালপালা আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করে। পরিষ্কার কাপড় আল্লাহর তাসবীহ আদায় করে। পাথর কংকর তাসবীহ পাঠ করে। সকল জিনিস আল্লাহ তায়ালার যিকিরে লিপ্ত রয়েছে। আমরা কেবল তা বুঝতে পারছি না।

সৃষ্টির তাসবীহ সম্পর্কে সুফিদের অনুভূতি

কোন কোন সময় আধ্যাত্মিক সাধকগণকে এসবের ইলম দান করা হয়। তাঁরা সকল জিনিসের যিকির তাসবীহ শুনতে পারেন, বুঝতে পারেন। নবী-রাসূলগণকে মু'জেযাস্বরূপ এই ইলম দান করা হয়। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এই মু'জেযা ছিল তিনি পশুপাখির ভাষা বুঝতেন। তাঁর কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু স্পর্কে অবহিত করা হয়েছে থেকে দেয়া হয়েছে।

হযরত সুলাইমান (আ.) বলে দিতেন দুটি কাক কি আলাপ আলোচনা করছে, দু'টি চড়ুই কি বলাবলি করছে।

হাদীসে বিভিন্ন প্রাণীর আঠারো উনিশটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের যিকির ও তাসবীহের কথা বলা হয়েছে। তিতির এই বলেছে, ময়ূর এই বলেছে, অমুক প্রাণীর যিকির এই, অমুকের তাসবীহ এই। তিতির সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– তার তাসবীহ এরূপ–

كَمَا تُدِيْنُ تَدَانُ

যেমন কর্ম তেমন ফল।

এটা একটি উপদেশ যা তার মুখ দিয়ে সব সময় উচ্চারিত হচ্ছে। কারো তাসবীহ এমন–

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحٰى وَزَيَّنَ النِّسَآءَ بِالذَّوَائِبِ

পাক পবিত্র মহান ঐ সত্তা যিনি পুরুষকে দাড়ি দিয়ে এবং নারীদের দীর্ঘ কেশরাশিও সুবিন্যস্ত খোঁপা দিয়ে সুন্দর ও সুশোভিত করেছেন।

বিভিন্ন উপদেশমূলক সতর্ক বাণী পাখিদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে থাকে কিন্তু–

وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারবে না।

کس زبان مرا نمی داند ☆ یا عزیزاں چہ التماس کنم

মানুষ আমাদের ভাষা বুঝে না, আমি প্রিয়জনদের সঙ্গে কি বলব? পাখি বলতে পারবে, আমি উপদেশ বাণী প্রচার করছি। কিন্তু মানুষ আমার ভাষা বুঝতে পারছে না। আল্লাহ তায়ালা যাঁদেরকে ইলম দান করেন, তাঁরা ভাষা শিখতে সক্ষম হয়। সুলাইমান (আ.)কে পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছিল। কিন্তু কোন মাদ্রাসা কলেজে পড়ে শিখেননি। আল্লাহ তায়ালার ওহীর মাধ্যমে শিখেছেন অর্থাৎ এটাই ছিল তাঁর মু'জেযা।

রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে জীব-জন্তুর কথা বলা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাখিদের ভাষা বুঝতেন। জীবজন্তু ও পশুর ভাষা বুঝতেন। কোন কোন সময় তাদের বিষয় আপোস নিষ্পত্তি করে দিতেন।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– একটি উট চিৎকার করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হল এবং নিজের ভাষায় বড় বড় করে কি যেন বলতে লাগল। তখন তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। উট এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারকের উপর মাথা রাখলো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ উটের মালিককে ডাক। উটওয়ালা হাজির হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– উটটি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তুমি তার শক্তি সামর্থের বেশি বোঝা পিঠে তুলে দাও। মালিক তার দোষ স্বীকার করল এবং বলল– হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ অন্যায় করেছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ভবিষ্যতে এমন করো না। এরপর উটটি আনন্দিত হয়ে চলে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের ভাষা বুঝলেন। তার অভিযোগ শুনে ফয়সালা করে দিলেন।

এভাবে হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গ্রাম্য ব্যক্তির বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি পাহাড় থেকে হরিণ শিকার করে এনেছিল। তার গলার রশি একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল। হরিণটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আর্তনাদ করতে শুরু করল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– গ্রামের লোকটি

তোমাকে ধরে এনেছে। এখন তুমি তাদের সম্পত্তি হয়ে গেছো। এ কারণে যে, যেসব জিনিস পাহাড় জঙ্গলে থাকে, তা যে দখল করে নেয় তারই সম্পত্তি হয়ে যায়। তুমি তার মিল্‌ক বা সম্পত্তি হয়ে গেছো। আমি তোমাকে কীভাবে ছেড়ে দেবো?

হরিণটি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! জঙ্গলে আমার দুটি কচি বাচ্চা আর্তনাদ করছে। ক্ষুধায় কাঁতরাচ্ছে, আমিই তাদেরকে দুধ পান করিয়ে থাকি। এখন আমি যদি দুধ পান না করাই তাহলে আমার বাচ্চাগুলো মরে যাবে। তাই হুজুর আমাকে ছেড়ে দিন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তাহলে তুমি ওয়াদা কর দুধ পান করিয়ে এখানে ফিরে আসবে।

হরিণটি ওয়াদা করল, শপথ করল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণটির গলা থেকে রশি খুলে দিলেন। হরিণটি গিয়ে বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তার গলায় রশি দিয়ে দিলেন।

এরপর গ্রামের সে লোকটি আসলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন– তুমি এ কাজ কেন করলে? এর বাচ্চাগুলো নিরূপায় হয়ে আর্তনাদ করছে; আর তুমি তাকে ধরে নিয়ে এসেছো! এ কে ছেড়ে দাও।

লোকটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নিয়ে হরিণটিকে মুক্ত করে দিল। হরিণ দোয়া করতে করতে জঙ্গলে চলে গেল।

সারকথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুদের কথা বুঝতে পারতেন। আম্বিয়া (আ.)কে প্রাণী জগতের ভাষা মু'জেযাস্বরূপ শিখিয়ে দেয়া হত। পাখিদের ভাষাও তাঁরা বুঝতে পারতেন।

মানুষ ছাড়া জগতের সব সম্প্রদায়ের ভাষা এক

আদি মানব হযরত আদম (আ.)কে সকল মানুষের ভাষা শেখানো হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا.

আদম (আ.)কে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

এর এক তাফসীর ও ব্যাখ্যা হচ্ছে এই–

عَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا يَعْنِيْ عَلَّمَ اللُّغَاتِ كُلَّهَا.

হযরত আদম (আ.)কে এমন সকল ভাষা শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল যেসব ভাষা কেয়ামত পর্যন্ত মানব সমাজে প্রচলন হবে। তাঁর প্রথম বংশধররা এসব ভাষা জানতেন। কিন্তু বিভিন্ন বংশ যখন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল, এক এক গোত্র এক এক স্থানে আবাদ হলো এবং বসবাস করতে শুরু করলো। বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে এর বৈশিষ্ট্যও ছিল আলাদা। একেক গোত্রের উপর একেক ভাষা প্রভাব বিস্তার করলো। এভাবে বিভিন্ন ভাষা হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে লোকেরা একে অন্যের ভাষা বোঝা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। একে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের নিদর্শন বলে প্রকাশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ خَلْقُ السَّمَـٰوَٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ.

আসমান জমিনের সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা ও রং-এর বিভিন্নতা তাঁর বিশেষ কুদরতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম। [রুম : ২২]

অর্থাৎ একই মাতা ও পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আদম সন্তানরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছেন। মানব জাতি সবই এক ও অভিন্ন। কিন্তু একজনের সঙ্গে অন্য জনের আকার আকৃতি রং-রূপের কোন মিল নেই, ভাষার মিল নেই। কেউ বাংলা ভাষায় আবার কেউ পাঞ্জাবী ভাষায়, আবার কেউ ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। দুনিয়াতে যত প্রাণী রয়েছে প্রত্যেক প্রাণীর একটি করে ভাষা আছে। সে যে কোন দেশের বাসিন্দা হোক না কেন। যেমন- তোতা যখন 'টি' করবে, তখন সব তোতা বুঝে নিবে, সে তোতা হিন্দুস্থানের হোক অথবা আরবের, এশিয়া, আফ্রিকা সব মহাদেশের ময়ূরই তা বুঝবে। কবুতর একই ভাষায় বলবে, সে যে কোন দেশের হোক না কেন। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তুর্কীরা এক ভাষায় ইউরোপীয়রা অন্য ভাষায় এবং এশীয়রা অন্য ভাষায় কথা বলে। কিন্তু কেউ কারো ভাষা বুঝে না। এটা আল্লাহ তায়ালার কুদরত ছাড়া আর কি হতে পারে? একই জাতের সদস্য সব কিন্তু তাদের ভাষা আলাদা আলাদা। তাঁরা একে অন্যের ভাষা বুঝে না। এ হলো আল্লাহর কুদরতের বিশেষ নিদর্শন।

মানুষের উদাসীনতা

আসল কথা, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় যিকির ও তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু আমরা তাদের ভাষা বুঝি না। যেমন- আমরা একে অন্যের ভাষা বুঝি না। পাথর কঙ্কর তাসবীহ পাঠে রত থাকে, পরিষ্কার কাপড় তাসবীহ পাঠ করে; প্রবাহমান পানি তাসবীহ পাঠে রত থাকে, গাছের শাখা-প্রশাখা যিকির করতে থাকে। অথচ পরিতাপের বিষয়, সর্বোত্তম জাতিই যিকির করে না। আর সে উত্তম জাতি হচ্ছে মানুষ, যে গাফেল উদাসীন। আল্লাহর যিকির ও স্মরণ হতে গাফেল অথচ সবচেয়ে বেশি যিকির করা মানুষের জন্য উচিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত মানব জাতিকে দান করেছেন, বিশ্বের অন্য কোন বস্তুকে তা দান করেননি। কত আদরের সৃষ্টি মানুষ। বিশ্বের অন্য কোন সৃষ্টি আল্লাহর এত প্রিয় এবং এত আদরের নয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টি তাঁর যিকির ও স্মরণে রত, আর মানুষ আল্লাহর যিকির হতে গাফেল। অথচ মানুষের সর্বাধিক যিকির করা উচিত ছিল। মানুষের উপর সব সময় আল্লাহ তায়ালার দান ও নেয়ামতের বৃষ্টি হচ্ছে।

সমগ্র বিশ্ব মানব জাতির খোরাক

প্রত্যেকটি প্রাণীর পোশাক হলো তার চামড়া। অথচ মানুষকে পৃথক পোশাক দান করা হয়েছে। নানা রংয়ের কাপড়, নানা ডিজাইনের পোশাক। প্রত্যেক সৃষ্টির খাদ্য কেবল একটি। কেউ ঘাস খায়, কেউ দানা খায়, কেউ লতাপাতা, কেউ মাটি, কেউ বা বাতাস চুষে খায়। কিন্তু মানুষ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। প্রতিটি জিনিস তার খাদ্য। ঘাস, পাতা, তৃণলতা, মাটি, চুনা, সোনা, রূপা, মণি-মানিক্য সবই মানুষের পেটে যায়। সারকথা, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু সব জিনিস তাদের খাদ্য। সোনা রূপার পাত সে খেয়ে ফেলে। শক্তি বৃদ্ধির জন্য মণি-মানিক্য ব্যবহার করে। মাটি সে খায়, সে লতাপাতা খায়, দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী তাদের উদরে ঢুকে। বিশ্বের সকল প্রাণীর রিযিক ও খাবার এক রকমের। আর মানুষের আহার নানা ধরনের।

জগতের সব কিছু মানুষের বাহন

প্রত্যেক প্রাণী নিজ নিজ পা দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু মানুষকে যানবাহনের ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জীবজন্তু তাদের বাহন, তৃণলতা, উদ্ভিদ সবই

তাদের বাহন। ট্রেনও চলছে, চলছে জীব জাতীয় বাহনও। উট, ঘোড়া, গরু সবই তাদের বাহন। মানুষ আরোহণ করছে প্রতিটি জীব জন্তুর মাথায়, জড় পদার্থের মাথায়, উদ্ভিদ জগতের মাথায়।

সাগরের বুক ভেদ করে তাদের বাহন চলছে। বাতাসে মহাশূন্যে তাদের বাহন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার বাহন ভূ-পৃষ্ঠেও ভ্রমণ করছে। কোন প্রাণী এমন নেই যাকে যানবাহন দান করা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের পা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য; কিন্তু মানুষ এত সম্মানী এত প্রিয়– যার জন্য বিশ্বকে তার বাহন হিসেবে বানানো হয়েছে।

দানের প্রতিদান

পাথরের অবস্থা হলো এমন–

يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ

পাথর কিছু করতে সক্ষম না হলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। তা যদি না হয় তাহলে পাথর উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। এ হলো তার তাওয়াজু ও বিজয়ের আলামত। অহংকার ও গর্ব-গরিমা যদি কারো মধ্যে ভর্তি থাকে সে হলো মানুষ। তার মধ্যেই এসব রয়েছে। তার চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয় না, সে বিনয়াবনত হয় না, ঝুঁকে না অথচ পাথরও পড়ে যায়, পানিও বের হয়। সব চাইতে গাফেল, উদাসীন হল মানুষ। অথচ তাকেই সবচে' যাকির হওয়া উচিত ছিল। কেননা, তার উপরই এনআম এহসান সর্বাধিক।

জীবনের মূল তত্ত্ব

এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যেহেতু আল্লাহর যিকির হলো হায়াত বা জীবন, তাই যিকিরকারী আর যিকিরে অলস, উদাসীন ও আল্লাহবিমুখদের মধ্যে এমন পার্থক্য বিদ্যমান, যেন মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি বসা আছে। যদি গাফেল অলসদের একটি জামাত হয় এবং একজন আল্লাহর যিকির ও স্মরণকারী থাকে, সে এমন হবে যেন মৃতদের মাঝে একজন জীবিত ব্যক্তি বসা আছে। তাই বলা যায়, শরীরের নাম জীবন নয়; বরং আত্মার জীবনই প্রকৃত জীবন।

مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

আত্মার জীবনের নাম হল প্রকৃত জীবন। আর আত্মার জীবন লাভ হয় আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা, রুটি গোশত দিয়ে নয়। রুটি দিয়ে যে জীবন লাভ হয় তা হল শারীরিক জীবন। এ জীবন এত ভঙ্গুর, এত ক্ষণস্থায়ী যে, যদি রুটি লাভে বিলম্ব হয়, তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, যদি না খাওয়া যায় তাহলে দেহের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু আত্মার জীবন স্থায়ী জীবন। এজন্য আল্লাহর যিকিরের কারণে যে জীবন লাভ হয় সে জীবন স্থায়ী জীবন, তা মানবীয় নফসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যিকিরকারীর মর্যাদা

আগেই বলা হয়েছে– যিকিরকারী আর গাফেলের মধ্যে পার্থক্য এমন, যেন মৃতদের মাঝে কোন জীবন্ত ব্যক্তি বসে আছেন। সুতরাং মানুষ যাকির হলে, সকল যিকিরকারীর উর্ধ্বে হবে তার মর্যাদা। আর যদি গাফেল হয়ে যায় তাহলে সে সর্ব নিকৃষ্ট হয়ে যাবে। তার উচিত ছিল সে সর্বাধিক যিকির করবে। যদি সে গাফেল হয়ে যায়, তাহলে পাথর ও গাছের শাখাগুলোও তার চেয়ে উত্তম। কেননা তারা যিকিরে ব্যস্ত। আর গাফেল মানুষ সবচেয়ে অধম, নিকৃষ্ট। যদি সে যিকির শুরু করে দেয়, তাহলে সকল যাকির তার নিচে। তাই মানুষের যিকির হবে ব্যাপকতর যা অন্যদের যিকিরে নেই।

সুতরাং যিকির হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আত্মার খোরাক। আর যিকিরই হল মানুষের জীবন, মানুষের প্রাণ। আল্লাহ তায়ালার যিকিরের মাধ্যমে আত্মার খোরাক অর্জিত হয়।

জীবনের প্রকৃত আহার

নবী-রাসূল ও ওলী দরবেশগণের খোরাক অল্পই হয়ে থাকে। তবে শক্তি থাকে বেশি। তাদের এ শক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে 'সওমে বেছাল' বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ইফতার না করে একাধারে রোযার পর রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। বরং সেহরি ও ইফতার করার জন্য আদেশ করেছেন। পানাহার করে পরবর্তী রোযা রেখো। পানাহার

না করে একাধারে রোযা রাখাকে 'সওমে বেছাল' বলে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওম বেছাল রাখতেন, পনের দিন একাধারে রোযা রাখতেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনি নিষেধ করছেন অথচ আপনি নিজে 'সওম বেছাল' রাখছেন!

তা শোনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَيُّكُمْ مِثْلِيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيُسْقِيْنِيْ

তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমাকে আমার প্রভু পানাহার করিয়ে থাকেন।

এ পানাহার কি ছিল? আকাশ হতে পোলাও, কোরমা, জর্দার খাঞ্চা অবতীর্ণ হতো না। এ ছিল আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণের পানাহার যা আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা রূহ জিন্দা ও সজীব ছিল আর রূহ দ্বারা দেহ জিন্দা ও সজীব ছিল। আল্লাহ তায়ালার যিকির যখন রক্ত মাংসের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, তখন খাবার গ্রহণের প্রয়োজন কমে যায়। জীবন যিকিরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমি আমার বুযুর্গদের কাছে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ঘটনা শুনেছি। তিনি দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শেষ বয়সে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে একথা বলেছেন–

আলহামদুলিল্লাহ! এখন জীবন রক্ষার জন্য পানাহারের কোন প্রয়োজন আমার নেই। শুধু ইত্তেবায়ে সুন্নতের জন্য পানাহার করে থাকি। জীবন রক্ষার জন্য পানাহারের প্রয়োজন নেই।

সারকথা, যিকরুল্লাহ যখন মানুষের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে যায়, তখন জীবন ধারণের নির্ভরতা রুটির উপর নির্ভরশীল থাকে না, যিকিরের উপর হয়ে যায়। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে মানুষ জীবিত থাকে, আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তার জীবন অক্ষুণ্ন থাকে। সুতরাং প্রকৃত জীবন হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণের নাম।

প্রিয়জনের মিলন ও বিচ্ছেদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

কথাটা এভাবে বলা উচিত, জীবনের নাম হচ্ছে বন্ধুর সঙ্গে মিলনের সময় প্রিয় বন্ধুর নাম স্মরণ। এ নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে আসক্ত ব্যক্তির প্রাণে জীবনের

স্পন্দন এসে যায়। দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য। যদি কোন ব্যক্তি কারো প্রেমে আসক্ত হয়ে যায়, তাহলে সে দিন-রাত তার ধ্যানে মগ্ন থাকে। তখন যদি ঐ বন্ধু তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দূরে সরে পড়ে তাহলে বন্ধুর বিরহে সে মোমের মতো গলতে শুরু করে। কঙ্কালসার জীর্ণ দেহে খাটের উপর পড়ে থাকে। নড়াচড়া করারও শক্তি থাকে না। পানাহার ত্যাগ করে থাকে। সর্বদা খাটের উপর পড়ে থেকে বন্ধুর বিরহে কাতরাতে থাকে। প্রেমের জ্বালায় বিগলিত প্রাণ, একই ধ্যান একই খেয়াল। এমন সময় কেউ যদি এসে বলে, তোমার প্রিয় বন্ধু আসছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বলতে থাকবে– কোথায় আমার প্রাণের বন্ধু? কে বলল সে এসেছে?

এ শক্তি তার মধ্যে কোথা থেকে আসে? সেটা কি রুটি খেয়ে করেছে? না কোন শক্তিবর্ধক সালসা পান করেছে? প্রিয়জনের নামেই মৃতপ্রায় ব্যক্তির প্রাণ চঞ্চল হয়ে গেছে। বোঝা গেল, প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের নাম হলো জীবন।

কারো অন্তরে যদি টাকা-পয়সার প্রচণ্ড মহব্বত জন্মে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে টাকা-পয়সার আলোচনা হবে, সে প্রাণবন্ত থাকবে। যদি টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে তার জানের উপর আজাব-বিপদ এসে যাবে। কোন কোন মানুষ টাকা-পয়সার অভাবে দেউলিয়া হয়ে হার্টফেল করে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এ কারণে যে, তার প্রিয়বস্তু হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবন প্রদীপ নিভে যায়। অথবা কোন মহিলার সঙ্গে যদি কারো প্রেম ও ভালোবাসা হয়ে যায়, তাহলে যে পর্যন্ত ঐ মহিলা কাছে থাকে, সেও প্রাণচঞ্চল থাকে। মহিলা যখন আলাদা হয়ে যায় তখন সে বিরহ বেদনার জ্বালা সইতে না পেরে তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দেয়। সারকথা, প্রিয় বন্ধুর মিলনের অপর নাম জীবন বা জীবনীশক্তি। কারো প্রিয় ধন-সম্পদ, কারো প্রিয় সম্মান আবার কারও প্রিয়জন কোনো মহিলা। তবে যাদের প্রিয়জন 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন' তাঁরা তাঁর নামে জীবিত। যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির থাকবে সে জীবিত থাকবে। যিকির বন্ধ হয়ে গেলে সে মরে যাবে। যাদের প্রাণ, যাদের আত্মা আল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ তাদের জীবন তখনই, যখন সব সময় আল্লাহর যিকির হতে থাকে, আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ হতে থাকে। যখন এতে গাফলতি দেখা দেয়, তখন তার অবস্থা এমন হয় যে, যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ہر دل سالک ہزاراں غم بود ☆ گر ز باغ دل خلال کم بود

আল্লাহপ্রেমিকদের হৃদয়ে হাজারো চিন্তা-ভাবনা থাকে। বিষাদের পাহাড় তাদের অন্তরে ভেঙ্গে পড়ে– যদি সে দেখতে পায় যে, হৃদয়-বাগানে যিকরুল্লাহর একটি

বালুকণা কমে গেছে। সে তখন মনে করে এ হ্রাস বৃদ্ধি মৃত্যু কষ্টের সমান। তার মনে হবে সে বুঝি জীবিত নেই।

যাকিরদের মাঝে কখনও কব্জের (আনন্দহীনতা) অবস্থা হয়। এ কব্জের ক্রিয়া হয় এমন– যাকির ব্যক্তি মনে করে আমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার যিকির বিদ্যমান নেই। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল, তাতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো কব্জে পতিত ব্যক্তি আত্মহত্যা করে বসেন; যদি রক্ষাকারী কামেল পীর না থাকেন, পীর যদি সাহায্য ও পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভে ধন্য হলেন এবং প্রথম ওহী অবতীর্ণ হলো–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ.

এরপর ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে ভীষণ চিন্তার উদয় হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'কোন কোন সময় আমার মন চাইত আত্মহত্যা করে ফেলি, এমন জীবন কি কাজের, যখন প্রিয়বস্তুই বিদ্যমান নেই।'

একবার এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপর উঠলেন। পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবেন। এমন সময় পেছন থেকে হাত ধরে ফেললো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে যেতে চাইলেন, পেছন থেকে কে যেন আওয়াজ দিল– يامحمد হে মোহাম্মদ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই সেখানে। এরূপ কব্জ অবস্থা যখন হয় তখন মানুষ মরে যেতে চায়। সালিক বা আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারী মনে করে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সারকথা, জীবন হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণের নাম। আমরা যেহেতু দিন-রাত পানাহারের চিন্তায় মগ্ন, তাই পানাহারকেই জীবন মনে করে থাকি। আমরা প্রেমের গলিতে পদার্পণ করিনি। সে সম্পর্কে অবহিত নই– যা হলো প্রকৃত জীবন। যাদের অন্তরে সে প্রেম এসে গেছে তারা বুঝতে পারছে প্রকৃত জীবন হলো প্রেম-প্রীতিরই নাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন।

مَثَلُ الذَّاكِرِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَمَثَلِ الْحَىِّ فِى الْاَمْوَاتِ.

যিকিরকারী ও গাফেলদের মধ্যে অবস্থা এমন যেমন মৃতদের

মধ্যে জীবিত ব্যক্তি বসে আছে। গাফলত হলো মৃত্যু, যিকির হলো জীবন।

যিকরুল্লাহর বিস্ময়কর ফলাফল

যিকরুল্লাহর বিস্ময়কর ফলাফল হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালার দরবারে সাম্যের আইন কার্যকর রয়েছে। মানুষ যেমন কর্ম করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তেমনই আচরণ করা হয়। বলা হয়েছে–

إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন। [মুহাম্মদ : ৭]

আরও বলা হয়েছে–

مَنْ اَحَبَّ لِقَآءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَآءَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। অপেক্ষায় থাকেন, কখন আল্লাহর বান্দা এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করবে। অর্থাৎ এদিক থেকে যে আচরণ হবে, ওদিক থেকেও তেমনি আচরণ হবে।

আরও বলা হয়েছে–

فَاذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ

আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব, তোমরা যদি আল্লাহর যিকির করতে থাক, তিনিও তোমাদের যিকির করবেন।

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে– বান্দা যদি নির্জনে বসে আমাকে স্মরণ করে, আমিও নির্জনে তাকে স্মরণ করি। যে ধরনের যিকির মানুষ করবে, আল্লাহ তায়ালাও সে ধরনের যিকির করবেন। যিকিরের ফলে সে আলোকিত মানুষ হয়ে যায়। এদিক থেকে মানুষ যিকির করছে ওদিক থেকে আল্লাহ যিকির করছেন। সে মাযকুর হয়ে গেল। তাই মানুষ যদি চায় আল্লাহর দরবারে তার আলোচনা হোক, তাহলে সে আল্লাহর যিকির শুরু করে দিক। যে পরিমাণ সে যিকির করবে, ঐ পরিমাণ আল্লাহ তায়ালাও তার আলোচনা ও স্মরণ করবেন।

দেখুন, কোন হাকিম, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির দরবারে যদি আপনার আলোচনা হয় এবং আপনি শুনতে পান যে আজ রাষ্ট্রপতি আপনার আলোচনা করছেন, তাহলে সম্মান ও গর্বে আপনার মাথা উঁচু হয়ে যাবে। আপনি পত্রিকায় প্রচার করবেন যে, আজ রাষ্ট্রপতি আপনাকে স্মরণ করছেন। আপনার আলোচনা করছেন। যদি কোন সম্মানী ও মহান ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, তাহলে তা আমার গর্বের বিষয় হবে।

আল্লাহ তায়ালা সকল বাদশাহর বাদশাহ। যদি তাঁর দরবারে কারো আলোচনা হয়, তাহলে কি তা অত্যন্ত গর্বের বিষয় নয়? সম্মানের ব্যাপার নয়? আল্লাহ কাকে স্মরণ করবেন? আল্লাহ কখন স্মরণ করবেন? যখন আপনি তাকে স্মরণ করবেন।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

সারকথা, কেউ যদি ইচ্ছা করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার আলোচনা, তার স্মরণ হোক, তাহলে সে নিজে আল্লাহর যিকিরকে নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করুন। সে যদি সব সময় যিকির করে, আল্লাহ তায়ালাও সব সময় যিকির করবেন। সে যদি গাফেল উদাসীন হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালার দরবারেও তাই হবে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

তোমরা এমন হবে না, আল্লাহকে ভুলে বসবে। তাহলে তোমরা নিজেদেরকে ভুলে যাবে। আল্লাহও তোমাদেরকে ভুলে যাবেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– যেসব মানুষ কুরআন হেফয করে ভুলে যায়, তাকে কেয়ামতের ময়দানে অন্ধ করে উঠানো হবে। তখন সে বলবে–

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

হে আল্লাহ! আমাকে অন্ধ করে উঠালেন কেন? আমি দুনিয়াতে থাকার সময় দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম। [ত্ব-হা : ১২৫]

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ

আমি আমার আয়াতসমূহ তোমার অন্তরে ঢেলে ছিলাম, আর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাকে ভুলে গিয়েছি। [ত্ব-হা : ১২৬]

তুমি যদি ভুলে যাও আল্লাহ থেকেও ভুলে যাওয়া হবে। আর যে স্মরণ করবে, আল্লাহ থেকেও স্মরণ করা হবে। হাদীস কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

হে বান্দা! সুস্থ অবস্থায় তুমি আমাকে স্মরণ রেখ, তাহলে অসুস্থতার সময় আমি তোমাকে স্মরণ করবো। সচ্ছলতার সময় আমাকে স্মরণ করো, দারিদ্র ও অভাবের সময় আমি তোমাকে স্মরণ করব। সুস্থ সবল থাকাবস্থায় আমাকে স্মরণ করো, রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর আমি তোমাকে স্মরণ করব– যখন তোমার স্মরণকারী কেউ থাকবে না। তুমি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আমাকে স্মরণ করো, তাহলে কবরের জীবনে আমি তোমাকে স্মরণ করব। যে দুনিয়াতে স্মরণ করবে হাশরে সে উপকৃত হবে। যে এখানে ভুলে যাবে, সে কবরে ও হাশরে অসহায় হয়ে থাকবে।

আল্লাহর স্মরণের অনুভূতি

তাই যিকরুল্লাহ শুধু জগতের প্রাণই নয়; বরং মানুষের রূহেরও প্রাণ। যদি যিকির বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে রূহের উপর মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি অনুভূতি থাকে তাহলে তা বুঝা যায়। জীবিত ও মৃত প্রাণের পার্থক্য হলো এই। কালো কাপড়ে হাজার দাগ লেগে গেলেও অনুভব হয় না। যেহেতু কাপড়টি আগে থেকেই কালো। আর সাদা কাপড়ে যদি সামান্য কালো দাগ লেগে যায়, তাহলে তা স্পষ্ট দেখা যায়, অনুভূত হয়। সুতরাং যাদের আত্মায় গাফলত ও উদাসীনতা বাসা বেঁধেছে, তাদের মধ্যে যদি আরও দশটি গাফলত বেড়ে যায়, তবুও তা অনুভূত হবে না। কারণ, আত্মা গাফলতের রঙে রাঙা। তবে স্মরণকারী যদি এক মিনিট গাফেল থাকে, তাহলে সে অনুভব করবে, তার হৃদয় থেকে কি যেন একটি জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাই যিকিরের অনুভূতি সৃষ্টি করা উচিত। এই হলো জীবন। জীবন বলা হয় কেন্দ্রীভূত হওয়াকে। মৃত্যু সবকিছুকে ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আপনার শরীরে, পানি, মাটি, আগুন, বাতাস একত্রিত রয়েছে। তাই বলা হচ্ছে আপনি জীবিত। কবরে যাওয়ার পর এসবই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন বলা হবে মৃত। যিকির রূহকে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে রাখে, দেহের বিভিন্ন অংশ একত্রিত করে রাখে। যিকির হচ্ছে মানুষের রূহ, মানুষের জীবন। যিকির যদি না থাকে তাহলে মানুষের প্রকৃত জীবন বলে কিছু থাকে না।

আল্লাহকে স্মরণ করার সঠিক নিয়ম

তাই এই হাদীসটি আমি তেলাওয়াত করেছিলাম। কোন দীর্ঘ ওয়ায করা আমার বাসনা ছিল না। এই হাদীসটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির মানুষের অভ্যাস হয়ে যায়। যিকির ও স্মরণ করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম নিয়ম : একে মৌলিক নিয়মও বলা হয়। তা হলো ফরয ইবাদতসমূহ আদায় করা। সর্বোত্তম যিকির হল ফরয ইবাদতগুলো আদায়। নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

আমার যিকির ও স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।

বোঝা গেল নামায আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকির। হজ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍ فَاذْكُرُوا۟ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا۟ اللَّهَ.

হজের এক একটি রোকন সম্পর্কে যিকরুল্লাহ, ইস্তেগফার, তাওবা, আল্লাহর স্মরণ প্রভৃতিকে বলা হয়েছে। সব কিছুর উদ্দেশ্য হল যিকির। নামাযের উদ্দেশ্য যিকির, সদকা যাকাতের উদ্দেশ্যও যিকির। [বাকারা : ১৯৮-৯৯]

কুরবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.

তোমরা যে কুরবানী করছো এর গোশত, রক্ত, চামড়া আল্লাহর কাছে পৌছবে না। বরং তাকওয়া (যিকির ও স্মরণ) আল্লাহর দরবারে পৌছবে। এসব হল তারই স্মরণ। [হজ্জ : ৩৭]

সারকথা, কুরবানী, যাকাত, হজ, নামায– এসবেরই রূহ ও প্রাণ হল আল্লাহ তায়ালার যিকির। যিকির করার নিয়ম ও নীতি হচ্ছে ফরয ইবাদতসমূহ যথারীতি আদায় করে যাওয়া।

সাময়িক যিকির

তবে মৌলিক ও প্রকৃত যিকিরের সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও দেয়া হয়েছে–

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً.

হে মুমিনগণ! বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির কর।

প্রথমে হচ্ছে মূল যিকির– তাহল ফরয ইবাদতসমূহ আদায় করা।

আরেক হল অতিরিক্ত বা বেশি বেশি যিকির। এর মর্যাদার স্তর সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে। এ যিকিরের দু'টি নিয়ম– ১. সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং ২. সময়ের সঙ্গে সীমাদ্ধ নয়। সময়ের সীমাবদ্ধতার অর্থ হচ্ছে সকাল বিকাল নির্দিষ্ট সময়ে কিছু তাসবীহ তাহলীল করে নেয়া। যেমন- ফজরের নামাযের পর বসে গেলেন। মনে করুন, একশত বার سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّه وَلاَ الهَ الاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ পড়ে নিলেন। একশত বার ইস্তেগফার, একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করলেন। এভাবে বিকেলেও পাঠ করলেন।

سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَـٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ.

আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর ও পবিত্রতা বর্ণনা কর সকাল সন্ধ্যায়। আকাশ ও জমিনে তাঁর প্রশংসা অপরাহ্নে। [রুম : ১৭-১৮]

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

সকাল বিকাল আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।

এ হচ্ছে নির্ধারিত যিকির। মানুষ পূর্ব নির্ধারিত সময় ও সংখ্যানুপাতে তাসবীহ পাঠ করে। শতবার করে হোক, তেত্রিশ বার করে হোক– যদি এই পরিমাণ নাও হয় তাহলে আরো কিছু কম সংখ্যকই হোক। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ করতে থাক। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

خَيْرُ الأُمُوْرِ مَا دِيْمَ عَلَيْهِ

সর্বোত্তম আমল তা-ই, যা সব সময় করা হয়।

এটা আত্মায় সক্রিয় হয়ে পড়ে। শক্ত ও মজবুত হয়ে পড়ে। পাহাড়ের উপর

একটি বিরাট পাথরের উপর ধুলোবালি জমতে থাকে। আপনি কয়েক মণ পানি ঢেলে দিলেন। ধুলোবালি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু অল্প সময় পর আবার ধুলোবালি জমতে থাকবে। অনেক মণ পানি ঢেলে দেয়ার কারণে পাথর পরিষ্কার হয়ে যায় বটে, কিন্তু পাথরের মধ্যে আর্দ্রতা আসে না। তবে আপনি যদি এক ফোঁটা করে বছর পানি ঢালতে থাকেন, তাহলে পাথরের গায়ে তা সক্রিয় হয়ে পড়বে। কম আমল হৃদয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। আত্মায় শক্ত হয়ে বসে পড়ে। কিন্তু আপনি যদি একদিন পঞ্চাশ রাকাত নফল নামায পড়েন; তারপর এমনভাবে উধাও হয়ে যান যে, বছরের মধ্যে একদিনও এরূপ পড়লেন না– তাহলে ধুলোবালি ধোয়া হয়ে যাবে। সওয়াব পেয়ে যাবেন। তবে আত্মায় কোন ক্রিয়া বা শক্তি সঞ্চয় হবে না। তাই আমল কম হোক, স্থায়ীভাবে সব সময় তা করতে হবে। এর মাধ্যমে অন্তরে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আমল ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কথা হলো, শতবার না হোক, খুব কম সংখ্যকই হোক তবে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ করা দরকার। কিছু কুরআন তেলাওয়াত করে নিলেন। কিছু তাসবীহ তাহলীল পাঠ করে নিলেন। দশ মিনিটই হোক কিন্তু পাবন্দীর সঙ্গে করবেন। চল্লিশ দিন পর নিজেই অনুভব করবেন, অন্তরে কি পরিমাণ ক্রিয়া হয়েছে। ফল লাভ হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– মানুষ যদি কোন আমল ইখলাসের সঙ্গে একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করতে থাকে, তাহলে তার অন্তরে হেকমত বা জ্ঞানের ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মা'রেফাত ও আল্লাহর পরিচয় লাভ, মহব্বত ও ভালোবাসা শুরু হয়ে যায়। যিকরে কাসির বা অধিক যিকিরের নিয়ম হলো– নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ আল্লাহর যিকির করবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে।

অনির্দিষ্ট যিকির

আরেকটি হলো অনির্দিষ্ট পদ্ধতি। মানুষ যিকিরের এমন অভ্যাস করে নিবে, তার যবানে আল্লাহ তায়ালার কোন না কোন নাম বের হতে থাকবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

ওঠাবসা, চলাফেরা, ওযু-বেওযু সর্বাবস্থায় যিকির করতে থাকবে। মাসের পর মাস কষ্ট করে এ অভ্যাস করতে হবে। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন অনিচ্ছায়ও আল্লাহর নাম মুখ দিয়ে জারি হতে থাকবে। যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায়,

যদি হঠাৎ পড়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ بِسْمِ اللهِ – اِلاَّ اللهُ এ জাতীয় কোন না কোন ইসম মুখ দিয়ে বের হবে। এ কথা বের হবে না 'লোক সকল! দৌড়ে এসো, আমাকে উদ্ধার কর!' বরং আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করবে। প্রাথমিকভাবে কিছুটা কষ্ট করতে হবে। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন ইচ্ছা ছাড়াই মুখ দিয়ে যিকির বের হতে থাকবে।

অনির্দিষ্ট যিকিরের ফলাফল

এর ফলে মরণের সময় চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার নাম মুখে জারী থাকবে। খাতেমা ঈমানের উপর হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

تُحْشَرُوْنَ كَمَا تَمُوْتُوْنَ وَتَمُوْتُوْنَ كَمَا تَحْيَوْنَ

> তোমাদের হাশর ঐ অবস্থায় হবে যে অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল এবং মৃত্যু ঐ অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

যদি আল্লাহর নামে যিকিরের উপর জীবন অতিবাহিত করে থাক তাহলে মরণের সময় নিশ্চয়ই আল্লাহর নাম মুখ দিয়ে জারী হবে। আর মানুষ যদি আল্লাহর নাম নিতে নিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তাহলে কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ও মুখ দিয়ে আল্লাহর নামই জারী থাকবে। তখন তার মনে হবে– আমি প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময়ে রয়েছি এবং আল্লাহকে স্মরণ করছি। পরে সে বুঝতে পারবে, এ হচ্ছে হাশরের ময়দান। মানুষের যখন অভ্যাস হয়ে যায়, তখন চেষ্টা ছাড়াই ঐ জিনিস মুখ দিয়ে বের হতে থাকে, যে জিনিসের অভ্যাস সে করে।

হযরত ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন– প্রত্যেক ইবাদত প্রাথমিক অবস্থায় রিয়াকারী (লোক দেখানো) হয়ে থাকে। তারপর অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সবশেষ ইবাদতের রূপ ধারণ করে। তিনি এর প্রমাণ পেশ করেছেন হাদীসের মাধ্যমে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

مُرُوْا اصِبْيَا نَكُمْ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغُوْا سَبْعاً وَاضْرِبُوْهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشَرًا

> শিশু যখন সাত বছরের হয়ে যায়, নামাযের জন্য তাকিদ কর। তাকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাও। যদি দশ বছর হয়ে যায় এবং কথা না মানলে নামাযের জন্য প্রহার কর।

স্পষ্ট কথা, সাত বছরের বাচ্চাকে যখন আপনি নামায পড়াবেন সে নামায

আল্লাহর জন্য হবে না। বরং সে নামায হবে বাপের জন্য। মারধরের ভয়ে নামায পড়বে এবং মসজিদে গিয়ে আঁড় চোখে দেখতে থাকবে– বাপ কি অবস্থায় আছেন। যদি দেখে বাপ দাঁড়িয়ে আছেন, তাহলে অত্যন্ত খুশু খুশু মনোযোগের সঙ্গে নামায আদায় করবে। আর যদি দেখতে পায় পিতা চলে গেছেন বা অন্যমনস্ক হয়েছেন তাহলে সেও কিছুক্ষণের মধ্যে সরে পড়বে। এ হচ্ছে বাবার নামায, প্রকৃত নামায নয়। আট নয় বছর পর্যন্ত এ নামায ছিল রিয়াকারীর নামায। দশ বছর বয়সে নামাযের অভ্যাস হযে যায়। তবে জ্ঞানবুদ্ধিও এসে যায়। কিন্তু নামাযের হাকিকত বা মাহাত্ম্য তখনও বুঝতে পারে না। একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের হল, মসজিদে পৌঁছে গেল, জামাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নিল। কিন্তু এ খেয়াল নেই। আমি কি করছি, এ কাজের হাকিকত ও মূলতত্ত্ব কি? এ কাজ কি ইবাদত না আদত বা অভ্যাস। একটা অভ্যাস হয়েছে। সে অনুযায়ী কাজ চলছে। নামায প্রাথমিক অবস্থায় রিয়াকারী বা লোক দেখানো ছিল। দীর্ঘদিন আদায় করার পর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারপর ইবাদতের রূপ লাভ করবে। কাজেই প্রত্যেক ইবাদত শুরুতে রিয়াকারী হয়ে থাকে। তারপর অভ্যাসে পরিণত হয়.। তারপর ইবাদত হয়।

এসব সত্ত্বেও শরীয়ত আদেশ দিয়েছে, রিয়াকারী হোক তবুও নামায পড়। অভ্যাস হিসাবে নামায আদায় কর। পরবর্তীতে ইবাদত হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ আল্লাহ তায়ালার যিকির করতে চায়, আর অন্তরে এ ধারণা জন্মে যে, এ ব্যক্তি রিয়াকারী। মানুষ বলবে– সুফী সাহেব হয়ে গেলেন; বড় নামাযী, বড় যিকিরকারী হয়ে গেছেন। তাহলে মনে করবেন, এসব শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। লোক দেখানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালার যিকির করতে থাকুন। যিকির নিজেই আপনাকে ইখলাস ও এবাদতের দিকে টেনে নিবে। যিকির আপনার অন্তরে বাসা করে নিবে, মজবুত ও দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করবে।

بہر دین وار دنیا بہر نام ☆ اللہ اللہ کردہ باید والسلام

দীনের জন্য, দুনিয়ার জন্য, লোক দেখানোর জন্য আল্লাহর নামে যিকির করতে থাক। এ নামই তোমাকে আল্লাহর দিকে টেনে নিবে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) মুহাদ্দিসীনের মধ্যে মহামর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন–

طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَاَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ اِلَّا لِلّٰهِ

আমরা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করেছিলাম– ইলম হাসিল করে প্রসিদ্ধি ও সুনাম অর্জন করব। হয়তো কিছু টাকা-পয়সাও পাওয়া যাবে। শিখেছিলাম দুনিয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইলম যখন অন্তরে এসে গেল, তখন ইলম অস্বীকার করে বসল, আমি দুনিয়ার জন্য থাকতে পারব না। আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়ে থাকব। শেষ পর্যন্ত ইলম আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং ইলম দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হলেও শিক্ষা করুন। ইলম শেষ পর্যন্ত ঐ স্থানে পৌঁছে দিবে, যে স্থান ইলমের যোগ্য। ইলম হীন ও নিচু হয়ে থাকতে চায় না। আপনি যতই হীন ও নিচু হতে চান, ইলম আপনাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাবে।

এটাই হচ্ছে যিকরুল্লাহর মূল হাকিকত ও মুল তত্ত্ব। আল্লাহ তায়ালা উচ্চ স্থানীয়, উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ; তাই তাঁর নামই উচ্চ মর্যাদাশীল। তাঁর যিকিরও উচ্চ। উঁচু মর্যাদাপূর্ণ জিনিস যখন আপনার যবানে থাকবে, আপনার উদ্দেশ্য যতই হীন এবং নিচু হোক না কেন, আপনাকে শেষ পর্যন্ত তা উপরে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সুতরাং সকাল বিকাল কিছু কিছু যিকির করা অত্যন্ত দরকারি ও কর্তব্য।

তাসবীহ স্মরণকারী

আল্লাহ তায়ালার নাম যদি স্মরণে না আসতে চায় তাহলে তাসবীহ হাতে রাখুন। তাসবীহ স্মরণ করিয়ে দিবে। হাতে তাসবীহ থাকলে তা দেখে বিনাশ্রমে মুখে سُبْحَانَ اللهِ জারী হয়ে যাবে। তাসবীহই হবে স্মরণকারী।

সংশয় মোচন

ভাবতে পারেন, হাতে তাসবীহ নিলে মানুষ বলবে বিরাট সুফী সাহেব সেজেছেন। এ সম্পর্কে হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) লিখেছেন– মানুষের খেয়ালে যিকির ত্যাগ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। মানুষ কি বলবে, আল্লাহর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ঠিক করে নাও। আল্লাহর সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নয়।

আপনি আন্তরিকভাবে যখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করবেন, তখন যদি এমন ধারণা আসে যে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করছি, তাহলে বুঝে নিবেন, এসব শয়তানের কারসাজি ও প্রতারণা। লা হাওলা পড়ে শয়তানের দিকে থুথু নিক্ষেপ করুন।

পূর্ণাঙ্গ প্রেম ও ভালোবাসায় দোষারোপ অর্থহীন

যদি কেউ হাসি ঠাট্টা করে, তাকে তা করতে দিন। মানুষের হাসি-মস্করা মন্দরূপ তখনই কার্যকর হয়, যখন আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা অপূর্ণাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ থাকে। প্রেম যখন পূর্ণতা পায়, তখন মানুষের কথা, কটুক্তি মনে কোন প্রভাব ফেলে না, কোন প্রকার দাগ কাটতে সক্ষম হয় না।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। যখন ইরান জয় হওয়ার পর তিনি সেখানে যান। সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। ইরান অত্যন্ত উন্নত বিত্তশালী রাষ্ট্র ছিল। সে যুগে দুটি বড় সাম্রাজ্য ছিল। একটি রোমানদের সাম্রাজ্য, যা খৃষ্টানদের অধীন ছিল। অপর দেশটি ছিল খসরুর; সেটা ছিল পারসিকদের। অন্যান্য রাজ্য এদের অধীন বা করদ রাজ্য ছিল।

সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান খাবার খেতে বসলেন। একজন পারসিক ক্রীতদাস দাঁড়িয়ে আহারের ব্যবস্থা করছিল। তার হাতে পানি ছিল। হযরত হুযাইফা (রা.)-এর হাত থেকে এক লোকমা খাবার মাটিতে পড়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়ে মাটি পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। তখন পারসিক ক্রীতদাস বলল– আপনি এটা কি করলেন! এটা অত্যন্ত সুসভ্য দেশ। এমন কাজ এদেশের তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী। মানুষ আপনাকে অত্যন্ত লোভী মনে করবে। এক একটি লোকমার জন্য জান কোরবান করে দেয়। মাটি পর্যন্ত পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলেছেন! এ হলো অত্যন্ত লোভী ও কৃপণতার পরিচায়ক। এমন করবেন না। এ দেশ ভদ্র ও সভ্যদের দেশ।

হযরত হুযাইফা (রা.) জবাবে কি বললেন? বললেন–

أَءَ تْرُكُ سُنَّتَ حَبِيْبِيْ لِهٰؤُ لَاءِ الْحُمَقَاءِ

আমি কি আমার বন্ধুর সুন্নতকে এসব বোকা নাদানদের কথায় ছেড়ে দেবো? একটা সুন্নতের এই পরিমাণ মূল্য ও মর্যাদা ছিল। এতটাই মহব্বত ও ভালোবাসা ছিল যে পারসিকদের সাম্রাজ্য, তাহযীব-তমদ্দুনও সেই পরিমাণ প্রিয় ছিল না। যখন প্রেমপ্রীতি পূর্ণতা পায়, তখন দুর্নামকারী ও অপবাদকারীদের কথায় কোন ক্রিয়া হয় না। অন্যের কথা ও নিন্দাবাদে তখনই প্রভাবিত হয়, যখন নিজের মধ্যে একটি ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকে। অপূর্ণতা ত্রুটিকে দূর করুন। অপূর্ণতা দূর করার নিয়ম ও পথ হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণ করার অভ্যাস করে নেয়া। যখন চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর নাম মুখে অন্তরে উচ্চারিত হতে

থাকবে, তখন আল্লাহর মহব্বত ও মারেফাতে প্রেমও বেড়ে যাবে। তখন দুর্নামকারীদের হাজারো দুর্নাম, নিন্দাবাদ কোন ক্রিয়া করতে পারবে না, প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বরং তাদের কথায় হাসি পাবে। মনে হবে, এরা বোকা নাদান। সুতরাং এসব কারণে প্রভাবিত ও লজ্জিত হবেন না।

সারকথা, এই হাদীসটিতে বলা হয়েছে প্রকৃত জীবন হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণের নাম! বিশ্বের সবকিছু জড় পদার্থ, তৃণলতা উদ্ভিদ সবার জীবন যিকিরের কারণেই। তাহলে যিকিরের মাধ্যমে মানুষের জীবন লাভ হবে না কেন? সুতরাং মানুষকে সর্বাধিক যিকিরকারী হতে হবে। যিকিরের মাধ্যমে সে জীবন লাভ করবে এবং চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।

মাওলানার আদেল রক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা পেশ করলাম এবং হাদীসখানার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে দিলাম। দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর যিকির ও স্মরণের তাওফিক দান করুন, আমিন!

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرِ خَلْقِه سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِه وَاَصْحٰبِه اَجْمَعِيْنَ. بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ৩

নবুওয়াত ও বাদশাহী

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় দশ বছর সময় কাটিয়ে যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় আগমন করলেন, তখন দশ হাজার অভিজ্ঞ বীর সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনির উপর সওয়ার। রাজা-বাদশাহগণ এ সময় নিজের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করেন। অহংকার ও গর্বের সঙ্গে চলেন। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– তখন বিনয়ে তাঁর মাথা নত হয়ে উটের গর্দানের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ○ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَحْذَرونَ○

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সীমা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামতের দুটি সিলসিলা জারি রেখেছেন। একটি হল জড়বাদী সিলসিলা, আর অন্যটি হলো রূহানী বা আধ্যাত্মিক সিলসিলা। জড় জাতীয় নেয়ামতের মধ্যে উন্নতমানের ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, সুদৃশ্য পোশাক-পরিচ্ছেদ, আরামদায়ক বাসভবন, সুন্দর সুগঠিত আকার আকৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এটা হলো একটা সিলসিলা– যার কোন সীমা সংখ্যা জানা যায় না। দুনিয়াতে এসব নেয়ামত দৈনন্দিন উন্নত হচ্ছে ও সমৃদ্ধি লাভ করছে। প্রতিটি জিনিসের নতুন নতুন ডিজাইন ও মডেল তৈরি হচ্ছে। কোনটি দিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়, সামান্য সময় আনন্দ পাওয়া যায়। কোনটির মাধ্যমে মন-মস্তিষ্ক এবং নাসারন্ধ্র বিমোহিত হয়ে যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করে চলেছেন এবং প্রতিদিন তা বেড়ে চলেছে।

এত কিছুর পরও জড় পদার্থ জাতীয় নেয়ামতসমূহের ক্ষমতা ও প্রভাব সবচে' বেশি। কোন জাতি ও সম্প্রদায়কে যদি সম্মান দান করা হয়, ক্ষমতা ও শক্তি তাদের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাহলে তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের মালিক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়। এরই নাম ইক্তেদার বা ক্ষমতা। জড় জাতীয় নেয়ামতগুলোর মধ্যে এক অংশ হল সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিদায়ক, আর কিছু অংশ ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি জাতীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামত হল রূহানী বা আধ্যাত্মিক। এ ধরনের নেয়ামত যেমন- ইলম, আখলাক, উন্নত চরিত্র, হেদায়াত ও সৎপথ প্রাপ্তি। এগুলো হচ্ছে জ্ঞানবুদ্ধির কাজ যা আত্মার শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এসবকে রূহানী নেয়ামত বলা হয়। যেগুলো দ্বারা মানবাত্মা সান্ত্বনা লাভ করে। আর এগুলো এত বিরাট নেয়ামত যে, জড়জাতীয় নেয়ামতসমূহ এদের তুলনায় ধুলোবালির মতো তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যায়।

ওলী আল্লাহগণ জড় জাতীয় নেয়ামতের স্বাদ ও আনন্দ-স্ফুর্তির উপর পদাঘাত করেছেন। নিশ্চয়ই তাদের হাতে এমন কোন নেয়ামত এসেছে যে কারণে তারা এসব নেয়ামতকে তুচ্ছ মূল্যহীন ও মর্যাদাহীন মনে করেছেন। তাহলে একথা ভিন্নভাবে অনুমাননির্ভর যে, এক শ্রেণীর নেয়ামত উচ্চমর্যাদাশীল আর এক শ্রেণীর নেয়ামত নিম্নমানের। তাহলে দুটোই নেয়ামত : একটি জড়জাতীয়, অপরটি রূহানী। জড় জাতীয় নেয়ামতের সীমা হল রাজ্য ও ক্ষমতা দখল। ক্ষমতার আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জড় জাতীয় নেয়ামত চরমে পৌঁছে যায়, শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে যায়। যখন কোন জাতিকে আল্লাহ তায়ালা রাজত্ব

ও ক্ষমতা দান করেন তখন সকল পার্থিব সম্পদ তাদের হাতে এসে যায়। আর রূহানী নেয়ামতের পূর্ণতা ঘটে অর্থাৎ রূহানী নেয়ামত তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যখন তা নবুওয়াতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। নবীগণ (আ.) নবুওয়াতের মাধ্যমে যেসব নেয়ামত নিয়ে আসেন, সেসব হল রূহ ও আত্মার প্রশান্তি। আর তা সাব্ত নার জন্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলম আখলাক, আল্লাহ তায়ালার জালাল ও জামাল, পবিত্র গুণাবলীর মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষদর্শন। সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া, আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহ তেলাওয়াত করা। এসবের মাধ্যমে রূহ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই সিলসিলা নবুওয়াতের দরজায় পৌঁছে তার ইতি টানে।

জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতা হলো পার্থিব যা দেহের উপর কার্যকর থাকে। আর নবীগণের (আ.) ক্ষমতা হলো রূহানী বা আধ্যাত্মিক। তাঁরা আত্মার উপর রাজত্ব করেন। রাজা-বাদশাহরা হলো দেহের বাদশাহ। আর নবীগণ হলেন আত্মার ও রূহের বাদশাহ। তাঁদের রাজত্ব সকল ক্ষমতার উপর। আর নবীদের ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রেম ও ভালোবাসা ভিত্তিক। বাদশাহ যদি সামনে থাকে তখন মানুষ ভয় করে। আড়ালেও আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। কারণ দুনিয়ার বাদশাহর সি.আই.ডি. রয়েছে। তাই আতংকিত থাকে। এমন কথা যেন মুখ দিয়ে বের না হয়, যাতে আইনের বেড়াজালে আটকে যায়। রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা না হয়ে যায়। যদিও সে মন থেকে বাদশাহকে অভিশাপ দিতে থাকে। অন্তর ও আত্মার উপর এদের কোন ক্ষমতা নেই। বরং অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রয়েছে। তবে মুখে বলতে পারছে না। এদের রাজত্ব ও বাদশাহী দেহের উপর। আর আম্বিয়া (আ.)-এর রাজত্ব ও ক্ষমতা অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা যদি সামনে না-ও থাকেন, তবুও মানুষ তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় নত হয়ে থাকে। তাঁরা যদি দুনিয়াতেও না থাকেন তবুও তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে অন্তরে। যখন তাঁদের নাম উচ্চারিত হয় আমরা সবাই তাঁদের নামের উপর দরূদ পাঠ করবো। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবো। নবীগণের যাত ও সত্তা তো অনেক অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের খাদেমগণ বা সাহাবাগণের যখন আলোচনা হয়, নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন আমরা 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম' বলবো। সাহাবীগণের স্থান ও মর্যাদা অনেক উপরে। তাঁদের খাদেম ও গোলামদের তথা ওলীগণের নাম আলোচিত হলে আমরা সবাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলি। নেক বান্দাদের আলোচনা হলে মহব্বত ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করি। আজ আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে আমাদের চোখের সামনে নেই। তবে আমাদের অন্তর তাঁদের

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। আজ যদি খাজা আজমিরী (রহ.)-এর নাম উচ্চারিত হয়, তাহলে শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় অন্তর নত হয়ে যায়। যদি শায়খ আলাউদ্দিন সাবির কলিরী (রহ.)-এর নাম এসে যায়, তাহলে সম্মান ও শ্রদ্ধায় অন্তরাত্মা ঝুঁকে পড়ে। আজ যদি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নাম এসে যায়, উচ্চারিত হয় তাহলে আমাদের অন্তর সম্মান ও শ্রদ্ধায় নুইয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি তাদের শানে গোস্তাকী করে, অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে মানুষ জান কোরবান করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয় যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন শব্দ সহ্য করতে পারে না। বরদাশত করতে পারে না। এসব মহব্বত ও শ্রদ্ধা ছাড়া আর কি হতে পারে? তাঁরা আজ দুনিয়াতে নেই। কিন্তু মানুষের আত্মার উপর এখনও রাজত্ব করছেন, করতে থাকবেন।

মি. আরনল্ড (Arnold) যিনি স্যার সৈয়দের যুগে আলীগড় কলেজের অধ্যাপক ছিলেন– তিনি 'প্রিচিং অব ইসলাম' নামের একটি বই রচনা করেছেন। তিনি ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন যুগ ও কার্য পদ্ধতির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন কীভাবে ও কোন পন্থায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, বিস্তার লাভ করেছে। তিনি ওই বইয়ে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এসব বর্ণনা করেছেন। হিন্দুস্থানেরও আলোচনা করেছেন। হিন্দুস্থানের আলোচনায় লিখেছেন– 'আমি একটি বিস্ময়কর বিষয় দেখেছি যা অন্য কোথাও আমি দেখিনি।' তার মতানুযায়ী তো ঠিক কথাই বলেছেন, তিনি অন্য কোথায়ও দেখেননি। তবে অন্যরা সবখানে এ অবস্থা দেখতে পান। তার জন্য এটা ছিল আশ্চর্যজনক ঘটনা।

ঘটনা হচ্ছে এই, তিনি লিখেছেন– আমি হিন্দুস্থানে দেখেছি আজমীর নামক স্থানে এক ব্যক্তি কবরে শুয়ে আছেন এবং কবরে থেকেও গোটা হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করছেন। সে ব্যক্তি বাদশাহ বনে আছে। তাঁর নাম 'সুলতান হিন্দ' বা হিন্দুস্থানের বাদশাহ। অর্থাৎ হযরত খাজা আজমিরী (রহ.)।

তিনি বলেন– 'আমি বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি, এক ব্যক্তি কবরে শায়িত আছেন। তিনি এ দুনিয়াতে নেই অথচ গোটা হিন্দুস্থানের জনগণের অন্তরের উপর তিনি রাজত্ব করছেন। তাঁর নামও উচ্চারণ করেন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বুঝানো যে, জড়বাদের ক্ষমতা, রাজত্ব ও প্রভাব দেহের উপর, আর রূহানী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হৃদয় ও আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ কারণেই নবীগণ (আ.)-এর অনুসারী খাদেম ও নবীগণের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও অন্তরাত্মার উপর রাজত্ব করেন। আর দুনিয়ার রাজা-

বাদশাহগণ ও তাদের সহচররা রাজত্ব করেন দেহের উপর। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা সামনে উপস্থিত থাকলে মানুষ সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেন। অন্যথায় কোন কোন সময় অভিশাপও দিতে থাকে। আর আম্বিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.) দুনিয়াতে থাকুন বা না থাকুন, মানুষের আত্মার উপর সমানভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান মানুষের অন্তরে সমানভাবে পরিপূর্ণ থাকে। ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির দুটি ধারা রয়েছে। তা হলো জড়বাদী ক্ষমতার ধারা, যার চরম ও শেষসীমা হচ্ছে রাজত্ব ও বাদশাহী লাভ। আর রূহানী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভের শেষসীমা হল নবুওয়াত লাভ।

নবুওয়াত ও মুলুকিয়াতের প্রকৃতিগত পার্থক্য

নবুওয়াত ও মুলুকিয়াতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। নবুওয়াতের প্রকৃতি এক রকম। বাদশাহাত ও মুলুকিয়াতের প্রকৃতি অন্য রকম। দুনিয়াতে যখন বাদশাহাত রাজতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে তখন তার প্রকৃতি হয় এক প্রকার। পবিত্র কুরআনে এ দু'টির প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে– বাদশাহ যখন কোন দেশের উপর জয়ী হয়, প্রাধান্য লাভ করে, বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে, তখন সে কি করে?

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ.

> কোন বাদশাহ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বসতির পর বসতি ধ্বংস ও বিধবস্ত করে দেয়। সম্মানিত মানুষকে চরম অসম্মান করে এবং হীন নিকৃষ্ট লোকদেরকে শীর্ষে উঠিয়ে নেয়, মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

যারা সম্ভ্রান্ত ও সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়া হয়। কারণ আশংকা থাকে, হয়ত এসব মানুষ পুনরায় ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে, ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করতে পারে। এজন্য তাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে তাদের ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা না থাকে। ঐসব চিহ্ন মুছে ফেলা হয়, যা কোন জাতি ক্ষমতায় থাকাকালীন কায়েম করেছিল। কাগজপত্র থেকে ঐসব নাম মুছে ফেলা হয়, যেন ভবিষ্যতেও কোনদিন তাদের

স্মৃতি স্মরণে না আসে। কারণ তাদের প্রভাব যদি সামান্যও থেকে যায়, তাহলে আমাদের ক্ষমতার মসনদ নিরাপদ থাকবে না। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ

এই হলো রাজা বাদশাহদের নিয়ম। [নামল : ৩৪]

রাজা বাদশাহদের ইতিহাস যদি দেখা যায়। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ক্ষমতা লাভ এবং রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি

আরেক হল নবীগণের স্বভাব প্রকৃতি। যখন নবুওয়াতের ক্ষমতা প্রাধান্য লাভ করে, প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়। সম্মানী লোকের সম্মান রক্ষা করা হয়। যারা নিম্নস্তরের তাদের উপরে উঠানো হয়, যেন মান-সম্মান, ইজ্জত আব্রুতে সবাই অংশীদার হতে পারে। কারো অপমান, লজ্জা ও লাঞ্ছনা না হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় দশ বছর সময় কাটিয়ে যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় আগমন করলেন, তখন দশ হাজার অভিজ্ঞ বীর সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনির উপর সওয়ার। রাজা-বাদশাহগণ এ সময় নিজের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করেন। অহংকার ও গর্বের সঙ্গে চলেন। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– তখন বিনয়ে তাঁর মাথা নত হয়ে উটের গর্দানের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। যেহেতু তাঁর মক্কা প্রবেশ সম্মানজনক ছিল। তখন আল্লাহ তায়ালার ইজ্জত ও সম্মান তাঁর দৃষ্টিতে ছিল। তাই নেহায়েত বিনয় ও নম্রতার কারণে মাথা এত বেশি ঝুঁকে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশ এমনই ছিল। রাজা-বাদশাহগণ যখন বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন, তখন অহংকার গর্ব গরিমার সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বাহু উচিয়ে প্রবেশ করেন। তারপর সম্মানিত লোকদের চরমভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করেন। আর অসম্মানি বা নিচু প্রকৃতির লোকদেরকে আরও অসম্মানি ও নিচু করেন। আর নবীগণের স্বভাব প্রকৃতি হল এই– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সৈনিকসহ প্রবেশ করলেন এবং সবখানে ঘোষণা করে দিলেন–

مَنْ دَخَلَ دَارَ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ

আবু সুফিয়ানের বাড়িতে যে ব্যক্তি ঢুকে পড়বে সে নিরাপদ।

مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ امِنٌ

যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে ঢুকে পড়বে সে নিরাপদ।

مَنْ اَغْلَقَ بَابَ بَهٗ فَهُوَ مِنْ

যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্দ করে দিবে সেও নিরাপদ।

মোটকথা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হল।

কোন্ জাতির বিরুদ্ধে এ বিজয় ছিল? এ বিজয় ছিল সেই জাতির বিরুদ্ধে যে জাতি তেরোটি বছর ধরে আল্লাহর রাসূলকে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি। তাঁর প্রতি অত্যন্ত জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন করেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল। তাঁকে গালিগালাজ করা হয়েছিল। মিথ্যুক, পাগল, গণক, জাদুকর বলা হয়েছিল। তাঁর উপর জাদু করা হযেছিল। তায়েফে যাওয়ার পর তাঁর প্রতি এত বেশি পাথর মারা হলো যে, পা মোবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তে জুতা ভরে গেল। পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর এই জাতিকেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে অথবা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে চলে যাবে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নিবে, সেও নিরাপদ। এমন কোন পথ খোলা রাখা হয়নি যে পথ দিয়ে বিশৃংখলা, অশান্তি, মারামারি বা রক্তপাত হতে পারে। ঐ জাতির সঙ্গে এমন দয়া ও মেহেরবানির আচরণ করা হল। যে জাতি তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল, হিজরত করতে বাধ্য করেছিল তাদের প্রতি তাঁর এই আচরণ! এ ছিল নবুওয়াতের স্বভাব প্রকৃতি। যে পরিমাণ ক্ষমতা লাভ হত, সে অনুপাতে তাওয়াযু ও বিনয় বেড়ে যেতো।

نہد شاخ پر زمہوہ سر بر زمیں

যে গাছে অনেক ফল ধরে সে গাছ মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এমন হয় না যে গাছ ফলবতী হয়ে শাখা উপরে উঠিয়ে রাখে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে সকল দৌলত নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন সে সবের দ্বারা বিনয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পার্থিব ধন-দৌলত যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় গর্ব অহংকারও সে পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের জন্য রওনা হয়ে যাওয়ার পথে হরাম শরীফে

তাশরিফ নিলেন। বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষক উসমান শয়বীর গোত্রের ছিল। শয়বী তাদেরকে বলা হয়, যারা বায়তুল্লাহ শরীফের দরজায় বসা থাকত। বায়তুল্লাহর চাবি তাদের কাছে থাকত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হিজরত করে চলে যাচ্ছিলেন, তাঁর অন্তর দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত– এ অবস্থায় শয়বীকে তিনি বললেন, 'হে শয়বী! দু'এক মিনিটের জন্য বায়তুল্লাহর দরজাটি খুলে দাও। আমি ভেতরে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিই।'

সে ধমক দিয়ে বলল, 'তোমাকে কখনও প্রবেশাধিকার দেয়া যেতে পারে না। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। আমাদের দেবীদের মন্দ বলেছ। চলে যাও, চাবি দেয়া যাবে না।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অনুনয় বিনয় করে বললেন– আমি ইবাদত করতে চাই। সে বলল, না তোমার জন্য অনুমতি দেয়া যায় না। তুমি চলে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে শয়বী! এমন সময় আসবে, যে স্থানে তুমি বসা আছ সে স্থানে আমি বসা থাকব। আর যে স্থানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি সে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন তোমার কি অবস্থা হবে? সে বলল– 'যাও যাও, এমন কথা বহু শুনেছি, বহু দেখেছি।'

ক্ষমতার নেশায় সে তখন আত্মহারা ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অসহায় ছিলেন। দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। মক্কার বেশিরভাগ লোক তাঁর বিরোধী ছিল। তাদের ক্ষমতা ছিল, ধন-দৌলত সৈন্য সামন্ত সবই ছিল। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কিছুই ছিল না। শয়বীর অন্তরে অহংকার ও গর্বের নেশা ছিল। সে জানত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই করতে পারবেন না। নবুওয়াতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা তার অন্তরে ছিল না। সে জানত না নবুওয়াতকে আল্লাহ তায়ালা কি কি শক্তি দান করেছেন। সে জানত শুধু পার্থিব শক্তি সামর্থ্যের কথা। এ কারণেই সে এ জাতীয় কথা বলত। বাস্তব অবস্থা হলো, এই ঘর হতে বেরুতে পারবেন না। অথচ এমন স্বপ্ন দেখছেন আমি কাবা ঘরের দরজায় মুতাওয়াল্লি হয়ে বসব। আর আজ যে ব্যক্তি মুতাওয়াল্লি সে তখন নিচে থাকবে। এসব হল শায়খ চিল্লির কথাবার্তা, কল্পনা ও স্বপ্ন মাত্র– এসব বলল সে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসলেন এবং হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। দশ বছর পর তিনি বিজয়ীর

বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। এক ফোঁটা রক্তপাতও হল না। একটি জানও নষ্ট হল না, একটি মানুষকেও হত্যা করা হল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে তাশরিফ নিলেন এবং বললেন– শয়বীকে ডেকে নিয়ে আসো।

সে আসল। কাবা ঘরের চাবি তার হাতে। তালা খুলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানে তাশরিফ নিলেন সেখানে শয়বী বসা ছিল। আর শয়বী ঐ স্থানে দাঁড়াল যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালা খুলে দেয়ার জন্য বিনয়ে কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে তোমার, যখন আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে তালা খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমি দু'রাকাত নামায পড়তে চেয়েছিলাম। তখন তুমি আমাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

সে বলল– জি হ্যাঁ, স্মরণ আছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'এ কথাও স্মরণ আছে যা আমি বলেছিলাম? আজ যে স্থানে তুমি বসা আছ ঐ স্থানে আমি থাকব, আর যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি ঐ জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে– সে কথার প্রমাণ কি তুমি পাচ্ছ?

সে উত্তর দিল– জি হ্যাঁ, পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং আপনি ঐ জায়গায় রয়েছেন যেখানে আমি ছিলাম।

এবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'এখন তুমি কী আচরণ আশা কর?'

সে একটি কথাই বলল–

اخ كريم وني كريم

আমি একজন দয়াবান নবী এবং ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

সে ছিল কুরাইশ গোত্রের। তাই সে এমন বাক্য বলল–

اخ كريم وني كرى

এখন স্মরণ করুন, শয়বী কিভাবে ধমকে ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাসম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও সে কেমন কথা বলেছিল। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে কি আচরণ

করলেন? বললেন– 'হে শয়বী! কাবার চাবি তোমার দায়িত্বে অর্পণ করলাম। কেয়ামত পর্যন্ত তোমার খান্দানের কাছে চাবি থাকবে, অন্য কেউ এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তুমি এবং তোমার গোত্র চাবির মুতাওয়াল্লী।'

আরব দেশে অনেক পরিবর্তন ও বিপ্লব হয়েছে। রাজা ও রাজত্বের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শয়বীর খান্দান যথারীতি ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কাবা শরীফের চাবি তাদের হাতে রয়েছে; বরং মক্কার প্রায় অর্ধেক বাজার তাদের দখলে রয়েছে। তাদের ধন-সম্পদের কোন সীমা নেই।

তার কারণ প্রতিটি মানুষ বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়। আর তারা ফিস নির্ধারণ করে দেয়। এত টাকা ফিস আদায় করলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে নতুবা দেয়া হবে না। অথচ এভাবে প্রবেশ ফিস ধার্য করা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। কিন্তু বায়তুল্লাহর মহব্বত ও তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে মানুষ ফিসের টাকা দিয়েও প্রবেশ করে। তবে শুধু মহব্বতই উদ্দেশ্য নয়, শরীয়তের নীতি ও বিধান মেনে চলাও কর্তব্য। শরীয়তের আনুগত্য ছাড়া কাজ ও মহব্বত সঠিক হয় না। ঐ মহব্বত উপকারী না, যে মহব্বতের সঙ্গে শরীয়তের আনুগত্য নেই, রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ অনুকরণ নেই। তাই ঘুষ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ জায়েয নয়।

কয়েক বার হাজির হওয়ার তাওফিক আমার হয়েছে। মন অনেক চায়। কিন্তু আমাদের জন্য এ সমস্যা ছিল। খুবই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার এক বন্ধুকে বললাম যে, আমি তো বঞ্চিত থেকে গেলাম। বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের সৌভাগ্য হল না।

শয়বীর সঙ্গে বন্ধুটির সম্পর্ক ছিল। সে বলল, 'কেবল আপনার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফ খোলা হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি ভেতরে গিয়ে জিয়ারত করতে পারবেন।'

তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। যখন মানুষের ভীড় শেষ হয়ে গেল এবং শয়বী দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার আয়োজন করছিল, তখন তিনি তার সঙ্গে শয়বীর সম্পর্ককে কাজে লাগালেন। তাকে আমার কথা বললেন। বায়তুল্লাহ শরীফের দরজা খুললেন এবং আমাকেও মানুষ পাঠিয়ে ডেকে আনলেন– 'আসুন, এখন বায়তুল্লাহ শরীফের দরজা খোলা হয়েছে।'

আমার কি মূল্য কতটুকুই বা অস্তিত্ব? তবে আমার স্থির বিশ্বাস ছিল। আমি শরীয়তের অনুসরণ করছি এবং অন্তরেও প্রবেশের আগ্রহ ছিল। কিন্তু ঘুষ দেয়া

জায়েয ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

মানুষ এসব কথা খেয়াল করেন না। তারা চান কোনভাবে ঘরে ঢুকে পড়ি, কোন নিষিদ্ধ পন্থায় হলেও।

সারকথা, শয়বীদের হাতে এ ক্ষমতা আজও রয়ে গেছে। চৌদ্দশ' বছর পার হতে চলেছে; কিন্তু তাদের গোত্রেই বায়তুল্লাহর চাবি রয়ে গেছে। অথচ শয়বী আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে নেহাযাত অসম্মানজনক আচরণ করেছিল। তবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসাবে তাকে কি দিলেন? কী আচরণ করলেন তার সঙ্গে? কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফের মুতাওয়াল্লী বানিয়ে দিলেন। তাদের থেকে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বাদশাহদের রাজত্বে এমন নজির নেই। রাজতন্ত্রে কেউ যদি সামান্যতম ক্ষমতা পেয়ে যায় এবং কেউ তার সামান্যতম বিরোধিতা করে তাহলে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফাঁসিকাষ্ঠে তাকে ঝুলান হয়। অথচ নবুওয়াতের বিশেষত্ব হচ্ছে এমন যে পরম শত্রুর সঙ্গেও এমন মধুর ব্যবহার করা হয় যা এক বন্ধু আর এ বন্ধুর সঙ্গে করে থাকে। এখনও শয়বী ঐ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কাবা শরীফের চাবি তাদের হাতে রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার গোত্রের হাতে অর্পণ করলাম।

ওলী আল্লাহরা নেকীর প্রতি লোভী

বিবয়টির ব্যাপারে আমার একটি ঘটনা মনে হল– আল্লাহ ওয়ালাগণের ক্ষেত্রে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে থাকে। তাঁরা প্রতিটি কাজকর্মে কথাবার্তায় পরকালে লাভবান হতে চান। যেমন দুনিয়াদার ব্যক্তি এদিক সেদিক করে পয়সা উপার্জন করে নেয়। আর আল্লাহ-ওয়ালাগণ ও এদিক সেদিক করে দীন ও আখেরাতের পথ সুগম করে নেন। আমরা দুনিয়াদাররা যেমন দুনিয়ার জন্য লোভী। একশ' টাকা পেয়ে গেলে হাজার টাকার আকাঙ্ক্ষা থাকে। হাজার টাকা পেয়ে গেলে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে কোটি কোটি টাকা পাওয়ার। এক কথায়, লোভ ও লালসা কোথাও গিয়ে থামে না।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– আদম সন্তান যদি এক মাঠ ভর্তি স্বর্ণ পেয়ে যায় তাহলে বলবে, হে আল্লাহ! পেট ভরেনি। আরেকটা সোনা ভর্তি মাঠ যদি পেয়ে যেতাম! যখন দু'মাঠ ভর্তি সোনা পেয়ে যায় তখন তৃতীয় মাঠের জন্য কামনা

করতে থাকবে। কোন সীমায় সে থামবে না। ঠিক একই অবস্থা আল্লাহ-ওয়ালাদেরও। সমগ্র জান্নাত যদি তাদের আয়ত্বে এসে যায় তবুও তাদের পেট ভরবে না। উদর ভর্তি হবে না। সারকথা, দুনিয়াদাররা দুনিয়ার জন্য লোভী। আর আল্লাহ-ওয়ালাগণ পরকালের জন্য লোভী।

আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম মুহতামিম হযরত মাওলানা রফীউদ্দিন (রহ.) নকশাবন্দী তরীকার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। হিজরত করে মক্কায় চলে যান। তাঁর ওফাতও সেখানেই হয়েছে। কবরও বিদ্যমান রয়েছে। এ হাদীসটি তাঁর জানা থাকার কথা যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়বীকে বায়তুল্লাহর চাবি অর্পণ করেছিলেন। মক্কার সকল গোত্র ধ্বংস হয়ে গেলেও শয়বীর গোত্র কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তার এ বিশ্বাস ছিল। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাও ছিল। মাওলানার অন্তরে আশ্চর্যজনক খেয়াল আসল। বাস্তবে বুযুর্গদের যেহেন কোথায় চলে যায়।

তিনি বললেন– এ গোত্র যখন কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে তাহলে নিশ্চয়ই ইমাম মাহদী আসার সময়ও থাকবে। কারণ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন ইমাম মাহদীর আর্বিভাব হবে, তখন মক্কায়ই হবে। তিনি বায়তুল্লাহর দেয়ালে কোমর লাগিয়ে বসবেন। জনগণ এসে তাঁর হাতে বায়াত করবেন। সে সময়ের যে সকল বিশেষ নিদর্শন বলা হয়েছে তা হল– পুরো পৃথিবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খৃষ্টানদের আয়ত্বে থাকবে। সবখানে তাদের প্রভাব থাকবে। দ্বিতীয় নিদর্শন বলা হয়েছে–

مُلِئَتِ الدُّنْيَا ظُلْمًا وَجَوْرًا

গোটা পৃথিবী জুলুম অত্যাচার নির্যাতনে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে দীন ও দীয়ানতের নাম নিশানা থাকবে না। প্রবৃত্তি ও নফসের সীমাহীন নষ্টামি, আয়াশ ও আরামপ্রিয়তা, জুলুম অত্যাচার, বদদীনি ব্যাপকতা লাভ করবে। খুবই নগণ্য সংখ্যক মানুষ থাকবে যারা পর্বতচূড়ায় আশ্রয় নিয়ে তাদের দীনকে হেফাজত করবে। দুনিয়াবাসী তাদেরকে হেয় তুচ্ছ ও হীন মনে করবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– একজন আলেম এত লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হবে, যেমনটা গাধার মৃতদেহ হয়ে থাকে। কেউ এটাকে দেখতেও চায় না। একজন আলেমের অবমাননার ঠিক এ অবস্থাই হবে। জুলুম-অত্যাচার, বদদীনি, বদদিয়ানতী পৃথিবীতে এ পরিমাণ বিস্তার লাভ করবে যেমনটা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সময় খৃষ্টানরা ক্ষমতাসীন থাকবে। মুসলমানরা চরম জুলুম ও নির্যাতনের শিকার

হবে। দীনদারগণ পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করে নিজের দীন রক্ষা করবেন। শহরে উপশহরে তাদের জন্য কোন স্থান থাকবে না। নামায রোযার কোন আলোচনাই থাকবে না। জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের প্রাধান্য থাকবে। ঐ সময়ে মক্কা শরীফে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

হাদীস শরীফে এ কথাও বলা হয়েছে– তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে। একটি গায়বী আওয়াজ শোনা যাবে–

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ اَلْمَهدِىُّ فَاسْمَعُو لَهُ وَ اَطِيْعُوا

তিনি আল্লাহ তায়ালার খলিফা মাহদী; তার কথা শোন, তার আনুগত্য কর।

বলা হয়েছে, ঐ সময় সিরিয়ার আবদাল, ইরাকের নজিব, ভারতের কুতুব এবং সকল ওলী-আউলিয়া যেখানেই থাকুন না কেন, সিরিয়ায় পৌঁছে যাবেন। ইমাম মাহদী সিরিয়াকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করবেন। সেখানে গিয়ে সবাই তাঁর হাতে বায়াত করবেন। মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত শক্তি সেখানে একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত হবে। তাঁর হাতে পাশ্চাত্য ও খৃষ্টান জগতের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। অতঃপর এমন সময় আসবে যখন সমগ্র বিশ্বে দীন ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে, বিস্তার লাভ করবে। অন্য কোন দীন ও ধর্ম, অন্য কোন জাতি অবশিষ্ট থাকবে না। এ সবের বিস্তারিত ব্যাখা বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যে ঘটনা বর্ণনা করতে চাচ্ছি, প্রাসঙ্গিকভাবে যতটুকু দরকার ঠিক সেটুকুই বর্ণনা করলাম।

ইমাম মাহদী মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন। সিরিয়াকে রাজধানী হিসেবে সাব্যস্ত করবেন। মুসলমানদের সকল শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। দাজ্জাল ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সঙ্গে মোকাবিলা হবে। মালহামাকুবরা (মহারক্তপাত) সংঘটিত হবে। তিনটি যুদ্ধ হবে। লাখ লাখ মানুষ এসব যুদ্ধে হতাহত হবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যুদ্ধের ফ্রন্ট এত দীর্ঘ হবে যে, কাক উড়বে। উড়ার ক্ষেত্রে কাক এতই পারদর্শী যে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত উড়েও ক্লান্ত হয় না। সেই কাক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত উড়বে। যেখানেই কাক যাবে শুধু লাশ আর লাশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে। ফ্রন্ট এতটাই দীর্ঘ হবে। নিহতদের কোন সীমা সংখ্যা থাকবে না। মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এ জেহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে– এ যুদ্ধের মুজাহিদীনকে এই পরিমাণ আজর ও সওয়াব দেয়া হবে, যে পরিমাণ সওয়াব বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে এসব বলা হয়েছে। আমি এখন ঐ ঘটনা বর্ণনা করছি। মাওলানা এ হাদীস শুনে হিজরত করে মক্কায় চলে গেলেন। তাঁর ঈমান ও বিশ্বাস এই ছিল যে, নিশ্চয়ই শয়বী খান্দান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আর ইমাম মাহদীর যখন আগমন হবে তখন মক্কায়ই হবে। বায়তুল্লাহর দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি বসবেন এবং মুসলমানদের বায়াত গ্রহণ করবেন। বায়তুল্লাহর চাবি শয়বীদের কাছে থাকবে। অতএব তারাও সেখানে উপস্থিত থাকবে। এসব বিক্ষিপ্ত কথা একত্রিত করে মাওলানা রফীউদ্দিন সাহেব একখানা কুরআন শরীফ এবং একখানা তরবারী সংগ্রহ করলেন এবং ইমাম মাহদীর নামে একটি পত্র লিখলেন–

'অধম রফীউদ্দিন দেওবন্দী মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত। আর আপনি জেহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। মুজাহিদরা আপনার সঙ্গে রয়েছেন। তারা এই পরিমাণ সওয়াব পাবেন যা বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণ পেয়েছেন। তাই রফীউদ্দিনের পক্ষ থেকে এ কুরআন শরীফ আপনার জন্য উপহারস্বরূপ দেয়া হল। আর এ তরবারীখানা কোনো মুজাহিদকে দিয়ে দিন। তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেন। আমি যেন ঐ পরিমাণ সওয়াবের ভাগী হয়ে যাই, যে পরিমাণ বদরের মুজাহিদগণ পেয়েছেন।'

এ পত্র লিখে কুরআন শরীফ ও তরবারী ঐ সময়ের শয়বীর হাতে অর্পণ করলেন এবং বললেন– তোমাদের খান্দান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পর্যন্ত এ হলো তোমাদের কাছে আমানত। তোমার যখন মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে, তখন যে তোমার স্থলাভিষিক্ত হবে, তাকে অসিয়ত করে যেয়ো এবং তাকে এ কথাও বলে দিও। তার যখন ইন্তেকাল হয় সে যেন তার বংশধরকে অসিয়ত করে যায়, যাতে রফীউদ্দিনের এ কুরআন শরীফ ও তরবারী খান্দানের মধ্যে এভাবে চলতে থাকে যতদিন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব না হয়। ঐ সময় শয়বী যে থাকবে সে যেন আমার পক্ষ হতে ইমাম মাহদীর খেদমতে এ দু'টি হাদিয়াস্বরূপ পেশ করে। কুরআন পাক তাঁর নিজের জন্য উপহার আর তরবারী আমানত স্বরূপ যেন আমার পক্ষ হতে কোন মুজাহিদকে দিয়ে দেন। তা হলে সে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, আমারও অংশ গ্রহণ করা হয়ে যাবে এবং সওয়াবে আমিও অংশীদার হয়ে যাব।

কোথাকার কথা তিনি চিন্তা করেছেন। এ হাদীস দ্বারা তিনি কিভাবে ফায়দা লাভ করতে চেয়েছেন। সর্বোত্তম জেহাদে অংশীদার হতে চেয়েছেন। ঘটনা তো হল এই– আল্লাহ-ওয়ালাগণ নেকীর জন্য এত বেশি লালায়িত থাকেন। নেকী দ্বারা তাদের ঘর ভরে গেলেও যদি তারা বুঝতে পারেন, অমুক স্থানে এভাবে নেকী

পাওয়া যেতে পারে; তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে যাবেন। এ সওয়াব কেন নষ্ট করব? কেন অর্জন করব না? তারা চান সমস্ত জান্নাত আমার হাতে এসে যাক। এ হল আল্লাহ-ওয়ালাদের স্বভাব।

ইমাম আবু দাউদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর কিতাব 'আবু দাউদ শরীফ' সকল মাদ্রাসায় পড়ানো হয়। কিতাবখানা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর একটা কিতাবে লেখা রয়েছে– তিনি সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাগরে একটি জাহাজ নোঙর করা ছিল। তখন বর্তমান সময়ের মত জেটি নির্মিত ছিল না। জাহাজটি প্রায় এক ফার্লং দূরে ছিল। কেননা তীরের কাছাকাছি পানি কম থাকে। সে কারণে জাহাজ তীরের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে না। মানুষ ছোট ছোট নৌকায় করে জাহাজে আসা যাওয়া করতেন।

একটি জাহাজ এক ফার্লং দেড় ফার্লং দূরত্বে দাঁড়ানো। আর ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সাগর তীরে দাঁড়ানো। জাহাজের কোন একজন মানুষের হাঁচি আসল। সে হাঁচি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আলহামদুলিল্লাহ বলল। এখন মাসআলা হলো, যখন কারো হাঁচি আসে, তখন তার আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত। আর আলহামদুলিল্লাহ শব্দের আওয়াজ যার কানে পৌঁছায় সে উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ যখন ঐ মজলিসে থাকে এবং তার কানে আওয়াজ এসে যায়, সে الحمد لله বলেছে, তাহলে يَرْحَمُكَ اللهُ বলে উত্তর দিবে। এমন না যে এক ব্যক্তি মসজিদে বসে হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে। আর অন্য ব্যক্তি যে রাস্তা দিয়ে বাজারে যাচ্ছে সে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে। মাসআলা হল উভয়ে এক মজলিসে থাকলে এটা করণীয়। তা ইমাম আবু দাউদের উপর উত্তর প্রদান ওয়াজিব ছিল না। যেহেতু হাঁচি প্রদানকারী প্রায় এক ফার্লং দূরে ছিল। আর তিনি ছিলেন সাগরের তীরে। এ ব্যক্তি ছিল জাহাজে। মজলিসও এক ছিল না। উভয়ের মধ্যে সাগরের একটা অংশ বাধা হয়ে আছে। কিন্তু এ কথার উদ্দেশ্য যে, নেকী হাছিল করার লোভ কোন না কোনভাবে নেকী হাসিল করা চাই। এ নেকীকে কেন ত্যাগ করব?

ইমাম আবু দাউদের আওয়াজ এত উঁচু ছিল না যে, সাগর পাড় হতে يَرْحَمُكَ اللهُ বলে তাকে শোনাতে পারবেন। যিনি হাঁচি দিয়েছেন তার আওয়াজ বড় ছিল। তার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর আওয়াজ ইমাম আবু দাউদের কাছে পৌঁছেছে। ইমাম সাহেব তিন দিরহাম দিয়ে একটি ছোট নৌকা ভাড়া করে দেড় ফার্লং পথ অতিক্রম করে তার কাছে জাহাজে পৌঁছলেন। আর সে জাহাজে আরোহণ করে يَرْحَمُكَ اللهُ বললেন। এভাবে নেকী উপার্জন করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যখন তিনি

يَرْ حَمُكَ اللّٰه বললেন, তখন গায়েব হতে একটি আওয়াজ আসল; কিন্তু বর্ণনাকারী দেখতে পেল না। আওয়াজ আসল– 'হে আবু দাউদ! আজ তিন দিরহাম দিয়ে জান্নাত ক্রয় করে নিলেন।'

সুসংবাদের এ আওয়াজ শুনলেন। জানি না কি পরিমাণ ইখলাসের সঙ্গে يَرْ حَمُكَ اللّٰه বলেছিলেন। অথচ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস। কত তাহাজ্জুত পড়েছেন, কত দান খয়রাত সদকা করেছেন। কিন্তু জান্নাত কেনার ব্যাপারে এ ছোট আমলটির উল্লেখ করা হল যা তিন দিরহাম দিয়ে নৌকা ভাড়া করে يَرْ حَمُكَ اللّٰه বলার ফল।

এতে অনুমান করা যায়, আমলের কবুলিয়ত তার আকার আকৃতি দিয়ে হয় না; বরং তার অন্তর্নিহিত হাকিকত দিয়ে হয়। ইখলাস যত অধিক হবে আমল ছোট হলেও ভারী হয়ে যায়, মকবুল হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) না জানি কি পরিমাণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে يَرْ حَمُكَ اللّٰه বলেছিলেন। ইত্তেবায়ে সুন্নতের কি পরিমাণ আবেগ ও আগ্রহ তাঁর অন্তরে ছিল। এ আমলটি এত ভারী ও মূল্যবান হয়ে গেল, তার তুলনায় তাহাজ্জুদ, দান খয়রাত, সদকা কিছুই উল্লেখ করা হল না। উল্লেখ করা হল ঐ আমলটি যা তিন দিরহাম দিয়ে জান্নাত ক্রয় করে নেয়ার ফল ছিল। সারকথা, এসব বুযুর্গ দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী, অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এত বেশি নেকী উপার্জন করতে আকাঙ্ক্ষী থাকতেন যেন সব সময় নেকীই উপার্জন করার চিন্তাতে মশগুল থাকতেন।

আমরা দোকানে বসে অর্থ উপার্জন করি আর তারা চলাফেরায়, ওঠা-বসায়, শয়নে-জাগরণে, ঘরে-বাইরে, সব সময় আলাদা আলাদা নেকী উপার্জন করতেন। সর্বক্ষণ নেকী উপার্জনের চিন্তায় থাকতেন। আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) যিনি দলপতি ছিলেন, সকল দেওবন্দীর পীর ও মুরশিদ ছিলেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর পীর ও মুরশিদ ছিলেন। তাঁর আমল কি ছিল? শুনুন। হাদীস শরীফে একথা বলা হয়েছে– মানুষ যখন নামায পড়ার জন্য বাড়ি থেকে মসজিদে রওনা হয় তখন প্রতি পদক্ষেপে একটি নেকী লেখা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। একথাও বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– হে লোকসকল! কি কি জিনিস দ্বারা দরজা (মর্যাদা) বুলন্দ করা হয়? কোন কোন জিনিস দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়? তাঁরা আরজ করলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একথাও বললেন–

كَثْرَةُ الْخَطَاءِ اِلَى الْمَسْجِدِ

মসজিদের দিকে যত কদম বেশি পড়বে সে পরিমাণ গুনাহ মাফ করা হবে, সে পরিমাণ মর্যাদা বুলন্দ হবে।

একদিকে এ হাদীস, যত বেশি পদক্ষেপ হবে, নেকী বৃদ্ধি পাবে, গুনাহ হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, ঐ হাদীস প্রতি কদমে একটি নেকী লেখা হয়, একটি গুনাহ মাফ হয়।

আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর এ আমল ছিল– যদি মসজিদের দু'টি পথ হয়; একটি কাছের এবং অপরটি দূরবর্তী– তাহলে দূরবর্তী রাস্তা দিয়ে মসজিদে যেতেন, যেন কদম সংখ্যা বেশি হয়; নেকী বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ মাফ হয়।

তারপর দীর্ঘ পথ দিয়ে ছোট ছোট কদমে হাঁটতেন, লম্বা লম্বা করে পা ফেলতেন না। যেহেতু হাদীসে كَثْرَةُ الْخَطَاءِ বলা হয়েছে। কদম সংখ্যা বেশি হবে। ছোট বড় কদম বলা হয়নি। তাই তিনি বললেন– ছোট কদম ফেলব, শরীয়ত আমাকে বাধা দেয়নি। যদি বিশ কদমে পথ অতিক্রম করা যায় তাহলে চল্লিশ কদমে তা অতিক্রম করতেন। মানুষ এসব তখনই করে যখন অন্তরে সর্বক্ষণ একই ধ্যান থাকে– আমাকে নেকী অর্জন করতে হবে। আমাদের অবস্থার উপর পূর্ণাঙ্গভাবে তুলনা করা চলে। আমাদের অন্তরে কেবল একটি ধ্যানই সব সময় আছে, তাহলো কিভাবে টাকা পয়সা উপার্জন করব? ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, ক্ষেত-খামার, চাকরি-নকরি ইত্যাদির মাধ্যমে কীভাবে অধিক উপার্জন করা যায়। মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা মাথা ঘামাতে থাকে, মাল-সম্পদ কিভাবে অর্জন করবে। যদি ধন-সম্পদ হ্রাস পেয়ে যায়, তাহলে কিভাবে তা পূর্ণ করবে? কোনক্রমেই যেন সম্পদ হ্রাস না পায়। খরিদ্দার গ্রাহক আসলে যেন একথা বলতে না হয়, অমুক মাল নেই; স্টক শেষ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী সব সময় খেয়াল রাখে যেন গ্রাহককে ফিরে যেতে না হয়।

গ্রাহক যদি বেড়ে যায়। যেমন পঞ্চাশজন গ্রাহক আসে তাহলে শতজনের পরিমাণ মাল মওজুদ রাখবে। যদি এক সঙ্গে একশত গ্রাহক এসে যায়, তাহলে যেন 'নাই' বলতে না হয়। অথচ সে যদি 'নাই' বলে, একশত জনের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনকে মাল সরবরাহ করতে পারে। ভাত, রুটি তখনও মিলবে। কিন্তু এটা হলো আবেগ, মাল বৃদ্ধি পাক, টাকা পয়সা বৃদ্ধি পাক। একই ধ্যান, একই

চিন্তা। ঠিক এভাবে ঐ সকল বুযুর্গের অন্তরে সব সময় ধ্যান থাকে নেকী বৃদ্ধি পাক। অথচ নাজাত ও মুক্তির জন্য এই পরিমাণ নেকীই যথেষ্ট যে পরিমাণ এখন রয়েছে। কিন্তু তারা চায় আরো বৃদ্ধি পাক। দরজা ও মর্যাদা উঁচু হোক। মর্যাদার কোন স্তরে থাকতে চান না। তাঁদের অন্তরে আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন।

এর দ্বারা বুঝে নিন, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা কোন মন্দ বিষয় নয়। তবে এর প্রয়োগের জায়গাটায় ভাল মন্দ থাকে। লোভ ও আগ্রহ অতি মহৎ জিনিস। লোভের মাধ্যমে মানুষের সাহস বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমি যদি এক মাঠভর্তি সোনা আদম সন্তানকে দিয়ে দেই, তবুও সে আবার দ্বিতীয় মাঠের জন্য প্রার্থনা করবে। বোঝা গেল এত বিরাট চাহিদা যে, আল্লাহ পুরো দুনিয়াকে সোনা দিয়ে ভরে দিলেও তার উদরপূর্তি হবে না। তার উদর এত বিরাট আর তার সাহসও এতই বেশি। সুতরাং লোভ-লালসা বিরাট জিনিস। একে মন্দ বলা যাবে না।

তাহলে মন্দ কোন জিনিসকে মনে করা হয়? উদ্যম উদ্দীপনা এত বিরাট জিনিস। একে কি সামান্য কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে ব্যয় করে দিবে? এ বিরাট জিনিস দ্বারা ঐ জিনিস উপার্জন কর– যেমন তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনার সীমা নেই, ঐ কাঙ্ক্ষিত জিনিসেরও যেন সীমা না থাকে। আমরা যদি পার্থিব ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনাকে নষ্ট করে দেই, ব্যয় করে ফেলি, তাহলে উৎসাহ উদ্দীপনার মত এত বিরাট জিনিস যার মধ্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের সংকুলান হবে, এমন জিনিসকে পার্থিব বিষয়ে ব্যয় করে দিলাম। অথচ দুনিয়ায় বসবাস কয়েক দিনের মাত্র। শিগ্‌গিরই তা শেষ হয়ে যাবে। উৎসাহ উদ্দীপনা পরে আর কাজে লাগবে না। আর দুনিয়ার সম্পদও এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা আগ্রহ, উৎসাহ উদ্দীপনার সঠিক মূল্যায়ন করলাম না। আল্লাহ তায়ালা বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা দান করেছিলেন। একে আমরা তুচ্ছ বস্তুর পেছনে ধ্বংস করে দিলাম। আমরা যদি এ উৎসাহ উদ্দীপনা দ্বারা জান্নাত কামনা করতাম তাহলে আমাদের উদ্দীপনার সঠিক মূল্যায়ন হত। জান্নাতের নেয়ামতসমূহ যেমন সীমাহীন; তেমনি সীমাহীন উদ্দীপনা নিয়ে তার সওয়ালও করা যায়।

এটা হলো স্থান ও সুযোগের ব্যাপার। মানুষ যে পরিমাণ ইচ্ছা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। আসল কথা হলো উদ্যম ও উদ্দীপনা, লোভ-লালসা ও আবেগ মন্দ জিনিস নয়। আমরা এর ব্যবহার ঠিক করে নিয়েছি মন্দ ও ভুল পথে। ঐ বিষয়ে আমাদের লোভ করা উচিত যেখানে নেয়ামতের কোন সীমা সংখ্যা নেই। আর তা হলো আল্লাহ তায়ালার ইলম ও কামালাত, জ্ঞান ও গুণাবলীর পূর্ণতা। এসবের কোথায়ও কোন সীমা সরহদ নেই। অর্থাৎ একজন আলেম অন্যজন

আলেমকে দেখে লোভ করতে পারে। তিনি একশ' মাসআলা জানেন, আমি দেড়শ' জেনে নিব। তিনি দুইশ' জানেন, আমি আড়াইশ' জেনে নিব না কেন? এসব ক্ষেত্রে লোভ করতে দোষ নেই।

উভয় আলেম যদি লোভ করেন। উৎসাহ উদ্যম দেখান, তিনি দেড়শ' মাসআলা জানেন, আমি লজ্জা অনুভব করলাম। তিনি আমার থেকে অগ্রগামী রয়েছেন। আমি তিনশ' মাসআলা জেনে নিব। তখন অপর জন লজ্জা অনুভব করবেন। তিনিও বলবেন, আমি চারশ' শিখে নিব। সারাটা জীবন পড়তে থাকুক ইলমে কোনো ঘাটতি দেখা দিবে না। কেননা ইলম অসীম। ইলমের কোনো সীমা সরহদ নেই। যদি সমগ্র বিশ্ববাসী ইলমের জন্য আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করতে থাকেন যে, আমাদের ইলম বেশি হউক, তবুও ইলমে ঘাটতি দেখা দিবে না। হিরছ ও আকাঙ্ক্ষা এসব জায়গায় করা উচিত, যেসব জায়গায় ঘাটতি ও কমতি নেই। হিরছের মত নেয়ামতকে তুচ্ছ জিনিসে নষ্ট করে দেয়া পছন্দনীয় নয়। দুনিয়াতে শুধু প্রয়োজন মিটিয়ে চলো এবং হিরছের উদ্যম উদ্দীপনাকে পরকাল, ইলম ও আল্লাহর মারেফত লাভে ব্যয় করো, কাজে লাগাও। তা হলে কোথাও তোমাদের থামতে হবে না। আল্লাহওয়ালারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এ কাজ করেছেন। নিজেদের হিরছ ও উদ্যম উদ্দীপনাকে নেকী অর্জনে লাগিয়ে রেখেছেন। যেমন আমাদের হিরছের কোন সীমা নেই। তেমনি নেকীরও কোন সীমা নেই। আমরা নিজেকে এমন সব জিনিসে লাগিয়ে রেখেছি, যেগুলো কয়েক দিন পরই শেষ হয়ে যাবে। আর হিরছ ও উদ্যম এরপরও থাকবে। এর পেট ভরবে না। পরকালেই এর পেট ভরতে পারে। এ কারণে ওলীগণ ছোট ছোট নেকীও ত্যাগ করতে রাজী নন। আমাদের হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.) মসজিদে যাওয়ার জন্য দীর্ঘপথ গ্রহণ করতেন। ছোট পথে যেতেন না। আর দীর্ঘ পথে ঘন ঘন পা ফেলতেন যেন কদম সংখ্যা বেশি হয়। এ ছিল নেকী অর্জনের হিরছ বা উদ্যম-উদ্দীপনা।

দুর্বল-অসহায়কেও নবুওয়াত উঁচু স্তরে পৌঁছায়

মোটকথা, একটা হল মুলুকিয়াত বা রাজত্ব আরেক হল নবুওয়াত। রাজত্ব লাভে ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়, পার্থিব জড় পদার্থ অধীনে থাকে। আর নবুওয়াত রূহানী ও আধ্যাত্মিক নেয়ামত। ইলম ও মারেফত, আল্লাহর কামালত তার গুণাবলীর পূর্ণতা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অধিকারী করে থাকে। নবীগণের স্বভাব প্রকৃতিতে এ নম্রতা, দয়া বিনয়, মায়া-মমতা, সমবেদনা, সহমর্মিতা ইত্যাদি থাকে। তাঁদের ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি যতই বৃদ্ধি পাবে,

দয়া, দান-দক্ষিণা আরো বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। আর পার্থিব ক্ষমতা নবীদের বেলায় অন্য রকম হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। যেহেতু ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাদশাহই হোক না কেন, তারও ভয়ভীতি আশঙ্কা থাকে; ক্ষমতা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যেতে পারে। এ আশঙ্কা ও সন্দেহের উপর অন্যদের পথ রুদ্ধ করতে হয় যেন আমার কাছে আসতেই না পারে। মাথাই যেন না থাকে। উদ্দেশ্য আমার ক্ষমতা যাতে হ্রাস না পায়। এ হল নবুওয়াত ও মুলুকিয়াতের পার্থক্য। রাজত্বের অধিকারীরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে চলে। আর নবুওয়াতপ্রাপ্তরা সমবেদনা এবং মেহেরবানীর দিকে ধাবিত হয়। দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর যদি ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে দাবিয়ে রাখার জন্য জোর চেষ্টা চালানো হয় যেন এগুতে না পারে। আর আম্বিয়া (আ.) দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিকে সামনে অগ্রসর করেছেন। এজন্য যে ব্যক্তি সবচে' দুর্বল থাকে তার প্রতি নবীগণের দয়া ও মেহেরবানী বেশি আকৃষ্ট করে। আর ইসলাম তাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।

উদাহরণ হিসেবে আরজ করছি। নারীরা প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষদের আল্লাহ তায়ালা যে শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন মাহিলাদের মধ্যে তা নেই। বাহ্যিক ও দৈহিক শক্তি বেশি পরিমাণে নেই। আধ্যাত্মিক শক্তিও সে পরিমাণ নেই। নারীদের শরীরও পুরুষের তুলনায় যেমন দুর্বল, তেমনি অভ্যন্ত রীণ শক্তি যথা জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা, বিচক্ষণতা ইত্যাদিতেও পুরুষের তুলনায় দুর্বল। সুতরাং নারীরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল অসহায়। ইসলাম তাদেরকে এ পরিমাণ সাহায্য সহায়তা দান করেছেন, উৎসাহিতও করেছেন যে, তারা যেন অনুভবও করতে না পারে আমরা দুর্বল, আমরা অসহায়। প্রথম থেকেই তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে শুরু করেছে।

নারীদের জীবনে তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে। এ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা জীবন কাটিয়ে যায়। প্রথম বাল্যকাল যখন তারা সন্তানের মধ্যে গণ্য হয়। মাতাপিতা তখন তাদের লালন পালন, সেবাযত্ন করে থাকেন। দ্বিতীয় যৌবনকাল, যখন তাদের বিয়ে শাদী হয়ে যায়। তখন তারা স্বামীদের অধীনে ও দায়িত্বে থাকেন। তৃতীয় অবস্থা যখন তাদের নিজেদের সন্তান ছেলে মেয়ে সামনে উপস্থিত থাকে। প্রথম হলো নিজে মেয়ে তারপর কোন পুরুষের স্ত্রী, তারপর মাতা। এ তিনটি অবস্থায় ইসলাম তাদের উচ্চ সম্মান দান করেছে, উৎসাহিত করেছে।

যখন কন্যা থাকে, তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ছেলে তোমাদের জন্য নেয়ামত ও দান স্বরূপ। এ নেয়ামতের শুকর আদায় কর, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর কন্যা সন্তান সম্পর্কে বলা হয়েছে– এরা হলো তোমাদের নেকী ও

পুণ্যতুল্য। এ নেয়ামতের শুকর ওয়াজিব, নাশুকরী করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কন্যাদের সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে– তারা পিতার নেকী ও পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর নেকী মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। অতএব কন্যা সন্তান তোমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম বা উসিলা হবে। এর মাধ্যমে মেয়েদের প্রতি অধিক দয়া ও মেহেরবানী স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। যেন মাতা-পিতা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরকে বেশি স্নেহ-মমতা করেন ও যত্ন নেন।

লক্ষ্য করুন, 'ছেলেদেরকে নেয়ামত ও মেয়েদেরকে নেকী' বলা হয়েছে। অতএব প্রতিটি নেক কাজের উপর যেমন প্রতিদান লাভের আশা থাকে; তেমনি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে প্রতিদানের কোনো প্রশ্নই উঠে না। শুকর আদায় কর, ভাল কথা। যদি তা না কর তাহলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যদি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহলে মানুষ শুকর আদায় করুক অথবা নাই করুক, মেয়ের জন্মগ্রহণই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেকী, মহাপুণ্য। পিতার আমলনামায় এ নেকী লেখা হবে।

আসলে সন্তান দান করে পিতা-মাতার উপর বিরাট ইহসান করা হলো যে, সন্তানরা তাদের আমলনামাকে নেকী দিয়ে পূর্ণ করে দেয়। আর শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো– তুলনামূলকভাবে মেয়েদের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়া; বেশি দয়া ও স্নেহ-মমতাশীল হওয়া কর্তব্য। সারকথা, শরীয়ত মেয়েদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করেছে। তাদের মান মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আর যখন সে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামীর অধীন হয়ে যাবে, শুরু হবে তার দাম্পত্য জীবন। তখন শরীয়ত এই বিধান ঘোষণা করেছে–

اِنَّ اَكْرَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا اَلْطَفُكُمْ اَهْلًا

তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশি সম্মানের যোগ্য ঐ মুসলমান যে পাক পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, আর স্ত্রীদের সঙ্গে দয়া ও মেহেরবানী, মহব্বত ও ভালোবাসাসুলভ আচরণ করে, কঠোর আচরণ না করে। কাজেকর্মে সংকোচ ও কার্পণ্য না করে। যদি স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েও যায় তবুও ধৈর্যধারণ করে ও সহ্য করে। যখন কন্যারা স্ত্রী হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি স্বামীদেরকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এরা তোমাদের প্রেমপ্রীতি ও স্নেহ-মমতার সর্বাধিক যোগ্য, সবচে' বেশি অধিকারী।

আর যখন তার নিজের সন্তান হয়ে যাবে অর্থাৎ মাতৃত্বের আসন লাভ করবে, তখন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– 'সন্তানের জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।' যে

পরিমাণ মায়ের আনুগত্য করবে, সে পরিমাণ জান্নাত তার নিকটবর্তী হবে। আর যে পরিমাণ মায়ের অবাধ্য হবে, সে পরিমাণ জান্নাত দূরে সরে যাবে। আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করুণা হতে দূরে চলে যাবে। বোঝা গেল, নারী সমাজের মাথার উপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও করুণা সব সময় থাকে। সন্তান যদি মায়ের নিকটবর্তী হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার রহমতও নিকটবর্তী হয়ে যায়। কথাটি কতটা দয়া ও মমতার সঙ্গে বলা হয়েছে। এমনও বলতে পারতেন, মায়ের হাত অথবা চোখের নিচে জান্নাত রয়েছে। অথচ তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে– মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

কথাটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই– পা হল সবচে' নিকৃষ্ট অঙ্গ। মানব দেহে সবচে' কম মর্যাদা হলো পায়ের এবং সবচে' মর্যাদাপূর্ণ হল মাথা। সন্তানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো– তোমাদের জন্য মায়ের পা হলো অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ। তুমি যদি এ পায়ের উপর হাত রাখ, তাহলে তাঁর পায়ের নিচে জান্নাত পাবে। শরীয়ত চরম সম্মান প্রদর্শন করেছে নারী জাতিকে।

বিশ্ববাসীর চোখে নারী-সমাজ

আর এসব করা হয়েছে এ কারণে যে, বিশ্বের সকল জাতি সকল সম্প্রদায় নারী সমাজকে লাঞ্ছিত অপমানিত করতো, নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে কোনরূপ ত্রুটি ও কার্পণ্য করেনি। প্রাক ইসলামী যুগে ইহুদীদের প্রাধান্য ছিল। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, সে সময় এসব অপকর্ম তাদের ধর্মের অংশ ছিল। তবে ধারণা করা হয় যে, এসব ধর্মের অংশ ছিল না। বরং তাদের নিজ হাতে রচিত জাতীয় আইন এবং জাতীয় বিধিবিধানে এসব নির্যাতনমূলক বিষয়াদি ছিল এবং গ্রীসবাসীর মধ্যে এ নিয়ম সবচে' বেশি প্রচলিত ছিল। তাদের আইন ছিল– মাতা-পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানকে হত্যা করে দেয়ার অধিকার রাখে। জীবন্ত সমাধিস্থ করার অধিকারও তাদের দেয়া ছিল। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দিয়ে দিত। সে যুগের আইন তাদেরকে এ অধিকার প্রদান করেছিল। তারা মেয়েদেরকে হত্যা করে অথবা জীবন্ত দাফন করে দিত। বাধা দেয়ার কেউ ছিল না। এমন কোন আদালত বা বিচারালয়ও ছিল না যে, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারে। গ্রীকদের মধ্যে এ আইন প্রচলিত ছিল– পুরুষ যখন কোন নারীকে বিয়ে করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করত, তখন স্ত্রীর মর্যাদা কৃতদাসী থেকেও অনেক নিচে হতো। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে স্বামীর অধিকার ছিল, স্ত্রীকে হত্যা করে দিবে, জবাই করে

ফেলবে। নির্মম শাস্তি দেয়ার অধিকার ছিল স্বামীর। এমন কি সামান্যতম কোন ত্রুটি ও অন্যায় করলে ঘোড়ার পায়ের নিচে এক প্রান্ত এবং অপর প্রান্ত স্ত্রীর গলায় বেঁধে স্বামী ঘোড়ায় আরোহণ করে দৌড়াতে থাকতো। আর অসহায় স্ত্রী ঘোড়ার পায়ে বাঁধা অবস্থায় কাতরাতে কাতরাতে প্রাণ বিসর্জন দিত। সর্বাঙ্গ রক্তে লাল হয়ে যেত। এই ছিল নারীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার। সর্বপ্রথম ইসলামই নারী সমাজের মান মর্যাদা প্রদান করে।

সেটা ঐ যুগ ছিল যাকে জাহেলিয়াত বা মূর্খতার যুগ বলা হতো। বর্তমান যুগ হলো সভ্যতার যুগ, আধুনিক যুগ। অনুমান দশ পনের বছর আগের ঘটনা। সব পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদটি পরিবেশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। ইউরোপে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য যে, মানব সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কি হওয়া উচিত। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত তারা নারী সমাজের সামাজিক মান-মর্যাদা ও অবস্থান ঠিক করতে পারেননি। অনুধাবন করতে পারেননি। নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ ও ব্যবহার হওয়া উচিত। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি যারা এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেন তারা এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কি এবং তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত– এ বিষয় নিয়ে নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত করা হলো। কোন কোন দেশের প্রতিনিধি মত প্রকাশ করলেন, আমাদের মতে নারীরা মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। মানুষ কেবল পুরুষরাই। নারীরা মানুষ নন। তারা আলাদা জাতি। তারা কেবল পুরুষের দয়া ও মেহেরবানীর উপর বেঁচে থাকতে পারে। অন্য এক দেশের প্রতিনিধি ভিন্নমত ব্যক্ত করলেন। তারপর মতবিরোধের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হলো। সর্বশেষ এ কথার উপর ঐকমত্য স্থাপিত হলো যে, নারী জাতি পুরুষদের আনন্দ উপভোগের সামগ্রী মাত্র। কেবলই চিত্তবিনোদের পাত্রী। পুরুষ তার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন করবে। এর অতিরিক্ত নারীদের মান-সম্মান বা সামাজিক মর্যাদা নেই। তাদের মূল্য দেয়া হয় কেবল চিত্তবিনোদনের স্বার্থে। নারীদেরকে তাদের সামাজিক মর্যাদার কারণে কোন মূল্য দেয়া হয় না। যেহেতু নিজেদের স্বার্থ রয়েছে, তাই এ সম্পদকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হয়। চিত্ত-বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে তাই তাকে সাজিয়ে রাখা হয়। যেমন অল্প বয়স্ক মেয়েরা কাপড়ের পুতুল বানিয়ে খেলা করে। তারা একজনকে নববধূ বানিয়ে সুন্দর পোশাক পরিয়ে রাখে। একে অলংকারও পরানো হয়। কোন কোন বোকা মেয়ে পুতুলের বিয়ের অনুষ্ঠান করে যৌতুকস্বরূপ দশ বিশ টাকা দানও করে দেয়।

এসব এজন্য করা হয় না যে, তাদের অন্তরে পুতুলের কোন মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। বরং এ হলো একটি খেলনা। তারা আনন্দ উপভোগের জন্য পুতুলকে পোশাক পরিয়ে সুসজ্জিত করে। যেহেতু নারী সমাজ আনন্দ উপভোগের পাত্র, তাই তাকেও সাজানো হয়, অলংকার পরানো হয়। প্রকৃতপক্ষে পুতুলের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার

তবে ইসলাম এসে তাদের বিপরীতে নারীদের সমান অধিকার দিয়েছে এবং এ নীতি ঘোষণা করেছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

> যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ও অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর উপরও স্ত্রীর সমান হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী যদি অধিকার হরণ করে, তাহলে তাকে সাজা দেয়া হবে। স্ত্রী যদি করে তাহলে তাকেও সাজা দেয়া হবে। [বাকারা : ২৩৮]

স্বামী-স্ত্রী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে উভয়ের হক অধিকার সমান সমান রাখা হয়েছে। যেহেতু নারীদের বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ, তাই তাদেরকে স্বামীর লালন পালন ও নেতৃত্বাধীন রাখা হয়েছে। এ হলো পদমর্যাদার কথা। তবে অধিকারের ক্ষেত্রে উভয়কে সমপর্যায়ে রাখা হয়েছে। স্ত্রীর উপর যেমন স্বামীর হক রয়েছে, তেমনি স্বামীর উপরও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। স্ত্রী যদি অবাধ্য নাফরমান হয়ে যায়, তাহলে স্বামীকে তালাক প্রদান ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয়েছে। আর স্বামী যদি অন্যায় অবিচার করে, তাহলে স্ত্রীকে খুলা করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যদি রাজ্য ইসলামী হয়, তাহলে স্ত্রী কাজীর আদালতে দরখাস্ত দিতে পারবে যে, ঐ স্বামীর সঙ্গে বসবাস ও জীবন যাপন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামী আমার প্রাপ্য ব্যয়ভার বহন করে না। নির্ধারিত ভাতা প্রদান করছে না। সরকার স্বামীকে বাধ্য করবে। আর যদি বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায়, তাহলে তাও করতে পারবে। এ পদ্ধতিকেই বলা হয় 'খুলা' خلع খুলা হলো এই বিচারকের কাছে আবেদন করবে। তখন বিচারক স্বামীকে তলব করে কৈফিয়ত চাইবে। তুমি কেন স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করনি? যদি সে আইনানুগ যুক্তিসঙ্গত কারণ বলতে না পারে

তাহলে বিচারক বলবেন বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য, যেহেতু স্ত্রী তার সঙ্গে থাকতে রাজী নয়। যদি স্বামী বিয়ে ভঙ্গ না করে তাহলে বিচারক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবেন। তালাক হয়েও যাবে। স্ত্রীকে শরীয়ত খুলার অধিকার দিয়েছে। সারকথা, স্বামীকে যেমন তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে, তেমনি স্ত্রীকেও 'খুলার' অধিকার প্রদান করেছে। অপারগ হলে স্ত্রীও বিয়ে ভেঙ্গে আলাদা হয়ে যেতে পারে। শরীয়ত স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছে।

নারীরা অনেক কাজ ভদ্রতার কারণে করে থাকেন যা তাদের দায়িত্ব নয়। স্বামীরাও যেমন অনেক কাজ দায়িত্বে না থাকলেও করে থাকেন। যেমন- নবজাতক শিশুর দুধ পান করানো স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়। স্ত্রী স্বামীকে বলতে পারে তুমি টাকা পয়সা ব্যয় করে সন্তানকে দুধ পান ও লালন পালনের ব্যবস্থা কর। আমি সন্তানকে দুধ পান ও লালন পালন করতে পারব না। স্ত্রী ছেলে মেয়েদের কাপড় সেলাই করে দেয়। অথচ সে স্বামীকে বলতে পারে, দর্জি থেকে সেলাই করে নিয়ে আসো; কাপড় সেলাই করে দেয়া আমার দায়িত্ব নয়। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারে না। এক কথায়, শরীয়তে এসব বিধান রাখা হয়েছে যে, স্বামীকে যেমন হক ও অধিকার দেয়া হয়েছে, তেমনি স্ত্রীকেও হক ও অধিকার দেয়া হয়েছে। এ শুধু ইসলামী শরীয়তই করেছে। অসহায় দুর্বল স্ত্রী জাতিকে সম্মান দিয়েছে, যা বিশ্বের সকল সম্প্রদায় পদলিত করছিল, নির্যাতন করছিল।

সারকথা, অশিক্ষিত ও মূর্খ সমাজের লোক নারীদেরকে এ অধিকার দান করেছিল যে পুরুষরা তাদের ইচ্ছা করলে নির্বিবাদে হত্যাও করতে পারে, নির্যাতন নিপীড়ন করতে পারে। আর ভদ্রতা ও সভ্যতার দাবীদার শিক্ষিত সম্প্রদায়গুলো নারীদের চিত্ত-বিনোদনের উপাদান সাব্যস্ত করেছিল। এর অতিরিক্ত কোন মূল্য ও মর্যাদা তাদের দেয়নি। ইসলাম নারীদের চিত্ত-বিনোদনের পণ্য বানায়নি। বরং পারিবারিক জীবনে সমান অধিকার প্রদান করেছে। যেমন স্বামীর ইন্তেকালের পর ছেলে মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য ব্যক্তিও ওয়ারিস হয়। তেমনি স্ত্রীও ওয়ারিস হয়। যেমন স্ত্রীর ইন্তেকালের পর স্বামী তার ওয়ারিস হয়, অংশীদার হয়, স্ত্রীও স্বামীর উত্তরাধিকারী বা অংশীদার হয়।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন হক ও অধিকার রয়েছে, সে পরিমাণ স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ও অধিকার রয়েছে। এই পরিমাণ

অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, স্ত্রী কোন দাসী নয়; বরং জীবন সঙ্গিনী, জীবনের অংশীদার। [বাকারা : ২৩৮]

এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের মৌলিক নীতি হচ্ছে দুর্বল অসহায়কে হেফাজত করা, সাহায্য করা। দুর্বলকে নির্যাতন করা ইসলামের নীতি নয়; বরং সহায়তা করাই ইসলামের নীতি। সবচে' দুর্বল ও অসহায় হলো নারী সমাজ। তাই ইসলাম তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া ও মেহেরবানী করেছে। যখন সে মেয়ে বা কন্যা থাকে তখন তাকে মাতা-পিতার নেকী ও পুণ্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। যখন বিয়ে হয়ে যায়, তখন স্বামীকে বলা হয়েছে তুমি সম্মানের পাত্র কেবল তখনই হবে যখন স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আচরণ হবে স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ। তারপর যখন সে নিজেই মা হওয়ার গৌরব অর্জন করবে, তখন সন্তানদেরকে বলা হলো, তোমাদের জান্নাত মায়ের পায়ের তলায়। যদি তাদের পায়ের উপর হাত রাখতে পার তাহলে জান্নাত নিকটবর্তী পাবে। আর যদি মাকে কষ্ট ও নির্যাতন কর, তাহলে জান্নাত কাছে পাবে না। বাবার তুলনায় মায়ের হক বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্তানদের উপর পিতার হক ও অধিকার রয়েছে কিন্তু মায়ের হক অনেক বেশি।

বাবার চেয়ে মায়ের হক বেশি

পবিত্র কুরআন এর কারণ ব্যাখ্যা করেছে এভাবে যে, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে মা যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন, বাবা সে পরিমাণ সহ্য করেন না। বাবা অর্থ উপার্জন করেন মাত্র। আমি বলি, বাবা যদি বিয়ে শাদী নাও করতেন তবুও অর্থ উপার্জন করতেন। নিজের জন্য অন্যদের জন্য উপার্জন করতেন। অর্থ উপার্জন করা পুরুষের স্বভাবজাত বিষয়। সর্বাবস্থায় সে উপার্জন করবে। তার পরিশ্রম কেবল স্ত্রীর জন্য নয়; বরং তার নিজের জন্য, নিজের প্রিয়জনদের জন্যও। তবে নারীরা সন্তানের লালন-পালনে যে কষ্ট সহ্য করেন পুরুষ তা করতে পারবে না। মা নয় মাস সন্তান গর্ভে ধারণ করে রাখে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً.

আরও বলা হয়েছে–

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ.

> ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় মা সন্তান গর্ভে ধারণ করে রাখে। বিরাট একটা বোঝা, কিন্তু সহ্য করছে, ধৈর্যের সঙ্গে সন্তান ধারণ করছে। [আহকাফ : ১৫- লুকমান-১৪]

তারপর সন্তান প্রসব করা। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে। জীবন মরণ সমান হয়ে যায়। তার জীবন প্রদীপ 'নির্বাপিত প্রায়' হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেন, নইলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। নয় মাস গর্ভ ধারণের কষ্ট তারপর প্রসবের কষ্ট, তারপর দীর্ঘ দুই বছর নিজের রক্তকে পানি করে দুধপান করান। নিজের শরীরের বিশেষ অংশকে সন্তানের শরীরে পৌছে দেয়া। এটা তার দ্বারাই সম্ভব, স্বামীর দ্বারা সম্ভব হবে না। মা-ই তা করতে পারে। বাবা তা পারবে না।

তাছাড়া সন্তান যদি একগুয়েমি করে বসে যে, আমি কোলে বসে ঘুমাব, তাহলে মা সারা রাত কোলে নিয়ে কাটিয়ে দেয়। বসার সুযোগই হয় না। ঘুমানো তো দূরের কথা, সন্তান যদি অসুস্থ হয়, তাহলে মা-ও সন্তানের সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক দুঃখ-ব্যথা সহ্য করে। এক কথায়, এসব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবা এসব কষ্ট যদি করতে যান, তাহলে পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন।

নারীর সেবা ও পরোপকারে উৎসাহ-উদ্দীপনা

এমন যদি হয়, স্ত্রী বললো– এক বছর অথবা এক মাসের জন্য কাজ পরিবর্তন করে নিব। আমি তোমার কাজ করব, তুমি ঘরে বসে সন্তানের লালন পালন ও সেবা যত্ন কর। তাহলে দু'দিন পর স্বামী পাগল হয়ে যাবেন এবং অপারগ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। এ হলো নারীদের সহ্য ও ধৈর্য যে, তারা এসব দুঃখ-কষ্টকে সব সময় হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছেন।

আমাদের এখানে একজন কৃষকের ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। ঘটনাটি কাল্পনিক নয়, বাস্তব। কৃষক তার কৃষি খামারে গেলো। সেখানে গিয়ে নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিয়ম ছিল ঠিক দুপুর বারটায় তাদের স্ত্রীরা খাবার তৈরি করে তাদের জন্য খামারে যেত। একদিন ঘটনাক্রমে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। এখন কৃষক কি করবে, কোথায় যাবে? সে রাগে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীকে অনেক গালমন্দ করল। তোমার দ্বারা কোন কাজ হবে না। তুমি অলস, তুমি উদাসীন, হতভাগিনী! তোমাকে দিয়ে কোনো কাজই হয় না। আমি হলে এমন করতাম, তেমন করতাম। অথচ তুই এমন তুই তেমন! অসহায় স্ত্রী কান পেতে শুনতেই থাকল। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সন্তানদের দেখাশুনা, লালন

পালন করে। সেবা যত্ন করে। খাবার তৈরি করে। তৈরি খাবার মাঠে নিয়ে যায়। অথচ ঘটনাক্রমে একদিন কিছুটা বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় স্বামী শত সহস্র গালমন্দ শুনিয়ে দিল। স্ত্রী নিরূপায় হয়ে অসহায়ের মত শুনতে থাকল। স্বামী একথাও বললো, আমি যদি সে কাজে থাকতাম তাহলে কখনও এমন হতো না। এবার স্ত্রী বললো– আচ্ছা তা হলে দু'চার দিনের জন্য কাজের পরিবর্তন করা হোক। আমি খামারে কাজ করব, তুমি বাড়িতে থাক। ছেলে পেলেদের দেখাশোনা, সেবা যত্ন কর এবং দুপুর বারটায় খাবার নিয়ে এসো। স্বামী বললো– এ কোন বড় কথা কি! আমি তা করে নিব। স্ত্রী বললো, আচ্ছা আগামীকাল থেকেই হোক তাহলে! আলোচনা মতো পরবর্তী ভোরে স্ত্রী কৃষি খামারে চলে গেল এবং ক্ষেতের কাজ শুরু করে দিল। স্বামী ঘরে শুয়ে নিদ্রায় বিভোর। যখন চেতনা পেল, চোখ খুলল, তখন একটি বাচ্চা কেঁদে উঠল। তিনি তাকে সামলাতে গেলেন, তখন আরেক বাচ্চা কেঁদে দিলো। একে সামলাতে গেলে, তৃতীয় বাচ্চা কেঁদে উঠল। এ বাচ্চাকে প্রবোধ দেয়ার আগেই স্মরণ হল, গরুগুলো ঘরে বাঁধা রয়েছে। গাভীর বাচ্চা রশি ছিঁড়ে দুধ খেয়ে ফেলছে। অথচ এই দুধের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করে। বাছুর বেঁধে রাখার জন্য দৌড়ে গোয়াল ঘরের দিকে গেলো। তখন তার ছেলে চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এরপর গরুর বাছুর বাঁধার জন্য গোয়াল ঘরে গেল এবং দুধ দোহন করতে শুরু করলো। গাভীটি আতংকিত হয়ে দৌড়াতে লাগল। গাভীর রশি চৌকির সাথে আটকে যাওয়ায় চৌকিটি পড়ে গেল উনুনের উপর। এবার চৌকি আগুনের উপর। ছেলে চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। অন্য বাচ্চা অন্য দিকে চিৎকার করছে। স্বামী সাহেব তখন পেরেশান। কাকে সামলাবেন, বাচ্চাদেরকে; না গাভী ও তার বাছুরকে। নাকি খাবার তৈরি করবেন। না গাভীর দুধ দোহন করবেন! এখন পাগলের মতো চারদিকে দেখছেন। এভাবে বেলা প্রায় দশ এগারোটা বেজে গেলো। স্ত্রী ক্ষেতে পরিশ্রম করছে। তার আশা আজ খাবার বারটার আগে সাড়ে এগারটায়ই এসে যাবে। যেহেতু পুরুষরা অত্যন্ত শক্তিশালী। কাজেই কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলবে। তারপর যখন বেলা বারটা পার হয়ে একটা হয়ে গেল তবুও খাবার নিয়ে কেউ আসল না, তখন তার চিন্তা হলো, বিষয় কি? খাবার আসল না কেন? সে বাড়িতে গেল। গিয়ে দেখতে পেল, এক বাচ্চা এদিকে পড়ে কাঁদছে। আরেক বাচ্চা ঐ দিকে পড়ে কাঁদছে। চৌকি চুলার উপর ঝুলানো। খানাপিনা, দুধ, চৌকি, নিজের ছেলেপেলে কোন জিনিসই যথাস্থানে নেই। আর স্বামী সাহেব এক কোণায় নীরবে বসে আছেন।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করল– বিষয় কি? স্বামী উত্তর দিল, কিছুই না। এসব তোমারই কাজ। এসব আমার শক্তি সামর্থের বাইরে। অতঃপর তিনি কৃষি কাজ এবং স্ত্রী ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

বাস্তব সত্য হলো, নারীদের অনেক সহ্য, অনেক ধৈর্য। রান্না করা, বাচ্চাদের সামলান, ঘর-সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম, স্বামীর সকল কাজে সহায়তা করা, স্বামীর খেদমত ও সেবাযত্ন করা সবই করতে পারে। কিন্তু স্বামীকে যদি চারটি কাজ এক সঙ্গে দেয়া হয়, তাহলে পাগল হয়ে যাবে। এসব কেবল নারীরাই করতে পারে। এ কারণেই শরীয়ত তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। বাবার চেয়ে মায়ের হক ও অধিকার বেশি সাব্যস্ত করেছে। পুরুষ পদমর্যাদা হিসাবে যত উপরেরই হোক না কেন, অধিকার হিসাবে এতটা উপরে নন, যে পরিমাণ হক ও অধিকার মাকে দেয়া হয়েছে।

এ হচ্ছে শরীয়তের বিশেষ নীতি–

أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

পৃথিবীর অসহায় দুর্বলদেরকে আমরা উৎসাহিত করব, তাদেরকে অগ্রসর করে দিব। এ হলো আমাদের নীতি। তাদেরকে উচ্চাসন দান করা হবে। নারীরা অসহায় দুর্বল; তাদেরকে উচ্চাসন ও উচ্চ মর্যাদাদান করা হয়েছে।

এতিমদের প্রতি স্নেহ-মমতা

এতিমদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও দয়াবান হওয়ার জন্য উম্মতকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এ কারণে যে, এতিমরা নিরীহ দুর্বল থাকে। তাদের মা-বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারা এখন অসহায় মুরুব্বিহীন অবস্থায় রয়েছে। তাদের লালন পালনকারী কেউ নেই। তাই তাদের প্রতি দয়া করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তি যদি দয়া পরবশ হয়ে স্নেহ মমতার সঙ্গে এতিমের মাথায় হাত বুলায় তাহলে তার হাতের নিচে যে পরিমাণ চুল পড়বে, সে পরিমাণে নেকী তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَا تَيْنِ

আমি এবং এতিমের সেবাযত্নকারী জান্নাতে সমভাবে থাকব। তাবে আমি একটু আগে থাকব এবং সে ব্যক্তি পেছনে থাকবে। কিন্তু তার মর্যাদা প্রায় আমার

সমান হবে।

সর্বপ্রথম এতিম স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর চেয়ে বেশি এতিমদের সেবাযত্নকারী আর কে হতে পারে? এতিমের খেদমত ও সেবাযত্নের ফজিলত বহু হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো– এতিমরা অসহায়, দুর্বল। তাদের মা-বাবা বিদায় নিয়েছেন। দুনিয়ার কেউ কারো আপনজন হয় না। আত্মীয়-স্বজন থাকে কিন্তু যে পর্যন্ত নিজের কোন স্বার্থ না দেখে, সে পর্যন্ত স্বার্থহীনভাবে সেবাযত্নকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। সাধারণত এমন হয় না। এজন্য সকল উম্মতকে এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতিমদের পিতা চলে গেছেন, এখন উম্মতের সকলে তাদের পিতার স্থলবর্তী। প্রতিটি উম্মত ও মুসলমানের দায়িত্ব হলো তাদের দেখাশোনা করা, সেবা যত্ন করা।

আবার নারীরা দুর্বল; তাদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এতিমরাও দুর্বল তাদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

দাস-দাসীর প্রতি ভাল আচরণের নির্দেশ

যদি আপনার কোন কৃতদাস থাকে, তাহলে সে নেহায়েত অসহায় দুর্বল। আপনাকে সে তার মনিব মনে করবে। এজন্য শরীয়ত এই নীতি ঘোষণা করেছে–

اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ

ঐ কৃতদাস যাকে তুমি ক্রয় করেছ, সে তোমার ভাইয়ের সমান। তুমি যা আহার কর, তাকে তা করাও, তুমি যেমন পোশাক পরিধান করো, তাকেও তেমন পোশাক পরতে দাও। তোমার সন্তানদের যা শিক্ষা দাও, তা তাদেরকেও শিক্ষা দাও। অর্থাৎ সমান মর্যাদায় রাখ। তারপর তাদের সম্মান ও মর্যাদা এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, কৃতদাস যদি মসজিদে আসে, তাহলে এই পার্থক্য করা যাবে না যে, কৃতদাস পেছনের কাতারে এবং মনিব সামনের কাতারে দাঁড়াবে। বরং সে মনিবের কাঁধে কাঁধ মিলাবে একই কাতারে দাঁড়াবে। তাকে পেছনে সরিয়ে দেয়ার অধিকার মনিবের নেই। শরীয়ত সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বলেছে–

اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ

এরা তোমাদের ভাই। পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষাদীক্ষায় তাদেরকে সমপর্যায়ে স্থান দাও, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।

এছাড়া কৃতদাসকে আজাদ ও মুক্ত করে দেয়ার ফজিলত সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থগুলো ভর্তি রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি কৃতদাস আজাদ বা মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে– হজ ও উমরার যে সওয়াব হয়, একজন কৃতদাস আজাদ করার সে সওয়াব রয়েছে।

এ কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন অধিক সংখ্যক যুদ্ধ সংঘটিত হত এবং দাসদাসীও পাওয়া যেত প্রচুর। তখন এসব দাসদাসীকে আজাদ করে দেয়ার এত বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হতো। দৈনিক শত সহস্র কৃতদাস মুক্তি লাভ করতো। তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দেয়া হত। এর ফল হয়েছিল এই– ইসলামের প্রাথমিক যুগের আকাবিরে উলামা যাদের দ্বারা দীন ও ইলমে দীন প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল– তারা অধিকাংশই মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস ছিলেন। তাদের কাছে ধন-দৌলতের আধিক্য, টাকা পয়সার প্রাচুর্য ছিল না। তাদের কোন ঘরবাড়ি ছিল না, কোন প্রাসাদ ছিল না– যার চিন্তায় তাদের দিন কাটবে। তারা সব সময় দীন ও ইলমে দীনের চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এজন্য যে পরিমাণ ইলম ও জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন, ঘর-সংসারে নিমগ্ন লোকেরা তা অর্জন করতে পারেন না। তাদের ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, ঘর-সংসারের চিন্তা-ভাবনা ও ব্যস্ততা ছিল। আর মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাসদের একমাত্র ইলম ও জ্ঞানার্জনের চিন্তা ছিল। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) গ্রামে বসবাসকারী কৃতদাস ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি উম্মতের নেতৃস্থানীয় ইমাম। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.) সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন–

مَارَأَيْتُ اَحْسَنَ مِنْ عَطَاءِ ابْنِ رِبَاحٍ

আমি আমার যুগে আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বেশি জ্ঞানী অন্য কোন ব্যক্তি দেখিনি।

যে ব্যক্তির ইলম, জ্ঞান ও গুণের প্রশংসা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) করছেন, তাঁর ইলমের পরিধি কত ব্যাপক ছিল একবার ভেবে নিন। একবার অনুমান করুন, তাঁর ইলম কোন স্তরের ছিল! অথচ তিনিও ছিলেন কৃতদাস। এত বিরাট আলেম, মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি মুসলিম উম্মাহর বরণীয় নেতা, অথচ কৃতদাস ছিলেন। ওলী-দরবেশ আলেম-উলামাদের মধ্যে অনেক আকাবির হয়েছেন এবং

তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বেশি। এ হচ্ছে শরীয়তের তালিম ও হেদায়েতের ফল। ইসলাম দুর্বলদের প্রতি উম্মত নির্বিশেষে সকলকে আকৃষ্ট করেছে। প্রত্যেক মনিবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যেন নিজের কৃতদাসদের কেউ হেয় বা তুচ্ছ মনে না করে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃতদাসদের সঙ্গে বর্বরতা

এখন এজন্য বলছি যে, ইসলামপূর্ব যুগের দাসদাসীরা বিশ্বের এক মারাত্মক আজাব ও শাস্তি ভোগ করত। গোলামের উপর মনিবের অত্যাচার করার অধিকার ছিল। মনিব তাকে হত্যা করতে পারত, জবাই করে দিতে পারত, কঠোরতম সাজা শাস্তি প্রদান করতে পারত। কোন আইনই তাকে বাধা প্রদান করতে সক্ষম ছিল না, বিরত রাখতে পারত না। এমন লোমহর্ষক কাণ্ড করা হতো যা ইতিহাসের পাতা উল্টালে আজও শরীর শিউরে উঠে। কাজেই কিভাবে তাদের প্রাণ এসব সহ্য করতো তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কৃতদাসদের থেকে সামান্যতম অপরাধ বা ত্রুটি সংঘটিত হলে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য এমন সব যন্ত্র তৈরি ছিল, যে যন্ত্রে বর্শা ও বল্লম লাগানো ছিল। যন্ত্রের মধ্যে গোলামকে রেখে বর্শা সজ্জিত যন্ত্রের উভয় পাট একত্রিত করে দেয়া হতো। বর্শা এক দিক হতে অপরদিকে পার হয়ে যেত, আর মনিবরা বসে বসে হাসত, আনন্দ উপভোগ করত। পুকুরের মধ্যে বিষধর সাপ ছাড়া থাকত। গোলামের সামান্যতম ত্রুটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে পুকুরে নিক্ষেপ করা হতো। আর সঙ্গে সঙ্গে সাপ তাকে ঘিরে ফেলত। আর মনিব চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উপভোগ করতো। ক্ষুধার্ত বাঘ একত্রিত করে গোলামকে তাদের সামনে নিক্ষেপ করা হতো। বাঘের দল সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিত, খণ্ড বিখণ্ড করে ভক্ষণ করতো আর মনিব-তামাশা দেখত। কৃতদাসদের অবস্থা ছিল এমন করুণ।

শুরুতেই দাসপ্রথা বিলোপ না করার কারণ

ইসলাম এসে শুরুতেই দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত করেনি। যেহেতু এই প্রথা প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত ছিল। রাজনৈতিকভাবে যখন কোন জাতির উপর বিজয় লাভ হয়, আর ঐ জাতি যুদ্ধরত থাকে এবং মোকাবেলা করতে চায়, তখন তাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি বিজয়ী জাতি বিজিতদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে তা হরণ করে নেয়। কৃতদাসদেরও রাজনৈতিক

অধিকার হরণ করা হয়। গোলামীর অর্থ হলো এই। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার হরণ করা হয় না। বিলুপ্ত করা হয় না। গোলাম মসজিদে আসতে পারে, ইবাদত, তেলাওয়াত করতে পারে এবং এসব মনিবের মতই করতে পারে। রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয় না, যেহেতু তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া সকল নাগরিক অধিকার তারা ভোগ করতে থাকে। প্রাক ইসলামী যুগে গোলামের উপর মনিবের এতটুকু অধিকার ছিল যে, তাদের নির্দয়ভাবে কঠোরতম শাস্তি দিতে পারত। ইসলাম ঐ সকল শাস্তি বিলুপ্ত করেছে। গোলামের আজাদ ও মুক্ত করে দেয়ার ফজিলত বর্ণনা করেছে, যে কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার গোলাম মুক্তি লাভ করেছে। গোলামরা বড় বড় আলেম, ওলী দরবেশ হয়েছেন। ইসলাম দুর্বলদের প্রতি দয়াবান, নারী সমাজ, এতিম ও কৃতদাসদের উপর অত্যন্ত দয়া করেছে। যে ব্যক্তি অসহায় ও মজলুম তার প্রতি সকল উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে, মজলুমের প্রতিকার করো, জুলুমকে প্রতিহত করো। মজলুমের সাহায্য করা সকল উম্মতের দায়িত্ব।

জীবজন্তুর প্রতি দয়াবান হওয়ার নির্দেশ

এছাড়া ইসলামে দুর্বলতম জীবজন্তুর প্রতিও অনেক দয়া দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পতিতা মহিলাকে জান্নাতে দেখেছেন। সারাটি জীবন কুকর্ম করেছে কিন্তু তাকে জান্নাতে দেখা গেল। কারণ কী ছিল? কারণ হলো, একটি কুকুর পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তার জিহ্বা ক্ষত-বিক্ষত ছিল। অত্যধিক গরম ও শুষ্কতার কারণে কুকুরের জিহ্বা বেরিয়ে পড়েছিল। ঐ পতিতা কুকুরটির এ অবস্থা দেখতে পেল। তার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। ভাষাহীন একটি প্রাণী পিপাসায় কাতর, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। পানির কূপের কাছে বালতি রশি কিছুই ছিল না। সে তার পা থেকে চামড়ার তৈরি মোজা খুলে নিল এবং তার দোপাট্টা দিয়ে বেঁধে পানি উঠিয়ে কুকুরের মুখে ঢেলে দিল। এতে কুকুরের প্রাণ ফিরে আসল, তার জীবন রক্ষা পেল। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ঐ আমলের বদলাতে পতিতা নারীও জান্নাতে প্রবেশ লাভ করল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নেক পরহেজগার ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেখেছেন। তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তার বিড়াল ছানাটি নানাভাবে

তাকে কষ্ট দিত। যেমন কোন কোন জন্তু কষ্ট দিয়ে থাকে। ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বিড়ালটিকে একটি ঘরে বন্দি করে রেখে দিল এবং সবাইকে নিষেধ করে দিল কেউ যেন দরজা খুলে না দেয়। দু'তিন দিন পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতরিয়ে বিড়ালটি মারা গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ পরহেজগার ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেয়া হল, যেহেতু সে প্রাণীদের উপর দয়া করেনি।

ফেরাউনী শক্তির উপর দুর্বল বনি ইসরাইল জয়ী

আসল কথা হলো, ইসলাম প্রত্যেক দুর্বলের উপর দয়া ও মেহেরবানী করে থাকে। মানুষের মধ্যে অথবা জীবজন্তুদের মধ্যে যে কেউ দুর্বল হোক না কেন সকল দুর্বলের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করে থাকে। যে ধর্ম জীবজন্তুদের প্রতি দয়া করে থাকে সে ধর্ম কিভাবে মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করবে! অথবা একে অপরের উপর অত্যাচার করবে? ইসলাম তা অনুমোদন করে নি। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে–

أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

এটা ফেরাউনের যুগের ঘটনা ছিল। হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন– 'আমরা দয়া ও ইহসান করব, কাদের উপর? সে সব মানুষের উপর যারা দুনিয়াতে অসহায় দুর্বল। এসব কথা হযরত মুসা (আ.)কে বলা হচ্ছে। [কাছাছ : ৫]

ফেরাউন প্রবল ছিল। শাসন ক্ষমতা তার হাতে ছিল। বনি ইসরাইল অসহায় দুর্বল ছিল। ফেরাউন তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার চরমে পৌছে দিয়েছিল। অথচ তারা নবীগণের সন্তান, নবী ফেরাউনের কৃতদাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য ফেরাউন তাদের উপর অত্যন্ত নিকৃষ্টতম কাজ চাপিয়ে দিয়েছিল। শ্রমিকের কাজ, মজুরের কাজ। মনিবের সন্তানদের লালন পালন। প্রভৃতি নানা ধরনের নিকৃষ্ট কাজকর্ম তাদের দিয়ে করানো হতো। তাদের জীবন যাপনের মান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে নবী হিসেবে

প্রেরণ করলেন। মুসা (আ.) তাদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে তাদের স্বভাব চরিত্রকে সংশোধন করলেন। কাজকর্ম ও নৈতিকতার উৎকৃষ্টতা সাধন করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করলেন– এ দুর্বল সম্প্রদায় যাদের তরবিয়ত আপনি করছেন, চরিত্র গঠন করছেন, আমি তাদের উপর বিশেষ দয়া ও ইহসান করব। তারা পৃথিবীতে অসহায় দুর্বল। আমি তাদেরকে শক্তিশালী করে দিব। পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের হাতে অপর্ণ করব। দেশের কর্তৃত্ব তারা লাভ করবে। মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে সান্ত্বনা দিলেন। যাতে তারা নিজেদের দুর্বলতার কারণে চিন্তিত ব্যথিত হয়ে না পড়ে। কিন্তু শর্ত হল, এই মুসা (আ.) যেভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন, তা মেনে চলবে অনুকরণ অনুসরণ করবে। যে ইসলাম তাদেরকে তিনি দান করছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন, সে ইসলামকে গ্রহণ এবং যে চরিত্র ও নৈতিকতার দিকে আহবান করছেন, তা গ্রহণ ও বরণ করে নিবে। তার আনুগত্য করবে। যখন তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা উন্নত হবে, তখন অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন– এ কথা মুসা (আ.)কে বলা হলো। তারপর বলা হল–

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ.

> আমি তাদেরকে ক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা দান করবো এবং ফেরাউন, মাহান ও তাদের সৈন্য-সামন্ত যাদের তারা ভয় করতো তারা সবাই তাদের সামনে আসবে। ঐ কাজ ও দায়িত্ব এখন তোমাদের উপর ন্যস্ত হবে। [কাছছ : ৬]

ফেরাউন ও তার লোকদের আশঙ্কা ছিল যে, বনি ইসরাইল ক্ষমতাবান হয়ে না যায়। আমাদেরকে যাতে অপদস্ত করতে না পারে। আল্লাহ তায়ালা সে যুগের ঐ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন এবং ইসলাম ঐ ঘটনাকে তার মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে যে, অসহায় দুর্বলকে দয়া ও ইহসান করো, সর্বহারাদের প্রতি দয়া ও ইহসান করো, সর্বহারা নিঃস্বদের সাহায্য করো, এতিম মিসকীন এবং অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করো, মজলুমকে জুলুম ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করো। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তাহলে তাদেরকে উদ্ধার করো। এটা তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সারকথা, নারী সমাজ, কৃতদাস, এতিম, মজলুম এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি ইসলাম দয়া ও কৃপাদৃষ্টি দান করেছে। এ হলো ইসলামের বিশেষ ও মৌলিক নীতি, এ উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তোমরা দুর্বলদের প্রতি দয়া ও

মেহেরবানী করো, শিক্ষা গ্রহণ কর– এজন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামিনের মহান মর্যাদা দান করা হয়েছে। তিনি সৃষ্টি জগতের রহমত ও করুণাস্বরূপ এবং তাঁর রহমত, দয়া ও করুণা সবচে' বেশি প্রকাশ পেয়েছে দুর্বল ও অসহায়দের উপর। আরব জাতি ছিল সবচে' দুর্বল ও ক্ষমতাহীন। তাদেরকে এত প্রবল ও শক্তিশালী করে দেয়া হলো যে, তাদের সমাজ ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হল। তাদের রাজত্ব কায়েম হল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমত ও করুণা দিয়ে দুর্বল অসহায়কে মর্যাদা দান করেছেন। মিসকিনকে উঁচু স্তরে পৌঁছে দিলেন, এতিমদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিলেন। কৃতদাসদেরকে তাদের মনিবদের উপর স্থান ও মর্যাদা দান করলেন। এসবই ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রতিফল। এ উম্মতের সামনে এ শিক্ষানীতিই পেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন এ নীতি অনুসরণ করে জীবন চালিয়ে নেয়। দুর্বলদেরকে দয়া ও সহায়তা করে। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ে দুর্বল ও সবল উভয়ই থাকে। সবলদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা অসহায় দরিদ্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। দুবর্লদের সাহায্য সহায়তা করবে। তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। ফারুকী যুগে দরিদ্র দুর্বলদেরকে আদল ও ইনসাফের মাধ্যমে প্রবল ও প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন খলিফা মনোনীত হলেন তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে যে ব্যক্তি দুর্বল সে আমার কাছে সবল ও শক্তিশালী, আর যে ব্যক্তি প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সে অসহায় ও দুর্বল। অর্থাৎ আমি দুর্বলদের সাহায্য করব। প্রভাব প্রতিপত্তিশালীরা এ ধারণা যেন না করেন যে, তাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে। আমি তাদের থেকে এক একটি হক ও অধিকার আদায় করে দুর্বল অসহায়দের কাছে পৌঁছে দিব।

তাই হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনকাল এসব ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে অসহায়দের অনেক সাহায্য সহায়তা করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য, অসহায় দরিদ্রদের লালন পালন করা। রাষ্ট্রনায়কের কাজ হলো নিজেদের প্রজাদের লালন পালন করা, তাদের স্বভাব চরিত্র, নৈতিকতার উন্নতি সাধনে সদা সচেষ্ট থাকা। সর্বদা লক্ষ্য রাখা, ইলম ও জ্ঞান, স্বভাব চরিত্রে কে পিছিয়ে রয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করা। এ জাতীয় অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত হযরত উমর ফারুক (রা.) রেখে গেছেন।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে– হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখাশোনা করার জন্য রাতে বেরিয়ে যেতেন। তিনি লক্ষ্য করতেন, সাধারণ মানুষের জীবন কিভাবে কাটে। তিনি প্রত্যেক

পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। লক্ষ্য করতেন তাদের নৈতিকতার কোনরূপ ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কিনা। রাতের বেলা এসব দেখার জন্য তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন রাতে একটি ঘর থেকে অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ গান গাইছে। আর আওয়াজ ছিল একজন যুবতী মেয়ের। সে প্রেমের আবেদনময় কবিতা পাঠ করছিল। হযরত উমর (রা.)-এর সন্দেহ হলো, একটি যুবতী মেয়ে কেন ঘরে বসে প্রেম আবেদনময় কবিতা আবৃত্তি করছে।

তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন– 'ঘরে কে?' মেয়েটি আমিরুল মুমিনীনের আওয়াজ বুঝতে পেরে ভয়ে আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারলো না। নিরব নিরুত্তর হয়ে যাওয়ার কারণে হযরত উমর (রা.)-এর মনে আরো বেশি সন্দেহ দেখা দিল। গানের সুর বন্ধ হয়ে গেল, তবে আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন? তারপর ধমকের সুরে আওয়াজ দিলেন– এ ঘরের ভেতর কে? মেয়েটি আরো বেশি ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তখন হযরত উমর (রা.) দেয়ালের উপর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন দেখার জন্য যে, ঘরে কে ও কি করছে? দেখতে পেলেন, ঘরে একজন যুবতী মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই।

জানতে চাইলেন– গান করছিল কে? তুমি জান না, ইসলামে নারীদের আওয়াজ গোপনীয় বিষয় বলে ঘোষণা করেছে। তুমি এত উচ্চৈঃস্বরে গাচ্ছিলে যে, বাইরে থেকে তা শোনা যাচ্ছিল? তুমি গুনাহগার হয়েছ। তুমি কি তা বুঝ না?

এবার যুবতী মেয়ে সাহস করলেন। তার এই বিশ্বাস ছিল, হযরত উমর ফারুক (রা.) ন্যায়পরায়ণ খলিফা। আমি যাই বলব আবেগের বশে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, চিন্তা-ভাবনা করবেন। সে কিছুটা কর্কশ ভাষায় বললো– আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে পাপ করছি বলে দোষারূপ করছেন? অথচ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে তিনটি পাপ করলেন। কুরআন ও হাদীসের তিনটি আদেশ লঙ্ঘন করেছেন।

মেয়ের কথা শুনে হযরত উমর (রা.) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রাগের পরিবর্তে শান্ত হয়ে গেলেন। একজন প্রজার মেয়ে খলিফাকে ধমকের সুরে কথা বলল। তখন আবেগজনিত ক্রোধ প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েটি যখন বললো, আপনি তিনটি গুনাহ করেছেন। তৎক্ষণাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন– কেন! বলো তো শুনি, আমি কী গুনাহ করেছি।

মেয়েটি বলল– আপনার প্রথম গুনাহ হলো, আমি একজন বেগানা মেয়ে। বেগানা মেয়ে নির্জনে থাকা অবস্থায় পরপুরুষ তার কাছে প্রবেশ করা জায়েয নয়। আপনার কি অধিকার ছিল আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশের এবং আমার নির্জনতা ভঙ্গ করার, ব্যাঘাত সৃষ্টি করার?

দ্বিতীয় কথা হলো, পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে–

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর।

আপনি এ আদেশ অমান্য করেছেন। আপনি প্রাচীরের উপর দিয়ে এসেছেন। প্রাচীর ডিঙিয়ে আসার কোন অধিকার আপনার আছে কি?

তৃতীয় কথা হলো কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا.

কারো ঘরে অনুমতি পাওয়ার আগে প্রবেশ করো না। প্রথমে অনুমতি গ্রহণ, তারপর সালাম করে প্রবেশ করো। [নূর : ২৭]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত ছিল, যখন কারো ঘরে যেতেন, তখন তিন বার সালাম করতেন। তিন বারের সালাম এভাবে হত– এক. অনুমতি প্রাপ্তির সালাম। দরজায় আওয়াজ না করে, নাম ধরে ডাক না দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন– আসসালামু আলাইকুম! গৃহকর্তা আওয়াজ শুনতেন। ঘর থেকে আওয়াজ আসত, ওয়া আলাইকুম সালাম। এরপর তারা বেরিয়ে এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভেতরে নিয়ে যেতেন। ঘরে প্রবেশ করে যারা ভেতরে রয়েছেন তাদেরকে সালাম করতেন। একে 'সালামে তাহিয়্যা' বলা হতো। তারপর যখন বেরিয়ে আসতেন তখন বিদায়ী সালাম করতেন। একে 'সালামে বিদা' বলা হতো। এই হল তিন সালাম।

মেয়েটি বলল, কুরআন নির্দেশ দিয়েছিল 'অনুমতি সালাম' না করা পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করবেন না; আপনি ঐ সালাম না করে প্রবেশ করলেন কেমন করে?

আর এই তিনটি গুনাহ আপনার হয়েছে। মেয়েটি ধমকের সুরে হযরত উমর (রা.)কে কথাগুলো বলল।

হযরত উমর (রা.) বললেন, আমাকে ক্ষমা কর বোন! সত্যিই আমার ভুল হয়েছে।

এবার মেয়েটি বলল, আমার কাছে আপনি কোন অপরাধ করেননি। আমি কি ক্ষমা করব! যাঁর কাছে অপরাধ করেছেন, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আপনি কুরআনের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর দরবারে তওবা ইস্তেগফার করুন। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কোনো মানে হয় না।

হযরত উমর (রা.) খুবই লজ্জিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে ফিরে আসলেন। অথচ তিনি খলিফা। আমিরুল মুমিনীন! পুলিশ বিভাগের অধিকার রয়েছে সন্দেহ হলে তল্লাশী করার। হযরত উমর (রা.) এ কাজ করে কোন গুনাহ করেননি। তাছাড়া তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, গান গাইছে কে? তখন কেউ কোন উত্তর দেয়নি। যখন তাঁর সন্দেহ হয়েছে সুতরাং প্রবেশ করার অধিকার তাঁর রয়েছে। কুরআনের নির্দেশ ঐ মেয়ে লঙ্ঘন করেছে। তিনি করেননি।

খলিফা হিসাবে তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেকে মেয়েটির বক্তব্য শুনে গুনাহগার মনে করলেন। সত্যিই আমার অন্যায় ও পাপ হয়েছে। তাই সারা রাত জেগে তওবা ইস্তেগফার করলেন। ইবাদত-বন্দেগী করে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সকাল বেলা তাঁর বিশ্বাস হলো আমার গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেছেন। অথচ তওবা ইস্তেগফারের প্রয়োজন ছিল না। তিনি গুনাহ করেননি। কিন্তু তার পরও নিজেকে গুনাহগার মনে করে তওবা করলেন।

এবার আইন অনুযায়ী পুলিশ পাঠিয়ে ঐ মেয়েকে দরবারে হাজির করলেন। বললেন, বোন! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তুমি আমাকে আমার ভুল সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছ। আমি রাতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করেছি এবং আশ্বস্ত হয়েছি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন।

বিনয়ের কারণে নিজেকে গুনাহগার বলছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গুনাহ ছিল না। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কিন্তু এখন আমি খলিফা হিসাবে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কেন তুমি গান গাইছিলে? প্রেম নিবেদনকারী কবিতা আবৃত্তি করছিলে কেন?

মেয়েটি উত্তর দিল– 'আমিরুল মুমিনীন! আসল কথা হলো, আমি একজন যুবতী মেয়ে। এখন আমার পূর্ণ যৌবনকাল। পনের দিন আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামীও যুবক ও সুপুরুষ। আপনি তাকে অমুক যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বিরহে কষ্টে আমি এসব কবিতা আবৃত্তি করছিলাম, আর কিছু

নয়। আমি চরিত্রহীন মেয়ে নই, অসতীও নই।'

হযরত উমর (রা.) বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ। তোমার স্বরভঙ্গি বলছে কথাটি বাস্তব।' তারপর অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে তাকে বিদায় করে দিলেন। যুবতী মেয়ে ঘরে ফিরে গেলো।

এদিকে হযরত উমর (রা.) ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যুবতী মেয়ের যদি বিয়ে হয় এবং তার স্বামীও যুবক হয়; আর উভয়ের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ করে দেয়া হয়, তাহলে তারা কতদিন পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে? যারপর তাদের পাপকাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে?'

স্ত্রী বললেন– 'যুবতী মেয়ে তিন মাসের বেশি সহ্য করতে পারবে না। তবে কথা আছে। কোন মেয়ে যদি ধর্মপরায়ণ ও লজ্জাবতী হয়, তাহলে নিজ চরিত্র গুণে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে। বরং ধৈর্য ও সহ্যের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে তা হবে ব্যতিক্রমী বিষয়, বিশেষ ব্যবস্থা। আলোচনা হচ্ছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে। আবেগ-উদ্দীপনা হিসাবে বলা হয়ে থাকে, তিন মাস পর অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যদি তার ধর্মপরায়ণতা, সতীত্বও লাজ-লজ্জা না থাকে।'

হযরত উমর (রা.) এ কথা শুনে সরকারী নির্দেশ জারি করলেন, যেসব নব বিবাহিত যুবককে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদেরকে তিন মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই বাড়িতে পাঠানো হোক এবং তাদের স্থলে অন্য সৈন্য মোতায়েন করা হোক। সদ্য বিয়ে করা কোন সৈনিককে যেন তিন মাস অথবা তিন মাসের বেশি যুদ্ধক্ষেত্রে আটকে রাখা না হয়। যথাসম্ভব ঐসব যুবককে যুদ্ধে প্রেরণ করা হোক, যারা এখনও বিয়ে করেনি, যেন তারা একাগ্র চিত্তে যুদ্ধ করতে পারে। আর বিবাহিত হলে তিন মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে যেন দেশে ফেরত পাঠানো হয়। একটি মেয়ের কারণে সকল সৈন্যর জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

জাতির মূল্যবোধ রক্ষা আমিরের দায়িত্ব

এ যেন সরকারীভাবে জাতির চরিত্র রক্ষার ব্যবস্থা। প্রথমত রাজনৈতিকভাবে জাতিকে রক্ষা করার কাজ প্রত্যেক শাসকই করে থাকেন। দ্বিতীয়টি হল নৈতিকভাবে রক্ষা করা। ইসলামে আমীরের এ দায়িত্ব আছে জনসাধারণের চরিত্র গঠন ও সংশোধন করবেন। তাদের স্বভাব চরিত্র পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখবেন। চরিত্রহীন, চরিত্রহরণকারী ও চরিত্র বিনষ্টকারী কোন কাজ যেন না হয়। তাদের তাকওয়া তাহারাতের মধ্যে কোন প্রকার

শৈথিল্য যেন আসতে না পারে। এ সকল দায়িত্ব আমীরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ধর্মীয় বিষয়েও নেতৃত্ব দেয়া আমিরের দায়িত্ব

তাই ইমামতি করা বা নামায পড়ানো আমীরের দায়িত্ব ও অবশ্যকরণীয় কাজ মনে করা হত। ইমামতির যে পদকে আমরা হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকি; এখানে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া। এখানকার মুসলমানগণ মসজিদের শুধু সম্মানই করেন না; বরং নিজ বাসভবনের চেয়েও বেশি সজ্জিত করে রাখেন, যত্ন করেন। ইমামগণের সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। উল্লেখযোগ্য বেতন ও ভাতা দিয়ে থাকেন; কিন্তু আমাদের ঐ দিকে এ সম্পর্কীয় অবস্থা এতই হীন, অধঃপতিত যে, অপদার্থ অযোগ্যদের ইমাম নিয়োগ করা হয়। যে চরম মূর্খ, অজ্ঞ যে বৈষয়িক কাজের অযোগ্য তাকে ইমাম বানানো হয়। অন্ধ খোঁড়া অকর্মন্যদের নিয়োগ করা হয় মুয়াযযিন এবং মনে করা হয় গৃহচাকর। যেমন ক্ষৌরকার, ডোম, সুইপার থাকে। বিয়ে-শাদী উপলক্ষে যেমন এদেরকে কিছু দেয়া হয়, তেমনি মসজিদের ইমামকেও কিছু হাদিয়া দিয়ে দেয়া হয়।

অথচ ফকীহগণ লিখেছেন, ইমামের পদ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পদ। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উচিত যাকে মহল্লাবাসী সম্মান শ্রদ্ধা করতে পারেন; তাকে সম্মান শ্রদ্ধা করা শরীয়তের বিধান মতে সকলের কর্তব্য।

ইমাম প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ইমামতি করছেন। এ হক ও অধিকার আমিরুল মুমিনীনের জন্য রাখা হয়েছে। এতে উপকারিতা হলো এই–

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ.

প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, 'যেমন রাজা তেমন প্রজা'; অর্থাৎ 'জনগণ নিজেদের বাদশাহ ও রাষ্ট্রনায়কের অনুকরণ করে থাকে'। যেমন বাদশাহ হবে প্রজারাও সাধারণত সেভাবেই গঠিত হবে। সুতরাং আমিরুল মুমিনীন যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াবেন, তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি কি থেকে যাবে যে মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায না পড়বেন? তাই মানুষ বাদশাহর ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ঐ কাজই করেন, যা বাদশাহ করতে থাকেন। অর্থাৎ দীন ও ধর্ম তো পবিত্র ও মহান বস্তু। বাদশাহ যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকেন, তাহলে প্রজাদের মধ্যে পাপাচার অজ্ঞাতসারে বিস্তার লাভ করবে। তারাও পাপাচারে

লিপ্ত হয়ে পড়বে।

ইতিহাসে লেখা আছে, সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক উমারী বংশের একজন খলিফা ছিলেন। তার অনেক বিয়ে করার আগ্রহ ছিল। তাই বলে নাজায়েয বা অবৈধভাবে তা করতেন না। চার জনের বেশি স্ত্রী এক সাথে রাখেননি। কিন্তু বৈধভাবে ভোগ-বিলাস করতেন। আইনের ছায়াতলে থেকে করতেন। তিনি এমনভাবে শাদী করতেন যে, সবসময় চারজন স্ত্রী থাকতেন। ছয় মাস পর একজনকে তালাক প্রদান করে তার মোহর আদায় করে দিতেন এবং এর স্থলে অন্য নারীর পানি গ্রহণ করতেন। এভাবে দুই আড়াই শত নারীর পানি গ্রহণ করেছেন। এ ছিল তাঁর বিলাস। রাজ্য ছিল, কোষাগার তারই হাতে ছিল, দীন ও ধর্মের প্রতি কোনরূপ খেয়াল ছিল না। জাতীয় কোষাগারকে ব্যক্তিগত কাজে উজাড় করে দিচ্ছিলেন। তবে অবৈধ কাজ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতেন। একত্রে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখতেন না। তবে চারের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকত। এটা ছিল তার নিয়ম, তার অভ্যাস।

ঐ যুগের রাজা-বাদশাহদের দরবারে গর্ব গরিমার কথাবার্তা হত। কোন রঈস বলত, আমি পঞ্চাশের অধিক বিয়ে করেছি। তখন দ্বিতীয় জন বলত, এ তো কোন বড় কাজ নয়। আমি একশ' স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেছি। তৃতীয় জন বলত আমি দুইশ' শাদী করেছি। যেহেতু রাজা বাদশাহগণ এমন করতেন, তাই প্রজাসাধারণের মধ্যেও তা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাজা-বাদশাহ আমির উমারা যে পথে চলেন সাধারণ নাগরিকও ঐ পথেই চলেন।

এজন্য ইসলাম ইমামতকে আমিরুল মুমিনীনের দায়িত্বে অর্পণ করেছে। তিনি যেন ইমাম নিয়োগ করেন, তা হলে কেউ তাদের হেয় নজরে দেখবে না।

আমিরুল মুমিনীন যখন মসজিদে আগমন করবেন, তখন উচ্চপদস্থ কোন রাজকর্মচারী মন্ত্রীবর্গ অনুপস্থিত থাকবেন না। সবাই মসজিদে আসবেন, অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিরা না আসতে পারেন, কিন্তু আমীর নবাব, জায়গীরদারদের মধ্যে কেউ এমন থাকবে না, যিনি মসজিদে আসবেন না। যেহেতু বাদশাহকে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে, সুতরাং ঐ পথে তাদেরকে চলতে হবে। বাদশাহ যখন নামায আদায়ে লেগে যাবেন, তখন তারাও বলবেন, আমরাও নামাযী হয়ে যাই।

বাদশাহ আলমগীরের যুগের ঘটনা লেখা হয়েছে। তাঁর সময়ের উলামায়ে কেরাম কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের খোঁজ খবর ও জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ ছিল না। আমীর উমারা তাদের ধন-দৌলতের মোহে মত্ত ছিলেন। আলেমদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে কে? আলেমগণ পথের ভিখারীর

ন্যায় হয়ে পড়েছিলেন। আলমগীর যেহেতু নিজেও আলেম ছিলেন। আলেমদের মূল্য ও মর্যাদা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু তিনি পত্র পত্রিকায় কোন নির্দেশ জারি করেননি যে, আলেমগণের শ্রদ্ধা করা উচিত, করতে হবে।

তিনি এ পন্থা গ্রহণ করলেন, যখন নামাযের সময় হত তখন বলতেন, আমার ইচ্ছা আজ অমুক গভর্নর যিনি দাক্ষিণাত্যের নবাব– আমাকে ওযু করাবেন। দাক্ষিণাত্যের নবাব সাহেব সাত বার সালাম করবেন। আমাকে সম্মান করা হয়েছে। বাদশাহ আমাকে ওযু করিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এখন আমাকে কোন জায়গীর প্রদান করা হবে। বাদশাহ আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তিনি তৎক্ষণাৎ পানির বাসন হাতে নিয়ে ওযু করাতে আরম্ভ করতেন।

বাদশাহ আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, ওযুর ফরয কয়টি? তিনি জীবনে কোন দিন ওযু করেননি, ফরয জানবেন কেমন করে? এখন তিনি পেরেশান। কি উত্তর দিবেন? পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ওযুর ওয়াজিব কয়টি? কোন খবর নেই। জিজ্ঞেস করলেন, সুন্নাত কয়টি? কোন উত্তর নেই।

বাদশাহ আলমগীর বললেন, অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের কথা, লাখ লাখ প্রজাসাধারণের তুমি শাসক। লাখ লাখ মানুষের তুমি শাসনকর্তা। তোমার নাম মুসলমান আর তুমি এ সাধারণ কথাটিও জান না যে, ওযুর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত কয়টি? আমি আশা করি ভবিষ্যতে এমন আর হবে না। এই নবাবের সঙ্গে এরূপ করলেন।

রমজানের মাস ছিল। অন্য এক আমীরকে বললেন, আপনি আমার সাথে ইফতার করবেন। তিনি বললেন, জাঁহাপনাহ! এ তো আমার সম্মান ও সৌভাগ্য, অধমের কি এ ভাগ্য হবে যে, বাদশাহ সালামত স্মরণ করবেন। ইফতার শুরু করার সময় বাদশাহ তাকে কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি রোযাই রাখেননি। তার জানাই ছিল না কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়। তিনি তো নীরব, কোন উত্তর নেই।

আলমগীর বললেন, অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা। তুমি মুসলমান শাসক, তুমি নবাব, তুমি গভর্নর। হাজার হাজার মানুষ তোমার নির্দেশ মেনে চলে। তুমি একজন মুসলমান অথচ তুমি জান না কি কি কাজে রোযা নষ্ট ও ভঙ্গ হয়।

এভাবে কারো কাছে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কারো কাছে হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মোটকথা সবাই ফেল করলেন। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে যেন এমন আর না দেখি।

এবার আমীর উমারা এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাসাইল শিক্ষার চিন্তা ও প্রয়োজন দেখা দিল। মৌলভীদের অনুসন্ধান শুরু হল। এবার মৌলভীরাও বাহানা করতে শুরু করলেন। 'আমাকে পাঁচশ' টাকা বেতন দিতে হবে।' তারা বললেন, হুযুর! আমরা এক হাজার টাকা বেতন দেব। যেহেতু জায়গীর ও জমিদারী বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সারা দেশে মৌলভীদের তালাশ শুরু হলো। আলেম উলামা যারা ছাত্র ছিলেন তারাও কাজে লেগে গেলেন এবং বিরাট অংকের বেতন পেতে লাগলেন। সকল আমীর উমারা মাসাইল শিখে নিলেন, দীনের উপর আমল শুরু করে দিলেন। এটা ছিল ঐ কথা

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْ كِهِمْ

যেমন রাজা তেমন প্রজা।

বাদশাহ যদি স্বয়ং দীনের প্রতি ঝুঁকে যান, তাহলে প্রজা সাধারণ দীনদার হবে না এ কথা অসম্ভব। রাজা যে পথ প্রদর্শন করে, প্রজারাও ঐ পথে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে চলতে থাকে। শুধু নেকী আর পুণ্যের কাজেই নয়। জঘন্যতম খারাপ কথা ও কাজ যদি বাদশাহ চালু করে দেন, তবে পাবলিকও তা অনুসরণ করে চলবে। বর্তমান যুগের তাহযিব ও তামাদ্দুন রাজ্যের পক্ষ থেকেই এসেছে। বর্তমান যুগের তাহযিব ও তামাদ্দুনের অর্থ কি? ইসলাম ধর্মে তাহযিব ও তামাদ্দুনের অর্থ হল– উন্নত চরিত্র, সবর, শুকর, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, লজ্জা, শরম, সৎসাহস, দানশীলতা ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু বর্তমান তাহযিবের অর্থ হলো ক্লাবে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করা। চরম লজ্জাহীনতা প্রদর্শন করা। অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এ হল বর্তমান তাহযিবের অর্থ। যেহেতু শাসকদের পক্ষ থেকে এসব চালু করা হচ্ছে, তাই পাবলিক এসব করে যাচ্ছে। তারা জানে না এসব ভাল না মন্দ। ভাল মন্দ সবই উপর ওয়ালারা করছেন। তাই আমরাও করছি। যে জিনিসের পেছনে রাজশক্তি থাকে ঐ জিনিস আকর্ষণীয় হয়ে যায়, চিত্তাকর্ষক হয়ে যায়। মানুষও তা সানন্দে গ্রহণ করে দেয়।

তাই ইসলাম সকল নেক ও মহৎ কাজের জন্য আমিরুল মুমিনীনকে দায়িত্বশীল করেছেন। এর সীমা হচ্ছে– যদি জানাযা নিয়ে আসা হয় তাহলে আমিরুল মুমিনীন জানাযার নামায পড়াবেন। পরিষ্কার কথা, আমির যখন জানাযা পড়াবেন, তখন আমির উমারা নবাবগণ মন্ত্রীবর্গ পদস্থ কর্মকর্তাগণ কেউ জানাযা হতে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না, সবাই মৃত ব্যক্তির কাছে যাবেন, জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করবেন। তখন তারা নিজেরাই দীনদার ও ধর্মীয় হয়ে

যাবেন। তারা যদি ইমামতি করেন, মসজিদ মুসল্লীতে ভরে যাবে। তারা যদি জানাযা পড়ান তাহলে জনসাধারণও জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে। মৃত ব্যক্তি ও তার উত্তরসূরীদের সঙ্গে দয়া ও হামদর্দী দেখাবে। আমীর যখন যাকাত প্রদান করবেন, তখন যাকাত প্রদান ব্যবস্থা দেশে চালু হয়ে যাবে। একথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

আমি যদি এসব মুসলমানের হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করি, রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করি, তখন তারা বিলাস ভোগে মত্ত হবে না। বরং তারা দীন প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাতের বিধান চালু করবে। আমর বিল মারুফের ব্যবস্থা চালু করবে। সৎ ও মহৎ কথাবার্তা দেশে প্রচলিত হবে। গর্হিত কাজ ও কথাবার্তা নির্মূল হয়ে যাবে। [হজ্জ : ৪১]

ক্ষমতার মসনদে আসীন ব্যক্তি যখন গর্তিত কাজকর্মকে নির্মূল করবে, তখন জনসাধারণের কেউই গর্তিত কাজ করবে না; বরং তারাও গর্হিত কাজকর্ম বর্জন ও নির্মূল করবেন। আমিরুল মুমিনীন যদি পাক পবিত্র স্বভাবের অধিকারী হন, দীন প্রচার করেন, তাহলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই পবিত্র স্বভাবের অধিকারী হবেন ও সৎস্বভাব উন্নত নৈতিকতার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করবেন। সদা সচেষ্ট থাকবেন। ফলে দীন প্রসার লাভ করবে। তাই এ কাজগুলোকে আমীরের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা জানাযার নামায পড়বেন। মসজিদে ইমামতি করবেন। প্রকৃতপক্ষে এ পদ ও দায়িত্ব তাদেরই যেমন বর্তমান যুগে গভর্নরের পদ। যারা প্রদেশে রাষ্ট্র প্রধানের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন আর রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে থাকেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি হয়ে নামাযে দাঁড়াবেন। যদি রাষ্ট্র ইসলামী হয়, তাহলে ইমামাতির পদ অত্যন্ত উচ্চ পদ। তাই বলা হয়েছে–

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

ইমামতি করার অধিকার ঐ ব্যক্তির যে পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক পাঠক ও বিজ্ঞ। যদি কুরআনের জ্ঞান সকলের সমপর্যায়ের হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা হবে, যে রাসূলের সুন্নতে সবচেয়ে বিজ্ঞ হবে, আমল করবে। যদি কুরআন ও সুন্নতে সবাই সমপর্যায়ের হন, সবাই অভিজ্ঞ হন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে

ইমাম নিযুক্ত করা হবে যে ফেকাহ ও নামাযের মাসাইল বেশি জানেন। যদি ফেকাহতেও সবাই সমান হন, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করতে হবে যে উচ্চবংশের ছেলে। এতেও যদি সবাই সমান হন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করতে হবে যে সর্বাধিক সুন্দর ও সুশ্রী।

সারকথা, ইমামের মধ্যে এমন বিশেষত্ব থাকতে হবে যার কারণে তার পেছনে নামাযে দাঁড়াতে কেউ লজ্জানুভব করবে না। তারা ইমামের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তার আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিবে। এখন যদি আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ইমাম নিয়োগ করেন, যার চেহারা কুৎসিত, ইলম ও জ্ঞান শূন্যের কোটায়। কোন গুণই তার মধ্যে নেই। সকলের চেয়ে অপদার্থ, অকর্মন্য– তাহলে যেমন ইমাম হবেন, তেমন নামায হবে। পরকালে সওয়াবও তেমনই পাবেন।

সারকথা, এসব হল উঁচু পদ। এসব পদের দায়িত্ব আমীরদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্যই ওয়াজ নসিহত উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব আমীরদের উপর দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে–

لَا يَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْ مَامُوْرٌ اَو مُخْتَالٌ

ওয়াজ নসিহত করার অধিকার সর্বপ্রথম আমীরদের, তিনি নিজেই ওয়াজ করবেন, মাসাইল বয়ান করবেন। তারপর ঐ সকল মানুষ বয়ান করবে, যাকে আমীর আদেশ করবেন বা এ কাজে নিযোগ করবেন। এ দু'জন ছাড়া যারা করবে তারা ধোকাবাজ প্রতারক হবে। সে তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ওয়াজ নসিহত করবে। সুতরাং যে পর্যন্ত কাউকে রাষ্ট্রপ্রধান অনুমতি প্রদান না করবেন কিংবা এ কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিয়োজিত ব্যক্তি না হলে সে নিঃসন্দেহে স্বার্থপর ও প্রতারক হবে। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ পথ বেছে নিয়েছে।

আলেম সমাজ খেলাফতের স্থলবর্তী

বর্তমান যুগ ইমামতের যুগ, খেলাফতের (গণতন্ত্র) যুগ নয়। এখন আলেম সমাজকে খলিফার স্থলবর্তী করা হয়েছে। তারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, এই ব্যক্তি ওয়াজ নসিহত করার যোগ্য, তা হলে সে ওয়াজ করবে, মাসাইল বয়ান করবে। কিন্তু যে ব্যক্তির শিক্ষিত বলে কোন সনদ বা সার্টিফিকেট নেই, কোন আলেমও সাক্ষ্য প্রদান না করেন তাকে শিক্ষিত বলে; তাহলে পরিষ্কার কথা, এমন ব্যক্তি যদি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, তাহলে দীন ধর্মকে ধ্বংস করবে। তাকে

স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।

বক্তৃতা-বিবৃতির স্বাধীনতা নেই; বরং সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে অনুমতি দেয়া হবে। যদি এ জাতীয় ওয়াজ ব্যাপক হয়ে যায়, যেমন আজকাল হচ্ছে; তাহলে এর ফল দাঁড়াবে, ঐ বক্তা কিছু একটা বলে চলে যাবে। অন্যজন এসে অন্য কিছু বলবে। ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবেন। মাসআলা জিজ্ঞেস করবেন কার কাছে? কার কথা মেনে চলবেন, কাকে অনুসরণ করবেন? একজন বলবে জায়েয, অন্যজন বলবেন, নাজায়েয। এখন নিরীহ জনসাধারণ একথা জানে না যে, এরা আসলে আলেম নন। আলেমের পোশাক পরে এসেছেন। তারা নিজেরা আলেম নন; তাই তাদের সামনে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, দীনের কথা বলবে, তারা তাকেই আলেম মনে করবে। তারা পার্থক্য করতে পারবে না, এ ক্ষমতা তাদের নেই।

তাই দীনের ইমারত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খলিফা ধর্মীয় বিষয়গুলোকে নিজের হাতে রেখে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালাতেন। এ কারণেই বলা হয়েছে–

لَا يَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْ مَامُوْرٌ اَو مُخْتَالٌ

বক্তা হয় আমীর হবেন অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি হবেন অথবা কোন প্রতারক। তবে আমীরের মনোনীত ব্যক্তি আলেমই হবেন। আমাদের হিন্দুস্থানে ভুপাল ও হায়দরাবাদ রাজ্যে কিছুদিন আগেও এ ব্যবস্থা ছিল। যখন কোন বাইরের বক্তা আসতেন, তখন উলামায়ে কেরামের একটি দল যে পর্যন্ত তার ওয়াজ শুনে সাক্ষ্য প্রদান না করতেন যে, এ ব্যক্তি আলেম, ওয়াজ করার যোগ্যতা রয়েছে- সে পর্যন্ত বক্তৃতা করার অনুমতি দেয়া হত না। এর ফল হত, এই রাজ্যে বিভিন্ন মতের মানুষ ছিলেন না; বরং একই মতের সবাই ছিলেন। মতের বিভিন্নতা ছিল না। সবাই একই মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। সাধারণের মধ্যে কোন ধরনের বিভ্রান্তি ছিল না। তারা দীনের উপর আমল করে চলেছেন।

হায়দরাবাদেও ছিল ভুপালেও ছিল। এজন্য যে এ দু'রাজ্যে অনেক উলামা ছিলেন, ইলমের মান মর্যাদা ছিল। ছোট ছোট আমল আখলাকের ব্যাপারেও রাজ্যের পক্ষ থেকে যখন গুরুত্ব প্রদান করা হয় তখন দীন প্রসার লাভ করে।

ভুপালে এমন নিয়ম ছিল, কোন গরীব লোক যদি তার বাচ্চাকে মক্তবে ভর্তি করে দেয়, তাহলে যে দিন বাচ্চা 'আলিফ লাম মিম' আরম্ভ করবে সেদিন রিয়াছতের পক্ষ থেকে মাসিক এক টাকা ভাতা জারী হয়ে যাবে। যখন দ্বিতীয়

পারায় যাবে ভাতাও দু'টাকা হয়ে যাবে। তৃতীয় পারায় তিন টাকা মাসিক পেতে থাকবে। ত্রিশ পারা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চার মাসিক ভাতা ত্রিশ টাকা হবে।

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে ত্রিশ টাকা মাসিক এমনই ছিল। যেন মাসিক তিন শত টাকা (এখন তিন হাজার টাকা হবে।)। প্রচুর আমদানী ছিল এবং সব জিনিসই সস্তা চিল। এর ফলে যারা গরীব মানুষ ছিলেন, যাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা ছিল না তারা বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিতেন। পবিত্র কুরআন হেফজ করাতেন। এদিকে ভাতাও পেতে থাকতেন। এমন হাজারো পরিবার ছিল এবং এভাবে হাজার হাজার হাফেজ তৈরি হয়েছিলেন। সকল মসজিদ হাফেযদের দ্বারা আবাদ ছিল। যেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।

এটা হল নিয়ম। রাষ্ট্র এবং সরকার যে কাজের দায়িত্ব বহন করবে, যে কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, সে কাজ চালু থাকে। জনসাধারণ সবাই আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে নেয়। খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল দীন। এজন্য এসব দায়িত্ব আমীরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বাদশাহ যখন ধর্মকর্ম মেনে চলবেন, তখন প্রজাসাধারণ দীন মেনে চলবেন। দীন প্রসার লাভ করবে, যে পর্যন্ত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল দীন প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করছিল। আর খেলাফতের ত্রিশ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীর উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন ছিল। এশিয়া ও অর্ধেক ইউরোপ জুড়ে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছিল। যেহেতু সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দীন বিস্তার লাভ করুক। প্রসারিত হোক।

খেলাফত যুগের পর উলামা ও সুফি-সাধকদের ইসলাম প্রচার

খেলাফত ব্যবস্থা খতম হয়ে যাওয়ার পর যখন রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন ও ব্যক্তিতন্ত্রের যুগ আসে; তখন মুসলমান রাজা বাদশাহগণ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থাকেন। তাবলীগে দীনের যে দায়িত্ব ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যে সব দেশ ও অঞ্চল সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেঈনের যুগে ইসলামের পতাকা তলে এসেছিল সেসবে কোন ভুল ছিল না। তারপর রোম ও পারস্য সম্রাটদের নীতি ও ক্ষমতার মোহ, স্বৈরশাসন ও ব্যক্তিশাসন প্রাধান্য লাভ করল। মুসলমান রাজা বাদশাহগণ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। ফলে দীনের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব

এসে পড়লো উলামায়ে কেরামের উপর। তাই ইসলাম যতটা বিস্তার লাভ করেছে তা সুফী দরবেশগণের মাধ্যমেই লাভ করেছে, উলামায়ে কেরামের সীমাহীন প্রচেষ্টায় লাভ করেছে। যারা গালিচায় নয়; বরং চাটাইতে বসে থাকতেন। তাদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না, ছিল না কোনো রাজ্যও।

তাই উলামায়ে কেরামকে রাজা-বাদশাহদের দরবারে না যাওয়ার জন্য তাকিদ করা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে। তা না হলে তারাও দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন। রাজা বাদশাহদের সংশ্রব ত্যাগ করে দীন প্রচার কর। কেননা দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম প্রীতি, উন্নত আচার আচরণ ও মহৎ চরিত্রের মাধ্যমেই দীন বিস্তার লাভ করেছে। রাজ ক্ষমতার মাধ্যমে আসেনি। রাজাদের মাঝে তো কেবল ক্ষমতার লোভ ও মোহ কাজ করেছে।

রাসূল (সা.)-এর নীতি অনুসরণ করতে হবে

আমি আরজ করেছিলাম যে, দু'ধরনের মন মানসিকতা রয়েছে। এক. নবুওয়াতের মানসিকতা, দুই. রাজতন্ত্রের মানসিকতা। বাদশাহদের মন মানসিকতা হলো রাজতন্ত্রের মানসিকতা। তাদের মন মানসিকতা হল ক্ষমতার লোভ। প্রভাব প্রতিপত্তির মোহ। আর নবুওয়াতের মানসিকতা হল বিনয়, নম্রতা, ইজয عجز ও নিয়ায نیاز ।

নবীগণ সকল রাজা বাদশাহ ও মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চ মর্যাদার হয়ে থাকেন। কিন্তু তারা এ পরিমাণ অনুনয় বিনয়ও করতে পারেন, সাধারণ মানুষ যা পারেন না। রাজার রাজত্ব নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর হয়ে থাকে। তিনি নিজেকে তার এলাকায় 'আমি এই করেছি, ঐ কাজ করেছি, এ কথা বলেছি, ঐ কথা বলেছি'– বলে প্রমাণ করতে থাকেন। প্রতিটি শব্দে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পাবে, আমিত্ব প্রকাশ পাবে। আর নবীগণের কথাবার্তায় বিনয়, নম্রতা, নিজের অপারগতা ও অসহায়তা প্রকাশ পাবে। ছোটদের সঙ্গেও বিনয় নম্রতা প্রকাশ করবেন। নিজের দুর্বলতা ও অপারগতা প্রকাশ পবে।

একবার হযরত উমর (রা.) সফরে যাচ্ছিলেন। তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

وَلَا تَنْسَا نَا يَا اَخِیْ فِی دُعَائِكَ

হে আমার ভাই! তোমার দোয়াতে আমাকে ভুলে যেও না, স্মরণ রেখ।

আল্লাহু আকবার! কোথায় সরদারে দো'জাহান, আর কোথায় উমর ফারুক! তাঁর একজন খাদেম, একজন গোলাম, তাকে বলছেন– আমার ভাই! দোয়াতে আমাকে স্মরণ রেখ। এ হল চরম বিনয় ও ইজয ও নিয়াযের কথা। উভয় জগতের বাদশাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই একজন খাদেমকে বলছেন, আমাকে দোয়ায় স্মরণ রেখো। এ হল নবুওয়াতের মন মানসিকতা। আমাদের নবীর মন মানসিকতার উপরই চলতে হবে।

রাজা বাদশাহ ও রাজতন্ত্র যখন পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয় তখন আশ্রয়ের স্থল একমাত্র নবুওয়াতই হয়ে থাকে। আমরা নবুওয়াতের সামনে যে পরিমাণ আশ্রয় নিব সে পরিমাণ আমাদের নৈতিক উন্নতি হবে। ইলম ও মারেফত লাভ হবে। আমাদের কাজকর্ম সৎ ও মহৎ হবে। এজন্য নবীগণের তালিম ও তরবিয়াত গ্রহণ করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা উচিত। ঐ ইলম হাসিল করা উচিত। এ সকল স্বভাব চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী নিজের মধ্যে পয়দা করা দরকার। এর ফল দাঁড়াবে এই– দুর্বল সবল হয়ে যাবে। নিরীহরা প্রভাবশালী হয়ে যাবেন। মজলুম ন্যায় বিচার লাভ করবে। নবীর পথ অনুসরণ করার এই হল ফল। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

তাই আমি এ কয়েকটি কথা আরজ করলাম। যেন দীনি ফায়দা লাভ হয়। আর দুনিয়ার জটিল সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানেরে একই পথ, আর তা হল নবীদের পথ। একথাই বলা হয়েছে–

أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الأَرْضِ.

আমাদের পথ অনুসরণ করলে দুর্বলকে শক্তিশালী করে দেয়া হবে। প্রভাব প্রতিপত্তিহীন হলে প্রভাবশালী করে দেয়া হবে। [কাছাছ : ৫]

পঠিত আয়াতের আলোকে আমি কয়েকটি কথা আরজ করলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম, মহিলা সমাজকেও সভায় উপস্থিত করা হয়েছে। তাই নারীদের সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করা হলো। তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ সচেতন থাকা দরকার। তাদের অধিকারকে যেন পদদলিত করা না হয়। আর নারীদের কর্তব্য হলো, তারা যেন স্বামীদের হক পদদলিত না করেন। তাহলে পরিবার ও সমাজ সঠিকভাবে এগুতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও আপনাদেরকে নেক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমাদের অবস্থা সুন্দর ও সঠিক করে দিন। আমাদের ইহ ও পরকাল দুরস্ত করে দিন। আমীন।

اللهُمَّ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ اَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَاَصْحَابُ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْ حَمَ الرَّا حِمِيْنَ.

বয়ান : ৪

জ্ঞানের সুফল

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এমন যুবক শ্রেণী গঠন করা যারা রক্ত-মাংস ও বংশ হিসাবে ভারতীয় হবে, আর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা আরবীয় হবে ও ইসলামী হবে। হতে পারে কেউ হবে চীন দেশের, কেউ ভারতের। এভাবে কেউ ইরানী, তুরানী, মিসরী, হিজাযী হোক– যে কোন অঞ্চলের হোক, সকলের অন্তর হবে এক ও অভিন্ন। সকলের অন্তর হবে ইসলামী। তাদের অন্তরে থাকবে ঈমান, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّـــابَعْدُ:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ oخَلَقَ الإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ o اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ o عَلَّمَ الإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ oكَلاَّ إِنَّ الإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰ o أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَىٰ o إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰo صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

সামান্য আত্মপরিচয়

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এইমাত্র শ্রদ্ধেয় বুযুর্গগণ আমার পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কথা, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং তার প্রতিষ্ঠাগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আসলে পরিচিতি বর্ণনা করার যোগ্য কোন বিষয় যদি থেকে থাকে, তাহলে তা হল দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এখানকার উলামায়ে কেরাম। আমার মত অধমের কোন যোগ্যতা নেই যে, পরিচিতি বর্ণনা করা হবে এবং সে পরিচিতি আপনাদের সামনে পেশ করা হবে। এক্ষেত্রে আমার পরিচয় এটুকুই যথেষ্ট যে, দারুল উলুমের সঙ্গে আমার খেদমতের সম্পর্ক রয়েছে। আসলে পরিচিতির যোগ্য হল এই প্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পবিত্র জামাত। এ জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণেই আমার নাম উচ্চারণ করা হয়। যদি এ দলের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে আমরা উল্লেখযোগ্য হওয়ার কিছুই না। আপনারা উস্ত াদ কবি গালিবের নাম শুনে থাকবেন। তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা উঁচু মানের ও অদ্বিতীয় ছিল। রাজ দরবারের কবি ছিলেন তিনি।

মোগল দরবারের সর্বশেষ বাদশাহ ছিলেন জাফর। তিনি নিজের সম্পর্কে একটি কথা বলেছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। তিনি বলেন–

بنا ہے شاہ کا ملازم پھرنے ہے اترنا ☆ وگرنہ شہر میں غالب اِبرو کیا ہے

রাজকর্মচারী হয়ে গেছো। তাই মানুষ সম্মান করে। যদি নিজেকে রাজকর্মচারী থেকে আলাদা করে নাও, তাহলে শহরে তোমার কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই; কেউ জিজ্ঞেসও করবে না।

এ অবস্থা আমাদের ও দারুল উলুম দেওবন্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানকার বুযুর্গানের গোলাম ও খাদেম হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এজন্যই মানুষ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। যদি এ সম্পর্ক না থাকে তাহলে আমাদের এমন কোন গুণ নেই, যার পরিচিতি বর্ণনা করা হবে। উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই আমাদের মধ্যে নেই। আমরা যে গর্ব করে বেড়াই, তা ঐ সকল বুযুর্গানের কারণে। সত্যিকার অর্থে আমাদের মধ্যে কিছুই নেই।

আমাদের উস্তাদ ও আকাবিরদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মাওলানা মুর্তজা হাছান সাহেব (রহ.)। তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। লাহোরের এক ভিক্ষুক অত্যন্ত অসহায় ছিলেন। তিনি লাহোরের বাজারে এ কথা বলে

বেড়াচ্ছিলেন– 'লাহোর আমার হাতের মুঠোয়, যখন ইচ্ছা পাল্টে দিতে পারি।'

দিনরাত তার একই কথা ছিল। জনসাধারণ বলতে লাগল, ফকিরের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে যে, লাহোরের মত বিরাট শহর তার হাতের মুঠোয় রয়েছে; যখন ইচ্ছা পাল্টে দিতে পারে। দেখা দরকার, তার মধ্যে কী শক্তি রয়েছে– নাকি অকারণ আস্ফালন করছে। ঐ সময় এক বুযুর্গ সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মানুষ তাকে বলল– 'জনাব! এই ফকির দিনরাত একথা বলে বেড়াচ্ছে যে, লাহোর কোন জিনিসই না; আমার মধ্যে এমন জিনিস রয়েছে, যখন ইচ্ছা লাহোরকে উল্টে দিতে পারি। আপনি দেখুন তো, সত্যিই তার কথায় কোন ক্ষমতা আছে কিনা।'

বুযুর্গ মুরাকাবায় (ধ্যানে) বসলেন। তিনি দেখলেন ফকিরের মধ্যে কোন কিছুই নেই। একেবারেই শূন্য বুলি। তার মধ্যে কোন গুণ বা কামালিয়াত নেই। তিনি আশ্চর্য হলেন। শূন্য হাতে এত বড় দাবী! তিনি চিন্তা করলেন, তা হলে ঐ ব্যক্তির পীর কেমন ছিলেন সেটা দেখা প্রয়োজন। হয়তো তার পীরের মধ্যে কোন শক্তি বা কামালিয়াত থাকতে পারে। আর তার পীরের কারণেই সে এমন আস্ফালন করছে। কিন্তু দেখা গেল তার পীরও শূন্য। তিনি আরো পেরেশান হলেন। বিস্মিত হলেন। কিসের বলে সে এত আস্ফালন করছে! তিনি আবার মুরাকাবা (ধ্যান) করলেন। এবার দেখতে পেলেন, তার দাদা পীরের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে– যখন ইচ্ছা লাহোরকে উল্টা পাল্টা করে দিতে পারেন। তিনি সবাইকে জানালেন যে, সে তার দাদা পীরের বলে এসব কথা বলছে; তার ভেতর কোন কিছু নেই।

আমরা যে গর্ব করি, যে সব কথা বলে বেড়াই, এ সবই ঐ সকল মাশায়েখ ও বুযুর্গানের বলে বলীয়ান হয়ে বলে থাকি। আমাদের মধ্যে কোন কামাল নেই। কোন শক্তি নেই। তাদের কারণেই আপনারা আমাদেরকে বলে থাকেন– অতি মহৎ ব্যক্তি, অত্যন্ত নেক ও জ্ঞানী গুণী। যদি ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে ভাল মন্দ কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কিছুই থাকবে না। আসলে পরিচিতি বর্ণনা করার যোগ্য ঐ সকল আকাবির এবং বুযুর্গানের ঐ জামাত যারা হিন্দুস্থানে দীন প্রচার করেছেন। যাদের কার্যক্রম হিন্দুস্থান অতিক্রম করে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে দারুল উলুম দেওবন্দের ফয়য পৌঁছায়নি। তাঁর সন্তানগণ পৌঁছাননি। আজ আপনাদের আফ্রিকায়ও (যে দেশ হিন্দুস্থান থেকে হাজার মাইল দূরে) দেখবেন, এখানেও দেওবন্দ ও তাঁর বুযুর্গানের আলোচক প্রশংসাকারী রয়েছেন। মাওলানা ইসমাইল সাহেব আমাদের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ। তিনি আফ্রিকার অধিবাসী। দেওবন্দী জামাতের

পরিচয় তিনিই আট হাজার মাইল পরিব্যাপ্ত করেছেন এবং তাদের ফয়য, তাদের আলো, তাদের জ্ঞান বিতরণ করেছেন। তারা এমন কোন কাজ করেছেন, যে কারণে হাজার হাজার মাইল দূরে তাদের অনুসারী রয়েছে, তাদের গুণগান প্রশংসা করছেন। এভাবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, হিজায– যেখানেই যাবেন, সবখানেই দেখতে পাবেন তাদের শাগরিদ। তাদেরই শিষ্য বিদ্যমান রয়েছেন এবং তাদের গুণ কীর্তন করছেন।

একবার আমার বার্মা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি দেখেছি, গ্রামে গঞ্জে দারুল উলুমের আমিল রয়েছেন। তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দীনি খেদমত এবং শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। একবার আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম। সেখানেও কোন গ্রাম গঞ্জ এমন নেই যেখানে দারুল উলুমের ফারেগ ছাত্র নেই। যারা হাজারো লাখো মানুষের নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শন করে চলেছেন। কোন প্রচার প্রোপাগান্ডা নেই, কোন প্রদর্শনী নেই, কিন্তু কাজ হচ্ছে; জনগণ দীনি আলো লাভ করছে। সঠিক পথের সন্ধান লাভ করছে। তাদের চেহারা, কাজকর্ম দেখে অনেক মানুষের ঈমান নিরাপদ রয়েছে। এ সকল আকাবির বিরাট কাজ করেছেন। ইলম ও জ্ঞানের একটি বিরাট ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়ে গেছেন।

দারুল উলুম সম্পর্কে হযরত নানুতবীর স্বপ্ন

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। যখন তাঁর বয়স সাত বছর, তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন (স্বপ্নটি তাঁর জীবনীতে লেখা রয়েছে)– তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাত পায়ের দশটি আঙ্গুল হতে বিশ্বের সর্বত্র ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। পানি স্রোতের ন্যায় প্রবাহমান রয়েছে। তাঁর মামা মৌলভী আবদুস সামী (রহ.) ফার্সী ভাষায় পারদর্শী এবং পরহেযগার আলেম ছিলেন। হযরত নানুতবী তাঁর স্বপ্ন মামার কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি এ স্বপ্নের তাবীরে (ব্যাখায়) বললেন– তোমার দ্বারা ইলমে নবুওয়াত বিশ্বের সবখানে বিস্তার লাভ করবে। তখন কি কেউ বুঝতে পেরেছিলেন, নানুতা একটি ছোট গ্রাম, যে গ্রামে কোন আলেম উলামা ছিলেন না। সেখানে সাত বছর বয়সের একটি ছেলে স্বপ্ন দেখেছে, এত বিরাট স্বপ্ন, বিশ্বের সর্বত্র ইলম তাঁর দ্বারা বিস্তার লাভ করছে।

হযরত যখন দারুল উলুমের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, এ হল ঐ স্বপ্নের তাবীর। বাস্তব ব্যাখ্যা, যা আপনি সাত বছর বয়সে দেখেছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দ আসলে ইলমের একটি সাগর। যে সাগর

থেকে অগণিত নদী নালা বিশ্বের সর্বখানে প্রবাহমান এবং জনগণ নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী উপকৃত হচ্ছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ ইলহামী প্রতিষ্ঠান

আমার শ্রদ্ধেয় ভাই যে বিষয়ের আলোচনা করলেন, তা হলো এই– দারুল উলুমের চৌহদ্দির মধ্যে 'মুলসরী' নামক একটি কূপ রয়েছে। এ সম্পর্কে মাওলানা রফীউদ্দীন (রহ.)-এর একটি স্বপ্ন রয়েছে। তিনি দারুল উলুমের প্রথম মুহতামিম ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি, নাম দস্তখত করাও জানা ছিল না। মাওলানা কাসেম সাহেব পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করলেন। তিনি বলেও ছিলেন, আমি লেখাপড়া জানি না, নাম দস্তখতও করতে পারি না। হযরত নানুতবী বললেন, যাই হোক, এ দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে। তিনি এসে তাঁর দায়িত্ব আদায় করতেন। মুন্সি আদেশ লিখে দিত। তিনি সিল লাগিয়ে দিতেন। দস্তখত জানতেন না। সিল দ্বারা নির্দেশাবলী জারী ও কার্যকর হয়ে যেত। এভাবে তিনি মুহতামিমের কাজ চালিয়ে নিলেন।

মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব নকশাবন্দী তরিকার বুযুর্গ। তাঁদের ঐ সিলসিলা আপনাদের এখানে আফ্রিকায়ও রয়েছে। তিনি হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনি (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন এবং তাঁর খলিফা ছিলেন হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব। তিনি দারুল উলুমের সর্বপ্রথম মুফতী ছিলেন। তাঁর খলিফা ছিলেন হযরত মাওলানা ইসহাক মিরাঠি। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। তার খলিফা ছিলেন হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব। তিনি হিজরত করে মদীনা শরীফে অবস্থান করছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর হাতে আফ্রিকার হাজারো মানুষ বয়াত হয়েছেন এবং ফয়য লাভ করেছেন। হযরত রফীউদ্দীন সাহেবের সিলসিলা আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করেছে। আপনারাও তাঁর রুহানী সন্তান। তাঁর থেকে আলাদা নন। আমি তাঁরই ঘটনা বলছি। মাওলানা বলেন, যখন আমার উপর ইহতেমামের (পরিচালনার) দায়িত্ব অর্পণ করা হল অথচ এত বড় প্রতিষ্ঠান আর আমি পড়ালেখা জানি না; আমি পেরেশান ছিলাম, আমি কীভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করব! আমার মধ্যে কি শক্তি আছে? ইলম ও জ্ঞান তো শূন্যের কোটায়। যদি মূর্খ অশিক্ষিতদের দায়িত্ব দেয়া হত, তাহলে এক কথা ছিল যে, জাহেল ব্যক্তি অন্য জাহেলদের পরিচালনা করছে। কিন্তু এখানে উলামায়ে কেরামদের পরিচালনা করতে হবে। আর মুনতাজিম (ব্যবস্থাপক) এমন যিনি লেখাপড়া কিছুই জানেন না। মাওলানা পেরেশান ছিলেন, কিভাবে

দায়িত্ব আদায় করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইলমে লাদুন্নী দান করেছিলেন। তাহলে অক্ষর জ্ঞান ছিল না এ কথা সত্য। মাওলানা বলতেন, আমি যখন অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লাম, তখন একদিন একটি স্বপ্নে দেখি। ঐ স্বপ্নটি আপনাদের শোনানো আমার ইচ্ছা। স্বপ্নটি ছিল– দারুল উলুমের বেষ্টনিতে দারুল উলুমের মূল চৌহদ্দি ছিল মুলসরী। যেখানে দুটি চারা মাওলানা রোপন করেছিলেন। যে দিন দারুল উলুম মাদ্রাসার দালানের ভিত্তি রাখা হয়েছিল, ঐ দিন চারা দুটিও রোপন করা হয়েছিল। দারুল উলুম এবং ঐ চারা দুটি সমবয়স্ক। একই বছর একই দিনে উভয়ের জন্ম। মোটকথা, মাওলানা স্বপ্ন দেখলেন, মুলসরীতে যে পানির কূপ রয়েছে, তা দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। কূপের তীরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছেন এবং দুধ বণ্টন করে দিচ্ছেন। হাজারো মানুষ দুধ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কেউ বড় বালতি করে, কেউ মটকা ভরে, কেউ পিয়ালা করে নিয়ে যাচ্ছেন। কারো কাছে কোন পাত্র না থাকায় সে হাত দুটি একত্র করে কিছু না নিয়ে গান করছেন। মোটকথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টন করছেন, আর মানুষ স্তর ভেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

মাওলানা বলেন, স্বপ্ন দেখার পর ধ্যানে বসলাম, বিষয় কি জানার জন্য। তখন আমার কাছে প্রকাশ পেল, এ কূপ হল দারুল উলুম। আর ইলমের সুরতে মিছালী। আর ইলম বণ্টন করছেন স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাজারো মানুষ দুধ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এরা হলেন দারুল উলুমের ছাত্র। মাওলানা বলেন, শাওয়াল মাসে যখন দারুল উলুমের নতুন বছরে ছাত্র ভর্তি হন, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ দলে দলে আসতে থাকে, আমি তৎক্ষণাৎ পরিচয় করে নেই, এ ব্যক্তি সেখানে ছিল কি না। দুধ গ্রহণকারীদের মধ্যে সে ছিল কি না। কারণ প্রত্যেকের আকার আকৃতি আমার পরিচিত ছিল। এমন কি তাঁকে সকল ছাত্রের আকৃতি দেখান হয়েছিল, যারা ভবিষ্যতে দারুল উলুম থেকে জ্ঞান আহরণ করবে, ইলম হাসিল করবে। দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি রাখা হয়েছিল ইলহামের মাধ্যমে ছাত্রদের নির্বাচনও আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ছাত্রদের অন্তরে ইলহাম করা হল দেওবন্দ যাও, ইলম শিক্ষা কর। যারা দেওবন্দের কামিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হন, সবাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্বাচিত। তাঁরা ইলম হাছিল করবে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিবে। এ প্রতিষ্ঠানটি হল ইলহামী। এর ভিত্তি ইলহামের উপর।

আপনারা এখন এই ঘটনা শুনলেন। দারুল উলুমের যে মানচিত্র আগে তৈরি করা হয়েছিল। (এখন যেখানে সাহান রয়েছে) তাতে জায়গা আরো কম ছিল।

এমন অবস্থায় মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব রাতে স্বপ্ন দেখলেন। বুযুর্গানের স্বপ্ন অর্ধেক কাশফ হয়ে থাকে। আমাদের স্বপ্নের মত নয়। তাদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করে সব বস্তু দেখতে পারেন। আসলে এটা স্বপ্ন ছিল না, কাশফ ছিল। মাওলানা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করছেন এবং বলছেন, তোমরা ভিত্তি স্থাপনের জন্য যে নকশা করেছ এতে সাহান খুব ছোট হয়ে যায়। এর ফলে মাদ্রাসা ছোট হয়ে যাবে। মাদ্রাসা বড় হওয়া দরকার। এই বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাঠি দিয়ে স্থান চিহ্নিত করে দিলেন। এখন মাদ্রাসা যে স্থানে রয়েছে সেখানে লম্বা রেখা দিয়ে দিলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ পর্যন্ত সাহান হওয়া উচিত, তাহলে মাদ্রাসা প্রশস্ত হবে। সাহানও বড় হবে।'

মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব বলেন, 'আমি সকালে যখন ঐ জায়গায় গেলাম, তখন ঐভাবে চিহ্ন দেয়া ছিল, যেভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্ন দিয়ে ছিলেন এবং আমি যে চিহ্নটি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ঐ চিহ্ন অনুযায়ী দারুল উলুমের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করার প্ল্যান, ইস্টিমেটও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিত্তিপ্রস্তর ও গৃহনির্মাণের নকশা করে দেয়া হয়েছে। ছাত্র নির্বাচনও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। সব কিছু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে হয়েছে। প্রচলিত পরামর্শ দ্বারা হয়নি, যেমনটা দুনিয়ার মানুষ করে থাকেন। একত্রিত হয়ে সবাই পরামর্শ করেন। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দরকার যা সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দারুল উলুম সাধারণ নিয়মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি; বরং অদৃশ্য জগতের আলমে গায়েবের ইলহাম অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে, একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য।

দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার আসল কারণ

এর কারণ ছিল– যখন ভারতে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং সব ক্ষমতা তারা দখল করে নিল তখন তারা ইলম ও জ্ঞানার্জনের সকল পথ বন্ধ করে দিল। পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে শুরু করলো। উলামায়ে কেরামকে নানাভাবে তারা হয়রান করতে লাগল। তাদের পেছনে ছিল রাজশক্তি। আর মুসলমানরা ছিলেন অসহায় নিঃস্ব। তখন ঐসব বুযুর্গ দেখলেন, যদি দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হয়, আর দীনি শিক্ষা বিস্তার লাভ না করে

তাহলে ভারতের মাটিতে ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না। থাকতেও পারবে না। ঐ পর্যন্ত কোন ধর্ম টিকে থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত তার শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যমান না থাকে। শিক্ষা দ্বারাই দীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কোন ধর্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি যদি বিলীন হয়ে যায় তাহলে ধর্ম বিলোপ হয়ে যাবে এবং ধর্মের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। এসব বুযুর্গ অনুভব করলেন, একটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার। এ কারণেই দারুল উলুমের ভিত্তি স্থাপন করা হল।

ভারতে যখন প্রথম বিপ্লব শুরু হয়, তখন কি অবস্থা ছিল? তখন সাধারণভাবে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের অন্তরে ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল। তারা বুঝতেন ইংরেজ আমাদের দেশকে ধ্বংস করেছে। আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। কিন্তু তারা সফলকাম হতে পারেনি। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই গেছে; বরং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তাদের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদরা চিন্তা-ভাবনা করে এই পথ আবিষ্কার করলেন– যে পর্যন্ত এদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করা না যাবে, সে পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষ থাকবে। সুতরাং ঘৃণা দূর করতে এমন চেষ্টা করতে হবে যাতে এদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করে দেয়া যায়। আর মন-মস্তিষ্ক পরিবর্তন হয় শিক্ষার মাধ্যমে। তখন থেকে স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল, যাতে মুসলমানদের মন-মগজ থেকে ঐ গুণটি বের করে দেয়া যায়– যে মহৎ গুণটি ইসলামী শিক্ষার কারণে তাদের মন-মগজে পয়দা হয়েছিল। লর্ড মেকালে শিক্ষা স্কীম নিয়ে ভারতে এলেন এবং ঘোষণা করলেন :

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এমন যুবক শ্রেণী তৈরি করা, যারা রক্ত মাংসে রং ও বংশে ভারতীয় হবে, আর মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ।

তিনি যেন ভারতবাসীকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)সহ সকল বুযুর্গানে দীন দেখতে পেলেন, যদি এ শিক্ষা ব্যবস্থা এককভাবে চালু হয়ে যায় এবং বিস্তার লাভ করে, তাহলে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং ইংরেজদের তাহযিব তামাদ্দুন এত প্রসার লাভ করবে যে সবদিক দিয়ে ইসলামকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তখন তাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ঘোষণা করেন–

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এমন যুবক শ্রেণী গঠন করা যারা রক্ত-মাংস ও বংশ হিসাবে ভারতীয় হবে, আর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা আরবীয় হবে ও ইসলামী হবে। হতে পারে কেউ হবে চীন দেশের, কেউ ভারতের। এভাবে কেউ ইরানী, তুরানী, মিসরী, হিজাযী হোক– যে কোন অঞ্চলের হোক, সকলের অন্তর

হবে এক ও অভিন্ন। সকলের অন্তর হবে ইসলামী। তাদের অন্তরে থাকবে ঈমান, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এমন এক বন্ধন, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদের এক কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত ও একত্রিত করে দিতে পারে। রঙ ও নসল, রক্ত মাংস ও বংশ এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলবে না, যদি সাদা-কালোর পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। সেক্ষেত্রে পরস্পরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকবে। এগুলো সাধারণ কথা, যা আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। যদি বংশের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে এক বংশ অন্য বংশের সঙ্গে একত্রিত হয় না। যদি দেশ ও অঞ্চলের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেশ ও অঞ্চল সীমিত হয়ে থাকে। এ কারণে বাসিন্দাদের অন্তরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। মানুষের অন্তরকে একমাত্র ঐ জিনিস একীভূত করতে পারে, যা সরহদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে এত বিপুল হয় যে, সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভে সক্ষম হয়। একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জিনিস নেই যা এ কাজ করতে পারে।

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

কোন আরবের অনারবের উপর, কোন অনারবের কোন আরবের উপর কোনো ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যদি কোন শ্রেষ্ঠত্ব থেকে থাকে, তাহলে তা হবে দীন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে, ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহভীতির মাপকাঠিতে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بُعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ

আমি কালো ও লোহিতের জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমার নজরে উভয়ে সমান মর্যাদার অধিকারী।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আমি আরব অনারব, হিন্দী সিন্ধী, ইরান তুরান সবার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

আল্লাহ তায়ালা আদেশ করলেন– হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি মানব জাতির জন্য, সকল গোত্র, সকল খান্দানের জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। ইসলাম সকলকে সকল বর্ণ ও গোত্রকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করেছে। [আরাফ : ১৫৮]

এ কারণেই বলা হয়েছে– দূর প্রাচ্যে যদি একজন মুসলমান অবস্থান করে তাহলে তার কষ্ট অনুভব করবে ঐ মুসলমান যে পাশ্চাত্যের অপর প্রান্তে বসে রয়েছে। যেহেতু উভয়ের মধ্যে ইসলামের বন্ধন রয়েছে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। যদি ভৌগোলিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়, তাহলে ইরানের সঙ্গে তুরানের কি সম্পর্ক? ভারতীয়দের সঙ্গে আফ্রিকাবাসীর কি সম্পর্ক? আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে আরব ও হিজাযবাসীর সম্পর্ক থাকার কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু যদি ইসলামের বন্ধন থাকে, তাহলে হিন্দী সিন্ধী সব এক। আফ্রিকা, আমেরিকা সব এক। হিন্দুস্থান পাকিস্তান সব এক। যেহেতু সম্পর্ক ও আত্মীয়তা এক ও অভিন্ন। এ সম্পর্ক যে পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে মুসলমানগণ এক অভিন্ন থাকবেন, মুত্তাহিদ থাকবেন। যখন এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন দলাদলি বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিবে, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ অনিবার্য হয়ে পড়বে। সার কথা, বিশ্বে অনেক ভৌগোলিক সীমারেখা রয়েছে। ইসলাম এসবকে নির্মূল করে সকলকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করেছে। ভাই ভাই করে সংগঠিত করেছে।

নবীর শিক্ষা গ্রহণ না করায় বনি ইসরাইলের পরিণতি

এই আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বনি ইসরাইলের একটি ঘটনা মনে আসলো। এটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে–

يَـٰبَنِى إِسْرَٰٓءِيلَ اذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ.

হে বনি ইসরাইল! আমার নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, যেগুলো আমি তোমাদের দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [বাকারা : ৪৭]

বনি ইসরাইল তাদের যুগে সম্মানের শীর্ষে ছিলেন। তাদের চেয়ে সম্মানী আর কেউ ছিল না। হাজারো নবী পয়গাম্বর বনি ইসরাইল খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সব কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু যখন ধন-দৌলতের প্রাচুর্য এসে গেল, তখন ভোগ-বিলাসের দিকে তাদের মন মস্তিষ্ক আকৃষ্ট হয়ে গেল। ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাফলত, অলসতা ও

উদাসীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে অনুপাতে হীন অবস্থা ও যিল্লত এসে যায়। বনি ইসরাইল এসব রোগে আক্রান্ত হল। এসব অপকর্মে লিপ্ত হল। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ভোগ-বিলাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। পাপাচার, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি সব ধরনের অপকর্ম শুরু করে দিল। সে যুগে হযরত দানিয়াল (আ.) নবী ছিলেন। তিনি ওয়াজ নসীহত এবং উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন–

হে লোক সকল! গাফলত ও উদাসীনতা ত্যাগ কর। গাফলতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ! জাতি ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে, পরবর্তী বংশধররা বরবাদ হবে, ধ্বংস হবে। তোমাদের সাময়িক ভোগ-বিলাসের কারণে উত্তরাধিকারীরা নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে। নিজেদের প্রতি দয়া কর। ভোগ বিলাস ত্যাগ কর। এ ধন-সম্পদকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ব্যয় কর। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করো না। আল্লাহর নির্দেশ মতো ব্যয় কর। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা অনুযায়ী ব্যয় না করলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে না।

তবে কোন জাতি বা সম্প্রদায় যদি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে যায়। তখন তারা বুঝতে পারে না ভবিষ্যৎ কি ও কেমন এবং তারা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ছিল বনি ইসরাইলের অবস্থা। ভোগ-বিলাসের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তারা! পরিশেষে এসব অপকর্মের ফল প্রকাশ পেল। বাদশাহ বুখতে নসর তাদের ঘাড়ে চেপে বসল। সে ইরাকের বাদশাহ ছিল। মূর্খের পূজারী ছিল। তার মধ্যে লেশমাত্র তাওহিদ ছিল না। তাওহিদবাদীদের তাওহিদ যখন বেরিয়ে যায়, আর যখন পাপাচার বৃদ্ধি পায় তখন অন্তরে প্রাণ থাকে না। তখন কাফের ও মুশরেকরা তাওহিদপন্থীদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। তা না হলে যে পর্যন্ত তাওহিদ অন্তরে থাকবে, তাদের আত্মার শক্তি এত বেশি থাকবে যে, দুনিয়ার কোন জাতি কোন সম্প্রদায় তাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। যখন নিজেদের মধ্য থেকে তাওহিদ ও ঈমানের প্রাণ ও শক্তি বেরিয়ে যায়, তখন অন্যরা তাদের উপর বিজয় লাভ করে। বুখতে নসর বাদশাহ বীর বিক্রমে ইসরাইলীদের উপর আক্রমণ করল এবং সত্তর হাজার ইসরাইলীকে হত্যা করল। নারীদের হত্যা করল এবং তাদের পেট থেকে বাচ্চা বের করে বর্শার মাথায় বিদ্ধ করে রাখল। তাওরাতের পৃষ্ঠাগুলোকে জুতা দিয়ে দলিত করল। বায়তুল মুকাদ্দাসে মল-মূত্র ইত্যাদি নাজাছাত ঢালা হল। সত্তর হাজার ইসরাইলীকে বন্দী করে দাস-দাসীতে পরিণত করে বাগদাদ নিয়ে গেল। ফিলিস্তিন দখল করে নিল। লাখ লাখ মহিলার মান সম্মান হরণ করল। লাখ লাখ শিশু হত্যা করল। যে সত্তর

হাজারকে বন্দী করে নিল, এদের মধ্যে হযরত দানিয়াল (আ.)ও ছিলেন। তাঁকেও বাঁধা হল।

হযরত দানিয়াল (আ.) বললেন– 'আমি আজকের এ ভয়ানক দিন সম্পর্কে তোমাদেরকে অনেক দিন আগে থেকে সাবধান করছিলাম। তোমরাও ধ্বংস হলে, আমাকেও ধ্বংস করলে। এবার বনি ইসরাইলের হুশ হল। তারপর তওবা করতে লাগল; কিন্তু এখন তওবা করলে কি হবে? তওবার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

اب کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت...

চড়ুই পাখি ফসল খেয়ে ফেলার পর এখন কি হবে? চড়ুই চাউল খেয়ে ফেলেছে, এখন ভূষি খেয়ে থাক।

কিন্তু নবীগণের দয়া উম্মতের প্রতি মাতা-পিতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। তাই কোন সম্প্রদায় যখন তওবা করে ফিরে আসে, তখন তাদের প্রাণ বিগলিত হয়ে যায়, মন কেঁদে উঠে এবং আগের চেয়ে বেশি দয়া ও করুণা প্রকাশ পায়। বেড়ে যায় তাদের দয়া ও কল্যাণ কামনা।

বললেন– আচ্ছা, আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি। আমার চেষ্টা থাকবে আল্লাহ তায়ালা যেন তোমাদেরকে বন্দীদশা থেকে বের করে আগের মতো উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেন। সত্তর হাজার বন্দীকে বাগদাদের বিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হল এবং তাদের দিয়ে দাসের কাজ নেয়া হত। যেহেতু প্রাচীনকালে দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য বর্তমান আধুনিক যুগের কারাগারের ন্যায় কোন ব্যবস্থা ছিল না। বন্দীদের এ ক্লাস, বি ক্লাস ছিল না। সে যুগে অন্ধকার কূপে বন্দীদের নিক্ষেপ করা হত। অর্ধেক আটা ও অর্ধেক বালু দিয়ে রুটি তৈরি করে দেয়া হত। খাবারের অভাবে এবং কীট-পতঙ্গের দংশনে মানুষের অকাল মৃত্যু হতো। সে যুগে কোন ব্যরাক ছিল না। সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। হযরত দানিয়াল (আ.) নবী ছিলেন। তাঁর চেহারায় নবুওয়াতের জ্যোতি। ইবাদত, যুহদ (দুনিয়া বিরাগ), বন্দেগির নিদর্শন দেখে জেল সুপার তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শুরু করে দিলেন।

মানুষ কাফের হোক অথবা মুসলমান, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা নূর (জ্যোতি) দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ হক ও বাতিল, সত্য মিথ্যার প্রভেদ করতে পারে। স্বজনপ্রীতির কারণে যদি গ্রহণ না করে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তার অন্তরাত্মা মেনে নেয় এই সত্য ও সঠিক পথ। হযরত দানিয়াল

(আ.)-এর মর্যাদা, ইবাদত, যুহদ, অল্পেতুষ্টি এবং অন্যান্য বরকত জেল সুপার নিজের চোখে দেখতে পেলেন। এদিকে বনি ইসরাইলের শুভবুদ্ধির উদয় হল। ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার কারণে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অবশিষ্ট নেই। তাই তারাও দিনরাত ইবাদতে ব্যস্ত। এখন কারাগারও ইবাদতগাহের রূপ ধারণ করল। সবখানে আল্লাহ তায়ালার যিকির হচ্ছে। কারাগারে যত কর্মচারী ছিল, সবাই ভক্ত হয়ে গেল এবং সকলের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পেতে লাগল। এদিকে হযরত দানিয়াল (আ.)-এর দোয়া জারী– হে আল্লাহ! এদেরকে নাজাত দাও, মুক্তি দাও। শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভের ব্যবস্থা হতে লাগল।

বনি ইসরাইলের পুনরায় সহজে রাজ্য লাভ

ব্যবস্থা হল এভাবে– বাদশাহ বুখতে নসর একটা স্বপ্ন দেখলেন। দেখার পর তিনি কি দেখেছিলেন সেটা ভুলে গেলেন। তবে এটুকু স্মরণ ছিল যে, স্বপ্নটা ভয়ানক ছিল। তাই তার অন্তরে ভয়ভীতি ও পেরেশানী ছিল। তার দরবারের গণকদের ডেকে একত্রিত করে বললেন– আমার স্বপ্নের তাবির ব্যাখ্যাটি কি, বল! তারা বললেন– স্বপ্নটা কি তা বলেন। তিনি বললেন– স্বপ্ন আমি ভুলে গেছি। তারা বলল, তা হলে কিসের তাবির বলব। তিনি বললেন– আমি লাখ লাখ টাকা তোমাদের জন্য ব্যয় করেছি। তোমরা গায়েব জান বলে দাবি কর। এত যখন জান, তাহলে কি আমার একটি স্বপ্নের বিষয়বস্তু বলতে পার না! তাহলে তোমরা কিসের গায়েব জান? তিন দিনের মধ্যে বলে দাও, নইলে তোমাদের খান্দানসহ ধ্বংস করে দিব। গণকরা মহাবিপাকে পড়লেন! মাত্র তিন দিনের সময়। তারপর না বলতে পারলে তাদের পরিবার পরিজন সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তারা তো নিজের মন গড়া প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে আসছেন। গায়েব তাদের জানা ছিল না। পয়সা হাসিলের জন্য এসব উক্তি ও দাবী ছিল। সময়ে তাদের সকল গোমর ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। এ সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে হযরত দানিয়াল (আ.) জানতে পারলেন।

হযরত দানিয়াল (আ.) জেল সুপারের কাছে গেলেন। বললেন– বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছেন। তার স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাবির আমার জানা আছে। তুমি গিয়ে বাদশাহকে জানিয়ে দাও। বাদশাহ যেন আমাকে নিয়ে যান, আমি তাবিরসহ তার স্বপ্ন বলে দিব। আর একথাও বলে দিলেন, আমি এজন্য বলছি, এতে আমার মঙ্গল ও উপকার রয়েছে। তোমারও মঙ্গল ও উপকার রয়েছে। তুমি বলবে, আমার বন্দীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে আপনার স্বপ্ন ও

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে। বাদশাহ পেরেশান আছে। কেননা তিনি স্বপ্ন ভুলে গেছেন। তাই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। তুমি তাড়াতাড়ি যাও। আমার উপকার হবে এই– আমি মুক্ত হয়ে যাব এবং আমার স্বজাতির মুক্তির জন্য আমি চেষ্টা করব। আর তোমার উপকার হবে এই– বাদশাহকে যখন চিন্তামুক্ত করে দিবে তখন তোমার পদোন্নতি হবে, সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে উভয়ের উপকার রয়েছে।

জেল সুপার খুশি হলেন। তাছাড়া আগে থেকেই তো তিনি তাঁর ভক্ত ছিলেন। অদৃশ্য জানার কথা শুনে তার ভক্তি আরো বহুগুণ বেড়ে গেল।

জেল সুপার বললেন– আমি জানি, জগতে বাদশাহের স্বপ্ন বলতে পারে, এমন যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে তা আপনিই হবেন। কিন্তু সত্য বলুন, আপনি জানেন তো? অথবা এমনিই কোন কিছু বলে দিবেন! যদি কথা সত্য ও বাস্তব না হয়, তাহলে আমাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আপনাকেও তা করা হবে। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক এবং বল যে, আমি স্বপ্নটিও জানি, তাবিরও জানি।

জেল সুপার আনন্দিত হয়ে দ্রুত গিয়ে বাদশাহকে সংবাদ দিলেন– 'হুযুর! আপনি যে পেরেশানিতে আছেন, স্বপ্ন দেখে ভুলে গেছেন। আমার বন্দীদের মধ্যে একজন অতি বুযুর্গ। আমি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বুযুর্গী প্রত্যক্ষ করছি। এমন মানুষ আমি আর দেখিনি। তিনি আপনার স্বপ্ন ও স্বপ্নের বিশদ ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।'

: সত্যিই সে আমার স্বপ্নের বিষয়বস্তু জানে? বাদশাহ বললেন, 'তাহলে যাও, ত্বরা তাকে হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি খুলে দাও এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার দরবারে নিয়ে আসো। সে যদি আমার স্বপ্ন বলতে পারে, তাহলে তোমার অনেক পদোন্নতি হবে, তোমার বেতন বাড়িয়ে দেয়া হবে।'

নবীর ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত হবে বলে জেল সুপার আনন্দিত হয়ে নেচে নেচে আসছিল। তার দেমাগ তখন আকাশেরও ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। জেল সুপার এসে হযরত দানিয়াল (আ.)-এর হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি সব কেটে দিলেন এবং পরনের জন্য পেশ করলেন উত্তম পোশাক। এ পোশাক পরিধান করে আমার সঙ্গে চলুন! আমার অনেক উন্নতি হয়েছে। আপনি আমার অনেক কিছু করে দিয়েছেন। নবী বললেন– শুধু তোমারই নয় আমারও সব কিছু ঠিক হবে।

হযরত দানিয়াল (আ.) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। বাদশাহর দরবারে উযির নাযির, মন্ত্রীবর্গ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, জ্ঞানী গুণী, গণক,

জ্যোতিষী সবাই উপবিষ্ট। তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। আমাদের জীবন রক্ষা হয়ে যাবে। নতুবা তৃতীয় দিন সবাইকে হত্যা করা হতো। বাদশাহর স্বপ্ন জানার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সবাই দরবারে উপস্থিত।

হযরত দানিয়াল (আ.) তাঁর ধর্মের নিয়ম অনুসারে বাদশাহকে সালাম করলেন। বাদশাহ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে তার নিকটে বসালেন। তার অন্তর পেরেশান, মন অস্থির। সঙ্গে সঙ্গে দরবার বরখাস্ত করলেন এবং নির্জনতার ব্যবস্থা করলেন। হযরত দানিয়াল (আ.), বাদশাহ এবং জেল সুপার– এ তিন জন থেকে গেলেন। কথা সত্য সঠিক হলে জেল সুপারের পদোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি হবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে প্রথম তার গর্দান কাটা হবে। মিথ্যা সংবাদ দিল কেন?

বুখতে নসর বাদশাহ হযরত দানিয়াল (আ.)কে বললেন– 'সর্বপ্রথম আপনাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হলো আমার দরবারে নিয়ম, যে ব্যক্তি আমার দরবারে আসবে, আমাকে সেজদা করবে। আপনি আমাকে সেজদা করেননি কেন? আপনি আপনার ধর্মানুযায়ী আমাকে সালাম করেছেন। অথচ আমার দরবারের নিয়ম হল সেজদা করা। আপনি সেজদা করেননি কেন?

নবীদের বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ থাকে

হযরত দানিয়াল (আ.) পয়গাম্বর। পয়গাম্বরগণ যেমন আরিফ (খোদার পরিচয় লাভকারী) ও কামিল হয়ে থাকেন, তেমনি পূর্ণাঙ্গ আলেম (জ্ঞানী) ও আকিল (বুদ্ধিমান)ও হয়ে থাকেন। পয়গাম্বরের বুদ্ধি এত উন্নত হয়ে থাকে যে, যদি সমগ্র উম্মতের জ্ঞান, বুদ্ধি এক সঙ্গে করা হয় তবুও পয়গাম্বরের বুদ্ধি অনেক বেশি হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুদ্ধি সম্পর্কে অনেক কিতাব রচনা করা হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহনকারী ঘটনাবলী একত্র করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সাইয়েদুল আম্বিয়া, নবীদের সরদার– যাঁর নবুওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বুদ্ধিও সর্বোত্তম, সকল নবীর চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুদ্ধি অনেক বেশি ছিল। উম্মতের সকল জ্ঞানী, গুণী বুদ্ধিমানগণ যদি সমবেত হন, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুদ্ধি, তাদের সকলের চেয়েও বেশি, উত্তম ও উন্নত হবে। এজন্য ওহী অবতরণের আগেই অনেক বিষয় তাঁর বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে দিয়েছেন।

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হল। আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল!

আমার প্রতিবেশী আমাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। এতে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। আমি তাকে অনেক খোশামোদ করেছি, অনেক অনুরোধ, উপরোধ করেছি। কিন্তু সে এমন অনিষ্টকারী যে, দিনরাত আমার অনিষ্ট করে চলেছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি করতে পারি? আমি সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে পড়েছি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমি তোমাকে তদবীর (কর্মপন্থা) বলে দিচ্ছি। তুমি তোমার ঘরের সব আসবাবপত্র বের করে রাস্তার উপর রেখে দাও এবং আসবাবের উপর বসে থাক। যে কেউ জিজ্ঞেস করবে, তুমি ঘর ছেড়ে রাস্তায় সব সামান নিয়ে এভাবে বসে আছ কেনো? তখন উত্তরে বলবে, প্রতিবেশীর যন্ত্রণা ও অনিষ্টতার কারণে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঘরবাড়ি ছেড়ে দাও, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

লোকজন আসলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন– ঘর ছেড়ে দিলেন কেন? আসবাবপত্র রাস্তায় কেন? অথচ ঘর বিদ্যমান রয়েছে। সে বলল, ভাই কি করি? প্রতিবেশীর দেয়া কষ্ট ও অনিষ্ট সাধন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর-দরজা ছেড়ে দেয়ার জন্য বলেছেন। কোন ব্যক্তি এ ঘটনা শুনামাত্র সেই প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে শুরু করে। পবিত্র মদীনা নগরীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজারো লানত হাজারো অভিশাপ বর্ষিত হলো। চারদিকে যেন অভিশাপের তাসবীহ পাঠ করা হলো। অনিষ্টকারী প্রতিবেশী অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে বাধ্য হয়ে, অপারগ হয়ে করজোড়ে নিবেদন করল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ঘরে প্রত্যাবর্তন কর। আমার জীবন ধ্বংস তাবাহ হয়ে যাচ্ছে। আমি ওয়াদা করছি, জীবনে কোনদিন তোমাকে কষ্ট দিব না। তোমার অনিষ্ট করব না। বরং তোমার খেদমত, সেবাযত্ন করব। এখন ঐ ব্যক্তি কৌতুক শুরু করল। 'ভবিষ্যতে আর করবে না তো? সত্যি করে বল।' সে শপথ করে বলল, কখনো কষ্ট দিব না, অনিষ্ট করব না। তাছাড়া নিজের হাতে সকল মাল সামান ঘরে নিয়ে দিল এবং প্রতিদিন কষ্ট দেয়ার পরিবর্তে খেদমত করতে শুরু করল।

তদবীর ফলপ্রসূ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তদবীর নিজের বুদ্ধি দ্বারা বলেছিলেন। ওহী দ্বারা বলেন নি। নবীগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমানও হয়ে থাকেন। তাদের বুদ্ধির তুলনায় অন্যদের বুদ্ধি মূল্যহীন। এর কারণ হলো খোদার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত হওয়ার নাম আকল বুদ্ধি। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক হলে, আত্মা ও রূহের পথ সরল, সোজা ও মুস্তাকিম হবে। বুদ্ধি বলে যে, কোন বিষয়ের শেষ পরিণতি কি হবে?

মানুষ শুরুতে বুঝতে ও অনুমান করতে পারে। আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন লোক এমন হতে পারে না। বরং চালাক, ধূর্ত, প্রতারক হতে পারে। ধূর্ত হওয়া ও বুদ্ধিমান হওয়া পৃথক পৃথক জিনিস। ধূর্তরা প্রতারণা ও ধোকাবাজি করে থাকে প্রতারণার মাধ্যমে, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। বুদ্ধিমান কাউকে ধোকা এবং প্রতারণা করে না। সরলভাবে বিষয় নিষ্পত্তি করে দেয়। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নবীদের চেয়ে বেশি অন্য কারও হতে পারে? তাঁদের চেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধি অন্য কারো হতে পারে না।

হাদীসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল, তখন এ যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য ছিল এক হাজার। আর মুসলমান সৈন্য ছিল তিনশ' তেরোজন মাত্র। কিন্তু কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা মুসলমানদের অজানা ছিল। যখন যুদ্ধের জন্য তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন শত্রুদের সংখ্যা কত? এটি মুসলমানদের জানা ছিল না। পরে অবশ্য জেনেছেন। তখন মুশরিকদের এক ব্যক্তি পথ হারিয়ে মুসলমানদের ক্যাম্পে এসে পড়ল। সাহাবাগণ তাকে বন্দী করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'বল তোমাদের সৈন্যসংখ্যা কত?' এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের শক্তি, সামর্থ্য কি পরিমাণ তা বুঝা। সাহাবাগণ তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। ঐ ব্যক্তি চালাক এবং তাঁর সৈন্য দলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাই সে প্রকৃত সংখ্যা না বলে বরং এভাবে বলল, والله لكثير আল্লাহর কসম! অত্যন্ত বিরাট বাহিনী...।

সাহাবাগণ তাকে কষ্ট দিতে লাগলেন, প্রহার করতে লাগলেন, সঠিক সংখ্যা জানার জন্য সব কিছু করলেন। কিন্তু সে বলেনি; বরং বার বার والله لكثير বলতে থাকল।

এসব আওয়াজ ও সুর শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাবু থেকে বের হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ আওয়াজ কি ও কেন? উত্তর দেয়া হল– 'শত্রুদের একজন আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। সাহাবীগণ তার কাছে তাদের সৈন্যসংখ্যা জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু সে তা বলছে না।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কষ্ট দিচ্ছ কেন? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

তাকে আনা হল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে এদিক সেদিকের কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এ কথা জিজ্ঞেস করলেন না যে, তোমাদের সংখ্যা কত? বরং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সৈন্য দলের গোশত রান্না হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই? সে বলল– হ্যাঁ, দৈনিক হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দৈনিক কয়টা উট জবাই করা হয়? সে বলল, দশ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– সংখ্যা জানা হয়ে গেছে। তাদের বাহিনীতে এক হাজার মানুষ রয়েছে। এজন্য যে, একটা উটের মাংস একশ' জন মানুষ খেতে পারে। সব সাহাবী অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প সময়ের মধ্যে কথা উদ্ধার করে নিলেন। এটা ওহী দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা করেছিলেন।

নবীগণের দীন ও ইলম যেমন কামেল ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে তেমনি তাদের বুদ্ধি বিবেচনাও পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কোন বুদ্ধিমান তাঁদের মোকাবেলা করতে পারে না। তাঁদের বিবেক বুদ্ধির উপর ওহীর ভিত্তি রাখা হয়। যদি তাঁদের বিবেক বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ না হয়, তাহলে এত ভারী ইলম বহন করবেন কেমন করে? কোন উস্তাদের সামনে যদি দু'জন ছাত্র থাকে, একজন বুদ্ধিমান অপরজন বোকা ও নির্বোধ আর উস্তাদ উভয়ের সামনে কোন মাসআলার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে বুদ্ধিমান ছেলে উস্তাদের বর্ণনা থেকে অধিক জ্ঞান লাভ করবে। আর বোকা ছেলেরা আগে যা ছিল, তাও শেষ করে বাড়ি ফিরবে। বুদ্ধি বিবেচনা অনুপাতে মানুষ ইলম হাসিল করতে পারে। আম্বিয়ায়ে কেরামের বুদ্ধি যদি পরিপূর্ণ না হতো তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের স্থান কোথায় হতো? তাঁদের মাথা তা বহন করবে কেমন করে? শরীয়তের উপর আমল কিভাবে করতে হবে– তা নবীদের তবিয়ত (প্রকৃতি)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। শরীয়তের সকল ইলম নবীদের বুদ্ধির উপর অবতীর্ণ হয়। এজন্য তাঁদের ইলম চার গুণ বেশি থাকে। যেমন তাঁদের বিবেক বুদ্ধি অন্যদের তুলনায় চার গুণ বেশি থাকে। তাঁদের আমল শক্ত ও মজবুত হয়। কেননা সত্য সঠিক আমল তাঁদের তবিয়ত ও স্বভাব প্রকৃতির চাহিদা, নবীদের প্রকৃতি মন্দের দিকে যেতে পারে না। তবিয়তের উপর শরীয়ত ও বুদ্ধির উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। এজন্য তাঁদের ইলমও পরিপূর্ণ থাকে। দীন ও আমল পরিপূর্ণ থাকে।

আমি হযরত দানিয়াল (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলছিলাম। বুখতে নসর প্রশ্ন করলেন, আপনি আমার আইন অনুযায়ী আমাকে সেজদা করলেন না কেন? হযরত দানিয়াল নবী যেমন পরিপূর্ণ আলেম ও আমেল তেমনি পরিপূর্ণ বুদ্ধিমানও। সুবহানাল্লাহ! কি চমৎকার উত্তর দিলেন! বললেন– আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সেজদা করা বর্জন করেছি। এতে আপনারও উপকার আমারও উপকার। যদি আমি সেজদা করে নিতাম তাহলে আপনিও মরে যেতেন, আমিও মারা যেতাম।

বাদশাহ বলল– এ আবার কেমন কথা, সেজদা করা হয় আমার সম্মানার্থে।

আমি মারা যাব কেন?

হযরত দানিয়াল (আ.) বললেন, এর কারণ রয়েছে। আমার রব আমার প্রভু। তিনি আমাকে ইলম দান করেছেন, সত্য ও সঠিক কথা বলতে বলেছেন। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে বলেছেন। আপনার স্বপ্নের ইলমও আমাকে তিনিই দিয়েছেন। আমার মনে আপনার স্বপ্ন রয়েছে কিন্তু আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত ইলমে নয়; বরং তা হল আমার প্রভুর বর্ণিত ইলম। তিনি একথা বলেননি যে, আমার ওহী আসে। একথা বললে সে বুঝে নিবে তিনি একজন নবী। আমার কাছে তাবলীগ করতে এসেছেন। যাক, আমি যদি আপনাকে সেজদা করে নিতাম, তাহলে আমার প্রভু আমার উপর অসন্তুষ্ট হতেন, আমার ইলম ছিনিয়ে নিতেন। আমার ইলম নিয়ে যাওয়ার পর আমার কোন সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা থাকত না। এভাবে আমি শেষ হয়ে যেতাম। আর আমি ছাড়া আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা অন্য কেউ ছিল না। আপনি চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। আপনি এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। তাই আমি সেজদা করলাম না। আমার ইলম বিদ্যমান থাক। আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেন আমি বলে দিতে পারি। আমিও রক্ষা পাব, আপনিও বেঁচে যাবেন, রক্ষা পাবেন।

বাদশাহ তাঁর হাত ধরে চুম্বন করলেন এবং বললেন– আপনার মত বুদ্ধিমান মানুষ আমি জগতে দ্বিতীয় জন দেখিনি এবং নিজের প্রভুর এত বাধ্য ও অনুগত খাদেমও দেখিনি, যে প্রভুর অসাক্ষাতেও তাঁর বাধ্য থেকে আনুগত্য করে চলেছে। বাদশাহ বলছিলেন– আপনার প্রভু আমাদের কারো সামনে হাজির নন। তার পরও আপনি আপনার প্রভুর এত সম্মান ও শ্রদ্ধা করছেন। অথচ আমার অবস্থা হল এই, যে পর্যন্ত আমার প্রভু সামনে না আসেন, তাকে শ্রদ্ধা করি না; বরং তার অসাক্ষাতে তাকে গালি গালাজ করতে থাকি। গাল মন্দ বলি। যখন সামনে আসেন, তখন ভয় করি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। কিন্তু প্রকৃত আবিদ (আনুগত্য প্রকাশকারী) আপনি; বরং আপনার সামনে নন, তবুও আপনার অন্তরে তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বেশি আমানতদার অন্য কাউকে আমি দেখিনি। সত্যিই কি আমার স্বপ্ন আপনি জানেন?

বললেন– হ্যাঁ, সত্যিই আমি আপনার স্বপ্ন জানি।

বাদশাহ বললেন– তার ব্যাখ্যা বলে দিন।

বুখতে নসরের স্বপ্ন

নবী দানিয়েল (আ.) বললেন– শুনুন, আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন– আসমান জমিনের মধ্যে একটি বিরাট মূর্তি রয়েছে। মূর্তির মাথা আসমানে এবং পাগুলো জমিনে লেগে রয়েছে। তার একটি কাঁধ প্রাচ্যে এবং অপর কাঁধ পাশ্চাত্যে রয়েছে। সম্পূর্ণ শূন্যলোক মূর্তি দ্বারা ভরে গেছে। আপনি বিস্মিত হয়ে দেখছিলেন। কত সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে! প্রস্তুতকারী কত নিপুণ কারিগর, কত সুন্দর শিল্পী! এত বিরাট মূর্তি, আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যলোক এ দ্বারা ভরে গেছে; বরং ঘিরে ফেলেছে।

তারপর মূর্তির অবস্থা হল এই– মূর্তির চেহারা স্বর্ণের তৈরি, বুক রুপার তৈরি, উদর পিতলের তৈরি এবং উভয় উরু তামার তৈরি, পায়ের গোছা দুটি লোহা ও শিশার তৈরি এবং পায়ের পাতা মাটির তৈরি। প্রত্যেকটি ধাতু পৃথকভাবে ঝলমল করছে। স্বর্ণ সবচে' মূল্যবান, তাই সবার উপরে। তারপর রুপা সবচে' মূল্যবান– তাই রুপা স্বর্ণের পরই রয়েছে। পিতল এর চেয়ে কম দামি, তাই এর নিচে রয়েছে। তামার মূল্য আরও কম, তাই এর পরে রাখা হয়েছে। লোহার মূল্য আরো কম তাই এর পর লাগানো হয়েছে। মাটির কোন মূল্য নেই; তাই পা বনে বসে আছে। প্রত্যেকটি ধাতু নিজ নিজ স্থানে চমকাচ্ছে।

আপনি বিস্ময়ের সঙ্গে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তারপর আপনি দেখলেন, আকাশ থেকে পাথর নিক্ষিপ্ত হলো এবং এত শক্তভাবে নিক্ষিপ্ত হল যে, মূর্তির মাথার উপর আঘাতে মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। শুধু ভেঙ্গেই যায়নি, বরং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বালুর ন্যায় হয়ে গেল এবং মূর্তির মধ্যে যত ধাতু ছিল সব একত্রিত হয়ে এক প্রাণ হয়ে গেল। স্বর্ণ স্বর্ণ থাকেনি, রুপা রুপা থাকেনি। সব কিছু একাকার হয়ে একটি বস্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখন ঐ বস্তুটিতে সব ধাতুর কিছু কিছু চমক রয়েছে বটে কিন্তু পৃথক পৃথক নয়। আপনি নেহায়েত বিস্মিত হলেন। এ পাথরটি কি? একই আঘাতে সম্পূর্ণ মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। শুধু খণ্ড বিখণ্ড করেনি; বরং পিষে সব কিছুকে একাকার করে দিয়েছে, এক বস্তু করে দিয়েছে। আর আপনি দ্বিতীয় চিন্তায় ছিলেন। তখন ঐ শূন্যলোকে যা মূর্তিতে ভর্তি ছিল, এবার খালি হয়ে গেছে। তখন ঐ পাথরটি বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বিস্তার লাভ করে সম্পূর্ণ শূন্যলোক ভরে গেল। যে পর্যন্ত ঐ মূর্তি বিস্তার লাভ করেছিল সে পর্যন্ত ঐ পাথর বিস্তার লাভ করল। এ অবস্থায় আপনার চোখ খুলে গেল।

বাদশাহ বললেন– আমি আমার রবের কসম করে বলছি! আমার স্বপ্ন এই ছিল,

আপনি বর্ণনায় সামান্যতমও কমবেশি করেননি। ঘটনা অবিকল এমনই ছিল যা আপনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন।

হযরত দানিয়াল (আ.)-এর তাবির

তারপর বাদশাহ বলতে লাগলেন– 'তাড়াতাড়ি তাবীর বলুন! আমি ব্যাকুল, আমি অস্থির, উদ্বিগ্ন।'

বললেন– শুনুন, আপনি যে মূর্তি দেখেছেন! এ হলো বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়। উপরিভাগে যে স্বর্ণ দেখেছেন, এ হলো আপনার ইরাকী জাতি, যে জাতির মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম তাহযিব ও তামাদ্দুন এসেছে, বিকাশ লাভ করেছে। তাহযিব ও তামাদ্দুন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন, সর্বপ্রথম সংস্কৃতিবান জাতি হলো ইরাকে বসবাসকারী জাতি। বাগদাদ থেকে তাহযিব ও তামাদ্দুনের সূচনা হয়েছে। এ হলো আপনার কওম, আপনার জাতি। যারা সর্বোত্তম তাহযিব ও তামাদ্দুনের অধিকারী এবং তারাই স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল ও ঝলমল করছেন। আপনার তিরোধানের পর দ্বিতীয় সম্প্রদায় আসবে, যার নেতা হবে আপনার ছেলে। তারা রুপোর মতো হবে। তাদের মর্যাদা হ্রাস পাবে। আর আপনি যে পিতল দেখেছেন এরা হলো হলুদ রঙের মানুষ। এরা চীন ও জাপানী জাতি। এদের চেহারা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। তারপর আপনি তামা দেখেছেন। এরা ঐ সকল জাতি যাদের রঙ লাল হয়। যেমন- আরব, হেজায ও সিরিয়ার অধিবাসীগণ– এদের চেহারা লাল হয়ে থাকে। আর আপনি যে লোহা দেখেছেন, এরা হল কালো মানুষ। যেমন আবিসিনীয় তাতরুনী।

আর দু'পা মাটির দেখেছেন, এরা হলো দু'জন মহিলা বাদশাহ। তারা দু'জন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকবে। তাদের জাতিগুলো নেহায়েত দুর্বল হবে। বিশ্বের সবাই এদেরকে নিচু মনে করবে। আপনার জাতি সর্বোচ্চ এবং মাটির ঐ জাতি সর্বনিম্ন হবে– যাদেরকে সবাই পদদলিত করবে। আপনি দেখেছেন বিশ্বের জাতিগুলো বিভিন্ন স্তরে উপর নিচ অবস্থান করছে। কোন জাতি দাবী করছে, আমরা স্বর্ণের, কেউ বলছে আমরা রৌপ্যের, কেউ বলছে আমরা পিতলের ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি উঁচু নীচু। তারা গর্ব অহংকার করে অন্যকে হীন ও তুচ্ছ মনে করে সয়লাব করে দিয়েছে। কেউ বলছে, আমরা ব্রাহ্মণ মুখ হতে বেরিয়েছি। আমরা ব্রাহ্মণ। আমাদের মর্যাদা আমাদের স্থান অনেক উচ্চ। তারা বিশ্বের জাতিগুলোকে নীচু জাতি মনে করে। অন্য জাতিগুলো ব্রহ্মার পা হতে সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় বিশ্ববাসী এরূপ উঁচু নিচুর ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল এবং

বিভিন্ন জাতি একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া করছিল। হঠাৎ বর্ষিত হলো তাদের সবার উপর পাথর। এ পাথর হল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন। এ দীন হলো ইসলাম, যে দীন বিশ্বে আগমন করে সকল জাতির মাথায় ভীষণভাবে আঘাত করবে। এবং এমনভাবে পদদলিত করবে যে, উঁচু নীচু সব একাকার হয়ে যাবে। স্বর্ণ, স্বর্ণ থাকবে না। রূপা, রূপা থাকবে না। সব একাকার হয়ে বিশ্বে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আইনের চোখে সবাই সমান মর্যাদা লাভ করবে।

তারপর আপনি দেখলেন পাথর বিস্তার লাভ করছে। এ হলো ঐ দীন বা ধর্ম। সর্বশেষ পৃথিবীর সব প্রান্তে বিস্তার লাভ করবে এ দীন। সমগ্র বিশ্বের মানব এ দীনের অনুসারী হয়ে যাবে। যাকে বর্তমানে গণতন্ত্র বলা হয়। জাতিসমূহের আবেগ উদ্দীপনা বিশ্বজনীন হবে। সকলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এক হবে, জাতিসমূহের মধ্যে সমতা ও একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ হলো খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন– যা সর্বশেষ সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করবে। এ হলো আপনার স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা।

ইলমে নবুওয়াতের মাধ্যমে বনি ইসরাইলের পুনঃসমৃদ্ধি

বাদশাহ তার হাত চুম্বন করলেন। বললেন– 'আমি পৃথিবীতে এমন বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি। এত আল্লাহভীরু আরিফ ব্যক্তি দেখিনি। আজ থেকে আমি নির্দেশ জারি করলাম, আমার রাজ্যে কোন কাজ আপনার পরামর্শ ছাড়া হবে না। আজ থেকে মন্ত্রিত্ব আপনার হাতে থাকবে। ততক্ষণ আমারও কোন নির্দেশ জারি হবে না, যে পর্যন্ত আপনি তা মঞ্জুর করে না দিবেন। এজন্য যে, আমি আজ পর্যন্ত এমন পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি। অতএব দানিয়াল (আ.) সেদিন হতে মূলত বাদশাহ হয়ে গেলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়ে গেল, দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব দানকারী ক্ষমতায় সমাসীনকারী শক্তি হল একমাত্র ইলম ও জ্ঞানের শক্তি। আর কিছু নয়। হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কাছে ধন-সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। শুধু ইলমে ওহী ছিল। ইলমের মাধ্যমে এত কল্যাণ লাভ হল যে, বিশ্বের বৃহত্তম জাতি ও শক্তি তাঁর কাছে অসহায় হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব তার হাতে অর্পিত হয়ে গেল।

'কলম বলে আমি বিশ্বের রাজা। যে ব্যক্তি কলমের যত্ন করে তাঁকে বড় বড় রাজ্যের শীর্ষ পদে পৌছে দিই। যে জাতি, যে সম্প্রদায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তা কেবল সুন্দর আকার ও আকৃতির কারণে করেনি। বরং রঙ রূপ ও শোভা সৌন্দর্য অনেক ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ইলম ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল করে দেয়ার কারণ হয়।'

বাইরের সৌন্দর্য পূর্ব-লক্ষণ

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুশ্রী পৃথিবীতে অন্য কেউ হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

فَاِذَا قَدْ اُعْطِىَ شَطْرُ الْحُسْنِ

আল্লাহ তায়ালা যখন এ বিশ্বে শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন, তখন অর্ধেক শোভা-সৌন্দর্য পুরো বিশ্বকে দান করলেন আর অর্ধেক হযরত ইউসুফ (আ.)কে। মিসরের নারীরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখলেন, তখন সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলেন–

وَاللّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ

আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি মানুষ নয়; এতো কোন সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা, যিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন।

এমনই ছিল তাঁর সৌন্দর্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ এর সাক্ষ্য প্রদান করছে। কিন্তু যত বিপদাপদ এবং ফেতনা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর এসেছে। সবই বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্যের কারণে এসেছে। কেনানের কূপে ভাইদের হাতে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর রূপ লাবণ্যের প্রতি ভাইদের হিংসা ছিল। ব্যবসায়ী কাফেলা তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল এবং মিসরের বাজারে কৃতদাস হিসাবে বিক্রি করল। বাহ্যিক রূপ তাকে কৃতদাসে পরিণত করল। মিসরের নারীদের মধ্যে জুলেখা আসক্ত হয়ে পড়ল। সে ছিল বাদশাহর স্ত্রী। সে মহিলা অসৎ চিন্তা ও ষড়যন্ত্র করল। পয়গাম্বরী গুণে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু ঐ মহিলা তাঁকে কারাগারের অন্ধ-কুঠুরিতে বন্দী করিয়ে রেখে দিল। সৌন্দর্যের কারণে দীর্ঘ নয় বছর কারাবাস করলেন। কৃতদাস, কারাবাস, কূপে নিক্ষেপ- এসব বিপদই রূপ-লাবণ্যের কারণে আসল। আর যখন মিসরের রাজত্ব লাভের সময় আসল, তখন কি বললেন? বললেন–

اجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

যদি দেশকে রক্ষা করতে চাও, দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে চাও, তাহলে দেশের বাগডোর আমার হাতে অর্পণ কর। আমি ব্যবস্থা করে দেখব। তখন তিনি একথা বলেননি–

إِنِّى حَسِيْن جَمِيلٌ

আমি অত্যন্ত সুন্দর সুশ্রী; সুতরাং আমি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে রাজ্য পরিচালনা করব। বরং তিনি বলেছেন–

إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

আমার মধ্যে ইলম ও জ্ঞান রয়েছে। দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতা ও দক্ষতা আমার রয়েছে।

দেখা গেল, যখন বিপদ আসল, তখন বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য সামনে দাঁড়িয়ে। আর যখন রাজত্ব লাভের সময় আসল, তখন ইলম ও কালাম, জ্ঞান ও গুণ অগ্রসর হলো। পৃথিবীতে ব্যক্তি হোক অথবা দল ও সম্প্রদায়– তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ইলম ও জ্ঞানের কারণে হয়। বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য ও শোভা-সৌন্দর্যের কারণে মানুষ উন্নতি লাভ করে না, করতে পারে না।

মূর্খতা মন্দ ও অকল্যাণের কারণ

এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগের যুগ পৃথিবীর সবচে' নিকৃষ্ট যুগ ছিল। ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে আরবে এমন কোন অসৎ ও মন্দ কাজ ছিল না, যা করা না হতো। কুকর্ম, ব্যভিচার, পাপাচার, আকিদা ও বিশ্বাসে ভ্রান্তি, কাজেকর্মে অসততা, কঠোর হৃদয়, অশালীন কর্কশ ব্যবহার এর সবই তাদের মধ্যে ছিল। তাছাড়া আপন সন্তানদের নিজ হাতে জবাই করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। নিজেদের কন্যা সন্তান জীবন্ত কবরে পুঁতে রাখত। তাদের অন্তরে দয়া-মায়ার উদ্রেক হতো না। ডাকাতি-ছিনতাই তাদের নিত্যদিনের ব্যবসা ছিল। লড়াই, ঝগড়া, যুদ্ধ-কলহ তাদের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল। সামান্য বিষয় নিয়ে দু'গোত্র ধ্বংস হয়ে যেত। তুচ্ছ কথা নিয়ে দু'গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। যুদ্ধরত ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যেত– যুদ্ধবিরতি যেন না হয়। তা হলে খান্দানের বদনাম হবে, সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। গোত্রের সুনাম রক্ষার জন্য পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতো। যুদ্ধ-

বিগ্রহ, পাপাচারে, অপকর্ম ও অপবিশ্বাসে তাদের কোন লজ্জা ও দুর্নাম বোধ ছিল না। শিরক চরমে পৌছেছিল। তিনশ' ষাটটি মূর্তি কাবা ঘরের আশপাশে রাখা ছিল। তিনশ' ষাটটি মূর্তির পূজা খানায়ে কাবায় করা হত। কেবল নঈলা ও কছাফ গোত্রদুটির দেবমূর্তি কাবা ঘরের ভেতরে রাখা ছিল। সেখানেই মূর্তিদুটির পূজা করা হত। বাড়িতে আসার পর প্রত্যেক গোত্র ও কবিলার দেবতা আলাদা ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের দেবতাকে উপাসনা করতে লজ্জানুভব করতো। নিজেদের জন্য কলংক মনে করত। অন্য কবিলাকে ছোট এবং নিজ কবিলাকে বড় মনে করত। অপর দেবতা ছোট, নিজের দেবতা বড় মনে করত। অত্যন্ত স্বজনপ্রীতি ছিল তাদের মধ্যে। প্রত্যেক কবিলার দেবতা আলাদা ছিল। প্রত্যেক পরিবারের ঘরে দেবতা আলাদা ছিল। পরিবারের লোকজন অন্য পরিবারের দিকে মুখাপেক্ষী ছিল না। বলত আমার খোদা আমার ঘরে রয়েছেন। সুতরাং আমি তার ঘরে কেন যাব। তার খোদার উপাসনা কেন করব। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তির খোদা পৃথক ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ভ্রমণকালের জন্য এক খোদা ছিল এবং নিজের ঘরে থাকার সময় অন্য খোদা ছিল.। যখন কোন ব্যক্তি সফরে বের হত তখন খোদাকে পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যেত। এমন যেন না হয় যে, উপাসনার সময় খোদা পাওয়া গেল না। তাহলে যদি খোদা সঙ্গে না থাকে আমি ইবাদত ও উপাসনা কার করব? পাহাড়ের শৃঙ্গে বসে পকেটে রাখা খোদার ইবাদত শুরু করে দিতো। তার সামনে হাত জোড় করত। এ অবস্থায় পূজারী দেখতে পেলো, সামনে যে পাথরের দেবতা রয়েছে এর চেয়ে বেশি সুন্দর একটি পাথর কাছেই পড়ে রয়েছে। তখন প্রথম পাথর নিক্ষেপ করে ঐ সুন্দর পাথর নিয়ে এসে এর পূজা শুরু করে দিল। এর সামনে হাত জোড় করল। যেন প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করল। এ অবস্থা ছিলো খোদাদের। খোদাদের যে সংখ্যা ছিল বান্দা ও উপাসকদের সে সংখ্যা ছিল না। এ ছিল তাদের শিরক ও পাপাচারের অবস্থা। তাদের আকিদা বিশ্বাস ছিল ভ্রান্ত। আমল ছিল জঘন্য। দয়া ও মেহেরবানী তাদের মধ্যে ছিল না। তারা ছিল চরম পর্যায়ের কঠোর হৃদয়। তাদের মধ্যে সকল অসৎ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের নৈতিক মূল্যবোধ শূন্যের কোঠায় ছিল। কিন্তু ঐ যুগের যে নাম দেয়া হল, তখন একথা বলা হয়নি– ব্যভিচারের যুগ, নর হত্যার যুগ, ডাকাতি ও রাহাজানির যুগ। বরং জাহেলিয়াত বা ঐ যুগে যদি শিক্ষাহীনতা ও মূর্খতা না থাকতো, তাহলে এসব পাপাচার প্রকাশ পেত না। প্রত্যেকটি অপকর্ম আলাদা, কিন্তু সকল অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো জাহালত ও মূর্খতা। যে কারণে এসব অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে।

ইলম কামালাত ও মহৎ গুণের উৎস

সে যুগের বিপরীত তবিয়ত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন। তিনি নূর ও আলো নিয়ে আসলেন। কুরআন পাকের সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়ে ছিলো–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

'পড়ো' অর্থাৎ জাহালাত ও মূর্খতা দূর করো। তোমরা যদি এ জিনিস (মূর্খতা)কে দূরীভূত করতে চাও। বিশ্বের সকল জাতি আরববাসীকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করত। তোমরা যদি এ অবমাননা ও হীনতাকে নিজেদের উপর থেকে মুছে ফেলতে চাও, তাহলে জেনে রাখ, এসব এসেছে মূর্খতার কারণে। এর চিকিৎসা হল এই– পড়ালেখা। পড়ার দিকে মনোনিবেশ কর। মূর্খতার কারণে যখন এসব হয়েছে তখন ইলমের দ্বারা, অপমানের পরিবর্তে মানসম্মান লাভ হবে। অন্ধত্বের স্থানে দর্শন, অকল্যাণের পরিবর্তে কল্যাণ আসবে। ভ্রান্ত আকিদার পরিবর্তে বিশুদ্ধ সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস লাভ হবে। বদ ও মন্দ আমলের স্থানে সহী ও শুদ্ধ আমল হবে। শিরকের পরিবর্তে তাওহিদ ও একত্ববাদ অন্তরে সৃষ্টি হবে। সুতরাং এসব তাদেরই হয়েছে, যে সকল ভাগ্যবান হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাঁর দাওয়াত ও কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছে– ঐ যুগে যাকে জাহেলিয়াতের যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হত। সেই যুগকে 'খায়রুল কুরুন' সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলা হল, যাদের নাম 'জুহালায়ে মক্কা'– মক্কার মূর্খ সমাজ ছিল; তাদের নাম সাহাবায়ে কেরাম বা সম্মানিত সহচর হলো। যাদের নাম উচ্চারণে বিশ্ববাসী অভিশাপ দিত, এখন তাদের নাম উচ্চারণে রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। যাদের অবমাননা ও নিকৃষ্টতা এই পরিমাণ ছিল যে, বিশ্ববাসী তাঁদেরকে রাখাল, (গোবরে বিচরণকারী) অপবিত্র ও নাজাসাতে অবস্থানকারী বলে ঘৃণা করত। এখন তাদের উপাধি হল, কামিল আরিফ বা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভকারী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, পাক পবিত্রতায়, ইবাদত-বন্দেগীতে, জ্ঞান বুদ্ধি মেধা ও মহৎ গুণে সবাই অলংকৃত হয়েছে। এই ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত নাযিল হলো– 'ইকরা'– 'পড়'; এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো– যখন কোন জাতি হীনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, উদ্বিগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করে, তখন ব্যবস্থা পত্র হল– ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের স্বভাব চরিত্র

সংশোধিত ও সুগঠিত করে নাও। এতে যদি কিছু সময় অতিবাহিত হয়েও যায়, অসুবিধা নেই। ইলম ও জ্ঞান লাভের পরই তাদের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত ও উন্নত হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের বছর পর্যন্ত শিক্ষাই দিতে থাকলেন। মক্কার তের বছরের জীবনে মুসলমানগণ নেহায়েত অসহায় দুর্বল অনাহারক্লিষ্ট ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের ছিল না, জনসংখ্যাও অতি নগণ্য ছিল। সারকথা, সকল বিষয়ে তারা ছিল পরমুখাপেক্ষী। তাদের প্রহার করা হতো, নির্যাতন করা হতো; তাদেরকে বকাবকি ও অশালীন কথাবার্তায় সম্বোধন করা হতো। কিন্তু হুকুম ছিল সবর কর, ধৈর্যধারণ কর।

কিন্তু সবর ও ধৈর্যধারণের অর্থ এই নয় যে, আঘাত ও প্রহার সহ্য করো, এ হলো কাপুরুষতা। ইসলাম কাপুরুষতা শিক্ষা দেয়নি। ইসলাম ও কাপুরুষতা একত্রিত হতে পারে না। শুধু প্রহার সহ্য করে যাওয়া কাপুরুষতা। কাজেই শত্রুদের প্রহার ও আঘাত সহ্য করতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে বীরবিক্রমে আক্রমণ করতে থাক। কেমন আক্রমণ? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا কালেমায়ে হক-এর ঘোষণা করতে থাক। আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান কর। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাক, যদি কাফেররা প্রহার করে সহ্য করো। আর যদি মন্দ বলে শুনতে থাক। যদি হত্যা করে, মরে যাও। কিন্তু কালেমায়ে হক-এর প্রচার দাওয়াত ও তাবলিগ ত্যাগ করো না; বন্ধ করো না। শুধু মার খাওয়ার জন্য বলা হয়নি। বরং আক্রমণ করার জন্যও বলা হয়েছে। তাহলে এ আক্রমণ তরবারী, লাঠি অথবা হাত-পা দিয়ে নয়। এ আক্রমণ হলো যবান দ্বারা। কালেমায়ে হক-এর তবলিগও প্রচার দ্বারা।

এ প্রচারের কারণেই তো তরবারী চালানো হত। সাহাবায়ে কেরাম যদি সত্য প্রকাশ না করতেন তাহলে তারা সবাই খান্দানী ছিলেন। ভদ্র পরিবারের ছিলেন। তাদের পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। একে অপরের বিরোধী হবেন কেন? আক্রমণ করবে কেন? এসব যুদ্ধ বিদ্রোহ যা হত, তা তাদের আক্রমণের প্রতিউত্তরে করা হত। কাফেরগণ আক্রমণ করত হাত দিয়ে। আর সাহাবীগণ আক্রমণ করতেন কালেমায়ে হক বা সত্য কালেমা দিয়ে। সাহাবীদের কাছে ইলম ও জ্ঞান ছিল। ইলম-বিশিষ্ট যারা তারা সত্য সঠিক কথা দিয়ে আক্রমণ করে, আর জাহেল মূর্খরা আক্রমণ করে হাত দিয়ে, জাহালত ও মূর্খতা দিয়ে। বলা হলো এ রাস্তায় প্রহৃত হও। আঘাতের পর আঘাত সহ্য কর, পরোয়া নেই। প্রতিউত্তর প্রদান করো না। তখন যেসব আয়াত নাযিল হত, সেসব আয়াতে

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হতো– হে নবী! ধৈর্যধারণ করুন। فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا এসব মূর্খ হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন। أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ এদের মন্দ বলার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের বলতে দিন এবং আপনি আপনার কাজ করতে থাকুন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ○ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ○

হে নবী! আমি জানি, যখন এরা (কাফেররা) আপনাকে গালমন্দ বলে, তখন আপনি অন্তরে ব্যথা পান, মানুষ হিসাবে আপনার কষ্ট হয়, আপনি দুঃখিত হন। কিন্তু এসব অসভ্যদের অশালীন উক্তি করতে দিন এবং আপনি আল্লাহর তাসবীহ ও তাহলিল এবং যিকির ও স্মরণে ব্যস্ত থাকুন। তাদের কেবল গালমন্দ দেয়ার বকাবকি করার তাওফিক রয়েছে। আর আপনাকে তাওফিক দেয়া হয়েছে হক ও সত্য কথা প্রকাশ ও প্রচার করার।

তেরটি বছর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) এ অসহনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তের বছর পর যুগ পরিবর্তন হলো। যারা সংখ্যায় অল্প ছিল, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। যারা মান মর্যাদায় হীন ছিলেন, তারা সম্মানিত হয়ে গেলেন। যাদের হাতে প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা ছিল না, তারা প্রভাবশালী হয়ে গেলেন। যারা সম্পদহীন অর্থহীন অসহায় ছিলেন রোম ও পারস্য সম্রাটদের কোষাগার তাদের হস্তগত হয়ে যেতে লাগল। আমূল পরিবর্তন সূচিত হল।

সংশোধিত আত্মার দ্বারা বিপ্লব সম্ভব

অবস্থার এ পরিবর্তন হলো কখন? যখন তাঁরা সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে বিপ্লব করেছেন। বিশ্বে বিপ্লব বাইরে থেকে সাধিত হয় না; বরং বিপ্লব হয় ভেতর থেকে। নিজের আত্মাকে গঠিত করুন। নিজের চরিত্র ও নৈতিকতাকে উন্নত করুন। নিজের স্বভাবকে সুন্দর করুন। তখন দুনিয়ার জাতিগুলো আপনাদের সামনে মাথা নত করে দিবে। আমি যদি দুনিয়াবাসীর সামনে অসৎ কাজকর্ম পেশ করি, তাহলে এর প্রতিউত্তরে বিশ্ববাসী আমাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত

করবে। পদদলিত করবে। কিন্তু আমরা যদি আত্মমর্যাদা, গাম্ভীর্য, স্থিরতা এবং মহৎ স্বভাব ও আচরণ পেশ করতে সক্ষম হই, তাহলে পৃথিবীবাসী আমাদের দুর্নাম করবে কেন? তাদের কি মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে? যদি করেও তবুও তাদের অন্তরাত্মা তাদের মালামত করবে, দোষারূপ করবে। তাদের আত্মাই তাদেরকে বলবে– ঐসব লোক তোমাদের সমালোচনা ও দুর্নামের যোগ্য না। তাঁরা সত্যবাদী, নানা গুণে উন্নত। এ অবস্থায় বিভিন্ন জাতি এসে মাথা নত করে দিবে।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– যখন কোন জাতি অবাধ্য হয়ে যায়, নাফরমান হয়ে যায়, আমার বিধি-বিধানকে বর্জন করে, অহর্নিশ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আমি বিশ্বের অন্যান্য জাতির অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে দেই; ঐ সকল জাতি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তাদেরকে নানাভাবে লাঞ্ছিত নির্যাতিত করে। হাত দিয়ে, তরবারী ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে তাদের ধন-দৌলত লুট করে নিয়ে যায়, মানসম্মান ধূলিস্যাৎ করে দেয়। তারা আমার পক্ষ থেকে জল্লাদ হিসাবে কাজ করে। তারা কিছুই না, আমার নির্দেশই কার্যকর হতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন– এমন পরিস্থিতি যদি তোমাদের নাপছন্দ হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস ও অপদস্ত করে দিক; তাহলে তাদেরকে দোষারূপ করো না; বরং আমার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নাও। আমি তাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে প্রীতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দেব। ঐসব জাতি যারা তোমাদের বিপক্ষে ছিল, তারা মাথানত করে দিবে। মানুষের অন্তর আমার হাতের মুঠোয়, আমিই এদিক সেদিক ঘুরিয়ে থাকি–

اَلْقُلُوْبُ بَيْنَ اَصْبَعِى الرَّحْمٰنِ يُصَرِّفُهَا حَيْثُ يَشَآءُ

মানব জাতির আত্মা দয়াময়ের দু'আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে। যে দিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

শেখ সা'দী কি চমৎকার কথা বলেছেন। কত মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন–

گر گزندت رسد ز خلق مرنج ☆ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج

যদি দুনিয়াবাসীর পক্ষ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট পাও, তাহলে চিন্তিত হয়ো না। কেননা সুখ-দুঃখ দুনিয়াবাসীর হাতে নয়, তারা যা করছে তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই করছে।

সেজন্যেই–

گر گزندت رسد ز خلق مرنج ☆ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج

از خداراں خلاف دشمن ودوست ☆ کہ دل ہر دودر تصرف اوست

শত্রুর শত্রুতা ও মিত্রের সহানুভূতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তা বিশ্বাস কর। যেহেতু অন্তরাত্মা তাঁরই হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে একজনকে অন্যজনের শত্রু বা বন্ধু করে দিতে পারেন। কাজেই শত্রু-মিত্রের পেছনে দৌড়াদৌড়ি না করে– এই লোক আমার শত্রু, তাকে কিভাবে ঘায়েল করব; অমুক আমার মিত্র, আমার বন্ধুত্বকে কিভাবে মাথায় উঠিয়ে নিব– এসব না ভেবে তোমার ঐ সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিচ্ছ না কেন? যার হাতে শত্রু-মিত্র সকলের আত্মা, সকলের প্রাণ। তিনি মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র করে দিবেন।

সত্যিকার বুদ্ধিমান ওলী-আল্লাহরাই

এটাই হওয়া উচিত বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সঠিক করার পরিবর্তে হাজারো মানুষের খোশামোদ ও তোষামোদ করার পরিবর্তে একই সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক দুরস্ত করে নাও। বিষয় অতি সহজ ও সরল। সকলের চিন্তা করা তখন অপ্রয়োজন হবে।

খলিফা হারুন অর রশিদ দরবারে বসাছিলেন। এসময় তার মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন– আজ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আমার কাছে আবদার করতে পার। আমি তোমাদের চাওয়া পূর্ণ করবো। একথা শোনে কেউ বলল– 'হুযুর আমাকে দশ লাখ টাকা দান করুন।' কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, দশ লাখ টাকা দিয়ে দাও। কেউ বলল– 'আমাকে অমুক প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দিন।' তাকে তাই করে দিলেন। কেউ বলল– 'আমাকে অমুক অমুক বাংলো দিয়ে দিন।' দিয়ে দেয়া হল। কেউ বলল– 'আমাকে অমুক বাহনটি দিয়ে দিন।' দান করে দিলেন। মোটকথা, যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাঙ্ক্ষিত জিনিস চেয়ে নিচ্ছিলেন।

হারুন অর রশিদের পেছনে দাঁড়িয়ে একজন কৃতদাসী হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করছিল। হারুন অর রশিদ তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন– তুমি কিছুই চেয়ে নিলে না কেন? সে উত্তর দিল– 'গর্দভের দলকে আগে নিতে দিন, তারপর আমি চাইব। এই বোকার দলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার

কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য প্রার্থনা করব।'

হারুন অর অবাক হয়ে জানতে চাইলেন– 'আচ্ছা, আমার দরবারের মন্ত্রীবর্গ, পদস্থ কর্মচারী সবাই গর্দভ ও বোকা?'

দাসী উত্তর দিল– 'হ্যাঁ! সবাই গর্দভ, সবাই বোকা আহমক। তাদের তো ভাল-মন্দেরই জ্ঞান নেই। হারুন অর রশিদ আরও বিস্মিত হলেন। নারী সমাজের সদস্য হয়ে সে মহাবুদ্ধিমতী হয়ে গেল! আর আমার পদস্থ কর্মচারী সবাই বোকা গর্দভ! মনে হয় বাঁদীটি নিজেই বোকা, এর মস্তিষ্কে বিকৃতি রয়েছে। এরা আমার মন্ত্রীবর্গ; দেশের শাসন ব্যবস্থা এরাই পরিচালনা করে। উচ্চপদের অধিকারী এরা, তারপরও এরা সবাই কি গদর্ভ?

দাসী বলল– হুজুর! সবাই গর্দভ! তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনা করার কোন শক্তিই নেই।

হারুন অর রশিদ তখনও ভাবছিলেন, নারী জাত, অযথা বাজে কথা বলছে। সে মর্যাদার কি বুঝে? এরপর হারুন অর রশিদ দাসীর দিকে মুখ ফেরালেন। জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কিছু নিবে? সে বলল– 'হ্যাঁ! বোকার দল সবাই নিয়েছে। এখন আমার পালা– এখন আমি আমার প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করব।'
হারুন অর রশিদ বললেন– 'বল, তুমি কি চাও।'
দাসী বলল– 'আমি যা প্রার্থনা করি তা দিবেন তো?'
বললেন– 'আমার ওয়াদা, আমার ঘোষণা খেলাফ হবে না।'
দাসী হারুন অর রশিদের কোমরে হাত রেখে বলল– আমি আপনাকে চাই। আপনি আমার হয়ে যান।

সে বাস্তবিকই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। এজন্য যে, যে ব্যক্তি দশ লাখ টাকা চেয়েছে, সে দশ লাখ টাকা পেয়েছে। আর কিছু পায়নি। যে ব্যক্তি বাংলো চেয়েছে সে বাংলোই পেয়েছে। অন্য কিছু পায়নি। যে উচ্চ পদ চেয়েছে, সে পদ পেয়ে গেছে অন্য কিছু পায়নি। কিন্তু দাসী স্বয়ং হারুনকে চেয়েছে। যখন বাদশাহ তাঁর হয়ে থাকেন, তখন সকল পদই তার। বাংলো তার, কোষাগার তার, দেশ ও জাতি তার– এই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। শাখা-প্রশাখা কেউ নিয়েছে, পাতা কেউ নিয়েছে, কেউ ফল। বাদী বলল– আমি গাছটিই দখল করে নিব। তখন সকল পাতা ফলমূল সবই আমার হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে দাসী নারী হয়েও চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

জগতে প্রকৃত বুদ্ধিমান হলেন আল্লাহওয়ালাগণ। তাঁরা পার্থিব জগতে কারও কাছে কিছু চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। হে আল্লাহ! আপনি

আমাদের হয়ে যান। যখন আপনি আমাদের হয়ে যাবেন তখন পুরো জগত আমাদের, পরকালও আমাদের হয়ে যাবে। আরশ কুরশী, লাওহ, কালাম, জান্নাত– সবই যদি আমাদের হয়ে যায়, আর আপনি যদি আমাদের না হন, তাহলে কি হবে? যারা ধন-সম্পদ নিয়েছেন, তাদের ধন কিছু দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার পর কিছুই থাকবে না। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও রাজত্বও যদি হাতে এসে যায়, আর আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ রাজত্ব এ সম্পদ দুনিয়াতে থাকার সময় শেষ হয়ে যাবে। অথবা মৃত্যুর থাবা একে শেষ করে দিবেই। পরকালে থাকবে কেবল অন্ধকার, মহা অন্ধকার। কোন জিনিসই তার ভাগ্যে থাকবে না। বাস্তব কথা হলো, দাসী বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে। এভাবে আল্লাহওয়ালাগণ বুদ্ধিমান, যারা মূলে হাত রেখেছেন। একথাই আমি বলছিলাম, হাজার জনকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে একজনকে সন্তুষ্ট করে নাও। তখন হাজার জন তোমার বশংবদ হয়ে যাবে।

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বন্দেগি ও দাসত্বের

তবে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালাকে রাজী করার জন্যে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে, তা যেন কোন সম্পদের কারণে না হয়। এ কারণে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা যেন না করা হয় যে, আমার ঘর তৈরি হয়ে যাক, আমার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাক। তা হলে উদ্দেশ্য আল্লাহ নয়; বরং ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত উদ্দেশ্য হয়ে যায়। আল্লাহকে সন্তুষ্ট কর এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁকে রাজী করাই আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য। যখন তিনি রাজী হয়ে যাবেন, তখন ঘরবাড়ি ধন-দৌলত সবই হয়ে যাবে। আর আমি বলি, যদি কিছুই পাওয়া না যায়, আল্লাহ যদি কেবল একথা বলে দেন, আমি সন্তুষ্ট তাহলে তো সবই পাওয়া হয়ে গেল। এরপর অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকবে না।

تو بندگی گدایاں بشرط مزد مکن ☆ کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند

আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগি শ্রমিকের মতো করো না যে প্রতিদান পাব। তখন সিজদা করব– যদি প্রতিদানে সামান্য ত্রুটি হয় তাহলে সব কিছু ত্যাগ করে চলে যাব। এ হলো নিজের প্রয়োজন ও অপারগতার বন্দেগি। এটা আল্লাহ তায়ালার বন্দেগি নয়। কাজেই আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান, এটাই চাই, আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এখন পরিষ্কার কথা, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে সকল ধনাগার হাতে এসে যাবে। কিন্তু নিজে লোভ করো না, লালসা করো না।

যখন মাহবুবে হাকিকী (প্রকৃত বন্ধু) নিজের হয়ে যাবেন, যিনি সকল বরকতের উৎস, তিনি যখন আমার তখন আমাদের অভাব কিসের? এক হলো আপনি আল্লাহর ইবাদত করলেন এ উদ্দেশ্যে, আমি যেন অমুক বাংলো পেয়ে যাই- এ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা হলো অত্যন্ত নিম্নমানের। আরেক হলো, আপনি বললেন- সমগ্র জগতও যদি আমার থেকে দূরে চলে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে আমি সফলকাম; অন্য কিছু চাই না। এ হলো যোগ্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। আল্লাহ তায়ালাকে পরীক্ষা করো না। পরীক্ষা তিনি নিবেন, তোমার দাবী সত্য কিনা। তুমি সত্যই আল্লাহওয়ালা হতে চাও কি না। তুমি কে? যে আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা নিবে? পরীক্ষা তিনি নিবেন। তুমি অসহায় বান্দা হিসাবে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ কর।

কোন এক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল- আপনার অবস্থা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন- ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করছ কেন? যার ইচ্ছানুযায়ী উভয় জগত পরিচালিত হচ্ছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল- 'আপনি কি ঐ স্তরের যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগত আপনার মর্জি মতো পরিচালিত হচ্ছে? বললেন- আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঐ স্তরে রয়েছি। আমার মর্জি মতো উভয় জগতের সব কিছু সংঘটিত হচ্ছে।'

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো- 'তা কেমন করে?

বললেন- এভাবে হতে পারে, উভয় জগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী ও মর্জি মতো পরিচালিত হচ্ছে। আর আমার মর্জিকে আল্লাহর মর্জির উপর বিলীন করে দিয়েছি। তাঁর মর্জি যা, আমার মর্জি তাই। কাজেই সকল কর্মকাণ্ড আমারও মর্জি মতো পরিচালিত হচ্ছে। আমার মর্জির বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারে না। কেউ জন্মগ্রহণ করে। আমি বলি, আলহামদুলিল্লাহ! এমনই হওয়া উচিত। কারো মৃত্যু হলে আমি ভগ্ন হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বসে থাকব- তাহলে কি আমি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব? তিনি বলবেন, অমুকের মৃত্যু হওয়া উচিত। আর আমি বলব মৃত্যু না হওয়া উচিত। এ ভুল কথা, এ তো আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা হলো। মানুষ বান্দা হয়ে বন্দেগি করবে। বন্দেগির অর্থ হলো, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিলীন করে দিবে। যা আপনার মর্জি তা আমারও মর্জি। আমার কি সাধ্য আপনার মর্জির বিরোধিতা করব।

আমাদের পাঞ্জাবে শাহদৌলা নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। যমুনা নদীর তীরে এক জনপদ ছিল। সেখানে তাঁর নিবাস ছিল। সেই জনপদে বর্ষা এলো। যমুনা নদীর পানি বেড়ে গেল। বন্যার পানিতে জনপদ তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। সে যুগে গ্রামের পাশেই একটি মজবুত প্রাচীর ছিল। পানি ওই প্রাচীরে আঘাত

করত। এ প্রাচীর ভেঙ্গে গ্রামটি তলিয়ে যেত। পানি বৃদ্ধির কারণে প্রায় অর্ধেক প্রাচীর তলিয়ে গিয়েছিল। এবং এ আশংকা দেখা দিয়েছিল, পানি যদি সামান্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তা ভেতরে প্রবেশ করবে এবং গ্রাম তলিয়ে যাবে। মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে শাহদৌলার খেদমতে হাজির হলো। আরজ করল, হযরত! দোয়া করুন, আমাদের সাহায্য করুন। গ্রাম বন্যায় তলিয়ে যাচ্ছে। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম রক্ষার প্রাচীর প্রায় ডুবে গেছে, সামান্য বাকী রয়েছে। যদি পানি সামান্য বৃদ্ধি পায় তাহলে গ্রাম রক্ষার কোন পথ থাকবে না।

তিনি বললেন– আচ্ছা! পানি অনেক বেড়ে গেছে?

: জি হ্যাঁ, অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বললেন– একটি কোদাল নিয়ে এসো।

কোদাল আনা হল। শাহদৌলা কোদাল কাঁধে নিলেন এবং বললেন– 'আমার সঙ্গে চল।'

সবাই তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। সবাই আনন্দিত। এখন হয়তো কোন ব্যবস্থা হবে। শাহদৌলা গিয়ে প্রাচীর ভাংগতে শুরু করলেন। যে প্রাচীর পানিকে বাধা দিচ্ছিল। মানুষ আরজ করলেন– 'হযরত! এ কি করছেন! তা হলে তো গ্রাম অতি সত্বর ডুবে যাবে। অথচ প্রাচীরই গ্রামকে রক্ষা করছে।

হযরত বললেন–

جدہر مولانا ادہر شاہ دولہ

আল্লাহ যেদিকে, শাহদৌলাও সে দিকে। নির্বোধের দল! তোমরা কি আল্লাহর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে বল? আল্লাহ চাচ্ছেন এ জনপদ ডুবে যাক আর আমি চাইবো ডুবে না যাক। আল্লাহ যদি বস্তির তলিয়ে যাওয়া কামনা করেন তাহলে আমিও তা কামনা করি। গ্রাম ডুবে যাক, যেদিকে আল্লাহ সে দিকে শাহদৌলা।

বন্দেগির অর্থ হলো এই– যখন আল্লাহর মর্জি ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারব, তখন নিজের ইচ্ছা ও মর্জি তাতে বিলীন করে দিবে। আমি আল্লাহর অনুগত বান্দা। আল্লাহর মর্জির বিপক্ষে নিজের মর্জি প্রকাশ করা, প্রস্তাব দান করা যে– এমন হওয়া উচিত ছিল; এটা হলো আল্লাহ তায়ালাকে পরামর্শ দান করা। যেমন কোন কোন মানুষ বলে থাকে– এ কথাটি অত্যন্ত ভুল, মারাত্মক ভুল। কোন বড়লোকের মৃত্যুর পর শোকবার্তা পাঠানো হয়। তাতে লেখা হয়– 'অমুক সাহেবের অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত'– এ কথাটি একজন মূর্খ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন যে, মৃত্যু কি কখনো অকালে আসে? মৃত্যু আগে

থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। তাহলে এ কথার অর্থ হলো এ সময়ে মৃত্যু দান উচিত হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার ছিল যে, অমুককে এ সময়ে মৃত্যু দান করব বা করব না। তখন তিনি পরামর্শ দিতেন– না এখনো সময় হয়নি। দু'চার দিন পরে বা দু'চার বছর পর মৃত্যু দূত পাঠানো হোক।

বান্দার কাজ এটা নয়। এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না যাতে মনে হবে আল্লাহর মর্জি ও তকদীরের বিরুদ্ধে তারও কোন প্রস্তাব রয়েছে। আমাদের উপর যে সকল বিপদাপদ দুঃখ-কষ্ট আসে সবই এজন্য আসে, আমরা আমাদের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দান করি এবং আল্লাহর তকদীরকে পশ্চাতে ফেলে দেই; তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারি না। কিন্তু আল্লাহর তকদীর ও সিদ্ধান্তই সত্য ও সঠিক।

মাওলানা রূমী (রহ.) একজন ক্রীতদাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কোন এক ব্যক্তির একজন ক্রীতদাস ছিল। মালিক জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি খাবে? সে উত্তর দিল– মুনিব যা খাওয়ান। আবার জিজ্ঞেস করলেন– কি পরিধান করবে? সে উত্তর দিল– মুনির যা পরতে দেন। জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কাজ করবে? জবাবে বলল– 'মুনিব যে কাজ করান।' মুনিব বললেন, 'তোমার কোন মর্জি আছে কি? সে বলল– আমার কোন ইচ্ছা বা মর্জি যদি থাকত, তাহলে আমি ক্রীতদাস হতাম কেন? মুনিবই হতাম। গোলাম হওয়ার অর্থই হলো, আমার মর্জি, আমার ইচ্ছা, মতামত সবই গোলাম, আশা-আকাঙ্ক্ষাতেও গোলাম।

একজন মানুষ মানুষের গোলাম হয়ে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিতে পারল। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করল। একজন বান্দা দাবী করবে– আমি আল্লাহর গোলাম, তারপর নিজের মতামত চালিয়ে দিতে চাইবে, এটা হলো পরস্পর বিরোধী কাজ। বন্দেগীর অর্থ হলো, আমি বিলীন হয়ে গেলাম। আর প্রস্তাব পেশ করার অর্থ হলো আল্লাহকে পরামর্শ দেয়া, আমার কাছ থেকে মতামত নিবেন। এ কাজ করা হলো না কেন? আমার পরামর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল– এসব অত্যন্ত গোস্তাখীর কথা।

অনুগতকে সব আর দাবিদারকে কিছুই না

বান্দার কাজ হলো, নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও মর্জিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধান জারি করেছেন, সে মোতাবেক আমল শুরু করে দিবে। ইতায়াত ও আনুগত্যে এই ফল হবে– আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত ও

ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে। পৃথিবীতে বাধ্য ও অনুগতরাই কিছু পেয়ে যায়। আর যে লোভী হয়, কেবল দাবী করতে থাকে, সে কিছুই লাভ করতে পারে না। আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে চল, সব কিছু পেতে শুরু করবে। আপনি যদি কাউকে বলেন– ভাই সাহেব! আমাকে আপনার পরিবারের গোপন বিষয় বলে দিন। তখন সে বলবে– বোকা! তুমি কে? আমার পরিবারের গোপন বিষয়াদি জানতে চাও? আর তুমি যদি তার খাদেম হয়ে যাও, তাহলে কিছু দিনের মধ্যে তিনিই সকল গোপন কথা বলে দিবেন।

এক ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে হাজির যদি হয়ে বলে– হুযুর! আপনার বেগমকে আমার সামনে নিয়ে আসুন আর এ কথাটিও বলে দিন তো আপনার কোষাগারে কী পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য রয়েছে? তাহলে বাদশাহ তখন বলবেন– এ বোকা গর্দভকে কান ধরে বের করে দাও! সে আমার বেগম এবং আমার কোষাগারের নাম উচ্চারণ করল কেন? আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার সে কে? এ বেয়াদব লোকটিকে কান ধরে বের করে দেয়া হবে দরবার থেকে।

আর অন্য এক ব্যক্তি দরবারে এসে হাজির। বাদশাহ বললেন– 'দাঁড়াও!' সে বলল– বহুত আচ্ছা হুজুর! তারপর দাঁড়িয়ে থাকল। বাদশাহ বললেন– বসে যাও! সে বলল– বহুত আচ্ছা! বসে পড়ল। এক কথায় সব বিষয়ে সে অনুগত্য প্রকাশ করল। তখন বাদশাহ বলবেন– লোকটি তো বেশ অনুগত, বাধ্যগত এবং বিশ্বস্ত! বলবেন– মনে হয় তুমি খুব মুখলেছ! অন্তরের সঙ্গে অনুগত্য করছ। অতি বিশ্বস্তও বটে। তখন তার প্রতি বাদশাহর বিশ্বাস জন্মে যাবে। বাদশাহ বলবেন, আমার প্রাসাদে যখন ইচ্ছা যাতায়াত করতে পার। তোমার প্রতি আমাদের কোন আশংকা নেই। এখন রাজপ্রাসাদে যাতায়াত আরম্ভ হবে। বাদশাহ বলবেন– বেগমকে এখন পর্দা করার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এ ব্যক্তি আমাদের আপনজন। এখন বেগমমাতাও কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। দু'বছর পর যখন আরো বেশি আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে, তখন বাদশাহই বলবেন– আমার সঙ্গে কোষাগারে চল, দেখে আসি। তাকে রাজকীয় কোষাগারে নিয়ে গেলেন। স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-মানিক্য সবই দেখালেন। ঐ ব্যক্তি আরো বেশি বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেল। আবার যখন এক বছর অতিবাহিত হল, এ ব্যক্তির কাছে অধিক বিশ্বস্ত নীতি পলিসী এবং গোপন বিষয়াদি সবই বলে দিবেন।

এ অবস্থা কেন হলো? এজন্য যে, অনুগত্যের পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। আর প্রথম ব্যক্তিকে কান ধরে বের করে দিয়েছিল কেন? এজন্য যে, অনুগত্য ছিল না। নিজেই দাবি করছিল, আপনার গোপন বিষয়াদি আমাকে বলুন। দাবি

উত্থাপনকারী ব্যক্তির উত্তর দেয়া হলো কান ধরে বের করে দেয়া আর অনুগত ব্যক্তির উত্তর হলো বাদশাহ নিজেই ডেকে নিয়ে সব গোপন কথা বলে দিলেন। একজন মুমিনের অবস্থা এমন হওয়া উচিত। দিনরাত আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য করতে থাক। দিনরাত শরীয়তের আইন-কানুন বিধি-বিধান জানার জন্য সচেষ্ট থাক। যখন ইহ-পরকালীন কল্যাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে অনুগত্যের উপর, তখন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর আশ্বস্ত থাকো। আল্লাহর ওয়াদা ভুল হতে পারে না, কখনো না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ.

আল্লাহ এমন ব্যক্তির সঙ্গে ওয়াদা করেন যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল ও সৎ জীবন যাপন করেছে। আমি তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করব। এ হলো আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় সত্য ওয়াদা। এর উপর আমল করে দেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা পূর্ণ করে দেখাবেন। [নূর : ৫৫]

আপনারা আমল করে পরীক্ষাই করলেন না, ফলের আশা করলেন কিভাবে? যদি কোন চিকিৎসক আপনাকে বলেন– আপনার সর্দি হয়েছে। দুধ দধি পান করা ত্যাগ করুন এবং বনফসা (ঔষধ) ব্যবহার করুন। যদি ঐ ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলে, তা হলে সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি বলে– আপনি কথা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু দুধ দধি ত্যাগ করতে পারব না। আমার বাড়িতে দুধের গাভী মহিষ বাঁধা রয়েছে। যখন দুধ ভর্তি পাত্রগুলো সামনে আসবে, তখন আমি সবর করে থাকব কি করে? তা কি সম্ভব? তখন মন দুধ পান করতে ব্যাকুল হয়ে পড়বে। কে কষ্ট করবে গুলে বনফসা পান করার জন্য? আমি দুধ পান করব। তাহলে আপনাদের বিধান যথাস্থানে ঠিকই রয়েছে।

বর্তমানে মুসলমানদের এই অবস্থা। যদি শরীয়তের বিধান পেশ করা হয় তাহলে বলবেন– কথা তো ঠিক, শরীয়তের বিধান শিরোধার্য। তবে দোকান, বিষয় সম্পত্তি, ঘর সংসার, নিজের আয়াশ আরাম এসব ত্যাগ করতে পারব না। আইন বিধান ঠিকই আছে। একথা ঠিক, মসজিদ ভাল জায়গা। নামায ভাল জিনিস। রোযা যাকাত এবং আল্লাহ তায়ালার ইতায়াত ও অনুগত্য ভাল জিনিস। কিন্তু কি করবো, এসব করার সুযোগ ও সময় নেই।

جنتا ہوں ثواب طاعت وزہد ☆ ہر طبیعت ادہر آتی نہیں

এ কথা সত্য জান্নাত পাওয়া যাবে কিন্তু মন যদি না চায় তাহলে এর ঔষধ কি? এই হলো আমাদের উদাহরণ। সব কিছু জানি বলি কিন্তু নফস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলছি। শরীয়তের অনুগত্যকে বরণ করে নিচ্ছি না।

চিকিৎসকের কথাই যখন মানা হলো না, তাহলে সর্দি জ্বর কমবে না। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শরীয়ত হলো একটি ব্যবস্থাপত্র। আপনি যদি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, আমল না করেন তাহলে রোগ মুক্তি হবে না। আর যদি প্রশংসাসূচক একটি বাক্যও না বলেন, আর যথারীতি ব্যবস্থাপত্র কাজে লাগান তাহলে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করবে। তাঁরা আমাদের পূর্বসুরী বুযুর্গ ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে সুখ-শান্তি ভোগ করেছেন, আমাদের ভাগ্যে তা জুটছে না। যদিও তাদের কাছে এ জাতীয় বাংলো ছিল না, যা আমাদের কাছে রয়েছে। জেনে রাখবেন, ঘরের সাজ-সজ্জার সঙ্গে সুখ-শান্তির কোন সম্পর্ক নেই। আত্মার প্রশান্তি অন্য জিনিস। প্রকৃত সুখ-শান্তি হলো আত্মার প্রশান্তি। যদি লক্ষ কোটি টাকা আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকে কিন্তু অন্তরে দুঃখ-ব্যথা, পেরেশানী ও উদ্বিগ্ন ভাব থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, শান্তি নেই। আর যদি সারাদিনে একটি রুটিও পাওয়া না যায়, কিন্তু অন্তরে শান্তি থাকে, আমার উপর কারো কোন প্রাপ্য নেই– তাহলে সে ব্যক্তি বাদশাহ। সুখ হলো অন্তরের শান্তি ও সান্ত্বনার নাম। আমাদের পূর্বসুরী বুযুর্গানকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদও দান করেছিলেন। অন্তরের প্রশান্তিও দান করেছিলেন। যে প্রশান্তি আল্লাহর আনুগত্য দাসত্বে লাভ হয়। আমরা ধন-দৌলতের মোহে আনুগত্য ত্যাগ করেছি। সুখ-শান্তির উপকরণ অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রশান্তি যাকে বলা হয় আমাদের কাছে তা নেই। অন্তরে শান্তি নেই। রয়েছে পেরেশানী উদ্বেগ।

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

আল্লাহর যিকিরে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। ধন-দৌলত উপায়-উপকরণ তখনই কেবল প্রশান্তি দান করতে পারে, যখন হৃদয়ভাণ্ডারে থাকে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যদি আল্লাহর যিকির ও স্মরণ না থাকে, তাহলে ধন-দৌলতে কোন শান্তি হয় না। বরং ধন-দৌলত হলো অশান্তির কারণ।

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে ছিল আফলাতুন (প্লেটো)। আপনারাও তার নাম শুনে থাকবেন। তিনি ইরানের প্রধান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ছিলেন। আমরা তো

এতটুকুই জানতাম। প্লেটো একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত শায়খ আবদুল করিম একটি (গ্রন্থ) রচনা করেছেন, যার নাম 'আল ইনসানুল কামিল'। ঐ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন– আমি তার সমাধিস্থলে হাজির হলাম এবং দেখতে পেলাম তার কবরে নূর (আলো) ও বরকত বর্ষিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায় ঐ ব্যক্তি আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিল। কেবল দার্শনিকই নন। মোটকথা, প্লেটো এবং মুসা (আ.) জানতেন, প্লেটো একজন আছেন। আর প্লেটোও জানতেন মুসা (আ.) আছেন। তিনি বনি ইসরাইলী নবী। ঘটনাক্রমে তারা একদিন একস্থানে একত্রিত হলেন। পথিমধ্যে তাকে দেখে প্লেটো বুঝতে পারলেন, ইনি কোন মহান ব্যক্তি হবেন। চেহারায় নবুওয়তের জ্যোতি, জামাল ও আনওয়ার ছিল। অন্তরে ছিল ঈমানের তেজো-দীপ্তি। ফলে তিনি বুঝে নিলেন এই ব্যক্তি কোন মহান ব্যক্তি হবেন। তবে একথা জানা ছিল না যে, ইনিই মুসা (আ.) পয়গাম্বর। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন– এই ব্যক্তি একজন মহাদার্শনিক হবেন। অনেক বিনয়ের সঙ্গে মুলাকাত করলেন এবং আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন, মহান ব্যক্তি ঠিকই। বলতে লাগলেন, কয়েক বছর ধরে আমার অন্তরে একটি প্রশ্ন খুব জাগছে। প্রশ্নটি প্রখ্যাত দার্শনিকদের কাছে পেশ করেছি। কিন্তু কেউ উত্তর দিতে পারেননি। আপনার চেহারা বলছে, আপনি অবশ্যই উত্তর দানে সক্ষম হবেন। ইলম ও জ্ঞান আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।

মুসা (আ.) বললেন– কি প্রশ্ন?

বিস্ময়কর প্রশ্ন তিনি করলেন– 'যদি আকাশকে ধনুক ধরে নিই, যার মাধ্যমে তীর নিক্ষেপ করা হয় এবং আমাদের উপর অহরহ যেসব বিপদাপদ দুঃখ-কষ্ট আসছে এসবকে যদি তীর ধরে নিই আর আল্লাহ তায়ালাকে তীর নিক্ষেপকারী মনে করি, তাহলে আকার ধারণ করবে এই– আকাশের ধনুক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের উপর তীর নিক্ষেপ করছেন। তখন আত্মরক্ষার উপায় কি? এটাই আমার প্রশ্ন।

বাস্তবিকই মানুষের বিবেক এ প্রশ্নের উত্তর দানে অপারগ। উত্তর দিতে পারবে না। এজন্য যে, আকাশ ধনুক। তাহলে আকাশের নিচ থেকে আপনি কোথায় যাবেন? পৃথিবীর উপর আকাশ আবরণের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আপনি ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আকাশের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যেতে পরবেন না। বিবেক বুদ্ধি যখন চিন্তা ভাবনা করবে তখন বলবে– এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

যদি মেনেও নিই যে আপনি কোন রাস্তা পেয়ে গেলেন এবং আকাশের পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রাজত্বের বাইরে কোথায়ও যেতে পারবেন না। যেখানেই যাবেন সেখানেই আল্লাহর রাজ্য বিদ্যমান। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করবেন, তখন এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের উত্তর দানে মানববুদ্ধি অপারগ। এ কারণেই সকল দার্শনিক ও জ্ঞানীজন উত্তর দানে ব্যর্থ হলেন।

প্লেটো একথাই মনে করছিল যে, তিনিও উত্তর দানে সক্ষম হবেন না। মুসা (আ.) বললেন– 'আত্মরক্ষার অতি সহজ পন্থা রয়েছে। মানুষ শান্তি সহকারে অতি সহজে বেঁচে যেতে পারে।' একথা শুনে প্লেটো বিস্মিত হলেন। সকল দার্শনিক ও চিন্তাবিদ অপারগ হলেন। আর এ ব্যক্তির কাছে উত্তর অত্যন্ত সহজ। তিনি বললেন– 'উত্তর কি?'

মুসা (আ.) বললেন, যখন তীর নিক্ষেপকারী তীর নিক্ষেপ করবে, তখন তাঁর সামনে না দাঁড়িয়ে বরং তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। তাহলে তুমি তীরবিদ্ধ হবে না। বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালা তীর নিক্ষেপ করবেন, তখন আল্লাহ তায়ালার পাশে চলে যাও। আর আল্লাহ তায়ালার পাশ হলো আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যখন নিজের আত্মাকে আল্লাহর যিকির দিয়ে পূর্ণ করে নিবে, তখন তার প্রতি আল্লাহর আস্থা ও বিশ্বাস হয়ে যাবে, হাজারো বিপদের আগমন হোক কিন্তু অন্তরে তার কোন প্রকার কষ্ট অনুভব হবে না। যদি কোন বিপদ এসেও যায় তখন সে বলবে–

هر چه از دوست میرست نیکوست

বন্ধুর কাছ থেকে যাই আসে তাই ভাল।

যেহেতু প্রভু পাঠিয়েছেন, এতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অবশ্যই আমি তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছি। বিপদ তখনই বিপদ হয়, যখন আত্মা আক্রান্ত প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। আর যখন আত্মা সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত থাকে তখন এটাই বলে যে, খোদা আমাকে স্মরণ করছেন। তখন তা বিপদ ও মুসিবত না হয়ে বরং নেয়ামত হয়ে যায়। আমরা রোগ-ব্যাধি ও দরিদ্রতাকে বিপদ মনে করি। এগুলো প্রকৃত বিপদ নয়; বরং বিপদের উপকরণ মাত্র। বিপদ হলো আত্মার প্রতিক্রিয়া। আত্মা যদি পেরেশান হয়ে প্রভাবান্বিত হয়ে যায়, তাহলেই হবে মুসিবত। যদি বিপদ আসে কিন্তু আপনি প্রভাবান্বিত না হন, তাহলে আপনি প্রকৃতপক্ষে বিপদগ্রস্ত নন।

কোন বুযুর্গ যদি কারারুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং বলেন– সুবহানাল্লাহ! কারাবাস আমার কত মহা নেয়ামত। বাইরে মানুষকে দু'বেলা আহারের জন্য কত কষ্ট

করতে হয়, ব্যস্ত থাকতে হয়, এখানে সকাল হতে বিকাল পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকা যাবে। এর চেয়ে উত্তম নেয়ামত আমার জন্য আর কি হতে পারে! তখন ঐ বুযুর্গের জন্য কারাগার বিপদ হবে কেমন করে?

এক ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়লো। তখন সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! যখন ধন-দৌলত ছিল, তখন রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা, চোর ডাকাতের ভয়, সরকারী ট্যাক্স ও করের আতঙ্ক– এসব বিপদ সব দূর হয়ে গেল। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে নির্জনে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকব। 'আল্লাহর শুকর' তিনি আমাকে চিন্তামুক্ত করে দিয়েছেন। তখন এ দরিদ্রতা তার জন্য কোন মুসিবত হল কেমন করে? এ তো নেয়ামত হয়ে গেল। কাজেই প্রকৃতপক্ষে রোগ-ব্যাধি, নিঃস্ব ও দরিদ্রতা এসব বিপদ ও মুসিবত নয়; বরং আত্মা আক্রান্ত হয়ে যাওয়াই হল মুসিবত। যখন 'আল্লাহ' দ্বারা আত্মা প্রভাবান্বিত হয়ে যাবে এবং অন্য কোন জিনিস দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না, তখন সে বিপদগ্রস্তও হবে না।

মোটকথা, মুসা (আ.)-এর উত্তরের সার ছিল এই– যখন বিপদাপদের তীর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তখন আল্লার নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আর আল্লাহর নৈকট্য হলো তাঁর যিকির ও স্মরণ। যখন কেউ তাঁর নিকটবর্তী হয়ে পড়লো তখন বিপদাপদ তার উপর কোন ক্রিয়াই করতে পারবে না।

যে ইলমে আল্লাহর পরিচয় মিলে না তা মূর্খতা

সোজা কথা হলো– সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহলে শত সহস্র জনের তোষামোদ থেকে বেঁচে গেলে। সুতরাং একজনের তোষামোদেই লেগে থাক।

یک دیگر محکم گیر

এ অবস্থা তখনই হবে, যখন ঐ মহান যাত সম্পর্কে সঠিক ইলম লাভ হবে। আমি কার দাসত্ব করব। যদি ইলমই না থাকে তাহলে এদিক সেদিক হতে থাকবে। ইলম দ্বারা কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমাকে এদিক থাকতে হবে। অটল বিশ্বাস হয়ে যাবে, আমাকে অমুকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর মহান যাত হল আল্লাহ তায়ালার বরকতময় যাত, যিনি খালেক ও মালেক। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

'পড়!' কি জাতীয় পড়া পড়বে? ঐ পড়া, যে পড়ায় আল্লাহ তায়ালার নাম আসবে। আল্লাহর পরিচয় লাভ হবে। তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন– Cat বিড়াল, Fan পাখা। এসব দ্বারা জ্ঞান লাভ হল বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ হল না। আপনি যদি এসব বলেন– আল্লাহ ঐ মহান যাত, তিনি খালেক ও মালেক। এখান থেকেই ইলমের সূচনা হল। আল্লাহর যাত সম্পর্কে তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে তার পরিচয়। যখন আল্লাহর মহত্ত্ব মানব অন্তরে স্থান করে নিবে তখন সৃষ্টি হবে তাঁর বন্দেগি ও দাসত্ব করার উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা– সবই সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন– তোমরা অন্যান্য ইলম অর্জন কর বা না কর তা তোমাদের ইচ্ছা, কিন্তু সবার আগে ঐ ইলম অর্জন কর যা দিয়ে মহান প্রভুর পরিচয় লাভ হয়ে যায়। ঐ ইলম কি? নিজ প্রভুর নামে পড়, যিনি তোমাদের প্রতিপালক।

সম্ভব ছিল মাতা-পিতার এ কথা বলার। তারা বলতে পারতো– আমরা লালন-পালন করি, কাজেই আমাদের নামে পড়। আমাদের পরিচয় লাভ কর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বললেন, কোন প্রতিপালকের? যে প্রভু সৃষ্টি করেছেন। তিনি উদ্দেশ্য, মাতা-পিতা সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক নন। প্রকৃত প্রতিপালক একমাত্র স্রষ্টাই। মাতা-পিতা যে লালন পালন করেন, তাও আল্লাহর দয়া। তিনি মাতা-পিতার অন্তরে স্নেহ মমতা রেখে দিয়েছেন। মায়ের অন্তরে যদি সন্তানের প্রতি দয়া স্নেহ মমতা না থাকত, তাহলে কখনো সে সন্তানের প্রতিপালন করতে পারতো না।

কোন স্বামীর যদি দু'জন স্ত্রী থাকে তাহলে যে স্ত্রীর সন্তান সেই পালন করতে পারে। সৎমার পক্ষে এ কাজ খুব কষ্টকর। সৎমার কাছে বাচ্চা যদি যায়, তাহলে বিমাতাসুলভ আচরণ দিয়ে বাচ্চাকে কষ্ট দিবে।

পার্থক্য হল গর্ভধারিণী মায়ের অন্তরে রয়েছে দয়া স্নেহ মমতা এবং সৎ মায়ের অন্তরে রয়েছে হিংসা বিদ্বেষ। এমতাবস্থায় সৎমা দিয়ে সন্তানের প্রতিপালন খুব কষ্টকর। সন্তান প্রতিপালিত হয় দয়া স্নেহ মমতা ও মেহেরবানী দ্বারা। অথচ উভয়ের স্বামী এক হওয়া সত্ত্বেও এমন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কাজেই বুঝতে হবে, আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। কখনো কখনো মাতা-পিতার অন্তরেও শত্রুতা হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। সন্তান যদি চরম অবাধ্য হয়ে নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন করতে থাকে, তখন মাতাপিতা বদদোয়া করেন, বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দেন। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেন না।

এজন্যই আল্লাহ বলেন– ঐ প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টিকর্তা। মাতা-পিতা যদি বলতে চান, আমরাই সৃষ্টিকর্তা, আমরা না থাকলে সন্তান আসতো কোথা থেকে?

আল্লাহ তার উত্তর দিলেন–

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

যিনি জমাট রক্ত হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন...!

মাতা-পিতার মধ্যে এই শক্তি যে তার জমাট রক্তে মানবীয় আকৃতি প্রদান করতে পারেন। মাতৃগর্ভে যে বীর্য পৌঁছে, পিতা কি মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি গঠনের জন্য সেখানে গমন করে? আকৃতি কি সে তৈরি করে? ঐ মহান সত্তাকে যিনি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে প্রতিপালন করে, আকৃতি গঠন করেন এবং এমন পূতঃপবিত্র আকৃতি গঠন করেন। যে অপবিত্র বীর্য থেকে পবিত্রতম বস্তু তৈরি করে দেন। অপবিত্র একটি জিনিস থেকে পূতঃপবিত্র মানুষ তৈরি করে দিলেন। যদি স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে মানুষ তৈরি করতেন তাহলে আল্লাহকে স্রষ্টা বলে কেউ মনে করত না। সবাই মনে করত এসব ধাতুর কারণে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এসব ধাতুরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আল্লাহ অপবিত্র বীর্য ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করলেন মানুষ। তিনি এমন মহান সত্তা যিনি অপবিত্র থেকে পবিত্র এবং পবিত্র থেকে অপবিত্র বের করতে থাকেন। সৃষ্টি করতে পারেন। মাতা-পিতা সৃষ্টির মাধ্যম, স্রষ্টা নন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করে থাকেন। সৃষ্টির মাধ্যম হওয়া এক কথা আর স্রষ্টা হওয়া অন্য কথা।

যখন একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা। যিনি স্রষ্টাও সুতরাং তাঁরই পরিচয় লাভ করা উচিত। ইলম বলা হবে কেবল তাকেই যা দ্বারা মানুষ তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে। শেখ সা'দী (রহ.) বলেন–

علمے کہ راہ حق ننماید جہالب است...

যে ইলম সত্য পথ প্রদর্শন করে না, তা মূর্খতাও বটে। ইলম হলো ঐ বস্তু যা সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, স্বীয় প্রভুর নামে পড় যেন তাঁর পরিচয় লাভ হয়। পরিচয় লাভ হবে কেমন করে?

পরিচয় লাভের উপায়

এরপর পথ ও পন্থা বর্ণনা করলেন–

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

ঐ প্রভুর নামে পড় যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। [আলাক : ৩]

কলম লোহা, কাঠ বা প্লাষ্টিকের হয়ে থাকে। এসবের মধ্যে অনুভূতি বিবেকবুদ্ধি কিছুই থাকে না। কিন্তু কলমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ইলম ও জ্ঞান প্রকাশ পায়, কিন্তু কলম নিজে তা জানে না। কলম হলো চরম মূর্খ। আল্লাহ তায়ালা বললেন, কলম কিছুই না। কলমের মাধ্যমে আমিই ইলম দান ও বিতরণ করি। কাজেই আমার কাছে জিজ্ঞেস কর। কলমকে জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু ইলম পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম বা বাহন হিসাবে কলমকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে মাতা-পিতাকে সৃষ্টির মাধ্যম বানানো হয়েছে। তাঁর স্রষ্টা নন। তাদের কি শক্তি রয়েছে কোন কিছু সৃষ্টি করার? সৃষ্টি করার অর্থ হল অস্তিত্ব দান করবেন কেমন করে? যদি তাদের অস্তিত্ব তাদের হাতেই থাকত তাহলে কখনো তারা মৃত্যুবরণ করাকে মেনে নিত না। কিন্তু সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যখন তাদের অস্তিত্বই তাদের হাতে নেই, তাহলে অন্যদেরকে অস্তিত্ব দান করবেন কেমন করে? আপনি যদি বলেন– তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাহলে তাদের একই অবস্থা। যখন তাদের চলে যাওয়ার সময় এসেছে, চলে গেছে। নিজের সত্তাকে রক্ষা করতে পারেননি। এভাবে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন তাদের কারো অস্তিত্ব তাদের কারো হাতে নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রয়েছেন। যার হাতে সবার অস্তিত্ব রয়েছে।

এজন্য বলেছেন, কলমকে ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যম বনিয়েছে। কিন্তু কলমের সে অনুভূতি নেই। তেমনি মাতা-পিতাকে সন্তান লালন পালনের মাধ্যম করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিন্তু বিশেষ বস্তু নেই, দয়া মেহেরবানী, স্নেহ মমতা আমিই তাদের অন্তরে দিয়েছি যাতে তারা সন্তানের প্রতিপালন করে। সুতরাং ঐ প্রভুর নামে পড় যে প্রভু কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা শিক্ষাদানে কলমেরও মুখাপেক্ষী নন। যবানের মাধ্যমে ইলম পৌঁছিয়েছেন। কথাবার্তার মাধ্যমে, চোখের মাধ্যমে, আকার আকৃতির নড়াচড়ার মাধ্যমে বিশ্বের দৈনন্দিন পরিবর্তন দেখে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। সাবধান কিংবা সতর্ক হয়ে যায়। এসব দ্বারাও জ্ঞান অর্জন হয়। আল্লাহ তায়ালা কলম, যবান ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন। যেভাবে ইচ্ছা ইলম দান করতে পারেন। ঐ বরকতময় সত্তাই পরিচয় লাভের যোগ্য যে সত্তার মধ্যে রয়েছে সর্বময় কামাল ও পূর্ণাঙ্গতা, তাঁরই নামে পড়।

দীর্ঘ আলোচনার সার হচ্ছে এই– কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রথম ধাপই হলো ইলম ও জ্ঞানার্জন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্খতার যে যুগকে খতম করেছেন, তা ইকরা দ্বারা করেছেন। জ্ঞানার্জন দ্বারাই মানুষ উন্নতির পানে অগ্রসর হয়। সে ভাল মন্দ ও আল্লাহর

সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়– এর মাধ্যমে আল্লাহর বন্দেগি করার উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

অধিক ধন-সম্পদ ইলম থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ.

ইলম থেকে বঞ্চিত রাখে কি জিনিস? যখন জীবন উপকরণ সব মানুষের হাতে এসে যায় এবং মানুষ বুঝতে থাকে আমি কারো মুখাপেক্ষী নই, আমি আল্লাহরও মুখাপেক্ষী নই, সম্পদ আমার হাতে রয়েছে। এখন আমি ক্ষমতাবান, এখন আমার জন্য আল্লাহর কি প্রয়োজন? যখন আল্লাহরই কোন প্রয়োজন নেই, তখন আল্লাহর ইলম ও জ্ঞানের কি প্রয়োজন? ইলম হতে বঞ্চিত রাখার প্রধান কারণ দৌলতের প্রাচুর্যই হয়ে থাকে। যখন মানুষের অন্তরাত্মা সম্পদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্পদকে মনে করবেন খাদেম ও সেবক মাত্র, আল্লাহ নয় এবং একথাও বিশ্বাস করবেন, এ সম্পদ আমার নয় আল্লাহর। তাঁরই নির্দেশানুযায়ী আমাকে সম্পদ ব্যয় করতে হবে। যখন একথা গ্রহণ করে নিবেন তখন খোদার মর্জি জানার প্রয়োজন দেখা দিবে– কিভাবে ব্যয় করাকে তিনি পছন্দ করেন, তাঁর উদ্দেশ্য কি? আমি কাকে দান করব? তখন তার চিন্তা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি জেনে নেয়া। তখনই শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিবে। শরীয়তের ইলম এসে যাবে, যা দ্বারা জানা যাবে আল্লাহ অমুক কাজে সন্তুষ্ট ও অমুক কাজে অসন্তুষ্ট।

আহলে হক পরিচয় লাভের যোগ্য

আর এ শিক্ষা প্রদানের জন্য বুযুর্গানে দীন দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে আমি বলেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে পরিচিতি তাঁদের হওয়া উচিত। আমাদের মত মানুষের পরিচিতি আবার কি? আমাদের মত হাজারো নালায়েক তাঁদের খাদেম। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই পরিচিতির যোগ্য। তাঁরা তাঁদের পরিচিতি জারি করে দিয়েছেন। ইলমের একটি ঝরনা স্থাপন করে দিয়েছেন। বিগত শত বছরের দারুল হতে ত্রিশ হাজার আলেম তৈরি হয়েছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী, মাওলানা মুফতী কেফায়েত উল্লাহ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মত

হাজার হাজার প্রাজ্ঞ আলেম হয়েছেন। তারাই প্রকৃত পরিচিতির যোগ্য। তাঁরা ইলমের ঝরনা। আমরা তাঁদের নাম নিয়ে নিজেদের পরিচয় বর্ণনা করি। তাদের কারণে মানুষ আমাদের পরিচয় করে নেয়। তাঁদের পরিচয় যদি না থাকত তাহলে আমাদেরকেই চিনত না।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) আমাদের হাদীসের উস্তাদ। ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে, অনেক সময় পিয়ার করে 'জাহেলীন' বা মূর্খ বলতেন। জাহেলীন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের রুটি লাভ হত। তাঁর নাম উচ্চারণ করি বলেই মানুষ আমাদেরকে আদর করে রুটি দান করে। আমাদের রুটি তাঁর নামেরই বরকত। তাঁর নাম যদি না থাকে, তাহলে আমাদের রুটিও থাকবে না।

সুতরাং পরিচিতির যোগ্য নবী ও রাসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উলামায়ে রাব্বানী; আমাদের মত মানুষের কি যোগ্যতা যা ব্যক্ত করে পরিচয় লাভ করা যাবে?

যেহেতু দারুল উলুম দেওবন্দের আলোচনা এসে গিয়েছিল, তাই আমি এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলাম। কথা হলো কোন আলোচ্য বিষয় থাকা দরকার। আমি আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কি বর্ণনা করব? কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আল্লাহ তায়ালা আমার শ্রদ্ধেয় ভাইকে উত্তম জাযা দান করুন। তিনি আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে আরজ করতে সক্ষম হলাম। সারকথা, এ হলো তাদের শিক্ষা, তাদের পরিচিতি–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ.

নিজ প্রভুর নামে পড়। মূর্খতা ও মূর্খতার যুগকে খতম কর।
[আলাক : ১-২]

ইলম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাহেলিয়াতের মিল্লাত ও অবমাননা দূর হবে। আর এর স্থলে আগমন করবে, মানসম্মান, ইজ্জত অব্রু। বর্তমান যুগেও উপর্যুক্ত পন্থায় অপমান ও হীনতার স্থলে মানসম্মান আসতে পারে। ঐ যুগে সেসব পরিবর্তন হয়েছিল তা আজও হতে পারে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

اج بھی ہو ابراہیم کا ایماں پیدا ☆ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

আজও যদি আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত ঈমানদার হতে পারি তাহলে আগুন আজও শীতল ও শান্তিদায়ক হতে পারে। ঐ আগুন যা সব কিছু

জ্বালিয়ে ভস্ম করার জন্য উত্তপ্ত করা হয়েছিল। ঐ আগুন সুশীতল হয়ে চির বসন্ত হয়ে যেতে পারে। আমাদের অন্তরকে প্রথমে পরিবর্তন করে নিতে হবে। এভাবে কাজ চলবে না যে আমরা নিজ স্থানে অনঢ় থাকব, আর মনে করব অমুক বস্তুটি পরিবর্তিত হয়ে যাক। রাজ্যে বিপ্লব হয়ে যাক। আর আমরা কিন্তু নিজ স্থানে অনঢ় থাকব। আপনি এমন কুতুব আসলেন কোথা থেকে? পৃথিবী উলট পালট হয়ে যাবে, আর আপনি তৎপর হবেন, তখন দুনিয়াও তৎপর হবে। এ কয়েকটি কথা আমার আরজ করার ছিল। এগুলোকে আপনারা ওয়াজ নসিহত মনে করুন। অভিযোগ ও চিকিৎসা মনে করুন। আপনাদের ইচ্ছা, তবে দরকারি সব কথা এসে গেছে।

নারীর দ্বারা পরিবারে শিক্ষা আসতে পারে

আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার বোনদেরকেও উদ্দেশ্য করে বলছি– সন্তানের জন্য সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ও শিক্ষাগার হল তার মায়ের কোল। যদি মায়ের কোলে ইলম থাকে, তাহলে মনে করুন সন্তান আলেম হবে। মায়ের কোলে যদি জ্ঞানবুদ্ধি থাকে, তাহলে বাচ্চাও বুদ্ধিমান হবে। কাজেই আমাদের মা ও বোনদের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তারা যেন তাদের কোলকে ইলম দিয়ে সাজিয়ে নেন। নিজেরা মাসাইল শিখে নেন। বাচ্চারা প্রথম যা শিখবে তাদের কাছেই শিখবে। মায়ের মুখে যদি ইলম বা জ্ঞানের আলোচনা থাকে, তাহলে বাচ্চা সে আলোচনাই করবে। আর মা যদি মূর্খ হয় তাহলে সন্তানও মূর্খতা নিয়ে বেড়াবে। এজন্য আমাদের বোনদের জন্য এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য নিজেদের সংশোধন করে নিজেদের শিক্ষিত করে নেয়া খুবই প্রয়োজন। আপনারা ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করুন। আপনারা যদি ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তাহলে পুরুষরা এ ব্যাপারে মনোযোগ না দিয়ে পারবে না। স্বামীরা হলেন তাদের কৃতদাস। সুখ-দুঃখের যত রসুম ও প্রচলন রয়েছে সেগুলোর কারণে মুসলমান সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। যখন জিজ্ঞাসা করা হবে– ভাই, আপনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়ে এ কি করছেন? তখন উত্তর দিবেন– গিন্নীকে মানাতে পারি না। মনে করেন এ অবস্থায় গৃহিণীরাই সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন। তাদের থেকে নির্দেশ জারী হবে। আর পুরুষদের কাজ হবে আদেশ পালন করে যাওয়া। তারা আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তারা যেন অনুগত্যের দাস। তাই আমি বলছি, মহিলাগণ যদি পুরুষদেরকে সৎকাজে নিয়োজিত করতে চান, তাহলে ভাল ও সৎকাজে লেগে যাবে। মহিলাদের যখন পোশাক পরিচ্ছদ বা অলংকার তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা তাদের দাবী পূরণ না হওয়া

পর্যন্ত সব কিছু করতে থাকেন। বিক্ষোভ-অনশন সবই করেন। স্বামী তখন চুরি ডাকাতি করে হলেও তাদের দাবী পূরণ করেন। যদি মহিলাগণ স্বামীকে বলেন– আপনি যে পর্যন্ত সকাল বেলা এক পারা কুরআন তেলাওয়াত না করবেন, নামায না পড়বেন, আমি খানা তৈরি করে দেব না। কাপড় সেলাই করে দেব না। তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাই নামাযী হয়ে যাবেন। তেলাওয়াত করতে লেগে যাবেন। আপনারা যখন জেদ করে পার্থিব দাবী আদায় করে নিতে পারেন, তখন জেদ করে দীনি ও ধর্মীয় দাবী আদায় করেন না কেন? আমরা অনেক পরিবার দেখেছি, দীনদার ধর্মপরায়ণ স্ত্রী স্বামীকে বাধ্য করে দীনদার করে দিয়েছে। আর ধর্মহীনা স্ত্রী এসে স্বামীকে ধর্মহীন করে দিয়েছে। স্ত্রীর প্রভাবে স্বামী প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। কাজেই স্ত্রী যদি তার প্রভাবকে যথাযথভাবে সঠিক স্থানে ব্যবহার করে, তাহলে তার নিজের স্বামীর এবং সন্তানেরও দীন-দুনিয়া, ইহ-পরকাল উজ্জ্বল হয়ে যাবে। আমি ঐ কাজ করব না– তখন স্বামী বাধ্য হবে এজন্য যে, তার হাতে পাকঘর। কাজেই তার কাছে সবাই অপারগ হতে বাধ্য। প্রসিদ্ধ প্রবাদ– 'যার হাতে পাকঘর পাকের বাসনপত্র, তার হাতে সব কিছু।'

পুরুষ ঘরে বসে খাবার তৈরির কাজ করতে পারবে না। সে ক্ষেতে খামারে দোকানে অফিসে রোজগার করবে। সে খাবার তৈরি করবে কেমন করে? এটা হলো মহিলাদের কাজ। যদি মহিলাগণ এ কাজ ত্যাগ করে বলেন, অমুক কাজ না করা পর্যন্ত আমরা খাবার তৈরি করব না, তাহলে পুরুষরা সে কাজ করতে বাধ্য হবেন। স্বামীর উপর যখন নির্দেশ জারী করবে, তখন কিছু ধর্মীয় নির্দেশ জারী কর। শুধু পোশাক অলংকারের জন্য নির্দেশ জারী করো না। কখনো কখনো দীনি কাজের জন্যও এসব অনুগতদের উপর নির্দেশ জারী করে দাও। তারা অনুসরণ করতে বাধ্য। তাই আমার বোনদের খেদমতে কয়েকটি কথা আরজ করতে হচ্ছে। তারা যেন এদিকে লক্ষ্য করেন। তারা যদি পুরুষ সমাজকে উৎসাহিত করেন তাহলে তারা খুব সহজে উৎসাহী হয়ে কাজে লেগে যাবেন। তারা অধিক প্রভাবান্বিত হবেন। যখন মহিলাগণ বলবেন, শিক্ষা গ্রহণ কর– অথচ তাদের কাজ গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকা– তখন পুরুষ চিন্তা করবে। আমার ঘরের প্রতিটি বালুকণায় শিক্ষার আলো এসে যাচ্ছে। এখন আমি শিক্ষা ছাড়া থাকব কেমন করে! স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সবাই বলতে শুরু করছে। এখন যদি আমি একাজ না করি, তাহলে যাব কোথায়? বাধ্য হয়ে একাজ শুরু করবে। তাই আমি আমার বোনদের নেহায়েত আদবের সঙ্গে আবেদন করছি– আপন আপন স্বামীকে দীনদার ধর্মপরায়ণ করে নেয়ার জন্য সময়ে কিছু জিদ অভিমান করে

নিন। পার্থিব কারণে যেসব মান-অভিমান করা হয় তা দীনের জন্যও করুন। তাহলে পরিবারের মধ্যে দীনের আলো এসে যাবে।

নইলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণ (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের যুবকগণ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সাহাবীগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। কেননা তাঁদের ঐ যুগ সম্পূর্ণ কল্যাণ ও বরকতের যুগ ছিল, পাপমুক্ত যুগ ছিল।

قَالُوْا وَاِنَّ ذٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! এমন যুগও আসবে– আমাদের মহিলাগণ আযাদ (উচ্ছৃঙ্খল) হয়ে যাবেন? আমাদের যুবক ছেলেরা দুষ্ট পাপিষ্ট হয়ে যাবে? দীন-ধর্মের অনুসরণ করবে না? قَالَ نَعَمْ وَ اَشَدُّ বলবেন– হ্যাঁ, এসবই হবে এবং এর চেয়েও জঘন্য কাজকর্ম হবে।

كَيْفَ بِكُمْ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ঐ যুগে তোমাদের কি (করুণ) অবস্থা হবে, যখন তোমরা সৎ ও ভাল কাজের আদেশ দেয়া ত্যাগ করবে? অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ ও বাধা প্রদান ত্যাগ করবে। তোমাদের সামনে মন্দ কাজ হবে, বাধা দেয়ার তাওফিক হবে না কারো। যেহেতু নিজেরা পাপাচারে লিপ্ত, অসৎ ও গর্হিত কাজে সদা ব্যস্ত, অন্যদেরকে কি বলবেন? 'আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' ত্যাগ করা হবে। এবার সাহাবা (রা.) আরো বেশি বিস্মিত হলেন। বললেন–

قَالُوْا وَاِنَّ ذٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! এমন দিনও আসবে, যখন সৎকাজের উপদেশ প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নিষেধ বাধা কিছুই থাকবে না? قال نعم واشد হ্যাঁ, এমন হবে এবং এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে।

كَيْفَ بِكُمْ اِذَا اَمَرْتُمْ بِا لْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوْفِ

যখন তোমরা অসৎ ও মন্দ কাজে আদেশ করবে এবং সৎ ও ভাল কাজে নিষেধ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরো বিস্মিত হলেন। বললেন–

قَالُوْا وَاِنَّ ذٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! এমন সময়ও হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

قَالَ نَعَمْ وَاَشَدُّ

হ্যাঁ, হবে এবং আরো জঘন্য কাজকর্ম হবে।

كَيْفَ بِكُمْ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوْفَ مُنْكَرًا وا لْمُنْكَرَ مَعْرُوْفًا

সে যুগ কেমন হবে, যখন সর্বকালের ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলা হবে? কাজকর্ম যখন পরিবর্তিত হয়ে মানুষ অসৎ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। তখন চিকিৎসা হলো পুনরায় নেক কাজে ফিরে আসা। নেক কাজ শুরু করে দিবে। শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ করতে থাকবে। নবীগণ (আ.)-এর শিক্ষা গ্রহণ করতে লেগে যাবে। তখন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

নবীদের শিক্ষাই প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে

বর্তমান যুগের বিজ্ঞান চোখ ঝলসে দিয়েছে। বিদ্যুতের মাধ্যমে শহর বন্দর আলোকময়। মহাশূন্যে বিমানে বিচরণ। নদ-নদী, সাগর মহাসাগরে বিরাট জাহাজে করে পরিভ্রমণ। জলে-স্থলে, অন্তরিক্ষে অবাধ যাতায়াত। সবই সত্য; কিন্তু স্মরণ রাখবেন, বিজ্ঞান ভালো ও উন্নত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে পারে বটে, কিন্তু উন্নত মানুষ তৈরি করতে পারে না। নবীগণের শিক্ষাই কেবল উন্নত মানুষ তৈরি করতে পারে। এ শিক্ষা দিয়ে স্বভাব-চরিত্র উন্নত, নৈতিকতা এবং আখলাকে রব্বানী পয়দা হয়। আমি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করছি না। জাহাজ স্টিমার তৈরি করুন। কিন্তু নিজেকে নিজের চরিত্রকে গঠন করুন। আকবর এলাহাবাদী কি চমৎকার কথা বলে গেছেন–

تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو ☆ جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ چھولو

হাজার ফুল ফুটিয়ে উপরে চলে যাও। চাঁদে চলে যাও। আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার একটি কথা স্মরণ রাখ, আল্লাহকে এবং নিজের মূলকে ভুলে যেয়ো না। তিনি দুটি জিনিস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের উপর এবং নিজের হীনতার উপর। অর্থাৎ আমরা একবিন্দু অপবিত্র পানি (বীর্যে)

ছিলাম। অন্য কিছু নয়। তাই নিজের মূলকে ভুলো না। আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বকে অন্তর থেকে মুছে ফেলো না। যখন এ দুটি জিনিস স্মরণ থাকবে, তখন বিজ্ঞানের তৈরি উন্নত দ্রব্য সামগ্রীও ভালো হয়ে যাবে। আমাদের অন্তর যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে বিমান, সামুদ্রিক জাহাজও ইসলামী হয়ে যাবে। আর যদি অন্তর কাফের হয়ে থাকে, তাহলে সব জিনিসই কাফের হবে এবং ক্ষতিকর হবে। নিজেকে ঠিক করে নাও। আসবাবপত্র তো ঠিক আছেই। এগুলোকে ঠিক করতে হবে না।

আমরা চাই বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বের সব জিনিসের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হোক। ঐ মানুষ কী করতে পারে, যে নিজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তার প্রবৃত্তি তার অধীন নয়, প্রবৃত্তির লাগাম তার হাতে নেই। প্রবৃত্তি হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে চাইলে, সে তাতে রাজী হয়ে যায়। প্রবৃত্তি একটি না-জায়েয কাজ করতে উদ্যত হলে সে তাতে রাজী হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, প্রবৃত্তিকে অধীন করতে পারে না, সে বিশ্বকে অধীন করবে কি করে? আজকে প্রতিটি জাতি সম্পূর্ণ বিশ্বকে করায়ত্ব করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার প্রথম কর্তব্য হলো নিজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথমে পৃথিবীর ব্যবস্থা ঠিক করে নাও, তার পর আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেল। পৃথিবীর উপর কাক উড়ছে, আর আকাশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে? যে ব্যক্তি মাটিকে ঠিক করতে পারেনি, সে আকাশ নিয়ে কি করবে?

যাক! এ কয়েকটি কথা ভাই-বোনদের খেদমতে আরজ করলাম। নিজের সংশোধনের চিন্তা করুন, আল্লাহর ইলম ও আখলাক শিক্ষা করুন, আসবাবপত্র সংগ্রহ করুন। এতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নিজের আত্মশুদ্ধির পরই এগুলো উপকারী হবে।

এখন দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সত্য সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন!

اللهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابُ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ৫

সৎকাজ

আল্লাহ তায়ালা যেমন মানুষের উপকারের জন্য আরো অনেক সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছেন, ধন-সম্পদও ব্যবহারের জন্য উপকরণ বিশেষ। একে ব্যবহার করবে এবং আল্লাহর শুকর আদায় করতে থাকবে। নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বানাবে না। তা না হলে যখন ত্যাগ করে দেয়ার সময় আসবে তখন সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, একে দীন ও দীনি কাজের মাধ্যম ও সেবক করে দিয়েছেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰه مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰه مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এটা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত, যা আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের আমলের জন্য

উৎসাহিত করেছেন। আমলী জিন্দেগী গ্রহণ শুধু বাক্যালাপের ব্যাপারে নয়। পরকালের জিন্দেগির জন্যও তা যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত আমলের জন্য মানুষের মধ্যে প্রচেষ্টা ও তৎপরতা না হবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্যের উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আমি এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি কথা আরজ করতে চাই।

আয়াতের বিষয়বস্তু আলোচনার আগে এ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ উদাহরণ দ্বারা আয়াতের বিষয়বস্তু খুবই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেননা উদাহরণের মধ্যে এর বিশেষত্ব রয়েছে। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম বিষয়ও যদি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়, তাহলে তা পরিস্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইসলামের এ বিশেষ শক্তি আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)কে দান করেছেন। তাঁরা সূক্ষ্ম বিষয়কেও উদাহরণ দিয়ে এভাবে বুঝিয়ে দেন যে, অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তিও তা বুঝে নিতে পারে। উদাহরণ বর্ণনার এ বিশেষ গুণ সর্বপ্রথম আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)কে প্রদান করা হয়েছিল, তার পর তাঁদের বরকতে আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে রব্বানীর মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি হয়েছে।

উদাহরণ সুস্পষ্ট প্রমাণ

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা স্মরণ হলো। তাঁর নাম আপনারাও শুনে থাকবেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে গেছেন।

তাঁরই একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ আমার স্মরণ হলো। তাঁর মুরিদগণের মধ্যে 'আল্লাহ দীন' নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমিও দেখেছি। অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। অক্ষর জ্ঞানও তার ছিল না। গোশত বিক্রির দোকান ছিল তার। যেহেতু তিনি অশিক্ষিত ছিলেন, তার ব্যবসাও এমন ছিল যেখানে লেখাপড়ার দরকারই হতো না। গরু-মহিষ জবাই করে গোশত বিক্রি করা ছিল তার ব্যবসা। তিনি হযরত মাওলানার হাতে বয়াত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাকে দেখেছি ধর্মীয় জ্ঞানবুদ্ধি এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে, বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যেও তা দেখা যায় না। যা ঐ অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে মুহব্বত ও সাহচর্যের বরকতে পয়দা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, হযরত নানুতবী (রহ.) এক মজলিসে বসাছিলেন। গরমের সময় ছিল। প্রায় দেড়শ'র

মত মানুষ হযরতের মজলিসে উপস্থিত। আমি হযরতের কাছে একটি প্রশ্ন পেশ করলাম– হযরত! আমরা শুনে থাকি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– মরণের পর বুযুর্গানের কবরের আশপাশে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ওলীদের মাজারের কাছে নিজেদের কবরের জন্য চেষ্টা করবে। এতে উপকার কি? আসলে মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, নেক আমল তার সঙ্গে থাকে, তাকে যে কোন স্থানে দাফন করে দেয়া হোক, তার নেকী ও পুণ্য তার সঙ্গে রয়েছে। তার কবর আলোকময় হয়ে যাবে। শান্তি নিকেতন হয়ে যাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির বদআমল ও মন্দ স্বভাব থাকে, তাহলে তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাফন করে দিলেও তার বদ ও মন্দ আমলই সামনে আসবে। কাজেই আম্বিয়া (আ.) ও আউলিয়াদের কবরের কাছে বা আশপাশে দাফন করলে কী উপকার হবে?

এ হলো তার প্রশ্ন। এখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি মূর্খ অশিক্ষিত, অক্ষর জ্ঞানও তার নেই। অথচ আলমে বরযখ সম্পর্কে তার প্রশ্ন, এখন তাকে যদি ঐ আমলের বিষয় বুঝানোর জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইলাজী কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে সে কিছুই বুঝবে না। কারণ সে মোটা বুদ্ধির মানুষ।

মাওলানা তাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন। উদাহরণ দিয়ে প্রশ্নটি বুঝানোর কারণে অশিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝে নিতে সক্ষম হলো এবং উপস্থিত অন্যরা বুঝে নিলেন। প্রশ্ন করার পর হযরত মাওলানা বললেন– আচ্ছা, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। প্রশ্নকারীও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। গরম ছিল খুব বেশি। প্রশ্নকারী পাখা নিয়ে হযরতকে বাতাস করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তার স্মরণও নেই, আমি কি প্রশ্ন করেছিলাম। পনের বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

হযরত মাওলানা তাকে জিজ্ঞেস করলেন– মিয়া আল্লাহ দীন! তুমি পাখা দিয়ে কার জন্য বাতাস করছ? উত্তর দিলেন– হযরত! আপনাকে বাতাস করছি। হযরত বললেন– 'মজলিসে যারা আমার সাথে বসে আছেন, তাদেরকে তো বাতাস করছ না! বললেন– না হযরত, তাদেরকে বাতাস করছি না। আমি তাদের শাগরিদ, মুরীদ কিছুই নই। এরা সবাই আমার সমপর্যায়ের। তাদেরকে বাতাস করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি কেন তাদের খাদেম হবো। আমি কেবল আপনাকে বাতাস করার জন্য দাঁড়িয়েছি।

হযরত মাওলানা বললেন– বাতাস কি সবার গায়ে লাগছে?

– জি হ্যাঁ, বাতাস তো সবার গায়ে লাগছে।

হযরত বললেন– এ হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর।

তুমি এ প্রশ্ন করেছিলে যে আম্বিয়া ও আউলিয়াদের পাশে দাফন করার উপকারিতা কি। উপকার হলো আউলিয়াদের কবরের উপর রহমতের বাতাস প্রবাহমান থাকে। রহমতের বাতাস নাযিল হয়। মূল উদ্দেশ্য ওলীগণই হয়ে থাকেন; কিন্তু আশপাশে যারা থাকেন, বাতাস তাঁদের গায়েও লাগে। রহমতের প্রতিক্রিয়া সবার উপর হয়। এজন্যই তাদের কাছে দাফন করার জন্য বলা হয়েছে। চেষ্টা কর নেককারদের, ওলী-দরবেশদের পাশে দাফন হওয়ার জন্য। রহমতের বাতাস তাদের উপর বয়ে যাবে। আশপাশে যারা থাকবে তাদের গায়ে লেগে যাবে। যদিও তারা লক্ষ্য নয়। উদ্দেশ্য কেবল কামেল ব্যক্তি বা ওলী দরবেশ। হযরত মাওলানা বললেন– এ হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর। আলমে বরযখ ও কবর সম্পর্কিত প্রশ্নকারী অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিল। উদাহরণ দিয়ে উত্তর প্রদান করে সূক্ষ্মতম বিষয়কে তার বোধশক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিত সবাই বুঝে গেলেন। সুতরাং এমন একটি সূক্ষ্ম মাসআলা যা কোনভাবেই বোধগম্য হয় না। তা উদাহরণের মাধ্যমে অতি সহজে বোধগম্য হয়ে গেল।

ঐ আল্লাহ দীন হযরতের কাছে আর একটি প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত নানুতবী (রহ.) মুজাফফরনগর গিয়েছিলেন। দেওবন্দ থেকে ষোল মাইল দূরের একটি জেলা। হযরতের মুরিদ ডাঃ আবদুর রহমান। তিনি কারাগারের ডাক্তার ছিলেন। কারাগারেই তার চেম্বার ছিল। হযরত ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কারাগারের দিকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ দীনও সঙ্গে ছিলেন। অন্যরাও ছিলেন। সে এবার আগের চেয়েও সূক্ষ্ম প্রশ্ন করল। বাস্তবিক সূক্ষ্ম প্রশ্ন করা সকলের কাজ না। কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَلسُّؤَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ

প্রশ্ন করার জন্য অর্ধেক ইলমের প্রয়োজন। অশিক্ষিত ও মূর্খ ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারবে না। কিছু না কিছু ইলম ও জ্ঞান থাকতে হবে। তারপরই প্রশ্ন করতে পারবে। মূর্খ ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে, তাহলে তার প্রশ্নই বুঝা যাবে না। আল্লাহ দীন অশিক্ষিত ছিল, কিন্তু সুহবত ও সাহচর্য লাভ করেছিল। তাই তার অন্তরে অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্ন উদিত হত। তার প্রশ্নের উত্তরে ইলমের দ্বার উন্মুক্ত হত, তখন সবাই উপকৃত হতেন।

হযরত মাওলানা কারাগারের দিকে যাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তিও সঙ্গে ছিলেন। প্রশ্ন

করলেন– 'হযরত! এ কথাটি বুঝে আসে না যে, নবীগণও ভবিষদ্বাণী করেন, ওলীগণও করেন। নবীগণও বলে থাকেন, এমন এমন ঘটনা সংঘটিত হবে, সময়কালও নির্ধারিত করে দেন, একশ' বা দুইশ' বছর পর এমন হবে। যেমন- হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন– আমাকে আমার উম্মতের বয়স পাঁচশ' বছর দেখানো হয়েছে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– হাজার বছর দেখানো হয়েছে। পাঁচশ' ও হাজারের অর্থ কি উলামায়ে কেরাম তা বলেছেন, আমার তা বলা উদ্দেশ্য নয়। অর্থ হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং সময়কালও ঠিক করে দিয়েছেন, পাঁচশ' বছর পর ঐ ঘটনাও হাজার বছর পর সংঘটিত হয়েছে।

আল্লাহ দীন বলল, নবীগণ ভবিষ্যদ্বণী দেন, সময়কাল নির্ধারণ করে দেন। নির্ধারিত সময়ে ঐ কাজ হয়েও যায়। কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরাম ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সময় নির্ধারণ করে দেন, কিন্তু কোন সময় নির্ধারিত সময়ের আগে আবার কোন সময় পরও ঘটনা ঘটে যায়। ঠিক সময়ে হয় না। তাহলে কি ওলীগণ ভুল দেখেন? তারা কি ভুল কথা বলেন, মিথ্যা কথা বলেন। তাঁদের বর্ণিত সময়ে যখন কাজ হয় না, আগে পরে হয়ে যায়, বোঝা গেলো, তারা ভুল সংবাদ দেন। যারা ভুল সংবাদ বা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেন, তারা ওলী হবেন কেমন করে? তাহলে নবীগণ যা বলেন, তা নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হয়ে যায়। একথাও বুঝে আসে না। নবী ও ওলীদের কথায় এমন পার্থক্য কেন? ওলী কি বুঝতে পারেন না, অথবা তারা ভুল করেন, অথবা তারা সার্বিকভাবে জানতে সক্ষম হন না? তারা যখন সঠিক জানেন না, তা হলে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়ার প্রয়োজন কি?

প্রশ্নটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। নবী ওলীগণের কাশফ সম্পর্কে প্রশ্ন। একজন অশিক্ষিত মানুষ প্রশ্ন করছে। সে কাশফ ও কাশফের সময়কাল সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই তার নেই।

এখন হযরত মাওলানা কাশফের হাকিকত কাশফের সময়কাল সম্পর্কে যদি আলোচনা করতেন, তাহলে ঐ অশিক্ষিত ব্যক্তি কিছুই বুঝতে পারবেন না। তিনি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে হযরতের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। তাই হযরত তার উপযোগী উত্তর দান করলেন এবং কাশফ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিষয় উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন– মিয়া আল্লাহ দীন! ঐ সামনে যে দালানটি দেখা যাচ্ছে, দালানটি কি? সে উত্তর দিল কারাগার। তখন কারাগারে পৌঁছার পথটি দুই ফার্লং দূরবর্তী ছিল। হযরত মাওলানা বললেন, ঐ ইমারতটি কি নিশ্চিতই কারাগার?

- জি হ্যাঁ নিশ্চিত কারাগার? আমি শপথ করে বলতে পারি এটা কারাগার।

জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে কি পরিমাণ দূরে হবে?

তিনি বললেন, অনুমান চারশ' গজ দূরে হবে।

মাওলানা বললেন– চারশ'র স্থলে তিনশ' পঁচানব্বই অথবা চারশ' পাঁচ গজ হতে পারে?

বললেন– জি হ্যাঁ তাও হতে পারে। এ তো হলো আমার অনুমান। পাঁচ গজ কম বা বেশি হওয়া অসম্ভব কিছু না। কিন্তু এটা কারাগার তা নিশ্চিত। মাওলানা নীরব হয়ে গেলেন এবং সামনে চলতে লাগলেন।

যখন তারা কারাগারের গেটের কাছে এসে গেলেন, কারাগারের প্রাচীর এক গজ দূরে, তখন বললেন– আল্লাহ দীন! এ ইমারতটি কিসের? বললেন, কারাগার।

- যা বললেন, ঠিক তো?

-জি হ্যাঁ। এখন আরো বেশি নিশ্চিত।

বললেন, দূরত্ব কি পরিমাণ হবে?

তিনি বললেন– এক গজ।

মাওলানা বললেন– দেড় গজ বা পৌনে দু'গজ হতে পারে?

তিনি বললেন– না, ঠিক এক গজ। আপনি যদি বলেন, আমি মাপ দিয়ে দেখিয়ে দেব।

মাওলানা বললেন– নবী ও ওলীদের কাশফের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। আর এটাই হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর। নবী যা দেখেন ওলীও তাই দেখেন। কিন্তু ওলী দূর থেকে দেখেন এবং নিজের জ্ঞান দ্বারা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করেন। এতে এদিক সেদিক, কমবেশি হয়ে যায়। আর নবীগণ দৃশ্যমান বস্তুর নিকটতম স্থানে পৌঁছে থাকেন এবং সময় ঠিক করেন, তা সম্পূর্ণ মাপ জোক করা থাকে। এতে কমবেশি হয় না। যেমন তুমি দু'ফার্লং দূর থেকে বলেছিলে চারশ' গজ হবে। কিন্তু চারশ' গজ থেকে পাঁচ গজ কম বা বেশিও হতে পারে। আর যখন কারাগারের কাছে পৌঁছে গেলে তখন তুমিই বললে, এক গজের স্থলে পৌনে এক গজ বা সোয়া গজ হতে পারবে না; এক গজই হবে। নবী ও ওলীদের কাশফে এই পার্থক্য।

কত সূক্ষ্ম বিষয় ছিল, কিন্তু মাওলানা কত সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ঐ অশিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝে নিল, আমাদের মত মূর্খ যারা তারাও উপকৃত হলো। তিনি যদি প্রশ্ন না করতেন তবে আমরাও বুঝতে সক্ষম হতাম না। অতএব

উদাহরণ ও উপমা দিয়ে আম্বিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.)গণ জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি মোটা বুদ্ধির মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর আরেকটি ঘটনা। একবার তিনি মোজাফফরনগর গেলেন। গাড়ী পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি স্টেশনে বসে গাড়ীর অপেক্ষা করছিলেন। ঐ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার একজন হিন্দু ছিলো। তার খুব গর্ব ছিল যে, অঙ্কশাস্ত্রে তার মত পণ্ডিত অন্য কেউ নেই। তিনি জানতে পারলেন হযরত নানুতবী (রহ.) স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছেন। হযরত মাওলানাও অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি জ্যামিতির অনেক বিষয়ের উপর মতানৈক্যও করেছেন অথচ সর্বজনগ্রাহ্য কথা হলো, জ্যামিতির নিয়ম-নীতির উপর কোন আপত্তি চলে না। হযরত যখন এতেরাজ ও আপত্তি উথাপন করলেন, তখন ঐ সময়ের জ্যামিতির বিশেষজ্ঞগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। ঐ হিন্দু পণ্ডিত যখন জানতে পারল হযরত মাওলানা স্টেশনে বসে আছেন, সে তৎক্ষণাৎ এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, কিছু আলাপ আলোচনাও করলো। এক পর্যায়ে সে বললো– হযরত! আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আমার প্রশ্ন হলো– মুসলমানগণ দাবী করেন, 'লাওহে মাহফুজে' সকল জিনিস লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজকর্ম নড়াচড়া সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে। একজন মানুষের সুদীর্ঘ জীবনে হাজারো লাখো ঘটনা রয়েছে। এখন যদি প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি হু হ্যাঁ লেখা হয়, তাহলে লাওহে মাহফুজ কত বিরাট কত বিস্তৃত হবে! এজন্য সে এসে সকল মানুষের এবং জীবজন্তু বৃক্ষলতা, মাটি, পাথরের সকল ঘটনা, এক একটি পাথরের নড়াচড়া, এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন, সবকিছু যখন লেখা রয়েছে তখন 'লাওহে মাহফুজ' কত বিরাট হবে! ঐ লাওহে মাহফুজ কোথায় রাখা হয়েছে? আকাশ যতই বিশাল হোক না কেন, লাওহে মাহফুজে আকাশ সম্পর্কেও লেখা রয়েছে। সুতরাং এত বিরাট লাওহে মাহফুজ রাখার স্থান কোথাও হতে পারে না। এই হলো তার প্রশ্ন।

হযরত মাওলানা বললেন– মশাই! আপনার বয়স কত? সে বললো– ষাট বছর। আপনার জীবনের ষাট বছরে অনেক অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকবে?

– হ্যাঁ, অনেক ঘটেছে।

মাওলানা বললেন– কিছু ঘটনা আপনার অবশ্য স্মরণ আছে?

– জি হ্যাঁ, অনেক স্মরণ আছে। বাল্যকালের চার পাঁচ বছর ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট জীবনের অনেক ঘটনাই মনে আছে। আমার স্মরণশক্তি অনেক প্রখর ছিল। সব

ঘটনাই আমার স্মৃতিপটে রয়েছে।

মাওলানা বললেন– আপনি যদি এসকল ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন তাহলে কি পরিমাণ কাগজের প্রয়োজন হবে?

সে বললো– আমি যদি লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করি তাহলে তা দশ বিশ পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

মাওলানা বললেন– দীর্ঘ জীবনের এত ঘটনা আপনি কোথায় সংরক্ষণ করে রেখেছেন? কোথায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? যা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারেন?

তিনি বললেন– আমার মস্তিষ্কে সবই সংরক্ষিত রয়েছে।

মাওলানা বললেন– এত দীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলী যদি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন তাহলে কাগজ কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। অথচ মস্তিষ্কের ছোট্ট কোঠায় এসব ঘটনা কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

মাওলানা বললেন– এ হলো আপনার স্মরণশক্তি আর আল্লাহ তায়ালার স্মরণশক্তি হলো লাওহে মাহফুজ। আপনার জীবনের ঘটনা যেমন আপনার স্মরণ শক্তিতে সংরক্ষিত রয়েছে এমনিভাবে বিশ্বের সকল ঘটনা, 'লাওহে মাহফুজে' সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বের ঘটনাবলী অনেক; তা ঠিকই যেমন আপনিই বলছেন এর কোন সীমা সংখ্যা নেই। এটা সঠিক নয়, যেমন আপনার স্মরণ শক্তি ও মস্তিষ্কের একটি সীমা ও পরিমণ্ডল রয়েছে। ছোট কৌটার মত যা সম্পূর্ণ মাথায় নয়; বরং মাথার পশ্চাৎভাগে রয়েছে। কেননা মাথার সম্মুখ ভাগে তো রয়েছে শ্রবণ, অবলোকন ও ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি। এদিকে সেদিকে কিছু ছোট নদীনালা রয়েছে এগুলোর ভেতর দিয়ে ইলম ও জ্ঞান ছুটাছুটি করে। স্মরণশক্তি রয়েছে কেবল পেছনের দিকে এবং ঐ অংশটা অত্যন্ত ছোট। এখন চিন্তা করুন, যে আল্লাহ এক ইঞ্চি পরিমাণ কৌটায় হাজারো লাখো ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছেন, সেগুলোকে যদি কাগজে লেখা হয়, তাহলে কাগজের বিস্তার পঞ্চাশ মাইলেও স্থান সংকুলান হবে না, সেই আল্লাহর এ শক্তিও রয়েছে যে, তিনি বিশ্বের সকল অণু-পরমাণু, সকল ঘটনা 'লাওহে মাহফুজে' লিখে রেখে দিতে পারেন এবং 'লাওহে মাহফুজ' এত বিরাট হওয়ারও কোন প্রশ্ন থাকে না, যা আপনি মনে করেছেন।

কত জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়কে হযরত মাওলানা কত সহজে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন। উদাহরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রমাণও অকাট্য, জটিল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু অতি সহজে স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে গেছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআন

ইহ-পরকাল সম্পর্কে অনেক উদাহরণ পেশ করেছে এবং উদাহরণ দিয়ে জটিল বিষয়াদি সহজ ও বোধগম্য করে দিয়েছে। হাদীস শরীফেও জটিল মাসাইল সম্পর্কে হাজারো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

উদাহরণের মধ্যে ইলম ও জ্ঞানের বিশেষ শক্তি রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে নবীগণ (আ.)কে দান করা হয়েছিল এবং তাঁদের বরকতে উলামা ও আউলিয়াগণ তা লাভ করেন।

হাদীসে তিন ভাইয়ের উদাহরণ

হাদীসের একটি উদাহরণ আমার স্মরণ হল। উদাহরণটি আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সে সম্পর্কিত। আমি আয়াতের বিষয়বস্তুর বর্ণনা এই উদাহরণ দিয়ে শুরু করছি, যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'হে লোক সকল! একটি উদাহরণ শুন!'

সবাই আকৃষ্ট হলেন, মনোযোগ দিলেন। বললেন– এক ব্যক্তির তিন ভাই ছিল। ছোট, বড় ও মেজো তিন জনই সহোদর ছিলেন। পরস্পরের অনেক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। মৃত্যুর সময় মানুষ খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। নিজেও কিছু করতে পারে না। অন্যরাও কিছু করে দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রহম ও করম, দয়া ও মেহেরবানীর উপর সব কিছু নির্ভর করে। অন্য কোন সহায় সম্বল থাকে না, কোন সাহায্যকারী বন্ধুও নজরে পড়ে না।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ○ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.

পাগুলো একত্রিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে থাকে। রুহকে বের করার জন্য টানা হয় এবং বলা হয়– এখন প্রভুর দরবারে চলো। এখন কে আছে যে রক্ষা করতে পারে? সাহায্যকারী কেউ নেই, চরম অসহায় অবস্থা। [কিয়ামা : ২৯-৩০]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তিরও অসহায় অবস্থা চলছিল। মৃত্যুর সময় প্রায় এসে গেছে। এবার প্রথমে তার বড় ভাইকে ডাকল এবং বললো– ভাই, আমি সবসময় আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছি, দান দক্ষিণা করেছি, আমার নেয়ামতগুলোতে আপনাকে অগ্রাধিকার দান করেছি, বিপদকালে আপনাকে হেফাজত করেছি। আপনাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে

আরাম ও শান্তি দেয়ার জন্য জানবাজি রেখেছি। এখন আমার শেষ সময় এবং অসহায় অবস্থা। আপনি আমার ভাই, আপনি এখন আমাকে সাহায্য করুন। আমার আর অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। আমি অন্য কাউকে বলতেও পারব না, বিপদে ভাইয়ের কথাই স্মরণ হয়। আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বড় ভাই উত্তর দিল– তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি তো তোমার কোন কাজেই লাগব না। তুমি আমার প্রতি এহসান করেছ। তা মন্দ করেছ। আমি তার প্রতিদান দিতে পারব না।

ভাই পরিষ্কার উত্তর দিয়ে দিল– 'আমি তোমাকে বেশির থেকে বেশি এ সাহায্য করতে পারি– তোমার প্রাণ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার পাশে বসে থাকবো কিন্তু তোমার কোন কাজ করে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার বিপদ হটিয়ে দেবার অথবা আমি তা নিয়ে যাব এমন আশা তুমি করতে পার না। আমি তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম নই।'

শুনে তার মন খারাপ হলো। যে ভাইয়ের সঙ্গে সমগ্র জীবন সদ্ব্যবহার করলাম, আমার বিপদের সময় পরিষ্কার এমন জবাব দিয়ে চলে গেলে।

নিরাশ হয়ে মেজো ভাইকে ডাকলো। তার সামনেও এসব কথা বলল– 'ভাই! আমার শেষ সময়। বিপদের সময় কোন সাহায্যকারী আমার নেই। আমার আশা, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কেননা, তোমার সঙ্গে আমি সারা জীবন সদ্ব্যবহার করেছি। আমি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি কিন্তু তোমার উপর কোন কিছু আসতে দিইনি। আমার এই বিপদের সময় তুমি সাহায্য করবে না?'

মেজো ভাই উত্তর দিল– 'তোমার ধারণা ভুল। আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে সমর্থ নই। আমি তোমার সহায়তা করতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছ, দয়া ও এহসান করেছ। ভালই করেছ। কিন্তু আমি তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। আমার প্রতি কোনরূপ আশা পোষণ করো না। আমি বড়জোর এতটুকু করতে পারি– তোমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পর তোমাকে নিয়ে কবরে দাফন করে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবো না।'

লোকটি বলল– আফসোস! ইন্না লিল্লাহ! যে ভাইয়ের সম্পর্কে অনেক আশা ভরসা ছিল, তারা সময়মত বিপদকালে সরে পড়ল, পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিল। আহা!

এরপর সবচেয়ে ছোট ভাইকে ডাকলো। বলল– স্নেহের ভাই, আমার

সংকটকাল। আমি খুবই উদ্বিগ্ন পেরেশান, তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? তোমার কাছে সাহায্য চাওয়া, প্রত্যাশা করা, আমার জন্য লজ্জাজনক। কারণ, আমি সারাটি জীবন তোমাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছি। সারা জীবন তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিনি। কিন্তু তবু তুমি আমার ভাই, রক্তের বন্ধন রয়েছে তোমার সঙ্গে। হয়ত তুমি আমায় কোন্ সাহায্য করতে পারবে, উপকারে আসবে।

ছোট ভাই বলল– 'পেরেশান হয়ো না, আমি তোমার সাহায্য করব, উপকার করব। তোমার যে কোন বিপদকে প্রথমে আমি নিজের উপর নিয়ে নিব এবং আমি সহ্য করব; তারপর তোমাদের উপর যেতে দিব। তুমি যদিও সারাটি জীবন আমাকে কষ্ট দিয়েছ, পেরেশান করেছ, আমাকে অপমানিত অসম্মানিত করেছ, কিন্তু আমি ভদ্র স্বভাবের লোক। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার সংকটের সমাধান করে দিব; তুমি কোন চিন্তা করো না। কোন বিপদ আসলে, প্রথমে আমি রয়েছি তা মোকাবেলার জন্য, তারপর তুমি।

সে বলল– আল্লাহ তোমাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার কোন আশা ছিল না। তুমি এত উচ্চ ও উদারমনা, আমি সারাজীবন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। এখন বিপদের সময় তুমিই সাহায্য করবে বলে আমাকে সান্ত্বনা দিলে।'

এ তিন ভাইয়ের ঘটনা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করলেন এবং বললেন– হে লোক সকল! এ তিন ভাই কারা বুঝতে পেরেছেন?

তারা আরজ করলেন– আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। বললেন, বড় ভাই কেমন ছিল? সকলেই বললেন, অত্যন্ত হীনমনা, অসভ্য ও হীন চরিত্র ছিল। সময়ে কোন কাজে লাগল না। প্রকৃত ভাই ঐ ব্যক্তি যে বিপদে সাহায্য করে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– মেজো ভাই কেমন ছিল?

বললেন– সেও খারাপ ছিলো। বদনিয়াত হীন ও নিকৃষ্ট স্বভাবের ছিল। তার মধ্যেও কোন চক্ষু লজ্জা ছিল না। প্রকৃত বিপদে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জিজ্ঞেস করলেন– ছোট ভাই কেমন ছিল?

তারা আরজ করলেন– অত্যন্ত ভদ্র, সাহসী নেক তবিয়তের ছিল। তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে বিপদে কাজে লেগেছে। সাহায্য সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে।

বড় ভাইয়ের আচরণ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– বুঝতে পারলে, এ তিন ভাই কে?

তারা আরজ করলেন– আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন।

এবার বললেন– বড় ভাই, যার সঙ্গে সারাটি জীবন সদ্ব্যবহার এহসান ও মেহেরবানী করেছে, সে হল তার ধন-দৌলত বা মাল-সম্পত্তি। সারা জীবন ধন-দৌলত উপার্জনের জন্য নিজের জান ও প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি, নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করেছে। কখনো জানের সঙ্গে ঈমানকেও সংকটে নিপতিত করেছে। ঈমান থাক অথবা না থাক, পয়সা হাতে এসে যাক। পয়সার জন্য কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। নিজেকে কত অপমানিত করেছে। হীনতম কার্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু টাকা পয়সা উপার্জন ও সংরক্ষণে কোন ত্রুটি করেনি। দুনিয়াতে এত বেশি সেবাযত্ন অন্য কোন জিনিসের করা হয়নি, যা মাল সম্পদের জন্য করা হয়। মাল-সম্পদের প্রতি যে আগ্রহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন জিনিসের প্রতি এত উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'বড় ভাইয়ের সঙ্গে মানুষ যে পরিমাণ সদ্ব্যবহার করে এর চেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার করে ধন-দৌলতের সঙ্গে। কিন্তু যখন মরণের সময় এসে যায়, তখন সর্বপ্রথম সম্পর্ক ছিন্ন করে ঐ মাল-সম্পদ, ধন-দৌলত। তখন যদি মানুষ ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে উত্তর দিবে– আমার কাছে কোনরূপ আশা পোষণ করো না। বড়জোর আমি তোমাকে এই করতে পারব, যে পর্যন্ত তোমার শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকবে আমি তোমার নিকটে বসে থাকবো, যখন শ্বাস বেরিয়ে যাবে তখন অন্যদের হয়ে যাব, অন্য কারো কাছে চলে যাব।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যখন মানুষের জানাযা বের হয়, তখন ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন–

مَا قَدَّمَ فُلَانٌ مَا قَدَّمَ فُلَانٌ

সে পরকালের জন্য কি কি কাজ করেছে, পরকালের জন্য কি পরিমাণ পাথেয় সংগ্রহ করেছে?

আর উত্তরাধিকারীগণ বলতে থাকেন–

مَا اَخَّرَ فُلَانٌ مَا اَخَّرَ فُلَانٌ.

সে কি কি সম্পত্তি রেখে গেছে, যা আমরা করায়ত্ত করব, ভাগ বাটোয়ারা করে নেব। যদিও মৃত ব্যক্তি কবরে এখনও যায় নি। উত্তরাধিকারদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ শুরু হয়ে যায়। বলতে থাকে এ জিনিস আমি নিব। ঐ জিনিস আমার আয়ত্বে রয়েছে। অনেক মানুষ স্বঘোষিত উত্তরাধিকার হয়ে যান। এই বলে যে আমি তার সম্পত্তিতে একজন অংশীদার। বিধবাদেরকে নিয়েও কোন কোন সময় ঝগড়া সৃষ্টি হয়। কে বিয়ে করবে? বিশেষত বিধবা যদি বিত্তবান হয়, তাহলে ব্যক্তির দাফনের আগেই এসব ঝগড়া-ফাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সুতরাং ধন-সম্পদই সর্বপ্রথম সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অন্যদের কবজায় চলে যায়। প্রকৃত মালিক শুধু অপলক চোখে দেখতে থাকে যে, তার কোন সাহায্যকারী আছে কিনা? মাল সম্পদ বলে– আমার কাছে কোন সাহায্যের আশা করো না।

মোটকথা, উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির পরিতাজ্য মাল-সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং ঐ অসহায় ব্যক্তি পর হয়ে যায়– যে কিনা সারাটি জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাল উপার্জন করেছিল, মালের মহব্বতে জানপ্রাণ ও ঈমান আমলের পরোয়া করেনি। সার কথা, এই ধন-সম্পদ যতই হোক, তা রোদ ও ছায়ার মত। আজ একজনের হাতে আগামীকাল অন্যজনের হাতে। হাজারো বিত্তবান এ বিশ্বে নিঃস্ব দরিদ্রে পরিণত হতে দেখা গেছে। ধন-সম্পদ কারো সঙ্গে ওফাদারী করে না, মানুষ একে খাদেম বানিয়ে রাখবে। মাখদুম বানিয়ে নয়। ধন-সম্পদের পূজা ও উপাসনা করবে না। এর মহব্বত ও ভালোবাসাকে অন্তরে স্থান দিবে না। সেবক মনে করবে– আল্লাহ তায়ালা যেমন মানুষের উপকারের জন্য আরো অনেক সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছেন, ধন-সম্পদও ব্যবহারের জন্য উপকরণ বিশেষ। একে ব্যবহার করবে এবং আল্লাহর শুকর আদায় করতে থাকবে। নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বানাবে না। তা না হলে যখন ত্যাগ করে দেয়ার সময় আসবে তখন সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, একে দীন ও দীনি কাজের মাধ্যম ও সেবক করে দিয়েছেন। স্বয়ং সম্পদ কোন উদ্দেশ্য নয়। দুনিয়ার উপায় উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অন্য জিনিস। মাল-সম্পদ হলো ঐ উদ্দেশ্যের জন্য উসিলা বা মাধ্যম।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একথা বুঝেছিলেন। তাঁরা সম্পদ উপার্জন করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত-খামার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ধন-দৌলত দান করেছিলেন কিন্তু তাঁরা ধন-সম্পদকে মুখ্য উদ্দেশ্য বানাননি। বরং উদ্দেশ্যের মাধ্যম করেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার মহব্বত ও

ভালোবাসাকে মনে করেছেন। ধন-সম্পদকে এর মাধ্যম ও উপায় মনে করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। বিত্তবান যদি ধন-সম্পদের মাধ্যমে দীন অর্জন করতে চায়, তাহলে তা করতে পারে। একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার দেহ ও প্রাণ দ্বারা দীন হাসিল করে আর বিত্তবান তার ধন-সম্পদ দ্বারা দীন হাসিল করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা একজনকে শারীরিক শক্তি দিয়েছেন, অন্যজনকে সম্পদ দিয়েছেন। দুটোই দীন অর্জনের উসিলা।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) দৌলত উপার্জন করার আদেশ দিয়েছেন–

كَسَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করা তেমনি ফরয যেমন নামায পড়া, রোযা রাখা ফরয; তবে সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন– অন্তরে সম্পর্ক ও প্রাণের ভালোবাসা কারো সঙ্গে করো না। মহব্বত ও ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাকবে; আর কাজকর্মের সম্পর্ক থাকবে নিজ নিজ ধন-সম্পদের সঙ্গে। অন্তরে থাকবে বন্ধুর প্রেম আর হাতে থাকবে কাজ। دل بیار دست بکار অন্তরকে কারবার দরবারে লাগাবে না। অন্তরে থাকবে কেবল আল্লাহ তায়ালার মহব্বত। কারণ, অন্তর একটি পবিত্রতম পাত্র। পবিত্র পাত্রে পবিত্র আল্লাহ রাখা দরকার। খোদার প্রেমের জেয়ে অন্য কোন জিনিস বেশি পবিত্র নেই। তাই অন্তরাত্মাই ঐ পবিত্রতম আল্লাহর পাত্র হওয়ার যোগ্য। ধন-দৌলত হালাল হওয়ার কারণে পবিত্র হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা কোন উচ্চাঙ্গের জিনিস নয়, যাকে অন্তরে ভরে রাখা হবে।

আত্মা পরকালের অঙ্গ বিশেষ

মানুষের শরীরে পরকালের জন্য কোন অঙ্গ যদি থেকে থাকে তাহলে তা হলো কলব বা হৃদয়। আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হলো দুনিয়ার। হাত পা, মাথা, মস্তিষ্ক সবই দুনিয়াবী জাগতিক অঙ্গ। কেবল একটি অঙ্গই পরকালের জন্য নির্ধারিত। তা হলো হৃদয়।

তাহলে পার্থক্য জানা যাবে কীভাবে? এভাবে যে, অন্তর শুধু হক ও সত্যকে গ্রহণ করবে, বাতিল ও অসত্যকে কখনো গ্রহণ করবে না। তাহলে এও হতে পারে যে, আপনি ভুলবশত বাতিল ও অসত্যকে হক মনে করে নিলেন। কিন্তু আত্মা হক ও সত্য মনে করেই গ্রহণ করবে না, বাতিলকে বাতিল মনে করে মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করে গ্রহণ করবে এবং সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাকবে। এমন শান্তি লাভ

কখনো হবে না, যখন সত্য কথার মাহাত্ম্য অন্তরে প্রবেশ করবে। এখানেই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়ে থাকে। প্রতারণামূলক কাজ ও মিথ্যা কথা বলতে থাকুন, অন্তরাত্মা কখনো শান্তি লাভ করবে না। মন্দ কথা বলতে থাকুন অন্তর শান্তি পাবে না। চোর চুরি করে কিন্তু অন্তরাত্মা তাকে মালামত করতে থাকে এবং দোষারোপ করতে থাকে– তুমি খুব মন্দ ও খারাপ কাজ করেছো। এখন তার প্রকৃতি ও রিপু তা গ্রহণ করুক বা নাই করুক, অন্তরাত্মা কিন্তু ঘোষণা করতেই থাকে– তুমি মন্দ ও গর্হিত কাজ করেছ।

আপনি কারো প্রতি দৃষ্টি দিন। অন্তরাত্মা আপনাকে বলবে নাজায়েয, এই মন্দ কাজের প্রতি দৃষ্টি দিও না। অন্তরাত্মা মালামত করতে থাকবে– যদি আপনি খারাপ দৃষ্টি দেন, অন্তরে অশান্তি হবে। অন্তরাত্মা কেবল হক ও সত্যকেই কবুল করবে। বাতিলকে, মিথ্যাকে প্রতারণাকে কবুল করবে না। আত্মার চেয়ে বেশি নিঃস্বার্থ আপনজন আর কেউ নেই। সে সততাকে গ্রহণ এবং মিথ্যা ও বাতিলকে বর্জন করে চলে।

অন্যান্য অঙ্গের অবস্থা তার বিপরীত। সত্য মিথ্যা হালাল হারাম সবই গ্রহণ করবে। এই হাত দিয়ে আপনি হালাল উপার্জন কিংবা চুরি ডাকাতির মালও বহন করতে পারবেন। হাতে কোন অসুবিধা হবে না, হাত তা ধরবে। কিন্তু অন্তরাত্মা কবুল করবে না, হাত কিন্তু কবুল করবে। হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জন দুটো বহন করে বাড়িতে নিয়ে আসবে হাত। মুখে আপনি যাই দেন, হালাল জিনিস যেমন স্বাদযুক্ত হবে হারাম জিনিসও তেমনি স্বাদযুক্ত হবে। মিষ্টি যদি হারামের পয়সায় কেনা হয় তাহলে তা তিতা হবে না। বরং এমনই মিষ্টি হবে যেমন হালাল রুজির পয়সা দিয়ে কিনলে হয়ে থাকে। জিহ্বা হালাল হারাম দুটোই একভাবে গ্রহণ করবে। হারামের মিষ্টিকেও এবং হালালের মিষ্টিকেও। হারাম জিনিস খেলে মুখে কাঁটা বিদ্ধ হয় না; বরং নির্বিঘ্নে খেয়ে ফেলে এবং স্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মা হারাম জিনিস খেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে না। বরং আত্মা বলতে থাকে, খুবই জঘন্য কাজ করা হয়েছে। পরকালে না জানি কি মারাত্মক অবস্থা হয়! এভাবে পদদ্বয়ও যেভাবে আপনাকে মসজিদে নিয়ে যাবে তেমনি মদ ও শরাবের কারখানায়ও নিয়ে যাবে। যদি যেতে চায় পা আটকাবে না, আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। আপনাকে হারাম কাজে ও হারাম স্থানে নিয়ে যাওয়া অথবা হালাল কাজে ও স্থানে নিয়ে যাওয়া পায়ের কোন আপত্তি থাকবে না। হাত, পা, মুখের কাছে জায়েয নাজায়েয বৈধ অবৈধ সবই সমান। নির্দ্বিধায় সব করে যাবে।

চোখ দিয়ে যদি নিজের মা ও স্ত্রীকে দেখা হয় তাহলে এ দৃষ্টি হবে পাক পবিত্র

দৃষ্টি। কিন্তু অন্য মহিলাকে যদি দেখা যায় তাহলে অপবিত্র নাপাক দৃষ্টি হবে। কিন্তু উভয়কেই চোখ সমানভাবে দেখতে পাবে। অপরিচিত মহিলাকে দেখতে চোখের কোন কষ্ট হবে না, কোন বাধা আসবে না। চোখ এভাবে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করবে যেভাবে হালাল ও বৈধ নারীকে দেখে উপভোগ করে থাকে। কিন্তু অন্তরাত্মা শান্তি পাবে না। আত্মা বলতে থাকবে– অতি অন্যায় অবৈধ কাজ করা হয়, আল্লাহ জানেন পরকালে কী অবস্থা হয়, কি সাজা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অন্তর সব সময় হক বা সত্য জিনিসকে গ্রহণ করে। বাতিল ও অসত্যকে গ্রহণ করে না। আর আত্মা ছাড়া যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে প্রত্যেকেই সত্য-অসত্য হক-বাতিল সবই গ্রহণ করে। এতে বোঝা গেল, একমাত্র অন্তরাত্মাই ন্যায় ও সত্য গ্রহণকারী অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সত্য অসত্য হক ও বাতিল সবই গ্রহণ করে সমানভাবে। নেক, বদ, ভাল, মন্দ সবই। এদের সত্যের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। এ হলো একমাত্র আত্মার কাজ। তাছাড়া আত্মা পবিত্র। মানুষ যদি তাতে এমন জিনিস ভরে রাখে, যা হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে তাহলে সে আত্মাকে অপবিত্র করে তুলল, সর্বনাশ করে ফেলল। আত্মা যেমন পাক পবিত্র বস্তু তেমনি পাক পবিত্র জিনিস এতে ভরে রাখা উচিত। আর পাক পবিত্র হচ্ছে আল্লাহর প্রেম ও মহব্বত, ইলম ও মারেফত, পূত-পবিত্র স্বভাব চরিত্র, নৈতিক গুণাবলী। এসব হক ও সত্য বটে। এসবের স্থান আত্মায় হওয়া দরকার। আর ধন-দৌলতের স্থান আত্মায় না হওয়াই উচিত। কারণ, ধন-দৌলত, হারাম হালাল, পাক নাপাক সবই হতে পারে।

অন্তরাত্মায় কেবল পূত-পবিত্র জিনিসই থাকা উচিত। আল্লাহওয়ালাগণ, সব সময় তারা যে মাল উপার্জন করেছেন, ধন-সম্পদ তাদের আয়ত্বে এসেছে, কিন্তু তারা ধন-সম্পদকে প্রধান উদ্দেশ্য বানিয়ে সম্পদের পূজা করতে লেগে যাননি; বরং ধন-সম্পদকে তার প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করেছেন, জায়েয জায়গায় ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের আনুগত্য করেছেন। সারকথা, ধন-সম্পদকে খোদা বানিয়ে নেয়া ঠিক নয়। ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা যদি পকেটে থাকে তাহলে আত্মা শান্তিতে থাকে আর যদি সম্পদ সামান্যতম হ্রাস পায়, তাহলে আত্মায় চরম অশান্তি দেখা দেয়। এ অবস্থা হবে কেন? আল্লাহর প্রেম এ মহব্বত যার অন্তরে আছে আল্লাহ থেকে সামান্য দূরে সরে গেলেও আত্মা অস্থির হয়ে উঠবে। আর নৈকট্য লাভ হলে আত্মা আনন্দ ও খুশি হবে।

বাজার দর যদি একটু কমে যায়, দ্রব্যমূল্য কমে যায়, মন্দা দেখা দেয়, তাহলে

ব্যবসায়ীগণ পেরেশান হয়ে যায়। এখন কী হবে? তাদের অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি থাকে না। এমন অবস্থা না হওয়া উচিত। উপার্জনের জিনিস জায়েয ও বৈধ উপায়ে উপার্জন করবে, ধন-সম্পদকে খাদেম ও সেবক মনে করবে, পুরোহিত মনে করবে না। আল্লাহর দাসত্ব করবে, তার প্রেম ও ভালোবাসায় মগ্ন থাকবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। তিনি বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দোয়া করেছিলেন। রোম, সিরিয়া, মিসর সবখানে তাঁর ব্যবসা ও বাণিজ্য চালু ছিল। যেখানে সেখানে তার দ্রব্যের আমদানী রফতানি হত। যখন মুনাফার টাকা তার কাছে আসত তখন এমন ছিল না যে দু'এক জন লোক টাকা নিয়ে আসবেন; বরং লাখ লাখ টাকা উটে করে নিয়ে আসা হত। যখন ঘরে স্থান সংকুলান হত না, তখন বিরক্ত হয়ে বলতেন– ঘরের কোণে স্তূপ করে রেখে দাও। টাকা-পয়সা স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা ঘরের ছাদ পর্যন্ত ভর্তি করে রাখা হত। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কোটিপতি সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মার এমন অবস্থা ছিল যে, মেহমান ও মুসাফিরের সেবায় প্রাণভরে আত্মনিয়োগ করতেন। তিন চারশ' মেহমান প্রতি ওয়াক্ত তার দস্তরখানে একত্রে আহার করতেন। নানা ধরনের খাবার পরিবেশন করা হত। যখন দস্তরখানে সব সাজানো হত, খাওয়া শুরু হবে, তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ কেঁদে ফেলতেন। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত এবং বলতেন– হে আল্লাহ! তোমার নবীর দস্তরখানায় এক দু'জনের খানাও থাকত না, আর আমি আবদুর রহমানের দস্তরখানে এত রকমারী খাবারের প্রাচুর্য! তা হলে কি আমার জান্নাতের নেয়ামত দুনিয়াতে নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে? পরকালে আমাকে বঞ্চিত করা হবে কি? একথা বলে কাঁদতে থাকতেন। যেহেতু একজন শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীর আত্মার পবিত্রতা রয়েছে। তাঁর ঐসব কথার প্রতিক্রিয়া সবার উপর হত। তাঁর কথায় এক সঙ্গে চারশ' মানুষের কান্না শুরু হত। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। নিজ নিজ পরকালকে স্মরণ করে সবাই কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়তো। কান্নার কারণে খাবার না খেয়ে সবাই উঠে পড়তেন, উপবাস করতেন। খানাপিনা দস্তরখানে পড়ে থাকত। রাতের বেলায় পুনরায় দস্তরখানা বিছানো হত। খানাপিনা সাজিয়ে রাখা হত। তখন হযরত আবদুর রহমান (রা.)-এর হৃদকম্প শুরু হয়ে যেত। অনিচ্ছায় কাঁদতে শুরু করতেন এবং বলতে থাকতেন–

'হে আল্লাহ! প্রথম যুগের মুহাজিরীন এত দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন, আহারের জন্য একটি পাই পয়সাও তাদের ছিল না। হযরত হামজা (রা.)-

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা– এত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে, পূর্ণ কাফন দেয়া সম্ভব হয়নি। মাথা ঢেকে দিলে পা বেরিয়ে যেত। পা ঢেকে দিলে মাথা বেরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছে এবং পায়ের উপর ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছে। এভাবে তাঁকে দাফন করা হয়েছে, যাঁর উপাধি সাইয়েদুশ শুহাদা বা শহীদগণের নেতা ছিল। رضى الله عنه

তিনি কাঁদতেন এবং বলতেন– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার অভাব ও দারিদ্র অবস্থা ছিল। আর আমি আবদুর রহমানের কি অবস্থা ! দশ রকমের খাবার দস্তরখানায় সাজানো রয়েছে। আমার পরকাল কি নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে? উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলতেন। তারপর খানাপিনা গ্রহণ না করেই উঠে যেতেন। একাধারে তিন বেলা উপবাস করতেন, না খেয়ে থাকতেন।

আপনারা অনুমান করুন, সম্পদের এত প্রাচুর্য! ধান চাউল ও গমের মত স্তূপ করে সোনা-রূপা রাখা হত। তাঁর আত্মা এই পরিমাণ খোদার দিকে রুজু ছিল যে খানাপিনার প্রাণও থাকতো না। মুসলমান এমনই হয়। মুসলমানকে এ কথা বলা হয়নি, তুমি শহর ত্যাগ করে পাহাড় পর্বতে জঙ্গলে চলে যাও। এ হলো রুহবানিয়্যত বা বৈরাগ্য। ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে খতম করে দিয়েছে। মাল উপার্জন করাকে ফরয করে দিয়েছে। উপার্জন করে যদি লাখপতি হয়ে যায় তাহলে অবস্থা এমন হবে যে, হাতে স্বর্ণ ভর্তি থাকবে আর অন্তর হবে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসায় পূর্ণ। মুসলমানের অবস্থা এটাই হবে।

অন্যান্য ধর্মে দুনিয়াকে এভাবে বর্জন করা শেখানো হয়েছে যে, ধন-সম্পদকে শেষ করে দাও। কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে– উপার্জন কর কিন্তু অন্তরকে আলাদা রাখ। প্রেম ও ভালোবাসা সম্পদ থেকে অর্জন কর। এটা খুবই সাহসের কাজ। দুনিয়াকে ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে নির্জনে বসে থাকা সহজ কাজ। কিন্তু দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য চোখের সামনে থাকবে অথচ অন্তরে তার স্থান হবে না– এ কাজ সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। অত্যন্ত কঠিন কাজ। দুনিয়ার মোহে অনেকেই ভেসে যাবে। এ সাধনা কেবল মুসলমানদের শেখানো হয়েছে যে, সব কিছু কর কিন্তু অন্তরকে পাক-পবিত্র ও দুনিয়া থেকে সম্পর্কমুক্ত রাখ। আর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে কাজে লাগিয়ে রাখ যেন এগুলো একাজের জন্যই সৃষ্ট।

সারকথা হলো; সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক, তা কিন্তু ওফাদার বা বিশ্বস্ত নয়। এ

জীবনেই সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। আর মরণের সময় তো ত্যাগ করবেই। এমন বেওফা জিনিসের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা স্থাপন করে মানুষ কি করবে? ধন-সম্পদকে দাস ও সেবক বানিয়ে রাখ। এই তার প্রাপ্য অধিকার। তারপরও যদি ধন-সম্পদকে মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়া হয়, তাহলে অবস্থা হবে এমন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুকালে জীবনের শেষ মুহূর্তে মানুষকে মালের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যেন একথা বলতে না হয়– আমি তোমাকে সারা জীবন বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করেছি, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমার কোন উপকার করবে? ধন-সম্পদ উত্তর দিবে, আমি তোমার কোন কাজে আসব না। কোন সাহায্য করতে পারব না। তখন মানুষ দুঃখ করবে, আক্ষেপ করবে। আমি আমার বিবেক বুদ্ধি, মন মস্তিষ্ক সবই এর পেছনে ব্যয় করেছি। এখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আফসোস, এ হলো বড় ভাইয়ের অবস্থা।

মেজো ভাইয়ের আচরণ

তারপর বললেন, মেজো ভাইকে। মেজো ভাই কে বুঝতে পারলে? মেজো ভাই হলো মানুষের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে। মৃত্যুর সময় মানুষ তাদের কাছে আশা করে, মনে করে হয়ত আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে কোন উপকার করতে পারে। আমার শেষ সময়। আমি জীবনের ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। কিন্তু তারাও বলে– আমরা কিছুই করতে পারব না। তুমিই জানো তোমার কবরের অবস্থা। আমরা বড়জোর এটুকু সাহায্য করতে পারব, তুমি মারা যাওয়ার পর তোমাকে কবরে দাফন করে দিব। তারপর তোমার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের করণীয় কিছু থাকবে না। আমরা তোমার সাহায্যকারী থাকব না। অথচ স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে মানুষের এত আদরের যে, যে কোন সময় এদের মহব্বতে মানুষ তার প্রাণও বিসর্জন দিয়ে দেয়। ছেলে মেয়ের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য মাতা-পিতা এমন কাজও করে বসেন, যা প্রকৃতই শিরক, যাতে ঈমান বিদায় হয়ে যায়। তাবিজ দোয়া টুটকা তো করবেই। এমন কি যাদু থেকেও বিরত থাকে না, অথচ যাদু হারাম। এজন্য করা হয় যেন সন্তানের প্রাণ রক্ষা পায়। সন্তানের জন্য এ সবই করলো। কিন্তু মরণের সময় সন্তানও পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিবে– 'আমি তোমার কাজে আসব না, সাহায্য করতে পারব না। তোমার দায়িত্ব এখন তোমার নিজের উপর।' সে বলবে– 'আমি সারাটা জীবন তোমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেছি।' তারা বলবে– তাতে কি হলো, তুমি করলে কেন? তোমাকে কে বলেছিল– ভালো আচরণ করার জন্য? তোমার ভোগান্তি তুমিই ভোগ।

তোমার কোন উপকার করার বা সাহায্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ ভাইটি কেমন? সাহাবাগণ আরজ করলেন–: হে আল্লাহর রসূল! এ ভাই শরীফ ও ভদ্র নয়। এও হীনমন্য, অভদ্র ও চরিত্রহীন।

এজন্য স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে মহব্বত হবে তাদের সংশোধনের জন্য। তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য। স্ত্রীর প্রেম ও ভালোবাসা এজন্য হবে যে আল্লাহর ইবাদতে তাকে ব্যবহার করা হবে। কেবল ইন্দ্রিয় উপভোগের মহব্বত হবে না। এতে বিপদের সময় স্ত্রী বলবে– তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সে বলবে– 'আমি তোমার স্বামী।' স্ত্রী বলবে– আমি তা জানি না, এখন আমি অন্যের ঘরে চলে যাব কিংবা বসে থাকব কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি শিক্ষা দীক্ষা তরবিয়ত দান করা হয়ে থাকে, তাকে সৎ ও নেক পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে, তা হলে স্ত্রী বলেবে– 'আমি তোমার জন্য ইসালে সওয়াব করব। তুমি কবরে যাওয়ার পর আমি তোমাকে ভুলে থাকবো না। পরকালেও তোমাকে ভুলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব সময় ইসালে সওয়াব করব। ছেলে মেয়েরা বলবে– আমরা তোমার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকব। তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছো, তরবিয়ত করেছ, নেক আমল করার জন্য তত্ত্বাবধান করেছ। আজ তুমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছ। আমাদের আমলও তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমরা সদকা জারিয়া হিসাবে তোমার সঙ্গে রয়েছি। তুমি চিন্তা করো না। কিন্তু যদি কেবল সন্তানই হয়, কেবল স্ত্রী হয়, তাদের কোন রূপ শিক্ষা দীক্ষা ও তরবিয়ত না থাকে, কেবল ইন্দ্রিয়ের উপভোগ ছাড়া অন্য কিছু মনে না করা হয় তাহলে তাদের উত্তর হবে– 'তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি জান আর জানে তোমার পাপ পুণ্য।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ মেজো ভাই কেমন লোক?

সাহাবীগণ আরজ করলেন– সে বেকার অকর্মণ্য, হীনমনা ও চরিত্রহীন প্রমাণিত হল।

ছোট ভাইয়ের আচরণ

এবার বললেন, তৃতীয় ভাইটি কে বুঝতে পেরেছ? যার সঙ্গে সব সময় অসদ্ব্যবহার করেছ, সেই ভাই বলল– আজ আমি কাজে লাগব। আর এই ভাই হলো মানুষের নেক আমল– যার সঙ্গে মানুষ সারা জীবন অসদ্ব্যবহার করে

থাকে। নামায কায়েম করেনি। সময়ের পাবন্দী করেনি, জামাতে হাজির হয়নি। কত মানুষ এমনও আছে যারা রমজান মাস আসে, কিন্তু রমজানের প্রতি তাদের সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই। বাজারে প্রকাশ্যে ধূমপান ও পানাহার করে বেড়ায়। অনেক আল্লাহর বান্দা এমন আছেন যাদের অগাধ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যাকাত ও সাদকার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা সিনেমা, থিয়েটার এসবে আনন্দ উপভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করেন, সৎকাজের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিচ্ছেন। না আছে নামাযের চিন্তা, না আছে রোযার ভাবনা, না আছে হজ ও জিয়ারতের আগ্রহ। আর যদি এসব নেক কাজ সম্পাদন করে তাহলে অহংকারী হয়ে বলে- 'আমি বিরাট ব্যক্তি, অগাধ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আমি নামায পড়ছি।' মাশাআল্লাহ! মনে হয় সে যেন আল্লাহর উপর বিরাট এহসান করেছে! সে বলে- নামায আদায় করার প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু ধন-সম্পদের হেফাজত অবসর দিচ্ছে না। এ আমার দয়া ও এহসান। আমি নামায পড়েছি, হজ সম্পাদন করেছি। হজ করার পর যেন সাত জান্নাত তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এখন তার হাত থেকে বের হতে পারবে না। সে তা করতলগত করে নিয়েছে। বিত্তশালীরা হয়তো আমলই করবে না। আর যদি করে তাহলে সঙ্গে থাকবে অহংকার গর্ব। এর চেয়ে না করাই ভাল।

মোটকথা, নেকী ও নেক আমলের সঙ্গে মানুষ সদ্ব্যবহার করে না। কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা ছাড়া, যারা এমন আছেন, যারা তাকওয়া, তাহারাত, পবিত্রতা ও খোদভীরুতাকে আসল মনে করেন। তারা তাদের নেকী ও সৎ আমলকে টিকিয়ে রাখার জন্য মনে প্রাণে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এমন লোক একশ'তে দু'চার জন হয়ে থাকেন। অধিকাংশ এমন হয়ে থাকেন, যাদের ভাল মন্দের কোন পরোয়া থাকে না। যেহেতু পরকাল সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই, তাদের সামনে কেবল এ জগতের সব কর্মকাণ্ড।

তাই মৃত্যুকালে মানুষ যখন নেক আমলের প্রাপ্তির দিকে আশা করে, অন্যের মুখাপেক্ষী হবে, তখন নেক আমল বলবে- আমিই কেবল তোমার কাজে লাগব। উপকার করবো। যদিও তুমি আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছ। আমি কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে তোমার সঙ্গে থাকব। জান্নাতে তুমি যে সকল নেয়ামত ও মুনাফা পাবে, তাও আমার কারণে পাবে। সেখানেও আমি তোমার সঙ্গে থাকব চিরজীবন। মানুষের সঙ্গে যে জিনিস থাকবে, তা হল মানুষের নেক আমল।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যখন মানুষকে কবরে শোয়ানো হয় এবং প্রশ্নের উত্তরে সে উত্তীর্ণ হয়, তখন তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয় তার দৃষ্টির সীমা

পর্যন্ত। সে এক বিরাট জগত দেখতে পায়। সেখানে আলো জ্যোতি সবই রয়েছে। সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখবে। আগন্তুকের চেহারা থেকে খায়র ও বরকত ঝরছে বলে মনে হবে। তাঁর চেহারা দেখে মৃতব্যক্তি অন্তরে আনন্দানুভব করবে। ধীরে ধীরে ঐ ব্যক্তি তার কাছে আসবে। কাছে আসার পর মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কে? আমার এ অসহায়ত্বের সময় আমার কাছে আসলেন? আপনার পূত-পবিত্র চেহারা দেখে আমার অন্তর আনন্দে ডুবে গেছে। আপনি কে? এ নির্জন বাসে আপনি আমার কাছে আসলেন? সে বলবে– 'তুমি আমাকে ভুলে গেলে? আমি তোমার নেক আমল। তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসেছি। এ নির্জন বাসে মোটেই তোমার ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, তোমার উপর সামান্যতম কোন দুঃখ কষ্ট আসতে পারবে না। যদি আসে তাহলে আমি তা বহন করব, সহ্য করব, তোমাকে হেফাজত করবো।

নেক আমল এমন বস্তু যা মৃত্যুর যন্ত্রণার সময়ও সঙ্গে থাকবে, কবরেও সঙ্গে থাকবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সকরাত বা মৃত্যুযন্ত্রণার সময় স্বয়ং মালাকুল মউত মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন– 'দেখ তোমার জান বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী। এখনো আল্লাহ আল্লাহ যিকির করে নাও, কালেমা পড়ে নাও।' এভাবে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন। ঐ সময় মানুষ নেক আমল করতে পারে না। তখন সম্পূর্ণ অসহায়। কোন কোন সময় জিহ্বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষ কথাও উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু অন্তরে কল্পনা করতে পারে– সংকট মুহূর্তের ঐ আমলও উপকারী হয়। হৃদয়াভ্যন্তরে তাওহিদ ও রিসালাতের এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর যিকির হতে থাকে। মালাকুল মউতও বলেন– তাড়াতাড়ি কর। কারণ, এ সময়ের নেকী খুবই উপকারী। ঐ সময়ে ধন-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র কিছুই করতে পারে না। কেবল নেক আমল কাজে লাগবে। মৃত্যু-যন্ত্রণার সময়ও নেক আমল উপকারী হবে।

কবরেও নেক আমল উপকারী ও সাহায্যকারী হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শুইয়ে দেয়া হয়, তখন চারদিক থেকে আযাব মৃত ব্যক্তির দিকে দৌড়ে আসতে থাকে। কিন্তু যদি কারো মস্তিষ্কের স্মৃতিপটে কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত থাকে তখন আয়াতগুলো দাঁড়িয়ে যায়। খবরদার, সাবধান! এদিকে এসো না। আযাবের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ডান দিক থেকে আযাব আসলে হাদীসে বলা হয়েছে– তখন নামায দাঁড়িয়ে যায়– সাবধান! এদিকে এসো না! বাম দিক থেকে আযাব আসতে থাকলে তখন রোযা দাঁড়িয়ে যায়। পায়ের দিক হতে আযাব আসলে তখন সদকা যাকাত দাঁড়িয়ে যায়।

চারদিকের রাস্তা বন্ধ করে দেয়, আযাব থেমে যায়। এভাবে নেক আমল আযাব থেকে রক্ষাকারী হয়ে যায়। সেখানে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সাহায্য করতে আসবে না। তাহলে নেক আমল সেখানে রক্ষক হয়ে দাঁড়িয়ে হেফাযত করবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– যখন কোন ব্যক্তির নামে খুনের মামলা দায়ের হয় আর তা প্রমাণিত হয়ে যায় এবং বিশ্বাস জন্মে যায় যে, এখন ফাঁসি হবেই তখন দুনিয়াতে প্রচলিত বিধান রয়েছে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি বাদশাহর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারে। আইনত কোন সুযোগ নেই। তবে বাদশাহ যদি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দেন তা হলে তার মুক্তি হতে পারে। ঐ সময় অপরাধী ব্যক্তি বাদশাহর সঙ্গে নিজের ওফাদারী ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে।

আদিকাল থেকেই এ বিধান রয়েছে যে, কারো ঘরে কোন রাজা-বাদশাহর লিখিত কোন শাহী ফরমান বিদ্যমান থাকলে বিপদের সময় মানুষ ঐ ফরমান পেশ করে। আমরা বংশানুক্রমে আপনার ওফাদার বিশ্বস্ত। আমাদের ঘরে অমুক বাদশাহর লিখিত ফরমান রয়েছে। বাদশাহ আমাদেরকে আপনজন মনে করেছেন। আমরা ঐ ফরমান পেশ করে আপনার কাছে মুক্তির আবেদন পেশ করছি। আমরা আপনার বিশ্বস্ত গোলাম ও খাদেম। এ রেওয়াজ ছিল, শাহী ফরমান আদবের সঙ্গে মাথায় রেখে পেশ করা হত, হাতে করে নয়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– যখন আল্লাহর আযাব মাথার দিকে আসবে, তখন যার মাথায় পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে, সে ব্যক্তি কুরআন পেশ করবে। আমি আল্লাহর রাজত্বের বিশ্বস্ত ব্যক্তি, আমি তাঁর গোলাম ছিলাম। আমার ঘরে শাহী ফরমান কুরআনুল কারিম রয়েছে। আমি মাথায় করে তা পেশ করছি। এর বদৌলতে আমাকে নাজাত দেয়া হোক। ফাঁসি থেকে আমাকে রেহাই দেয়া হোক। যখন মাথায় দিক থেকে আযাব আসে তখন কুরআন বাধা প্রদান করে।

ঐ হাদীস শরীফেই বলা হয়েছে– اَلصَّلٰوةُ بُرْهَان নামায মানুষের জন্য সনদ ও দলিল বিশেষ। আদালতে যখন নিজের মুক্তি প্রমাণের জন্য কোন সনদ বা প্রমাণ পেশ করা হয় তখন সম্মান রক্ষার্থে ডান দিক থেকে পেশ করা হয়। নামায ডান দিক থেকে আযাবকে বন্ধ করবে। এ হলো মানুষের জন্য সনদ।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। যখন শত্রুর আঘাত প্রতিহত করা হয়, তখন ঢাল বাম হাতে থাকে। যখন বাম দিক থেকে আযাব আসে, তখন রোযা ঢালের ন্যায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকেও আযাব আসতে পারে না। সদকা যাকাত হলো মানুষের ময়লা স্বরূপ।

তার হাত পায়ের উপার্জন। পায়ের দিক থেকে আযাব আসলে তখন এসব সদকা যাকাত প্রাচীরের ন্যায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সারকথা, চারদিক থেকে নেক আমল দুর্গ তৈরি করে রাখে।

পুণ্য সবখানে উপকারী

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– মানুষ যখন কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হবে, ময়দানে হাশরে যাবে, তখন সামনে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মাথার উপর اَللّٰهُ اَكْبَر ডান দিকে سُبْحَانَ اللّٰهِ বাম দিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পিছন দিকে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ থাকবে। এ পাঁচ কালেমা এভাবে তাকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করে নিবে, যেভাবে দেহরক্ষী কাউকে হেফাযত করে থাকে। এই পাঁচ কালেমা হাশরের ভয়ানক দৃশ্যাবলী থেকে রক্ষা করবে। এমনকি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ.

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগে-পিছে, ডানে বামে কিছু জিনিস থাকবে, যেগুলো আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাকে হেফাজত করবে। মুয়াকিবাত معقبت বলা হয়েছে ঐসব তাসবীহ ও ওজিফাকে যা আল্লাহ তায়ালার নাম ও সিফাত যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ রক্ষা পাবে হাশরের ময়দানে। নেক আমলই কাজে আসবে মৃত্যু যন্ত্রণাকালে, কবরে সব সময় নেক আমলই কাজে আসবে।

ইহকালেও এসব আমলই কাজে আসে। যদি কোন মুত্তাকী ব্যক্তি ঘটনাচক্রে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে সকল মানুষের সহানুভূতি সে পেয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, ভাই অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি, বিপদে পতিত হয়েছে, সে চোর ডাকাত নয়। কখনো কোন মন্দ কাজ করেনি। আজ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। মনে হয় কোন শত্রু দুষ্টুমি করেছে। লোকটি তো মন্দ নয়। ভাল মানুষকে সকলেই ভাল বলে। মন্দ মানুষকে সবাই মন্দই বলে। তাকওয়া ও নেকী দুনিয়াতেও কাজে লাগে।

وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে নেক আমল করে, বিপদের সময় আল্লাহ তার জন্য কোন না কোন সুরাহা করে দেন। সে যখন চারদিক থেকে বিপদে পড়ে যাওয়ার পর পেরেশান হয়ে যায়, তখন কোন না কোন সুরাহা হয়ে যায়। তার নেকী ও পরহেজগারির কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হয়। وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ যখন রিযিকের দরজা সবদিক থেকে বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষ যদি নেক ও মুত্তাকী হয় তাহলে এমন পথ দিয়ে রিযিক পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা সে কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই পথে রিযিক আসবে বা আসতে পারে।

অতএব নেক আমল ইহজগতে, মৃত্যুর সময়, কবরে, হাশরে সবখানে কাজে আসবে। নেক আমল ছাড়া অন্য কোন কিছু কাজে আসবে না। স্ত্রী-পুত্র তখনই কাজে আসবে, যদি তারা নেককার হয়। এরা যদি বদকার পাপিষ্ঠ হয় তাহলে স্ত্রী স্বয়ং একটি বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। সন্তান যদি মন্দ অসৎ হয়, তাহলে এরাও বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন–

اللهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّلَدٍ يَكُوْنُ عَلَىَّ وَبَالاً.

اللهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِمْرَةٍ تُشَيِّبُنِىْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ.

হে আল্লাহ! এমন নারী হতে আমি পানাহ চাই, যে বার্ধক্যের আগেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়।

অর্থাৎ দিনরাত এত যন্ত্রণা দেয় যে, চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানিতে পড়ে সময়ের আগেই বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং এমন সন্তান থেকে পানাহ চাই, যে সন্তান আমার জন্য আযাব ও দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। ত্যাগ করেও রক্ষা নেই, সঙ্গে রেখেও রক্ষা নেই। ত্যাজ্যপুত্রও করা যায় না। যেহেতু সন্তান, রক্তের বাঁধন। আর রেখে দেয়া অবস্থায় দিন-রাত তার বদমেযাজী, উগ্র প্রকৃতি সহ্য করতে হয়। স্ত্রী-সন্তান জীবনের জন্য মহাবিপদ হয়ে দাঁড়ায়। সুখ-শান্তির কারণ কখন হবে? যখন তাদেরকে নেক ও সৎপথ দেখান হবে। এখানেও নেকী কাজে লাগবে। স্ত্রী-সন্তান কাজে লাগেনি।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কয়েকটি জিনিস এমন রয়েছে যেগুলোর সওয়াব সদকা জারিয়া হিসাবে মানুষ পেতে থাকবে। যেমন পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করে দেয়া, মুসাফিরখানা তৈরি করে দেয়া, যে পর্যন্ত মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হতে থাকবেন, বিশ্রাম গ্রহণ করবেন– ঐ ব্যক্তি সওয়াব পেতে থাকবে। এগুলো স্থায়ী সদকা। কেউ যদি মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করে, তাহলে যে পর্যন্ত মানুষ মসজিদে নামায ও মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে, নির্মাণকারী সে পর্যন্ত সওয়াব পেতে থাকবে। এ হলো সদকায়ে জারিয়া। বলা হয়েছে, সর্বোত্তম সদকায়ে জারিয়া হলো মানুষের নেক সন্তান, যে সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করা হয়েছে। যে পর্যন্ত সন্তান নেক কাজ করবে, তার নেকি দেখে অন্য কেউ

নেকির আমল করবে। সবাই যে সওয়াব পাবেন ঐ ব্যক্তি একাই সে সওয়াব পাবেন, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে নেক বানিয়েছেন। যে ব্যক্তি সন্তানকে দীন শিক্ষা ও দীন ইসলাম শিখিয়েছে, তার আমল দেখে দেখে মহল্লা ও শহরবাসী নেক হয়েছেন, এখন সবাই মিলে যে সওয়াব পাবেন– ঐ ব্যক্তি একাই ঐ সওয়াব পাবেন। কেননা সে রাস্তা দেখিয়েছিল। সন্তান সদকা জারিয়া কখন হয়? যখন তাদের নেক পথে পরিচালনা করা হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নেকীই কাজে আসল। সন্তান কাজে আসেনি। স্ত্রী কখন শান্তির কারণ হয়? যখন পিতা-মাতা তার স্বভাব চরিত্র গঠন করে দেন। সঠিকভাবে তরবিয়ত করে দেন। সে তার স্বামী শ্বশুরালয়ের জন্য শান্তির কারণ হয়। শান্তি স্ত্রী দেয়নি, তার নেক স্বভাব শান্তি দিয়েছে। ফল দাঁড়ালো– আমল দুনিয়াতে, কবরে, হাশরে এবং পরকালে সবখানে কাজে লাগবে। স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন কেউ কাজে আসবে না। ধন-দৌলত কোন উপকার করবে না। এরা হলো বড় ভাই ও মেজো ভাই– যারা বিপদের সময় সংকট মুহূর্তে জবাব দিয়ে দিবেন। আর আমল ছোট ভাই যে সর্বত্র কাজে লাগবে, সাহায্য করবে।

এ উদাহরণ দিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সূক্ষ্ম বিষয়কে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ধন-সম্পদ ও স্ত্রী এবং সন্তানের অবস্থাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। নেক আমলের মর্যাদাও বলে দিয়েছেন। যদি এভাবে দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে দিতেন, তাহলে হয়তো আমাদের অনেকের বোধগম্য হতো না। উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ হলো নবীগণ (আ.)-এর বিশেষ জ্ঞান ও শক্তি। সূক্ষ্মতম জটিল বিষয়কে উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করে দেন। নেক আমলের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

নেক আমলের প্রয়োজনীয়তা

وَقُلِ اعْمَلُوْا আপনি বলুন, হে লোক সকল, আমল কর, কাজ কর, শুধু বাকপটু কথার ঝুরি হয়ো না। কেবল জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করো না, এও এক ধরনের বিলাসিতা। এ হলো মেধার বিলাসিতা। এতে কোন বিশেষ উপকার (পরকালে) হবে না। ইলমকে নিজের অন্তরে স্থাপন করে নেক আমলের কাজে ব্যবহার করো। আমলে সালেহ-এর পথ তৈরি কর, তাহলেই উপকার হবে। সুতরাং হে নবী আপনি বলে দিন– হে লোক সকল! আমল কর।

فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

তোমরা যে আমল করছ, তা নিরর্থক হবে না। অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ এসব আমল দেখবেন। কেয়ামতের দিন সকল মুসলমানের সামনে তোমাদের জীবনের কার্যাবলী প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তায়ালার সামনে সকল আমল পেশ করা হবে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সকল আমল পেশ করা হবে। তাঁর উম্মতের আমল এবং আগের সব ঈমানদারের আমল প্রত্যেকের সামনে পেশ করা হবে। তাই বলা হয়েছে, এমন মারাত্মক সময় থেকে গাফেল উদাসী থেক না, যেখানে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। যদি আমাদের কোন অপকর্ম থাকে, মন্দ কাজ থাকে এবং নিজ পরিবারের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা কিভাবে মুখ লুকিয়ে থাকি। পরিবারবর্গের সামনে অপমানিত লজ্জিত অপদস্থ হয়ে থাকি। প্রতিবেশী ছাড়িয়ে যদি এ অপবাদ সম্পূর্ণ শহরে ছড়িয়ে পাড়ে যে, অমুক সাহেবের কার্যকলাপ হলো এই। তাহলে ঘর থেকে বেরোবার উপায় থাকবে না। আমাদের অপকর্ম যদি অন্যদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। আর যখন আল্লাহ না করুন, পূর্বাপর মানব জাতি আদম (আ.)-এর বংশধর সকলের সামনে আমাদের পাপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সবাই দেখবে, সেখানে মুসলমান অমুসলমান আপন ও পর সবাই থাকবে। প্রতিটি মানুষ পরিষ্কার দেখবে, অমুক ব্যক্তি এ অপকর্ম করেছে। তখন কত অপমান ও লজ্জার কথা হবে। তখন ঐসব মানুষের অপমান লাঞ্ছনা কি চরম আকার ধারণ করবে। কাজেই ঐ বিপদের সময় থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। ঐ সময়ের يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব নিকাশ দিতে থাকবে।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ.

কেয়ামতের দিনে যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন– তোমরা হেদায়েত করেছিলে? সৎপথ প্রদর্শন করেছিলে? তোমাদের উম্মতগণ তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিল? রাসূলগণ বলবেন– অমুক ব্যক্তি আমার কথা শুনেছিল, অমুক শুনেনি। অমুক সম্প্রদায় আমার কথা মেনেছিল, অমুক সম্প্রদায় আমার কথাবার্তা শুনেনি। তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় অপমানিত লজ্জিত ও অপদস্ত হওয়া কত মারাত্মক হবে। অনুমান এখানে বসে কেউ করতে পারবে না।

দৈনন্দিন কাজের হিসাব-নিকাশ করা উচিত

এজন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا পরকালের হিসাব নিকাশের আগে নিজ জীবনের হিসাব নিকাশ করে নাও। আগেই নিজের ভাল মন্দ আমল সংশোধন করে নাও। আল্লাহ তায়ালার হিসাব রক্ষকগণ তোমাদের হিসাব নিকাশকে সংরক্ষণ করছেন; সব পরীক্ষা করে দেখা হবে।

যদি অভ্যাস করে নেয়া হয়, তাহলে এটা বড় কোন কাজ নয়। জীবনের সব কিছু মানুষের স্মরণ থাকে না। কিন্তু প্রাত্যহিক কাজকর্ম স্মরণ থাকে। তাই শয়নকালে বিছানায় শুয়ে দশ মিনিট এ চিন্তা করে নাও। আজকের দিনে কত পাপ করেছ, কত পুণ্য ও নেকী করেছ। যদি নেকী করে থাকো, তাহলে আল্লাহর শুকর আদায় কর। এ হলো আল্লাহ তায়ালার দয়া; তিনি আমাকে নেকী করার তাওফিক দান করেছেন। এ সম্পর্কে খোদা তায়ালার ওয়াদা রয়েছে– যে ব্যক্তি নেয়ামতের শুকর আদায় করবে তার নেয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে। নেকীর উপর শুকর আদায় করা হলে নেকী বাড়িয়ে দেয়া হবে। দিনে যে সকল পাপ করেছ, তাও চিন্তা করে দেখ। কৃত পাপের জন্য কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে তওবা করো– হে আল্লাহ! আমার ভুল-ভ্রান্তি ও পাপকে মোচন করে দাও। যদি আল্লাহর হক নষ্ট করে থাক, তাহলে পরের দিন সেটা মাফ হয়ে যাবে। আর যদি মাখলুকের হক নষ্ট করে থাক, তাহলে পরের দিন তা পূরণ করে দিবে। কারো টাকা পয়সা হরণ করে থাকলে তা ফেরত দিয়ে যাবে। কাউকে মন্দ বলে থাকলে, নিন্দা করে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আল্লাহর হক নষ্ট করে থাকলে তা তওবায় মাফ হয়ে যাবে।

বান্দাদের হক যদি নষ্ট করে থাক, তাহলে তওবা করবে এবং হকদার ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। যদি দৈনন্দিন নিজের হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করে নাও, তাহলে মরণের চিন্তা মানুষের হবে না। মৃত্যুকালে হিসাব পরিষ্কার থাকবে। কোন অসুবিধা বা কোন বিপদ হবে না।

আর যদি প্রতিদিন হিসাব না করা হয়, তাহলে প্রতিদিনের পাপকর্ম সঞ্চিত থেকে যাবে। আগামীকাল আরো পাপ জমা হবে। পাপের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তৃতীয় দিন আরো পাপ করায় পাপের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল। এভাবে মৃত্যুকালে পাপের কালো পর্দা সামনে উদ্ভাসিত হবে।

পুঞ্জীভূত পাপে ক্লেদাক্ত অন্তরকে পরিষ্কার করা খুবই কঠিন ব্যাপার। যদি কোন কাপড়ে দাগ লেগে যায় তৎক্ষণাৎ সাবান দিয়ে ধুয়ে দেয়ার ফলে কাপড় পরিষ্কার

হয়ে যায়। আর যদি দাগের পর দাগ লাগতে থাকে, তাহলে এক মাসে সম্পূর্ণ কাপড় কালো হয়ে যাবে। তখন বাজারের সকল সাবান ব্যবহার করেও কাপড়ের দাগ উঠানো যাবে না। যেহেতু কাপড়ের রঙই কালোতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এজন্য প্রতিদিন ময়লা ধুয়ে কাপড় পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। জমা করে রাখা ভাল নয়।

এজন্যই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যদি পাপকর্ম কর, তাহলে পাপের সঙ্গে সঙ্গে তওবাও করতে থাকবে, যেন পাপ মুছে যায়। আমলনামা ঠিক থাকে। বার বার পাপ করবে না। পাপকে কেন্দ্রীভূত করবে না। শোয়ার সময় দশ মিনিট এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখবে। একাজ কোন কঠিন কাজ নয়। প্রতিদিন নিজের নফসের হিসাব নিকাশ করে নিবে। নেক কাজ মনে পড়লে শুকর করবে, বদকাজ পাপকর্ম মনে পড়লে তওবা করে নিবে। প্রতিদিন যখন তওবা করতে থাকবে সহজভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারবে। মৃত্যুর কল্পনা আতংকিত করবে না।

নেকীতে আশা আর পাপে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়

নেক আমল করলে আশা সৃষ্টি হয় এবং পাপ দ্বারা নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। যে চাকর সব সময় আদেশ লংঘন করে, সে নিরাশ হয়ে পড়ে। সে কিছুই পাওয়ার যোগ্য থাকে না। মনিব তাকে কৃত অপরাধের কারণে জুতা মারবে। আর যে চাকর উত্তমরূপে মনিবের আদেশ পালন করে চলে সে আকাঙ্ক্ষা করে, যদি কেউ তার কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে সে কি কাজ করেছে, তা হলে সে বলতে পারবে– কি কি কাজ সে করেছে এবং সে পুরস্কারের আশা করবে। তার বেতন বৃদ্ধি পাবে। মনিবের অন্তরে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি হবে। অতএব সৎ ও নেক আমল দ্বারা আশার সঞ্চার হয়। আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পয়দা হয়। আর পাপ দ্বারা নৈরাশ্য পয়দা হয়। অন্তরে দুশ্চিন্তার উদয় হয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। খোদার সাক্ষাৎ মন চায় না। নেককার মানুষ আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে, কখন মৃত্যু আসবে। যেহেতু কৃতকর্মের শুভফল তার লাভ হবে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিরাশ হয়ে পড়ে। মৃত্যু যেন কোনভাবে না আসে, মৃত্যুর কল্পনাও তাঁর জন্য মারাত্মক হয়ে পড়ে, পীড়াদায়ক হয়।

এজন্য কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা সব সময় কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকে, তাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। পরকালের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। এজন্য মৃত্যু তাদের কঠিন মনে হয়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ.

তোমরা তাদেরকে জীবিত থাকার জন্য অত্যন্ত লালায়িত দেখতে পাবে। তাদের বয়স যদি পঞ্চাশ বছর হয়, তাহলে তারা ষাট বছরের আকাঙ্ক্ষা করবে, দুনিয়াকে ত্যাগ করতে চাইবে না। [বাকারা : ৯৬]

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

যারা শিরক গুনাহে লিপ্ত রয়েছে তারা এ আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে– হায়! যদি আয়ু হাজার বছর দীর্ঘ হত! যদি এমন হয়ে যায়, তাহলে আরো এক হাজার বছরের জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। তারা দুনিয়া থেকে যেতে চাইবে না। যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী নয়, তাদের সামনে নিরাশা ও অন্ধকার বিরাজমান, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর নেককার মুমিন সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– ইহুদীগণ বলেছিল, আমরা খোদার আপনজন। খোদার বন্ধু। তাদেরকে তখন বলা হলো–

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ.

হে ইহুদীগণ! তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার বন্ধু ও আপনজন হয়ে থাক তাহলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে তা প্রমাণ কর। ওলীগণ আকাঙ্ক্ষা করতে থাকেন– কখন আমি এ দুনিয়া ত্যাগ করে আমার প্রভুর কাছে চলে যাবো, তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হব। তোমরা যদি বাস্তবিক ওলী হয়ে থাক, তাহলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাও। অথচ তোমাদের অবস্থা হলো– মৃত্যুর নাম শুনলেই তোমাদের কম্পন আসে। তোমরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাক, কোন অবস্থায় যেন দুনিয়া ছেড়ে যেতে না হয়। আর একজন কামেল ওলী বলতে থাকেন– হে আল্লাহ! কখন ঐ দিন আসবে যখন এ পঙ্কিল দুনিয়া ত্যাগ করে পবিত্র বাসস্থানে পৌঁছে যাব।

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم

راحت جاں طلبم وزپئے جاناں بروم

نذر کرم گر آید بسرایں بنجم روزے

تادر میکدہ شاداں وغزل خواں برویم

তাঁরা বলতে থাকেন– ঐ দিন কত মোবারক হবে, যে দিন এ নশ্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত দুনিয়াকে ত্যাগ করে পবিত্র বাসস্থানে পৌঁছে যাব। উৎফুল্ল মনে, আনন্দ চিত্তে খোদার হামদ ও ছানা (প্রশংসা) সম্বলিত গান গেয়ে গেয়ে পরকালে পৌঁছে যাব। বেলায়েতের বিশেষত্ব হল এই– মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পয়দা হয়। খোদার সাক্ষাৎ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। আর পাপ ও গুনাহর বিশেষত্ব হলো– নিরাশা বেড়ে যায়। খোদার দিদার ও সাক্ষাৎ মনে চায় না। তাই বলা হয়েছে– মুশরিকরা দুনিয়ায় দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য অত্যন্ত লালায়িত থাকে। আসলে নেকী যত বৃদ্ধি পাবে, মৃত্যু মানুষের জন্য ততই পছন্দনীয় ও প্রিয় হতে থাকবে।

কোন কোন সময় আমাদের অবস্থা এমন হয়– সামান্য অসুখ হলেই মনে হয়, আর বাঁচব না। তখন আমরা পেরেশান হয়ে যাই। আমার জন্য কিছু করা হোক। তাবিজ করা হোক, চিকিৎসা করা হোক। ডাক্তার, কবিরাজ ডাকা হোক। আমি যেন মরে না যাই। জীবন মরণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু মানুষ এত আতংকিত হয়ে যায়। আল্লাহই জানেন কি হয়ে যাবে। একজন নেক মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য মৃত্যু আনন্দ ও খুশির ব্যাপার। যদি জীবিত থাকি, তাহলে আমি রোযা, নামায, ইবাদত-বন্দেগী সবই করার সৌভাগ্য লাভ হবে। আর যদি মরে যাই, তাহলে খোদার সাক্ষাৎ লাভ হবে। এর চেয়ে উত্তম আর কি জিনিস হতে পারে। তাদের জীবন মরণ উভয়ই আনন্দদায়ক।

হযরত বেলাল (রা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তাঁর চেহারা আনন্দিত ছিল। তিনি আনন্দে বিভোর ছিলেন। মানুষ আরজ করল– হযরত! মৃত্যু যাতনা হচ্ছে, আর আপনি কি করে এত আনন্দিত হচ্ছেন? চেহারা এত উৎফুল্ল মনে হয় যেন আপনার শাদী হবে।

তিনি বলেন– غَدًا نَلْقَى مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهٗ 'অতি শিগগিরই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাই আনন্দিত হচ্ছি, কারণ মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী।

হযরত উসমান (রা.) তার শাহাদতের সময় আনন্দিত ছিলেন এবং রোযাদার ছিলেন। বললেন– কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইফতার করব। মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে। এ অবস্থায় নেকী তাহারত, তাকওয়া ও পবিত্রতা পয়দা হয়, মৃত্যু আনন্দদায়ক হয়ে যায় এবং অন্তরে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পয়দা হয়।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করে নিবে এবং শুকরের মাধ্যমে নেকীকে বাড়িয়ে নিবে। আর তওবার মাধ্যমে পাপকে মোচন ও পরিষ্কার করে নিবে। এমতাবস্থায় মৃত্যু আনন্দদায়ক হয়ে থাকে, যখন বুঝে আসতে থাকে– মৃত্যু আসন্ন, তখনও আতঙ্কগ্রস্ত হবে না। বলবে– হে আল্লাহ! আমি যদি বেঁচে থাকি, তবুও তোমার আর যদি মরে যাই তবুও তোমার। এখানে তুমি দুনিয়ায় রেখেছো, আর ওখানে রাখবে পরলোকে। দু'জগতই তোমার। কাজেই তোমার কাছেই থাকব। আমার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে কবরের ভয়ানক অবস্থা বর্ণনা করলেন। ভয়ানক আকৃতি নিয়ে মুনকার নকীর ফেরেশতা নেমে আসবেন। সেখানে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করবে। অত্যন্ত বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে।

হযরত উমর (রা.) আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হ্যাঁ ঠিক থাকবে। উমর (রা.) বললেন– তাহলে চিন্তার কারণ নেই, যা কিছু হওয়ার হবে। মুনকার নকীরকে কাবু করে ফেলব। যে বুদ্ধি দিয়ে পার্থিব জড় পদার্থের জ্ঞান বুদ্ধি বুঝায় এ বুদ্ধি তা নয়। পার্থিব জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে উড়োজাহাজ ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে থাকে, কিন্তু সবই নশ্বর। কিন্তু ঈমানী জ্ঞান বুদ্ধি অর্থাৎ ইলম, মারেফত, তাওয়াক্কুল এবং ইমানী শক্তি অবিনশ্বর। এরা কি ঐ সময় সঙ্গে থাকবে? বললেন– থাকবে। আরজ করলেন– তা হলে কোন চিন্তা নেই, নকীর মুনকীর যে কোন আকৃতি নিয়ে আসুন, তারাও খোদার সৃষ্টি, আমরাও খোদার সৃষ্টি। ভয়ের কি প্রয়োজন? আল্লাহ তায়ালা সামনে রয়েছেন, যাকে আমরা ভয় করছি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, সে অন্য কাউকে ভয় করবে না। এ হলো পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ও নেক আমলের বরকত। মুমিনের না আছে মৃত্যুর ভয়, না আছে ভয়ানক দৃশ্যাবলীর ভয়। ব্যস! আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা। যখন তিনি ইচ্ছা করবেন নিয়ে যাবেন, আমরা তাঁরই ছায়াতলে আশ্রয়ে রয়েছি। আমাদেরকে ভীত আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন কি?

যে রাজকর্মচারী বাদশাহর কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকে, সব সময় সে তার নিকটে থাকে, তার জন্য কোন চিন্তা নেই। যখন বাদশাহ ভ্রমণে যাবেন, সেও তাঁর সঙ্গে থাকবে। তার হালুয়া রুটি সর্বদা ঠিক থাকবে। কারণ সর্বদা সে রাজার সহচর। তার চিন্তা করার প্রয়োজন কি? এ অবস্থা হলো মুমিনের সফরকালে দুনিয়ার মুসাফিরখানায়। এখানেও কোন চিন্তা, কোন কষ্ট নেই।

কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে রয়েছে। আবার যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবে, তখন তো সুখ আর সুখ। ঐ স্থানে পৌছে গেল যার জন্য আজীবন সে সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছিল।

এসব জিনিস আমলের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়েছে– قُلِ اعْمَلُوْا হে নবী! আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন– হে লোক সকল! আমল করতে থাকো। কারণ, আমল বেকার যাবে না। নিষ্ফল হবে না–

فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ.

অচিরেই এ আমলকে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুমিনকে দেখাবেন। [তাওবা : ১০৫]

وَسَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

সময় ঘনিয়ে আসছে। তোমরা সবাই তখন খোদার কাছে পৌছে যাবে। যে খোদা গায়েব ও শাহাদা দৃশ্য অদৃশ্য সবই জানেন। কোন সূক্ষ্মতম বস্তুও তাঁর অদৃশ্য নয়। শুধু এমন নয় যে তিনি কেবল জানেন বরং–

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কৃতকর্মসমূহ তোমাদেরকে বলে দিবেন। যদি নেকী ও পুণ্য করে থাক, তাও বলে দিবেন। তুমি খুব ভাল মানুষ, উত্তম কাজ করেছ। আর যদি খারাপ ও মন্দ কাজ করে থাক, তাও বলে দিবেন– এসব তোমার কার্যাবলী। তিনি সব বলে দিবেন। তোমরা কে কেমন মানুষ, তোমরা কে কি করেছিলে সব বলে দিবেন।

পৃথিবীতে পাপ-পুণ্যের প্রকাশ

মানুষের পাপ-পুণ্য গোপন থাকে না। দুনিয়াতে থাকাবস্থায়ই প্রকাশ হয়ে পড়ে। পরকালে তো প্রকাশ হবেই। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যদি একটি রুদ্ধদ্বার কোঠা এবং তার মধ্যে আর একটি কোঠা থাকে এবং এর ভেতরে আর একটি কামরা থাকে– এভাবে যদি সাতটি কামরা থাকে; আর যদি কোন কামরায়ই দরজা, জানালা না থাকে এবং কোন ছিদ্র না থাকে, রোশনদান না থাকে। সপ্তম কোঠার ভেতরে বসে মানুষ কোন পাপ বা পুণ্য কাজ করে, আল্লাহ তার আমল

ও কাজকে প্রকাশ করে দেন। মাখলুকের অন্তরে ঢেলে দেন, অমুক ব্যক্তি এ কাজ করেছে।

নেককার মানুষকে লোকে নেককার বলে স্বীকার করে, মান্য করে। যদিও কেউ গিয়ে তাকে দেখেনি যে, সে কি কি নেক কাজ করেছে। সাধারণভাবেই মুখে প্রকাশ হয়, অমুক ব্যক্তি খুব নেককার। আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে এ নেক ধারণা দিয়ে দেন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সব সময় তার পাপকর্ম গোপনে করে থাকে। জনসমক্ষে কেউ অসৎ কাজ করে না। চোর চুরি করে গোপনে। ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় গোপনে, কিন্তু দুনিয়াবাসী বলবে– অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত বদকার পাপিষ্ঠ, নেহায়েত চরিত্রহীন। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমরা স্বয়ং তাকে অপকর্ম ও পাপকর্ম করতে দেখেছ কি? তারা বলবে, না দেখিনি। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে সংবাদ পৌছে দেয়া। মানুষ ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য যাই করুক, গোপন থাকে না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের এসব আমলকে দেখবেন, শুধু দুনিয়াতে নয় বরং পরকালে আল্লাহর দরবারেও। আল্লাহ বলবেন, তুমি এসব করেছিলে। বলে দেয়ার পর প্রতিফল দেয়া হবে। নেকীর প্রতিফল নেকী দ্বারা এবং মন্দের প্রতিফল মন্দ দ্বারা দেয়া হবে। অণু পরিমাণ নেক কাজ যে করেছে–

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ

তা তার সামনে এসে যাবে এর প্রতিফল দেয়া হবে। [যিলযাল : ৭]

যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও পাপ করবে–

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ

কবরে তাও সামনে এসে যাবে। এর প্রতিদানও সে পেয়ে যাবে। [যিলযাল : ৮]

আমলী জিন্দেগি গ্রহণ করা দরকার

আমি এ আয়াত এ কারণে গ্রহণ করেছিলাম যাতে আমলী জিন্দেগী গ্রহণ করা হয়। যেসব মাসআলা জানা হয়েছে, নিজের জীবনের পর্যালোচনা করে সে অনুযায়ী আমল করা প্রয়োজন। আর যেসব মাসআলা জানা হয়নি, সেগুলো জেনে নেয়া দরকার যাতে বাকি জীবন সুন্দর সঠিক হয়ে যায়। এ অবস্থা তখনই

হবে যখন অন্তরে আমলী জিন্দেগির ফিকর ও চিন্তা-ভাবনা জাগবে। শুধু বাকপটুতা দিয়ে উচ্চ আশা পোষণ করলে কাজ হবে না। আসলে কাজ হয় চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে–

لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

মানুষের জন্য তার চেষ্টা ও পরিশ্রমই কার্যকরী বা উপকারী। [নাজম : ৩৯]

যেমন পার্থিব বিষয় লাভ করতে যদি চেষ্টা পরিশ্রম না করে ব্যবসা-বাণিজ্য চাষাবাদ না করে, তাহলে তার কোন উপকার হবে না। নিজের কর্মই উপকারে আসে। অন্যজন যদি সেবা যত্ন করেও, তাহলে একদিন করবে, দুদিনও করতে পারে। কিন্তু নিজের মতো সব সময় দায়িত্ব নিবে না। তাকে বসিয়ে রেখে লালন পালন করবে না। বিখ্যাত প্রবাদ– 'চোখের পানি দিয়ে কলস ভরা যায় না।' নদী বা সমুদ্রে কলস ভরা যায়। কেবল অন্যের সাহায্য নিয়ে জীবন চলে না। মানুষ নিজে কিছু করবে। তারপর অসুবিধা দেখা দেবে। তাতে অন্যের সাহায্য নেয়া চলবে। এমনটা হতে পারে না যে, অন্যরা তার দায়িত্ব বহন করবে। তিনি হাত পা নড়াচড়া করবেন না। কেবল অন্যের আশায় থাকবেন, এটা হয় না। নিজের চেষ্টায়ই সফলতা আনবে। দুনিয়ার নশ্বর বস্তুও যখন বিনা চেষ্টায় হাসিল করা যায় না, তখন পরকালের মত পবিত্র জিনিস বিনাশ্রমে পাওয়া যাবে কেমন করে? ঘরে বসে বিনাশ্রমে কি পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

আমি কি আমার রহমত ও দয়া তোমাদের কোমরের সঙ্গে বেঁধে দেব? অথচ তোমরা একে অপছন্দ করে পলায়ন করছ এবং আমি তোমাদের পেছনে ছুটতে থাকব– রহমত ও দয়া নিয়ে যাও। না, তা হয় না। চেষ্টা পরিশ্রম কর। তোষামোদ করো, তাহলেই রহমত পাবে। মুখাপেক্ষী যদি না হও, তাহলে আমিও গনি, মুখাপেক্ষী নই। তোমরা মুহতাজ হয়েও মুখাপেক্ষী হতে চাচ্ছ না। আর আমি তো কখনো কারো মুখাপেক্ষী নই। মুখাপেক্ষিতার নামগন্ধও নেই আমার মধ্যে। এ তো হল আমার কাজ, আমার ইচ্ছা মানুষের নয়।

এ কারণে আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম এবং আমল সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরজ করলাম। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দিয়ে উদাহরণ পেশ করলাম যে, আমলের মূল্য ও মর্যাদা হচ্ছে এই। এদিকে খেয়াল রাখা কর্তব্য। ইলম অল্প হোক কিন্তু সে মোতাবেক

পূর্ণাঙ্গ আমল হোক। ইনশাআল্লাহ ইহ ও পরকালে তা উপকারী হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নেক আমলের তাওফিক দান করুন। আমিন!

اللهُمَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٌ وَّاٰلِهٖ وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

বয়ান : ৬

মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জীবন যখন সীমাহীন ও অনন্ত তখন উদ্দেশ্যও এমন হবে যা চিরকাল সঙ্গে চলতে পারে। কিছুদিন পর যদি তা শেষ হয়ে যায় তাহলে তাও পাগলামী হবে। লাখ লাখ বছরের আয়ু নিয়ে মানুষ এসেছে এবং উদ্দেশ্য স্থির করেছে। এমন নয় যে দশ বিশ বছর পর তা শেষ হয়ে যাবে। তারপর জীবন হয়ে পড়বে উদ্দেশ্যহীন। তা হলে ঐ পাগলামী আবারও এসে যাবে। জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা কর্তব্য।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا.

সবচেয়ে বড় নেয়ামত

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আল্লাহ তায়ালার দান ও দয়া মানব জাতির উপর বেশুমার। এর শুমার বা গণনা করা যায় না। পদে পদে নেয়ামতের বারি মানুষের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মানব সমাজকে বিস্ময়কর এনামের মাধ্যমে ভূষিত করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে বসে যাও, তাহলে গণনা করে তা শেষ করতে পারবে না। নেয়ামতের হিসাব করতে পারবে না।

সারকথা, মানব জাতির উপর অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে। কিন্তু সব নেয়ামতের মূল হলো জীবন, যা আমাদেরকে দান করা হয়েছে। যদি জীবন না থাকে তাহলে কোন নেয়ামতই আমাদের কোন কাজে আসবে না। উপকারী বা কল্যাণকর হবে না। কাজেই প্রকৃত নেয়ামত হল জীবন। একজন জীবিত মানুষই কেবল নেয়ামতের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। তাই সব নেয়ামত একদিকে আর জীবন অন্যদিকে।

প্রথম নেয়ামত জীবন, যার কোন মূল্য নেই বা হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তা বিনামূল্যে দান করেছেন।

ما نبودیم و تقاضئے ما نبود ☆ لطف تو نہ گفتہ ما می شنود

আমরা ছিলাম না। আমাদের পক্ষ থেকে কোন দাবী বা আবেদন নিবেদন ছিল না কিন্তু তাঁর দয়া ও মেহেরবানী আমাদের নীরব আবেদন শুনেছিল। আমরা চাচ্ছিলাম, আমাদেরকে জীবন দান করা হোক। এ নীরব প্রার্থনার উপর এত বড় নেয়ামত তিনি দান করেছেন যে সমগ্র দুনিয়ার বিনিময়ে এর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। একজন মানুষের একান্ত ইচ্ছা থাকে তার সন্তান হোক। যদি না হয় তাহলে বিশ্বের কোষাগার উজাড় করে দিয়েও তা লাভ করা যাবে না। আর যখন তিনি দান করেন, তখন দরিদ্র ব্যক্তিকেও এত বেশি সন্তান দান করেন যে সে ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায়। আবেদন করেও নেয়ামত পাওয়া যায় না। মূল্যের বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল দয়া ও মেহেরবানীর মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় ও উত্তম নেয়ামত হল জীবন। এ জীবন কোন ছোটখাটো জীবন নয়। আপনি যাকে জীবন মনে করেন, পৃথিবীতে সে জীবন কারো পঞ্চাশ বছর কারো ষাট বছর। যদি দীর্ঘ হয় তাহলে আশি নব্বই বছর হয়ে থাকে। এ জীবন আসল নয়। এ জীবন হলো আসল জীবনের এক ক্ষুদ্রতম অংশ।

চিরস্থায়ী জীবন

মানুষ সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন–

মানুষ আদি নয় কিন্তু চিরন্তন। সর্বকালে ছিল না। কিন্তু জন্মগ্রহণের পর চিরকাল থাকবে। জীবন পাওয়ার পর মানুষের জন্য ধ্বংস নেই। বাসস্থান পরিবর্তন, প্রথম স্থান হতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হতে তৃতীয় স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকবে। স্থান পরিবর্তন হবে। কিন্তু মানুষের জীবন নিঃশেষ হবে না।

মানুষ সর্বপ্রথম أَلَسْتُ (রূহ) জগতে ছিল, যখন আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে

তার বংশধরগণকে আল্লাহ তায়ালা বের করেছিলেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– আল্লাহ তায়ালা ডান হাত দিয়ে হযরত আদমের পিঠে আঘাত করলেন। তখন তার সব নেক সন্তান বেরিয়ে পড়ল। বাম হাত দিয়ে আঘাত করলেন, বদকার সব সন্তান বেরিয়ে পড়ল। এই ছিল আদম সন্তানদের প্রথম প্রকাশ। এই ছিল عَهْدَ اَلَسْتُ এর প্রথম প্রকাশ। এখান থেকে মানুষের যাত্রা শুরু। তারপর স্থান পরিবর্তন করে মাতৃগর্ভে আগমন করল। মাতৃগর্ভে তার বয়স হলো নয় মাস। আগেও সে ধ্বংস বা শেষ হয়নি। মাতৃগর্ভে এসেও শেষ হয়ে যায়নি। عَهْدَ اَلَسْتُ হতে স্থান পরিবর্তন হয়ে এসে পড়ল মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভ থেকে স্থান পরিবর্তন হয়ে এসে পড়লো দুনিয়াতে। ইহজগত পার করে অন্য জগতে যাওয়ার জন্য তার ইন্তেকাল হয়। দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল হবে। আলমে বরযখে (কবর জগত) যাবে। বরযখ থেকে ইন্তেকাল হলে আলমে মাহশরে পৌছে যাবে। সেখানকার একটি দিন দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। আলমে মাহশর থেকে ইন্তেকাল হবে। আলমে জান্নাতে পৌছে যাবে। তারপর আলমে জান্নাতে প্রতিদিন একাধিক ইন্তেকাল হবে। বড় বড় জগত স্তর হিসাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হতে থাকবে। অতএব যে দিন থেকে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সব সময় সফর করে চলছে এবং করতে থাকবে। এজন্য মানুষ আদি নয় কিন্তু অনন্ত। তার শেষ নেই। তাই আপনার বয়স কম নয়। একে বিশ পঞ্চাশ বা শত বছর মনে করে নিবেন। এ হলো মানব জীবনের এক অতি সাধারণ অংশ। মানুষ অনন্ত কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে। ঐ সীমাহীন জীবনের এক সামান্য অংশকে আমরা জীবন মনে করি। এ জীবন ঐ জীবনের কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। এতে অনুমান হলো মানুষের জীবন খুব দীর্ঘ।

ঐচ্ছিক উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব

এই পার্থিব জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ তায়ালা এখতিয়ার-বহির্ভূত একটা অংশ রেখেছেন। আপনি ইচ্ছা করুন বা নাই করুন তা শেষ হয়ে যাবে। আর মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করেছে তখন সে আর ধ্বংস ও নিঃশেষ হবে না। কিন্তু কিছু জিনিসকে তিনি মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। এগুলোকে সে স্বেচ্ছায় নিজ জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে চলে। এগুলোর অধীনে জীবন পরিচালিত করে। কারণ যে সময়কাল বা যে জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে পার হয়ে যায় তা যে পাগলের পাগলামী। পাগলের কোন কাজে উদ্দেশ্য থাকে না। তারও

জীবন পার হয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবন পার করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ হলো পাগলের কাজ। জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যে উদ্দেশ্যের অধীনে জীবন পার করা হবে। আমি জীবিত কেন? আমাকে কি করতে হবে? এখানে আমার আগমন হয়েছে কেন? আর যে স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, এক জগত থেকে অন্য জগত, এখান থেকে সেখানে– এ কি কোন নাটক, না কোন কাহিনী, যাতে অযথা মানুষ চলছে?

আমরা যখন করাচী থেকে হায়দারাবাদ সফর করি তখন কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। সে উদ্দেশ্য দীনি কিংবা দুনিয়াবী যাই হোক। ভেবে নিই যে, এই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। উদ্দেশ্যহীনভাবে কেউ কোথাও যায় না। যদি জিজ্ঞেস করা হয়– 'কেন যাচ্ছেন?' তখন বলবে– 'এমনেই যাচ্ছি।' এমন কথায় লোকেরা পাগল মনে করবে। পাগল তাকেই বলা হয় যে উদ্দেশ্যহীন জীবন পার করে দেয়। আর সেই বুদ্ধিমান যার প্রতিটি কাজে কোন না কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই থাকে। তাই এত বড় কাজ, বড় সফর যা হাজার বছর ধরে চলছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে– এটা যদি উদ্দেশ্যহীন হয় তাহলে এটা হবে পাগলামী। আর এত দীর্ঘ পাগলামী যার কোন শেষ নেই, সীমা নেই। তা মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। মানুষের দাবি হলো, আমি সর্বোত্তম, আমি বুদ্ধিমান। আমাকে পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধি দান করা হয়েছে। তার দাবি, আমি সৃষ্টির সেরা। আমার স্থান ও মর্যাদা সবার শীর্ষে। আমি শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা জাতি থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই ঐ মানুষ, যার দাবী এত বিশাল– সে তার দীর্ঘ জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে পার করে দিবে তা হয় না। বিবেক বুদ্ধিতে যে সবার শীর্ষে– তার এত বড় দাবি সত্ত্বেও এসব পাগলামী কাজকর্ম সে করবে তা হয় না। অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন কর্মপদ্ধতি বিহীন জীবন যাপন তার শোভা পায় না। তাই প্রকৃত মানুষ ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে যার জীবনের স্থির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে।

অনন্ত উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ হবে না, হওয়া উচিতও না। এ কারণে যে, জীবন যখন সীমাহীন ও অনন্ত তখন উদ্দেশ্যও এমন হবে যা চিরকাল সঙ্গে চলতে পারে। কিছুদিন পর যদি তা শেষ হয়ে যায় তাহলে তাও পাগলামী হবে। লাখ লাখ বছরের আয়ু নিয়ে মানুষ এসেছে এবং উদ্দেশ্য স্থির করেছে। এমন নয় যে দশ বিশ বছর পর তা শেষ হয়ে যাবে। তারপর জীবন হয়ে পড়বে উদ্দেশ্যহীন। তা হলে ঐ পাগলামী আবারও এসে যাবে। জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা

কর্তব্য। যেমন- আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। যদি মানুষ দশটি জগত অতিক্রম ও পরিবর্তন করে, তাহলে ঐ উদ্দেশ্যেই দশটি জগত অতিক্রম করব। তাই চিন্তা করা দরকার, জীবনের মত নেয়ামত, অমূল্য দৌলত, যার মূল্য সমগ্র পৃথিবী একত্রিত করেও হবে না। এ নেয়ামতের জন্য এমন পূত-পবিত্র ও উচ্চাঙ্গের উদ্দেশ্য হতে হবে যা দেখে সৃষ্টিজগত আমাদের বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করে নেয়। মানুষ নিজেরা যেন পরপারে বলতে থাকে– উদ্দেশ্য অত্যন্ত সঠিক ও মূল্যবান ছিল।

সম্পদ ও খাবার উদ্দেশ্য নয়

দুনিয়াতে অনেক উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- জীবনের এক উদ্দেশ্য এও হতে পারে– আমরা আমাদের সুদীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য রুটি ও খাদ্য সামগ্রী স্থির করে নিলাম। আমাদের আহার্য মিলে যাক। আমরা খাবার পেতে চাই। এটাও একটি উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু এ কেমন উদ্দেশ্য যার জন্য কোন মহৎ গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজন নেই। কোন ইলম ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এ উদ্দেশ্য অশিক্ষিতরা স্থির করে নিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যই তো একমাত্র জিনিস যার জন্য কোন প্রকার ইলম বা জ্ঞানের প্রয়োজন নেই; বরং এ কাজে বিদ্যা ব্যয় করা শিক্ষার অবমাননা। কেননা শুধু খাদ্যদ্রব্য জীবজন্তুদেরই উদ্দেশ্য। প্রত্যেক জীবজন্তু তার উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করে। বাঘ, সিংহ এসব পশুও আহার করে। তাদের কি কোন ডিগ্রী আছে, যা দিয়ে তারা খাবার উপার্জন করে? আহার্য এমন বস্তু যার জন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আলেম, জাহেল শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই তা পায়। মানুষও পায়, আবার জীবজন্তুও পায়। সারকথা, এমন জিনিসকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত ও গ্রহণ করা যায় না যার জন্য কোন প্রকার ইলম ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এ যেন জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, জীবনের অবমাননা।

তারপর এ জীবন অনন্তকালের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। অথচ উদ্দেশ্য এমন জিনিসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যা দশ বিশ বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যখন মানুষের শ্বাস শেষ হবে, রুটি ও খাদ্যের প্রয়োজন তখনই শেষ হয়ে যাবে। রুটি তাকে এবং সে রুটিকে ত্যাগ করবে। এর অর্থ হল– পরবর্তী জীবন তার রয়ে যাবে উদ্দেশ্যহীন। এজন্য দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্যও দীর্ঘ হতে হবে। কাজেই খাদ্য ও রুটি উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ধন-দৌলতও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি যদি ধন-সম্পদ অর্জন করাকে জীবনের

উদ্দেশ্য বলে স্থির করেন তাহলে এ কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়। এ হলো একটি মাধ্যম বা প্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষ যে পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবিত থাকবে, উপার্জন করবে। আর মানুষের প্রতি উপার্জনের আদেশও রয়েছে। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে না। কিন্তু তা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উপার্জন করা অন্য উদ্দেশ্যের জন্য হয়ে থাকে।

ধন উপার্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ঐ উদ্দেশ্য যা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়- যদি তা অন্য কোন উপায়ে হাসিল হয়ে যায় তাহলে উপার্জন অবশ্যই ত্যাগ করা হবে। খাদ্যবস্তু ও বাসস্থান অর্জন কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যদি আল্লাহ তায়ালা এমন কোন জগতে পাঠিয়ে দেন যেখানে আমাদের এ জাতীয় বাসভবনের প্রয়োজন হবে না, আর হবে না প্রয়োজন উদর পূর্তির। তখন অর্থ ও ধন উপার্জনেরও প্রয়োজন হবে না। মোটকথা, ধন-দৌলত অর্থ-সম্পদ জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ সবই অস্থায়ী জিনিস।

তাছাড়া জগতের যে কোন বস্তু যত মূল্যবানই হোক না কেন সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ যখন এ জগত ত্যাগ করবে, তখন সবকিছু ফেলে রওনা শূন্য হাতেই রওনা হবে। তাহলে এটা উদ্দেশ্য হবে কেমন করে? প্রয়োজন এমন উদ্দেশ্যের যা আমাদের জীবনের পাশাপাশি চলতে থাকবে। কোটি কোটি বছরের জীবন যদি হয় তাহলে কোটি কোটি বছর সঙ্গে থাকবে। তাহলেই দীর্ঘ জীবনের মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হবে। আল্লাহর এ নামের সম্মান করা হবে। নইলে অসম্মান করা হবে। এত বড় নেয়ামত, অথচ এর কোন উদ্দেশ্যই নেই। আর যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে অল্প সময়ের জন্য মাত্র।

সম্মান ও প্রতিপত্তি উদ্দেশ্য হতে পারে না

ধরা যাক, মান সম্মান একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা খাদ্য নয়, ধন-সম্পদও নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা। অর্থাৎ মান-সম্মান আমাদের উদ্দেশ্য এজন্য মনে করা হয় যে, এর মাধ্যমে মানুষ সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে।

এই উদ্দেশ্য মন্দ নয়। তবে এমন উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্থূল ও ভিত্তিহীন। এর কোন ভিত্তিই নেই। এজন্য যে, আমরা যে বস্তুকে মান-সম্মান বলে মনে করি তার অর্থ মানুষ আমাকে বড় মনে করবে। অর্থাৎ আমার সম্পর্কে মানুষের ধারণা যদি সাঠিক হয়, তাহলে আমাকে সম্মান করবে। তাহলে সম্মান আমাদের বটে কিন্তু তা অন্যদের হতে। তাও আবার কাল্পনিক। তাদের ধারণা যদি পাল্টে যায়, তাহলে আমাদেরও মান-সম্মানের সৌধ মিসমার হয়ে যাবে। মানুষ যদি আজ

আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, তাহলে আমি সম্মানী ব্যক্তি। আর আগামী কাল যদি জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে জুতার মালা পরিয়ে দেয়, তাহলে আমি অপমানিত হয়ে গেলাম। এ কেমন উদ্দেশ্য হলো? প্রথমে তো হলো ধারণাপ্রসূত। দ্বিতীয় হলো, ধারণা আমার নিজের নয় অন্যদের।

যদি সম্মান আমাদের কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত হতো তাহলে এ কল্পনা ও ধ্যান করে বসে থাকতে পারতাম যে, আমি বড়। সারা জীবন এ ধারণা পোষণ করতে পারতাম। সারা জীবন সম্মানী থেকে যেতাম। কিন্তু সম্মান আমাদের আয়ত্বে নয়, অন্যদের। তাও আবার কাল্পনিক। আবার ঐ কল্পনাও তাদের আয়ত্বে নয়। আজ যদি তাদের ধারণা পাল্টে যায়, তাহলে কালই আমরা অসম্মানী হয়ে যাব। এখন এত দীর্ঘ জীবন ও বড় নেয়ামতের উদ্দেশ্য এমন একটি কাল্পনিক ভিত্তিহীন বস্তু হতে পারে না।

সত্যিকার সম্মান

সত্যিকার সম্মান হচ্ছে আল্লাহর দরবারে মকবুল ও গ্রহণীয় হওয়া। আল্লাহ তায়ালা যদি কোন ব্যক্তিকে মকবুলিয়ত দান করেন তাহলে সেটাই হলো ইজ্জত, সত্যিকার সম্মান। তাঁর মাখলুকের অন্তরে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা ঢেলে দিবেন সেটা হবে ইজ্জত। তা অসার হবে না; বরং সত্যিকার ও বাস্তবিক ইজ্জত হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, ভালবাসেন, তখন জিবরাঈল (আ.)কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত কর। তখন জিবরাঈল (আ.)-এর অন্তরে মহব্বত এসে যায়। জিবরাঈল (আ.) প্রথম আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন– আমরা সবাই অমুককে ভালবাসি ও মহব্বত করি, তোমরাও মহব্বত কর। তারপর দ্বিতীয় আকাশে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়। তারা আবার তৃতীয় আকাশে, এরপর চতুর্থ আকাশে– এভাবে দুনিয়ার নিকটবর্তী প্রথম আকাশে ঐ ব্যক্তির মহব্বত এসে যায়। ফেরেশতা সমাজের মধ্যেও ঐ ব্যক্তি প্রিয় হয়ে যায়। তারপর উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাগণ, নিম্ন জগতের ফেরেশতাগণকে বলে দেন– আমরা অমুককে ভালবাসি, তোমরাও তাকে মহব্বত কর। এভাবে এদেরও মহব্বত এসে যায়। নিম্ন জগতের ফেরেশতাগণ আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তরে মহব্বত ঢেলে দেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর

প্রিয়তম মানব কাফেলা বলে স্বীকৃত, তারা বলেন– আমরা সবাই অমুককে ভালবাসি, আপনারাও তাকে ভালবাসুন। এমনিভাবে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তরে তার ভালোবাসা এসে যায়। তারপর তাঁদের আশপাশের লোকদের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। فيوض له القبول فى الارض তার মকবুলিয়ত সম্পূর্ণ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। তাকে কিছু করার প্রয়োজন হয়নি। তার ভালোবাসা ও সম্মান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসমান জমিনে বিস্তার লাভ করে। এই হলো প্রকৃত ইজ্জত। এখানে নিজেকে সম্মানী বলে মনে করতে হয়নি, মালিশ করতে হয়নি। তোমরা আমাকে সম্মানী ও মহান বলে প্রকাশ করতে থাক। এটা ক্ষণস্থায়ী বিষয়। যখন অন্যদের ধারণা পাল্টে যাবে, ইজ্জতও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যার সম্মান উর্ধ্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে, উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতে যার মান সম্মান হবে। এই মহব্বত ও সম্মান কাল্পনিক হবে না; বরং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা অটল অনঢ় এবং এত মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কখনো নষ্ট ও ধ্বংস হয় না। কেউ নষ্ট করতে পারবে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর মহব্বত ও ভালোবাসা এমনই ছিল আল্লাহ তায়ালার দরবারে। তারা প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। তাদের মাহবুবিয়ত বা প্রেম প্রীতি বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আউলিয়া ও সুফিয়ায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের মহব্বত ও ভালোবাসা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন বা যাবেন। কিন্তু তাঁদের মহব্বত দুনিয়াবাসীর অন্তরে থেকে যাবে। নবী (আ.)-এর মধ্যে আজো যদি কারো নাম উচ্চারিত হয় তাহলে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়; আমরা দরূদ শরীফ পড়তে শুরু করি।

আজ এ সকল মহামানব পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তাদের মহব্বত লোকের অন্তরে বদ্ধমূল রয়েছে এবং তা বংশানুক্রমে চলতে থাকবে। কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের অন্তরে তাদের মহব্বত ঠিকই রয়েছে। যেহেতু তাদের মহব্বত আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছিল যা কখনো ধ্বংস হবার নয়। আজ হযরত খাজা আজমিরী (রহ.) জীবিত নেই। হযরত সাবির কালিরী জীবিত নেই। শায়খ শাহাবুদ্দীন জীবিত নেই। কিন্তু অন্তরে তাদের মহব্বত রয়েছে। তাদের নাম উচ্চারণ করা হলে, আমাদের মুখ দিয়ে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বের হয়। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দেই। ঐসব মনীষী জীবিত নন কিন্তু তাদের ভালোবাসা লোকের অন্তরে বিদ্যমান। কারণ এই ভালোবাসা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছিল এবং বান্দাদের কাছে পৌঁছেছিল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু হয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছেছে।

মান-সম্মান বিষয়ে অমূল্য বিধান

এ মাধ্যমে একটি মৌলনীতি জানা গেল। যে মকবুলিয়ত ও স্বীকৃতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু হয়ে ক্রমে উপরের দিকে যায়, তা ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্মান বিস্তার লাভ করল কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এর কোন অস্তিত্ব থাকল না। এ সম্মান হলো ক্ষণিকের। কিছুদিনের মধ্যে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর যে সম্মান ও স্বীকৃতি বিশেষ মনীষীদের থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে সাধারণে প্রসার লাভ করে, তাই সত্যিকার সম্মান। তা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। আমি আরজ করছিলাম আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.), আউলিয়া, উলামায়ে রব্বানী এবং নেক বান্দাদের মহব্বত। কোন মহৎ কাজ সম্পাদনকারী লোকের মহব্বত আজীবন মানব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকবে। এই হলো সত্যিকার ইজ্জত। এর ভিত কাল্পনিক নয়; বরং অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। মানুষ যদি নিজের মন থেকে এ মহব্বত উপড়েও ফেলতে চায় তাহলে সম্ভব হবে না। তার অন্তর তাকে মন্দ বলবে, দোষারোপ করবে। বলবে, তোমাকে এই মহব্বত রাখতে হবে। কারণ এই মহব্বত দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপতিষ্ঠিত।

সারকথা, সম্মান ও সত্যিকার ইজ্জত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসে; আল্লাহর কাছে মকবুলিয়ত হয়। ঐ সম্মান সত্যিকার সম্মান নয়, যার ভিত্তি মানুষের কল্পনার উপর। কারণ, কল্পনা অহরহ পরিবর্তনশীল। কাজেই ঐ মহব্বত ঐ মান-সম্মান কাল্পনিক হয়ে থাকে। একে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করবো, তা হয় না। এটা হবে জীবনের অবমাননা। জীবন হবে বাস্তব, আর উদ্দেশ্য হবে কাল্পনিক ও বানানো জিনিস, যার কোন ভিত্তি নেই– এ হলো জীবনের অবমাননা। কাজেই এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে না। ধন-দৌলত এবং পদ্ধতিগত মান-সম্মানও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। ভাত-কাপড় বাসস্থানও হতে পারে না। যদি দুনিয়া পর্যন্তই জীবন সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে আমরা এসবকেই উদ্দেশ্য বলে মেনে নিতে পারতাম। তবে মুশকিল হলো এই জীবন দুনিয়ার পরও থাকবে। পার্থিব জীবন প্রকৃত জীবনের কোটি ভাগের এক ভাগও হবে না। স্থায়ী ও অনন্ত জীবন তো পরবর্তীতে রয়েছে। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সে মোতাবেক হওয়া উচিত।

মানুষের ইলম ও জ্ঞান

সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? পরিষ্কার কথা, মানুষ তা স্থির ও পছন্দ করতে পারবে না। মানুষ হলো একটি সীমিত প্রাণী। সে তার অবস্থা গভীরভাবে দেখে, যেহেতু

তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সীমিত। তার মন-মানসিকতায় সীমাবদ্ধ পরিবেশই রয়েছে। সে অনুযায়ীই চিন্তা ভাবনা করবে। আর মানুষের চিন্তা-ভাবনার পরিধিই বা কতটা বিস্তৃত হবে? তার বিবেক-বুদ্ধিই বা কতটুকু- যা দিয়ে তার সীমাহীন জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করবে? সে তো নিজের শক্তি অনুযায়ীই জীবনের জন্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করবে। সে তো নিজের শক্তি অনুযায়ীই চিন্তা-ভাবনা করবে। আর তা হবে সীমিত। তাই মানুষের সীমাহীন জীবনের উদ্দেশ্য ঐ মহান সত্তাই বলতে পারে, যে সত্তা নিজেও অসীম, যার ইলম ও জ্ঞান অনন্ত অসীম। আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সব কিছু তিনি জানেন। তিনি মানুষের স্রষ্টা, মানব জীবনের চড়াই-উতরাই ওঠানামা সব জানে। তিনিই মানুষের ছল-চাতুরি সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কুরআনে বলা হয়েছে–

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যে সৃষ্টি করেছে সে কি তার সৃষ্টিকে জানবে না? সত্যিকার জ্ঞানী ও অবগত তিনিই। [মুলক : ১৪]

আমরা আমাদের সম্পর্কে এতটুকু অবগত নই যতটুকু আমাদের সম্পর্কে আমাদের স্রষ্টা অবগত আছেন। আমরা আজো এ কথা জানি না, আমাদের পেটের ভেতর কিসব কর্মকাণ্ড হচ্ছে। অর্থাৎ পেট আমাদের, প্রাণ আমাদের, কিন্তু আমরা জানি না ভেতরে কি হচ্ছে। অথচ বিরাট মেশিন যা অনবরত চলছে। খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে যাচ্ছে। পাকস্থলী তার কাজ করছে। কলিজা, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক সবই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আপনি যখন এক লোকমা খাবেন তখন তা পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। পাকস্থলী এই খাবার পরিপাক করে। অথচ পরিত্যক্ত বস্তু অন্ত্রনালীর মাধ্যমে বের করে দেয় এবং সারাংশ কলিজায় পৌঁছে যায়। কলিজাকে শরীরের বাবুর্চি বলা হয়। কলিজা ঐ খাদ্যকে পাক করে। যখন পাতিল চুলায় সিদ্ধ হতে থাকে তখন কিছু অংশ ফেনার মতো বের হয়। কিছু অংশ গাছের মতো জমে যায়। আর একটা অংশ মূল পদার্থে পরিণত হয়ে শরীরকে রক্ষা করে। ফেনার মতো যা উঠে তা কফ হয়ে বের হয়। কফ নিচের তেল ছাটের অংশ এর ছাওদা। যা মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে তা পিত্তরস হয় এবং এ তিনটি দ্বারা যা তৈরি হয় তাকে রক্ত বলা হয়। এই চারটি মিশ্র বস্তু তৈরি হলো। কলিজা শিরার সাহায্যে রক্তকে হৃদপিণ্ডের ভেতরে পাঠায়। হৃদযন্ত্র সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ লিখেছেন– এটি এমন একটি চুগারর মতো বস্তু যার ভেতরটা দাবানো, উভয় পাশ বিস্তৃত উগালদানের মতো। ভেতরটা পাতলা ও উভয় পাশ বিস্তৃত। এই হলো হৃদযন্ত্রের আকার। এর এক অংশকে উর্ধ্ব

উদর এবং অন্য অংশকে নিম্ন উদর বলা হয়। এই রক্ত নিম্ন উদরে পৌঁছে। হৃদযন্ত্র নিজের তাপ দ্বারা একে পুনর্বার পাকিয়ে নেয়। এ পাকানোর দ্বারা একটি মৃদু সূক্ষ্ম উত্তাপ সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় রূহে হায়ওয়ানী বা জীবপ্রাণ। এর উপরের অংশে আসমানী রূহ, যাকে রূহে রব্বানী বলা হয়। এরই সঙ্গে মানুষের ইলম ও অনুভূতির সম্পর্ক। মানুষের শরীরের নিম্নাংশ একটি বাহন। এর উপর রূহে হায়ওয়ানী আরোহণ করে আছে। তারপর রূহে হায়ওয়ানী একটি বাহন। এ তিনটি জিনিস একত্রিত হয়ে ভ্রমণ করছে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, কিভাবে খাবার পৌঁছে পরিপাক হচ্ছে এবং এ থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হচ্ছে। তবে ঐ ব্যক্তি তা জানে না। পাকস্থলী কি কাজকর্ম করছে, কলিজা কি করছে, হৃদপিণ্ড কি করছে– আমাদের ভেতর সব কিছু হচ্ছে কিন্তু আমাদের খবর নেই। আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই সীমাহীন জীবনের উদ্দেশ্য আমরা স্থির করব কেমন করে? যদি কোন উদ্দেশ্য নির্ধারণও করি তাহলে তা হবে কয়েকদিনের জন্য। যেমন- মানুষের ইলম ও জ্ঞান কয়েক দিনের। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণকারী ঐ সত্তা হতে পারে, যিনি জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মানুষের শুরু ও শেষ সম্পর্কে সচেতন। আর কেবল তিনিই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারেন।

মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্রষ্টা একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। আর নিজের আদেশের মাধ্যমে তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। যাকে বলা হয় পবিত্র কুরআন। বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ.

> আমি মানব ও দানবকে জিন ও ইনসানকে এজন্য সৃষ্টি করেছি, তারা আমার ইবাদত ও অনুগত্য করবে। [যারিয়াত- ৫৬]

জীবনের উদ্দেশ্য নিজ খালেক ও মালিকের ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য সাব্যস্ত হল। ইবাদতের শব্দ শুনে হয়ত আপনাদের মনে হবে– এখন বলা হবে মসজিদে গিয়ে বসে থাক, দালান কোটা ত্যাগ কর, মসজিদের রাস্তা ধর, ইবাদত সেখানেই হবে। আর এ কথাও বলা হতে পারে, ধন-দৌলত ত্যাগ কর, সব কিছু সদকা করে দাও এবং আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়। নিজের (খবর) ঘরবাড়ি সবকিছু বর্জন কর।

ধন-সম্পদ দিয়েও আল্লাহ্ মিলে

আমি আরজ করছি, এমন ধারণা ভুল। ইসলামের বিশেষত্ব হলো– মানুষ যে অবস্থা ও পরিবেশে থাকে তা থেকে তাকে নিরাশ করা হয় না। বরং আল্লাহ্ তায়ালা পর্যন্ত পৌছে দেয়ার রাস্তা বলে দেয়া হয়। একথা বলা হয়নি যে, মানুষ যে পরিবেশে ও চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে তা ত্যাগ করে অন্য পরিবেশে যে পর্যন্ত না যাবে, সে পর্যন্ত আমার কাছে পৌছতে পারবে না। যদি ঐ পরিবেশ ত্যাগ করে কেবল তখনই আমার কাছে পৌছতে পারবে– এমন কথা বলাও হয়নি। কোন লোক সম্পদশালী। ইসলাম তাকে একথা বলবে না যে, তোমার সম্পদ নিঃশেষ করে দাও; বরং এ সম্পদকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম বানিয়ে দিবে এবং সম্পদের আয়-ব্যয়ের পথ নির্দেশ করবে মাত্র। এর বিধি-বিধান বলে দিবে। আমার বিধি অনুসারে ব্যয় কর। তা হলে এসব তোমার জন্য ইবাদত বলে গণ্য হবে। এ আমলের মাধ্যমে তুমি আমার কাছে পৌছে যাবে। ইসলাম সম্পদশালীকে বলবে, দৌলত ও সম্পদের মাধ্যমে আমার কাছে পৌছে যাও।

এ কারণে যে, এমন হাজারো ইবাদত রয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক মাল ও সম্পদের সঙ্গে। যদি সম্পদ না থাকে তাহলে মানুষ যাকাত প্রদান করবে কেমন করে? সারকথা, সদকা খয়রাত চাঁদা প্রদান ইত্যাদি আমল করতে পারবে না যদি মাল-সম্পদ না থাকে। এসবই দীন ও ইসলামের কাজ। সুতরাং ইসলাম কীভাবে বলবে মাল-সম্পদ ধ্বংস করে দাও। অথবা ধন-সম্পদ উপার্জন করো না, যদি এসে যায় তাহলে নষ্ট করে দাও। বরং সম্পদকে সংরক্ষণ কর, আর এর মাধ্যমে পথ বের করে নাও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাবার।

গরীবানাতেও আল্লাহ্ মিলে

ইসলাম যেমন ধনীদের জন্য রাস্তা বলে দিয়েছে যে, তোমরা নিজেদের মাল-সম্পদকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম বানিয়ে নাও। এ কথা শোনে হয়তো নিঃস্ব দরিদ্ররা নিরাশ হতে পারেন। ধনীরাই কেবল দুনিয়া ও আখেরাত সব নিয়ে গেলেন। আমি ইহকালেও বঞ্চিত; কারণ আমি সদকা প্রদান করতে পারব না, খয়রাত করতে সক্ষম হবো না। আত্মীয়দের সহায়তা করতে পারবো না। আমি এ জগতেও অসহায়, পরকালে গিয়েও অসহায় থাকব। যেহেতু ইবাদত খুবই কম, তাই তার অন্তরে দুঃখ হবে। কিন্তু ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে, সাহস প্রদান করে বলে– তুমি নিরাশ হয়ো না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হে অসহায় দরিদ্র! তুমি তোমার দারিদ্রতার উপর দুঃখ করো না। ঐ সময়কে স্মরণ

করে, কেয়ামতের দিন ধনীরা তার ধন-সম্পদের হিসাব প্রদানে ব্যস্ত থাকবে এবং দরিদ্ররা পাঁচশত বছর আড়ে জান্নাতে চলে যাবেন।

তখন গরীবরা বলবেন, আমাদের গরিবী মোবারক হোক। ধন-দৌলতের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এ পাঁচশ' বছর সময় আল্লাহই জানেন, কিভাবে অতিবাহিত হবে? হিসাব দিতে পারব কি পারব না। কোন বিপদাপদ না হোক; সাজা শাস্তি ভোগ করতে না হোক। দুনিয়ার ষাট সত্তর বছরের জীবনকাল যে কোনভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে। আমি আন্তরিকভাবে আমার দরিদ্রতার উপর সন্তুষ্ট, আনন্দিত। একজনকে সম্পদের নেয়ামত অন্যজনকে পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার নেয়ামত দান করেছেন। ধন-সম্পদ নেই কিন্তু তার আত্মা পরিতৃপ্ত, তুষ্ট। আমাদের হযরত মাওলানা থানভী (রহ.) কোন কোন সময় একটি পংক্তি আবৃত্তি করতেন–

لنگے زیر ولنگے بالا ☆ نے غم دزدے نے غم کالا

একটা লুঙ্গি পরে নিল, আর একটা জড়িয়ে নিল। চুরিরও ভয় নেই, অপরিষ্কার হওয়ারও ভয় নেই। ব্যাস, সে বিত্তবান বনে গেল।

ধনীকে ধনের কারণে হাজারও পেরেশানিতে থাকতে হয়। সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হয়। চোর ডাকাতে যেন নিয়ে না যায়। প্রশাসনের কুদৃষ্টি হতে কিভাবে রক্ষা পাব। ধন-সম্পদকে রক্ষাকরণে ট্যাক্স বা তাগাদা দেয়া। এটা এক মসিবত ও পেরেশানী। কিন্তু গরীব ব্যক্তি বলে, আমি বিপদগ্রস্ত নই। হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

ہائچ نداریم غم ہیچ نداریم ☆ دستار نداریم و غم پیچ نداریم

আমাদের কিছুই নেই, এজন্য কোন চিন্তাও নেই। আমাদের পাগড়িও নেই, পাগড়ির চিন্তাও নেই। যার পাগড়ি রয়েছে সেই পাগড়ির চিন্তা করবে।

সারকথা, একজন ধনবানকে যেমন প্রচুর সম্পদ দান করা হয়েছে, তেমনি গরীবকে ধৈর্যশীল করে সওয়াবের প্রত্যাশী করা হয়েছে। তাকে ইস্তেগনার দৌলত দান করা হয়েছে। এসব লোক তাদের ইস্তেগনা ও অল্পে তুষ্টির কারণে রাজা বাদশাহদের চেয়েও শান্তিতে জীবন যাপন করছে। তাদের বলা হলো, তোমাদেরকে এ নেয়ামত (উষ্ট্রি) দান করে অনেক বিপদাপদ হতে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। আর পরকালের নেয়ামত হলো– পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। ধনীরা তখনও হিসাব কিতাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং ধনীরা এভাবে আনন্দিত যে, আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা জান্নাত অর্জন করছি। দরিদ্ররা এভাবে আনন্দিত যে, আমরা আমাদের অল্পেতুষ্টি দ্বারা জান্নাত হাসিল করেছি। ইসলাম কোন অবস্থায় মানুষকে নিরাশ করেনি। ধনীকেও না গরীবকেও না। বিত্তবানকে বলেনি বিত্তহীন হয়ে যাও। বিত্তহীনকেও বলেনি বিত্তবান হয়ে যাও। সর্বাবস্থায় তাদেরকে সান্ত্বনা দান করেছে, পথ প্রদর্শন করেছে। এ হলো ইসলামের বিশেষত্ব। অবস্থার পরিবর্তন না করেও সঠিক পথ নির্দেশ করে, নিরাশ হতে দেয়া হয় না।

সুস্থ-অসুস্থ উভয় অবস্থায় আল্লাহ মিলে

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– সবচে' বড় নেয়ামত যার প্রতি ঈর্ষা করা যায় তা হলো সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য যদি না থাকে তাহলে ইবাদত করবে কেমন করে? হজে যাবে কিভাবে? নামায কিভাবে পড়বে? রোযা কিভাবে করবে? সকল ইবাদত-বন্দেগি স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। তাই স্বাস্থ্যের অনেক ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকে। যেহেতু আল্লাহ আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আল্লাহর শুকুর, আমি শারীরিক ইবাদত করছি। কায়িক পরিশ্রম করতে পারছি। হজে যেতেও সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মন ছোট। মনে করে হায়! আমি কিছুই করতে পারলাম না। না পারি মসজিদে যেতে, না পারি হজ সম্পাদন করতে, আর না পারি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে। কোনো কাজই আমি করতে পারছি না। হায়! আমি চির বঞ্চিত। ইসলাম তাকেও সান্ত্বনা দান করেছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন কোনো কোনো বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন– হে বান্দা! আমি অসুস্থ ছিলাম ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি কেন? আমার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে আসনি কেন? বান্দা বলবে– হে আল্লাহ! আপনি মহান প্রভু। রোগ ব্যাধির সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? রোগ ব্যাধি ত্রুটি ও দোষের বস্তু। আর আপনি সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র!

আল্লাহ তায়ালা বলবেন– আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল। তুমি যদি তাকে দেখার জন্য, তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য যেতে, তাহলে তার বিছানার কাছে আমাকেও পেয়ে যেতে। এতে রোগীর সাহস বেড়ে যেত। আমার এ পজিশন, এ মর্যাদা, রোগাক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়ে গেল। কোন সুস্থ ব্যক্তির বিছানার কাছে আল্লাহ তায়ালা থাকেন না। থাকেন

রোগীর বিছানার সঙ্গে। অর্থাৎ রোগাক্রান্তের সঙ্গে আমার বিশেষ দয়া এবং তাজাল্লী বিদ্যমান থাকে। কোন সুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি। আমি সুস্থ ছিলাম, তুমি আমার নিকট কেন আসনি? বরং তিনি বলেছেন– 'তুমি যদি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে আসতে তাহলে আমাকে সেখানে পেয়ে যেতে।' রোগী সম্পর্কে বলেছেন। আমি অসুস্থ হয়েছিলাম। তুমি আমার খোঁজ খবর নিতে আসনি। রোগীর কাছে রোগ কত প্রিয় যে, তিনি তার রোগকে নিজের রোগ বলে বর্ণনা করবেন।

এ কথা দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তির সাহস সৃষ্টি হয়। ঐ অসুস্থতার প্রতি সালাম, যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। আমার কাছে রোগই প্রিয় ও বরকতময়। আমি এ রোগকে ত্যাগ করতে চাই না। এ রোগ আল্লাহর পানে ধ্যানের মাধ্যম হয়েছে। আর দরজা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধৈর্যের ফল

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁর দেহে একটি ফোঁড়াজনিত ক্ষত ছিল। এতে তিনি বত্রিশ বছর যন্ত্রণা দুর্ভোগ সহ্য করেছিলেন। ফোঁড়াটি তার শরীরের এক পাশে ছিল। চিৎ অবস্থায় শুয়ে থাকতেন, পাশ ফিরানো সম্ভব ছিল না। বত্রিশ বছর চিৎ হয়ে শুয়ে কাটিয়েছেন। ঐ অবস্থায়ই খানাপিনা, ইবাদত-বন্দেগি এবং মলমূত্র ত্যাগ করতেন। অনুমান করুন, বত্রিশটি বছর একজন মানুষ এমন অবস্থায় পড়ে থাকলে তার কি কষ্ট হয়! কত মারাত্মক রোগ ছিল।

এ ছিল রোগের অবস্থা। কিন্তু তাঁর চেহারা প্রফুল্ল ও আনন্দিত দেখাচ্ছিল। এমন প্রফুল্লভাব যে, কোনো স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরও তা ছিল না। তাঁকে দেখে মানুষ বিস্মিত হত। রোগ এত মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে, তিনি পাশ পরিবর্তন করতে পারতেন না। আর চেহারা এত প্রফুল্ল, আনন্দিত ছিল যা স্বাস্থ্যবানদের ভাগ্যেও জুটেনি। মানুষ তাঁর কাছে আরজ করল– 'হযরত! এ কি কথা, রোগ এত মারাত্মক! এত দীর্ঘ আর আপনার চেহারা এত প্রফুল্ল ও আনন্দিত যা সুস্থদের ভাগ্যেও জোটে না! উত্তরে তিনি বললেন–

যখন আমার উপর রোগ আসল আমি ধৈর্যধারণ করলাম। আমি বললাম– আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এটা উপহার। আল্লাহ আমার জন্য এ অবস্থাই পছন্দ করেছেন। আমিও এতে সন্তুষ্ট; এ ধৈর্যের ফল আল্লাহ আমাকে দান করলেন। আমি আমার শয্যা থেকে প্রতিদিন ফেরেশতাদের সঙ্গে মুসাফাহা

করি। অদৃশ্য জগৎ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অদৃশ্য জগৎ আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

যে রোগীর জন্য অদৃশ্য জগতের দ্বার খুলে দেয়া হয়, ফেরেশতাদের গমনাগমন অনুভূত হয়। তার জন্য রোগব্যাধি কোনো মসিবতই না যে, এজন্য সে রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষা করবে। তার জন্য রোগব্যাধি বড় নেয়ামতস্বরূপ। সারকথা, ইসলামের বিশেষত্ব এই যে, স্বাস্থ্যবানকেও সান্ত্বনা দিয়েছে, আবার ব্যাধি তোমার জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম, যদি তুমি সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করতে পার। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ অবস্থার প্রতি ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট যদি থাকতে পার তাহলে তোমার জন্য অনেক দরজাত ও মর্যাদা রয়েছে।

তাছাড়া একথা বলা হয়নি, তুমি চিকিৎসা গ্রহণ করবে না। চিকিৎসা নাও। ঔষধ ব্যবহার কর, কিন্তু ফল যাই হোক তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ এবং আল্লাহর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করো না। চিকিৎসা করানো তোমার কাজ, ঔষধের দ্বারা সুস্থ করে দেয়া তোমার কাজ নয় যে, ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্য ঠিক হতেই হবে। এ কাজ আল্লাহ তায়ালার। তুমি তোমার কাজ করো, আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করো না। আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাক। যা হচ্ছে আমার জন্য কল্যাণকরই হচ্ছে, এমন মনে কর। যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ঐ রোগব্যাধি দরজা ও সম্মান বৃদ্ধি ও নৈতিক উন্নতির কারণ হবে। এর দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হবে। স্বাস্থ্যবান আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হবে। স্বাস্থ্যবানরা আধ্যাত্মিকতার এমন স্তরে পৌঁছাতে পারে না, যেখানে পীড়িত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি পৌঁছাতে পারে। তখন পীড়িত ব্যক্তি এমন বলবে– 'আমার জন্য আমার পীড়া মোবারক। আমার প্রয়োজন নেই সুস্বাস্থ্যের। পীড়িত অবস্থায় আমি যেসব মর্যাদা লাভ করেছি, সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে লাভ হত না, হওয়া সম্ভব না।'

ইসলাম স্বাস্থ্যবানকে তার সুস্থ অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়েছে। তুমি স্বাস্থ্যকে আমার কাছে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়ে নাও। পীড়িতকে পীড়িতাবস্থায় সান্ত্বনা দিয়েছে। তুমি রোগব্যাধিকে আমার কাছে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়ে নাও। তুমি পীড়িত হওয়ার কারণে বঞ্চিত থাকবে না। এ ধারণা করো না যে, যা পাওয়ার স্বাস্থ্যবানরাই পেয়েছেন। আমার জন্য কিছুই নেই। তোমার রোগব্যাধির মধ্যে তোমার জন্য সব কিছু রয়েছে।

সারকথা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সান্ত্বনা দান করা কেবল ইসলামেরই কাজ।

জীবন-মরণেও আল্লাহ্ পাওয়া যায়

জীবন একটি বড় নেয়ামত। জীবন যদি না থাকে তাহলে মানুষ ইবাদত-বন্দেগি করবে কি করে? উন্নতির সোপানগুলো আয়ত্ত করবে কেমন করে? সকল কাজই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন মৃত্যু আসে তখন মৃত্যু বরণকারীর মন ভেঙ্গে যায়– অন্যরা সব কিছু উপার্জন করেছে। আর আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য আর কিছুই থাকছে না। তৎক্ষণাৎ ইসলাম তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনালো, ধৈর্য হারিয়ো না। পেরেশান হয়ো না। الموت تحفة المؤمن মৃত্যু মুমিনের জন্য সবচে' বড় উপহার যা তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। বলা হয়–

إِنَّ الْمَوْتَ جَسْرٌ يُوْ صِلُ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ.

মৃত্যু একটি সেতু, যে সেতু পার হয়ে মানুষ তার সত্যিকার প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়। যদি মৃত্যু না আসে তাহলে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের কোন পথ নেই। এ জীবনের ইতি হয়ে পরজীবন যদি না আসে তাহলে আল্লাহর জামাল অবলোকন করার কোন পথ থাকবে না। এ বাণী দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপনীত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া হলো, আমি খুব উঁচু মর্যাদা লাভের জন্য গমন করছি। কাজেই এ জীবনের প্রয়োজন আমার নেই; বরং এ জাতীয় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পয়দা হয়ে যায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اللهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلى مَنْ يَعْلَمُ اَنِّي رَسُوْلُكَ

হে আল্লাহ! প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে মরণকে প্রিয় করে দাও,
যে আমাকে তোমার রাসূল বলে স্বীকার করে।

এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসা থাকবে। আর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে কেবল মৃত্যুই। সুতরাং মৃত্যু তার প্রিয় হবে। কারণ, গন্তব্যস্থল যদি প্রিয় হয় তাহলে রাস্তাও প্রিয় হবে।

এভাবে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে– ইয়াহুদীগণ দাবী করলো, আমরাই আল্লাহর প্রিয়জন। তখন সঙ্গে সঙ্গে কুরআন পাক দাবী উথাপন করল–

قُلْ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوْٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ.

হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! যদি তোমাদের এ দাবী সত্য হয়ে থাকে যে, তোমারই কেবল আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন, তাহলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে তা দেখাও, প্রমাণ কর। [জুমআ : ৬]

আল্লাহর ওলী ও প্রিয়জন ঐ ব্যক্তি হয়, যার অন্তরে জীবন থেকে মৃত্যুর প্রতি বেশি ভালবাসা থাকে। তাদের মুখে সব সময় এ পংক্তিটি উচ্চারিত হতে থাকে–

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم ☆ تادر میکدہ شاداں وغزل خواں بروم

ঐ মোবারক দিন কোন দিন হবে, যেদিন নশ্বর বসতি ত্যাগ করে আমার ঐ কাঙ্ক্ষিত অবিনশ্বর স্থানে পৌঁছে যাব। আনন্দে নেচে নেচে গান গাইতে থাকব। ঐ দিন কখন আসবে, যখন এ দুর্গন্ধময় জগৎ ত্যাগ করে চলে যাব।

ইবনুল কারিব (রহ.)-এর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হলো তখন তাঁর জীবনী রচয়িতা লিখেছেন যে, আট জান্নাত তাঁর সামনে মেলে ধরা হল। তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, চোখ বন্ধ করে নিলেন, আর এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন–

اِنْ كَانَ مَنْزِلَتِیْ فِی الْحِبِّ عِنْدَكُمْ

مَا قَدْ رَأَیْتُ فَقَدْ ضَیَّعْتُ اَیَامِیْ

আমার জীবনের চেষ্টা ও সাধনার ফল যদি এই আটটি হয় যা আমাকে আপনি দেখালেন, তাহলে আফসোস! আমার জীবন ধ্বংস হয়েছে, বৃথা হয়েছে। আমি কিছুই পেলাম না।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– আট জান্নাতকে সারিয়ে নেয়া হলো এবং আল্লাহ তায়ালার তাজ্জালী হতে লাগল। তখন তাঁর রূহ আনন্দে নেচে উঠলো।

মরণোন্মুখ ব্যক্তি যখন দেখবে আল্লাহর তাজ্জালী তাকে অভ্যর্থনা করছে, তখন তার জন্য এ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে কেন?

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যখন মুমিনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন মালাকুল মওতের সহকর্মী ও সাহায্যকারী দু'ধরনের হয়। একদল যারা ডান দিকে রয়েছেন। তারা সংখ্যায় কোটি কোটি। আরেক দল যারা বাম দিকে রয়েছেন। ডান দিকে অবস্থানকারীরা মুমিনদের রূহ কবজ করে নিয়ে যান এবং বাম দিকে অবস্থানকারীরা কাফেরদের রূহ কবজ করেন। ডান দিকের ফেরেশতাগণ উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। সূর্যের ন্যায় তাদের চেহারা উজ্জ্বল।

বাম দিকের ফেরেশতাগণ কালো চেহারার; তাদের চেহারা খুবই ভয়ানক ও আতংক সৃষ্টিকারী।

মুমিনের যখন মরণের সময় আসে, তখন অনেক দূরে কিছু তারকা ও জ্যোতি দেখতে পায়। সে বিস্মিত হয়ে পড়ে। এসব কিসের জ্যোতি? এ কেমন চন্দ্র সূর্য?

এ সময় এদিক থেকে গাফলত এবং ঐদিক থেকে তাওয়াজ্জুহের সময় হয়। তখনও মৃত্যু যাতনা শুরু হয়নি। তখনও উদাসীনতা রয়েছে। মৃত্যু যাতনা যখন শুরু হবে তখনও শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকবে। তখন দুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং পরকালের জীবন প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তখন দেখতে পাবে, লাখ লাখ চন্দ্র সূর্য ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন সে বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকবে এ কি? এ কেমন জগৎ?

ফেরেশতাগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন এজন্য যে, তার অন্তরে তাদের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যাক। যদি হঠাৎ এসে পড়েন তাহলে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে যাবে। এ কি হচ্ছে? তাই ধীরে ধীরে তার অন্তরে স্থান করে অগ্রসর হতে থাকেন। সে সহ্য করে নিক। বুঝে নিক ব্যাপারটি কি? তারপর সে এদেরকে অপরিচিত মনে করবে না। আসার সঙ্গে সঙ্গে রূহ কবজ করেন না। বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– 'তারা এ ব্যক্তিকে পরকালের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন এবং দুনিয়া সম্পর্কে তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করেন।

اُخْرُجِىْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِىْ الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُخْرُجِىْ اِلٰى رُوْحٍ وَ رَيْحَانٍ وَ رَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانْ.

হে পবিত্র আত্মা! তুমি তোমার দেহকে নেক আমল দ্বারা পবিত্র করেছিলে। আত্মাকেও যিকির দ্বারা নেক করেছিলে অথবা নেক কথাবার্তা দ্বারা পবিত্র করেছিলে। হে পবিত্র আত্মা! পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়ে আস! কোথায় যাবে?

اُخْرُجِىْ اِلٰى رُوْحٍ وَ رَيْحَانٍ

যাবে সদা বসন্তের দিকে নেয়ামতরাজির দিকে। চল এবং প্রভুর দর্শনে চল, যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টন নন; বরং অত্যন্ত মেহেবান দয়ালু ও রহীম রয়েছেন এবং তোমার অপেক্ষা করছেন। এ হলো উৎসাহ প্রদান। আত্মা সন্তুষ্টচিত্তে বেরিয়ে যায় এবং তার সন্তুষ্টির পর রূহ কবজ করা শুরু করেন।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর রূহ কবজ করার জন্য ফেরেশতা যখন আসেন, তখন তারা যথারীতি অনুমতি প্রার্থনা করেন। যখন অনুমতি দেয়া হয় তখন রূহ কবজ করা আরম্ভ করেন। মুমিনদের কাছে অনুমতি চাওয়া হয় না, তবে উৎসাহ প্রদান করা হয়। যেন সে মওতের উপর রাজী হয়ে যায়। তখন রূহ কবজ করা আরম্ভ করেন। এভাবে উৎসাহিত করেন– এই অপবিত্র জগতকে বর্জন কর এবং ঐ পবিত্র জগতের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়। এখানে নফসের রাজত্ব ছিল, ঐদিকে মহান প্রভুর সান্নিধ্য– যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। সর্বদা তোমার প্রতি মেহেরবান থাকেন, রূহ ও রায়হান এবং নেয়ামতরাজির দিকে চল।

সবাই জানেন, মৃত্যুকে মানুষ স্বভাবত অপছন্দ করে। যতই নেয়ামত হোক, মানুষ কিন্তু মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। উৎসাহ প্রদানের পরও সে রাজি হয় না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– তখন তাকে জান্নাতের উপঢৌকন দেখান হয়। ফলমূল, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখান হয়। এসব দেখে রূহ উড়তে আরম্ভ করে দেয়। তার বের হয়ে যাওয়াকে এভাবে উপমা দেয়া হয়েছে– যেমন মশকে পানি ভরে উল্টিয়ে দেয়া হয়, তার মুখ খুলে নিম্ন মুখ করে দেয়া হয়। তাহলে সব পানি গড় গড় করে বের হয়ে যাবে এবং বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে আগ্রহের সঙ্গে রূহ উড়ে যাবে। ফেরেশতাগণ আসেন, উৎসাহ প্রদান করেন। মানুষের সন্তুষ্টি লাভ করেন। যখন সে রাজি হয়ে যায়, তখন তার রূহ কবজ করেন। এ হলো ফেরেশতাদের দয়া, তাদের মেহেরবানী। মালাকুত মওত আলাপও করেন।

মৃত্যু-যাতনা আরম্ভ করা মালাকুল মওতের সহযোগীদের কাজ। যাতনার পর রূহকে কবজ করা এবং তা কব্জায় আনা মালাকুল মওতের কাজ। প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করেন সহযোগীরা, আর শেষকর্ম সম্পাদিত হয় স্বয়ং মালাকুল মওতের হাতে। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল এই, জীবন যেমন নেয়ামত, মৃত্যুও তেমনি নেয়ামত। ইসলাম যেমন জীবনে প্রশংসা করেছে উৎসাহ প্রদান করেছে এবং বলেছে, তোমরা দোয়া করতে থাক। আমাদের জীবনকে নেক আমলের সঙ্গে দীর্ঘায়িত করুন। মরণোন্মুখ ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়ে। এই আমার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে। তাকে ঐ অবস্থায়ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। তোমার মৃত্যু তোমর জন্য উপঢৌকন এবং পরম সুখ শান্তির পয়গাম। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পয়গাম। তখন সে তার মৃত্যুতে রাজি আর ঐ ব্যক্তিও যার জীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। উভয়ের মধ্যে কেউ নিরাশ নয়। ইসলাম সবাইকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কোন অবস্থায় তার অনুসারীদেরকে নিরাশ করেনি। হাজারো বিপদাপদ এসে যাক। ইসলাম কিন্তু নিরাশ হতে দেয় না। হাজারো নেয়ামত

আসুক, পথ প্রদর্শন করে যাবে। বিপদাপদ সম্পর্ক বলা হয়েছে–

لَا تَايْئَسُوْا مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

যতই বিপদ আসুক! কখনো নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া মুমিনের কাজ নয়। তা হলো কাফেরদের কাজ। [ইউসুফ : ৮৭]

বিপদের সময় ইসলাম সান্ত্বনা দান করে। বিপদে ঘাবড়ে যেয়ো না, বিপদদানকারীর প্রতি দৃষ্টি রাখো। আর নেয়ামতে মানুষ সন্তুষ্ট থাক, নেয়ামত পেয়েছ। বিপদ এসে গেলে ধৈর্যশীল ব্যক্তি ঐ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট। আমিও নেয়ামত লাভ করেছি। আমার আখলাক আমার নৈতিকতা উন্নত হয়েছে। পার্থিব নেয়ামতের দ্বারা এ উন্নতি লাভ হত না। এ বিপদ আমার নৈতিকতাকে উন্নত করেছে। সারকথা, কোন কথা এমন নেই যেখানে মানুষকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।

এসব আমি এ উপলক্ষে আরজ করছিলাম, আমি যখন ইবাদতের কথা বলছিলাম তখন হয়তো কারো অন্তরে এ ধারণা জন্মে থাকতে পারে, এখন বলা হবে– ঘরবাড়ি ত্যাগ করো এবং মসজিদে গিয়ে আস্তানা করো। তা বলা হচ্ছে না। বরং এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে আল্লাহকে পাওয়া না যায়। আপনি রাজপ্রসাদে অবস্থান করেও আল্লাহকে স্মরণ করতে পারেন। আপনার নিয়ত শুদ্ধ সঠিক থাকতে হবে। আপনার উদ্দেশ্য সঠিক হতে হবে। ধন-দৌলত উপার্জন কর, বৈধ পন্থায় ব্যয় কর। বৈধ পন্থায় উপার্জন করাও ইবাদত, ব্যয় করাও ইবাদত। উভয় কাজের উপর সঠিক নিয়তে এভাবে সওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন নামায আদায়ে পাওয়া যায়। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দরিদ্র নিঃস্ব হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতিগতভাবে ধন-সম্পদ মন্দ নয়

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধনীও ছিলেন, গরীবও ছিলেন। লাখপতি ছিলেন, কোটিপতি ছিলেন। হযরত আবু যর (রা.)-এর মতও ছিলেন, যার মাযহাব ছিল– যদি এক বেলার আহার থাকে তাহলে অন্য বেলার জন্য সঞ্চয় করে রাখা জায়েয নয়। যেখানে আবু যর গিফারীর মত সাহাবী ছিলেন, সেখানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর

মত সাহাবীও ছিলেন, যিনি কোটিপতি ব্যবসায়ী ছিলেন।

তাঁর ব্যবসায় বরকত হওয়ার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন। তাঁর ব্যবসা সিরিয়া মিশর এবং রোমসহ বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত ছিল। যখন মুনাফার মাল সম্পদ আসত, তখন এমন ছিল না যে, দশ পাঁচ ব্যক্তি তা বহন করে আনতেন; বরং তা বহন করতে উটের বহর প্রয়োজন হত। তিনি বলতেন– ঘরের মধ্যে ঢেলে রাখ। এত বেশি মাল হত যে, খাদ্য সামগ্রীর মতো তা স্তূপ হয়ে যেত। এ ছিল তাঁর সম্পদের অবস্থা।

অথচ তাঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল? এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। মেহমানদারীর অবস্থা ছিল এমন যে, প্রতি বেলা তিন চারশ' মেহমান দস্তরখানায় উপস্থিত থাকতেন। যখন খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হত এবং সাজান হত দস্ত রখানা এবং আহার গ্রহণের জন্য সবাই বসে পড়তেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ কাঁদতে শুরু করতেন। অনিচ্ছায় তাঁর অন্তর কেঁদে উঠত। তিনি বলতেন– হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানায় কখনো একজনের আহারে দু'জন জমায়েত হয়নি। আর আমার দস্ত রখানায় এত নেয়ামত যে তা বুঝি পৃথিবীতেই দিয়ে শেষ করে দেয়া হচ্ছে।

এ কথা বলে কেঁদে কেঁদে পাগলপারা হয়ে যেতেন। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলতেন। খাবার গ্রহণ না করেই সকলে উঠে পড়তেন। আর দস্ত রখানা তুলে নেয়া হত।

সারা রাত মেহেমানদের জন্য খাদ্য সামগ্রী তৈরী ও ঠিক করা হত। অতঃপর আবদুর রহমান কাঁদতে শুরু করতেন এবং বলতেন– হে আল্লাহ! প্রাথমিক যুগের মুহাজিরগণ এত দরিদ্র অসহায়ত্বের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন যে, উপবাসের পর উপবাস করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা (রা.) এত নিঃস্ব অবস্থায় শহীদ হন যে, পূর্ণাঙ্গ কাফনও তাঁর জুটেনি। যদি মাথা ঢেকে দেয়া হতো তাহলে পা বেরিয়ে পড়ত, আর পা আবৃত করলে মাথা উদোম হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত পায়ের উপর ইজখির নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। যেখানে হযরত হামজা (রা.)-এর এই অবস্থা ছিল সেখানে আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফের ঘর স্বর্ণ মুদ্রায় ভর্তি। তাহলে কি আমার জান্নাতের নেয়ামত ইহজগতে নিঃশেষ করে দেয়া হচ্ছে?

এই বলে বলে কাঁদতেন। উপস্থিত সবাই কাঁদতে কাঁদতে আহার গ্রহণ না করেই দস্তরখানা থেকে উঠে যেতেন। এভাবে তিন তিন বেলা অভুক্ত হয়ে থাকতেন। ধন-সম্পদের অবস্থা ছিল এই। আর অন্তরের অবস্থা ছিল এমন। কথা হচ্ছে

ইসলাম ধন-সম্পদের বিরোধী নয়। ধন-সম্পদকে মন্দ বলে না। কিন্তু ধন-সম্পদের মাধ্যমে যদি অন্তর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ অন্তরকে ইসলাম মন্দ বলে। ধন-সম্পদ এজন্য নয় যে অন্তরকে নষ্ট করবে। বরং অন্তর ঠিক রেখে ধন-সম্পদ মানুষের জন্য মন্দ জিনিস নয়। মানুষ নিজে মন্দ কিন্তু ধন-সম্পদ মন্দ নয়। মানুষ যদি ভাল হয় তাহলে তার ধন-সম্পদও ভাল হয়ে যাবে। দ্রব্য সামগ্রীর সত্তাগত ভাল মন্দ কিছুই নেই। দ্রব্যের মালিককে দেখো ভাল না মন্দ। সে যদি ভাল হয় তাহলে তার সম্পদও ভাল, সে যদি মন্দ হয় তাহলে তার সব সম্পদ মন্দ। মানুষ অযথা সম্পদকে মন্দ বলে। সম্পদের কি দোষ?

ধন-সম্পদের উদাহরণ

মাওলানা রূমী (রহ.) অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন– ধন-সম্পদের উদাহরণ হচ্ছে সাগরের মতো। আর মানুষের অন্তর হল নৌকার মতো। পানি যদি নৌকার বাইরে থাকে তাহলে মনযিল অতিক্রম করবে। আর যদি নৌকার ভেতর ঢুকে পড়ে তাহলে নৌকা ও নৌকার মাঝি উভয়ই তলিয়ে যাবে, ধ্বংস হবে। বলেন– 'দৌলত হলো সাগরের মতো, আর আমাদের অন্তর নৌকার ন্যায়। ধন-দৌলত যদি অন্তরের বাইরে থাকে তাহলে সাগর পার হয়ে পরকাল রূপ সাগরের তীরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি অন্তরের ভেতর প্রবেশ করে, তাহলে তার অন্তর ডুবে যাবে। সারকথা, ইসলাম ধন-সম্পদকে মন্দ বলেনি। এর স্থান বলে দিয়েছে। অন্তরের বাইরে রাখ, উপার্জন কর, পানাহার কর, ব্যয় কর কিন্তু অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে দিও না। অন্তরে থাকবে কেবল আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা। ধন-সম্পদের মহব্বত অন্তরের ভেতর না থাকা উচিত।

স্বভাবগত মহব্বতের প্রতি অনুগ্রহ

প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক মহব্বত কিছু থাকলে মানুষ সে মহব্বত সম্পূর্ণ বের করে দিবে কেমন করে? কিছু না কিছু মহব্বত সম্পূর্ণ বের করে দাও। তোমাদের স্বভাবগত মহব্বত রয়েছে তা রাখ। কিন্তু মহব্বত এত বেশি যেন না হয় যে, আল্লাহর মহব্বতের প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। যদি তুলনা হয় তা হলে আল্লাহর মহব্বত যেন প্রবল হতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

বলুন! যদি তোমাদের মাতা-পিতা সন্তান, ভাই-বন্ধু, স্ত্রীগণ তোমাদের গোষ্ঠী, মাল, ব্যবসা-বাণিজ্য– যাতে তোমরা লোকসানের ভয় কর যেন মাল সস্তা হয়ে না যায়। তোমাদের দালান-কোটা সুউচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ যেগুলোকে তোমরা পছন্দ কর এবং যার প্রতি তোমাদের অন্তরে আকর্ষণ রয়েছে– যদি এসব আল্লাহর মহব্বতের তুলনায় বেশি প্রিয় হয়ে যায়, তাহলে তোমরা বিপদাপদ ও ফেতনা ফাসাদের অপেক্ষা কর। [তাওবা : ২৪]

এ আয়াতে বলা হয়েছে– অন্য কিছুর মহব্বত আল্লাহর মহব্বতের তুলনায় যেন বেশি না হয়। বোঝা গেল, অল্পস্বল্প মহব্বত যদি হয় তাহলে অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের নিজের মাল-সম্পদের সঙ্গে মহব্বত হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষ কামেল ওলী হয় না। এ হলো নবীগণের (আ.) স্থান। তাদের অন্তরের সামান্যতম সম্পর্কও এসবের সঙ্গে নেই। আমরা এই উঁচু স্থানে পৌছাব কেমন করে। আল্লাহ বলেন, মহব্বত রাখ, আমি অন্তর হতে তা বের করতে চাই না। কিন্তু মোকাবেলা যদি হয়ে যায় তাহলে লক্ষ্য কর, আল্লাহর মহব্বতের তুলনায় এসবের মহব্বত বেশি না কম! যদি বেশি হয় তাহলে আপদ বিপদের অপেক্ষা কর। যদি কম থাকে তাহলে কোন আপত্তি নেই। কথা হলো, ইসলাম মাল-ধনের মহব্বতের সুযোগ দিয়েছে। বোঝা গেল, ধন-সম্পদের মধ্যে ডুবে থেকে অন্তরে কিছুটা ভালোবাসা রেখেও মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ধন-দৌলতমুক্ত থাকার প্রয়োজন নেই। বরং এসব ধন-সম্পদকে আল্লাহর নৈকট্য ও আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নিবে।

সারকথা, ইবাদতের শব্দ শুনে এ ধারণা যেন না করা হয়, বাড়িঘর সব ত্যাগ করে মসজিদে যেতে হবে। মসজিদেও আল্লাহ পাওয়া যায়, ঘরে বসেও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

মানুষ সর্বদা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে

আহারের সময় দস্তরখানে আল্লাহ পাওয়া যায়। এমন কি প্রস্রাবের সময়ও মানুষ আল্লাহ পেয়ে যেতে পারে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– এক ব্যক্তি আহার করেছে এবং এ নিয়তে করেছে যে, আহারের মাধ্যমে যদি আমার শরীরে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় হয় তাহলে এ শক্তি ব্যয় করব আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে। তাহলে পুরো আহারই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে তা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করে এবং আলহামদুলিল্লাহি কাছিরান বলে শেষ করে, غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রুটি খাচ্ছে আর মাফ হচ্ছে গুনাহ। নামাযের মাধ্যমে যে ফল লাভ হয় তা পানাহারের দস্তরখানায় বসেও লাভ হচ্ছে। বোঝা গেল, মানুষ দস্তরখানায় বসে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে। রোযা দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে পারে। ইফতার দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে পারে। রোযা রাখলে, বলা হয়েছে–

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اُجْزِى بِهٖ.

রোযা হল আমারই জন্য। এর প্রতিদান আমিই দান করব।

ইফতার করতে বসো, তখন দুটি আনন্দ, দুটি খুশি। প্রথম আনন্দ হলো, পানি পানে তৃপ্তি লাভ হয়। শরীর সতেজ হয়ে যায়। দ্বিতীয় আনন্দ, আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ হবে, সন্তুষ্টি লাভ হবে। রোযার উপবাস থেকে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যায়। পেট ভরে খাবার খেয়েও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যায়। আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য নিঃস্ব দরিদ্র হওয়ার প্রয়োজন নেই। পুঁজিপতি হয়েও মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো, আরম্ভ ও শেষ শুদ্ধ ও সঠিক হতে হবে। উপার্জন অবৈধ নাজায়েয যেন না হয় এবং অবৈধ পথে তা ব্যয় করা না হয়। অপব্যয় অপচয় না করা হয়।

এ যুগের জুনায়েদ ও শিবলী

বর্তমান যুগে আমি তো মনে করি, কেউ যদি হারাম কাজ হতে পরহেজ করে, ফরয কাজগুলো আদায় করতে থাকে, তাহলে সে কামেল, সে ওলী। সে বর্তমান যুগের জুনায়েদ বোগদাদী। ঐ যুগে জুনায়েদ হওয়ার জন্য এসব প্রয়োজনীয় ছিল যে, কোন মাকরূহ কাজও করা যাবে না। কোন মুস্তাহাব কাজও ত্যাগ করা চলবে না। কিন্তু বর্তমান যুগের জুনায়েদ যদি ফরযগুলো আদায় করে

হারাম কাজ হতে পরহেজ করে তাহলে সে ইনশাল্লাহ জুনায়েদ ও শিবলীর মতো আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পেয়ে যাবে।

এ কারণে যে, বর্তমান যুগ অত্যন্ত ফেতনা ও ফাসাদের যুগ, বাধা-বিপত্তির যুগ। এসব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে মানুষ যদি দীনের উপর টিকে থাকতে পারে, তাহলে সে মুজাহিদ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণ (রা.)কে ইরশাদ করেছিলেন– তোমরা বর্তমানে এমন যুগে বাস করছ যে, তোমরা যদি দীনের দশ ভাগের নয় ভাগ কাজ সম্পাদন কর এবং এক ভাগ ছুটে যায় তাহলে কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কেন এক ভাগ ছুটে গেল?

তারপর বললেন– তোমাদের পরে উম্মতের দুর্বল ব্যক্তিগণ আসবেন। তারা যদি দীনের এক দশমাংশের উপর আমল করে এবং নয় ভাগ ছুটে যায়, তাহলে তাদেরকে ঐ প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

এজন্য যে তোমাদের সামনে কোন বাধা-বিপত্তি নেই, আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। মুজিযা বিদ্যমান রয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে তোমরা অবস্থান করছ। দীনের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী সকল উপায় উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। দীনের উপর আমল করতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। পরবর্তী যুগে এমন মানুষ হবেন যাদের চোখের সামনে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান থাকবেন না। থাকবে না মুজিযা, হবেন না তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের অধিবাসী। এসব অবস্থা তখন থাকবে না; বরং দ্বিধা, সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের প্রাধান্য থাকবে। তারা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফেতনা-ফাসাদের আধিক্য থাকবে। এসবের মধ্যে থেকে যারা দীনের উপর কায়েম থাকবে তারা অল্প আমলেও প্রতিদান পাবে ঐ রূপ, যে রূপ আজ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

সারকথা, বাধা-বিপত্তির আধিক্যের মধ্য দিয়ে যে জিনিস আসে তার মূল্য ও মর্যাদা বেশি। এজন্য ধন-সম্পদ হোক টাকা পয়সার প্রাচুর্য হোক, দালান কোঠা হোক, ক্ষেত খামার হোক, যদি হালাল পথে উপার্জন করা হয় তাহলে তা হল আল্লাহর দান। এগুলো নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। কিন্তু আল্লাহর বিধি বিধান মতে ব্যয় করবেন।

আমাদের সম্পদের আসল অবস্থা

আমরা যেহেতু নিজেদের জানেরই মালিক না, তাহলে নিজেদের মাল-সম্পদের মালিক হব কেমন করে? জানের মালিক সত্তা যিনি জীবন সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মাল-সম্পত্তিরও মালিক তিনি, যিনি সম্পদ সৃষ্টি করে আমাদের হাতে দিয়েছেন। আসলে মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজেই, আমরা মালের রক্ষক আমানতদার। আমানতদারের কাজ নয়, নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিবে। মালিককে জিজ্ঞেস করতে হবে। কাকে দিবে কি পরিমাণ দিবে। মালিকের পক্ষ থেকে আদেশ হবে, তারপর সে অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। বলা হয়েছে–

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ.

পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তায়ালা। যাকে ইচ্ছা মাল দিয়ে দিবেন। আমরা এর প্রকৃত মালিক নই। দান করে দেয়ার পরও তিনিই মালিক থেকে যান। বলেন– وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ সকল মানুষ ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যাবে। সত্যিকার উত্তরাধিকারী আমিই, উত্তরাধিকার সূত্রে সব আমার কাছে এসে যাবে। সর্বপ্রথম আমিই মালিক ছিলাম, সর্বশেষ আমিই মালিক থাকব। মধ্যবর্তী সময়েও আমি মালিক, আমার নির্দেশই চলবে। আমার নির্দেশ মত মাল ব্যয় করা হবে।

তাই বলেছেন– وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ ঐ সম্পদ থেকে ব্যয় কর যা আমিই দিয়েছি। এটা বলা হয়েছে এজন্য, তোমরা যেন মনে না কর তোমরাই মালিক। তোমরাই তা সৃষ্টি করেছ। আমিই স্রষ্টা, আমিই মালিক। তাই বললেন, এ দৌলত যা আমি দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

সৎপথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান সৎপথে ব্যয় করা সহজ হয়ে যায়। নিজের জিনিস অন্যকে দান করতে মানব প্রকৃতি স্বভাবত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এভাবে বলা হয়, এ জিনিস তোমার না। তখন দান করা সহজ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ প্রবাদ–

مال مفت دل بے رحم

যখন কোন কিছু বিনামূল্যে পাবে, তখন নির্দ্বিধায় মুক্তহস্তে ব্যয় করবে। জিনিস অন্যের আমি কার্পণ্য করব কেন? তাই বলা হয়েছে– তোমরা নিজের জিনিস বলে ধারণা করছ কেন? এ তো আমারই জিনিস। আমি যখন অনুমতি প্রদান করছি তখন আমার জিনিস ভেবে-চিন্তে ব্যয় কর। যেন দানশীল হতে পার। নির্বিঘ্নে ব্যয় করতে পার।

এসব ধন-সম্পদ দীন হাসিল করার মাধ্যম। যেমন আমি বলছি, সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর মত ব্যক্তিও ছিলেন, আবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)ও ছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমার উপর কোন মানুষের কোন ইহসান নেই। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিকের ইহসান রয়েছে। তিনি আমার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। সে সময় চল্লিশ হাজার টাকা বর্তমানের চল্লিশ লাখের চেয়েও বেশি।

সাফ কথা, আল্লাহর রাসূলেরও টাকা পয়সার প্রয়োজন ছিল। খাদেমগণ তাঁর জন্য ব্যয় করেছেন। এ ব্যয় ইবাদত ছিল। আর তা পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। সিদ্দিকিয়্যত-এর মহান মর্যাদা লাভ হয়েছিল।

দেশ চালনার সঙ্গে ইবাদত

কথা হল, মানুষ যে কোন অবস্থায় থাক, ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। প্রত্যেক অবস্থায় ইবাদত রয়েছে। বিত্তবানের ইবাদত ধন-সম্পদের সঙ্গে এবং দরিদ্রের ইবাদত দরিদ্রের সঙ্গে। রাজ্য প্রশাসকের ইবাদত রাজ্যের সাথে রয়েছে। অসহায়, নিঃস্বদের ইবাদত তাদের অসহায়ত্বের সঙ্গে। আমির বা নেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّه

সাত ধরনের মানুষ হবেন, যাদেরকে কেয়ামতের কঠিন দিনে আরশের ছায়ার নিচে স্থান দেয়া হবে, যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। এদের প্রথম প্রকার বলা হয়েছেন– امام عادل ঐ বাদশাহ, যে ন্যায়পরায়ণ। তাকে আরশের ছায়াতলে স্থান দেয়া হবে। একজন নিঃস্ব দরিদ্র মনে করে যে, ঐ ব্যক্তির অনেক উঁচু মর্যাদা লাভ হচ্ছে। সিংহাসনে আরোহণ করে আছে, তার সামনে জীবনোপকরণের দরজা সদা উন্মুক্ত। আয়েশ আরামের সকল সরঞ্জাম তার হাতের মুঠায়। সে কি দীনদার হবে? কিন্তু ইসলাম তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। তুমি সিংহাসনে বসেও আল্লাহকে পেতে পার। তাহলে তুমি ঐ মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ তোমাদের আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে। মোটকথা, একজন নিঃস্ব দরিদ্রকেও এ মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং একজন রাজা-বাদশাহকেও– যে সিংহাসন ও রাজমুকুটের অধিকারী– তাকেও এ মর্যাদা দান করা হয়েছে। ইসলাম কারো সঙ্গে কার্পণ্য করেনি। একথাও বলেনি, তুমি তোমার অবস্থা পরিবর্তন কর। তা হলে আল্লাহকে পাবে। বরং নিজের মাকাম ও অবস্থার উপর থাক। কিন্তু প্রয়োজন কোন জিনিসের? প্রয়োজন চিন্তা ও ফিকিরের। ভাবনা-চিন্তাহীন মানুষ কোন মানুষই না। যে মানুষের কোন উদ্দেশ্য

ও লক্ষ্য নেই, সে মানুষ নয়। বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়। উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্য। বিত্তবান হয়েও বন্দেগী ও আনুগত্য করতে পারবে। নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন হয়েও ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে। উদ্দেশ্য রক্ষা করে চলতে পারবে। রাজা রাজ সিংহাসনে বসেও উদ্দেশ্য রক্ষা করে চলতে পারবে। উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে। অসহায়ত্বেরও উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে। স্বাস্থ্য থাকার সময়ও, পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হলেও জীবন যদি থাকে তাহলে উদ্দেশ্যও থাকবে। যদি মৃত্যু হয়ে যায় তখনও উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে। এ এক বিস্ময়কর উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য এই দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে চলতে পারে।

কবরে ইবাদত

কবরে যাওয়ার পরও ইবাদত হতে থাকে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) সম্পর্কে হাদীস শরীফে পরিষ্কার বলা হয়েছে–

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.

নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন এবং ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছেন। নামাযও পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى يُلَبِّىْ.

আমি যেন নিজের চোখে দেখছি হযরত মুসা (আ.) তলবিয়া পড়ছেন। لبيك لبيك বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাচ্ছেন। যেন তিনি হজও করছেন। তালবিয়াও পড়ছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– এক ব্যক্তি প্রশস্ত বুক, সুন্দর চেহারা, মোটা তাজা দেহে তাওয়াফ করছে। দেখে মনে হয় এইমাত্র হাম্মাম থেকে গোসল করে এসেছে। কেশরাজি এত সুন্দর এত কালো! মনে হচ্ছে ভেজা চুল থেকে টপ টপ ফোঁটায় পানি ঝরছে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম– এই ব্যক্তি কে? বললেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)। নবীগণ তাওয়াফও করেন। তাদের কবরে ইবাদত করা প্রমাণিত হলো। আর ওলীগণও। এটাও আশ্চর্যের কিছু না। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যিকিরের ইলহাম করে থাকেন এবং তাঁরাও তাসবীহ ও তাহলিলে ব্যস্ত থাকেন। এভাবে নেক মুমিনগণ আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

تُحْشَرُوْنَ كَمَا تَمُوْتُوْنَ وَ تَمُوْتُوْنَ كَمَا تَحْيَوْنَ.

তোমাদের হাশর ঐ অবস্থায় হবে যে অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল। আর মৃত্যু ঐ অবস্থায় হবে যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। যদি আল্লাহর যিকির ও স্মরণের উপর অতিবাহিত করে থাকে তাহলে মৃত্যুও আল্লাহর যিকিরের উপর হবে। কবর থেকে যখন উঠবে যিকির করতে থাকবে। হজব্রত পালনকালে যদি লাব্বাইক লাব্বাইক বলে মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসে বলা হয়েছে, যখন কবর থেকে উঠবে, তখন লাব্বাইক লাব্বাইক মুখে জারি থাকবে। সে মনে করতে থাকবে, আমি হজ সম্পাদন করছি। তারপর বুঝতে পারবে, এ ময়দান আরাফাত নয়; বরং এ হলো ময়দানে হাশর।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– মানুষকে যখন কবরে শুইয়ে দেয়া হয়, ফেরেশতাগণ সওয়াল জওয়াবের জন্য আসেন। যাদের একজনের নাম 'নকীর' অপরজনের নাম 'মুনকার' বলা হয়েছে। মুনকার-নকীর এজন্য বলা হয়েছে, তাদের চেহারা অপরিচিত হবে। যাদের কখনো দেখা যায়নি। চেহারা ভয়ানক ভীতিপ্রদ এবং আতংক সৃষ্টিকারী হবে। তারা আসবেন এবং তিনটি প্রশ্ন করবেন। তোমার প্রভু কে? তোমার দীন (জীবনবিধান) কি ছিল? ঐ পবিত্র সত্তা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে) কে?

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– এ দু'জন সওয়াল ও জওয়াবের জন্য কবরে আসেন। তখন মুমিন ব্যক্তিকে কবরে যে সময় তাদেরকে দেখান হয়– তা এমন অবস্থা হয়, সূর্য যেন অস্তপ্রায়, অল্পক্ষণের মধ্যে দিন শেষ হচ্ছে। কৃত্রিম সূর্য দেখান হবে যা অস্ত যাচ্ছে। তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার প্রভু কে?' মুমিন ব্যক্তি তখন বলবে– 'মিয়া, এখন সরে দাঁড়াও, আমাকে নামায পড়তে দাও। সময় সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। আমার নামায মাকরূহ হয়ে যেতে পারে।'

দ্বিতীয় ফেরেশতা বলবেন– 'এ ব্যক্তির কাছে তার প্রভু সম্পর্কে কি প্রশ্ন কর? সে তো প্রভুর জন্য এত ব্যস্ত যে এখানেও নামায পড়তে প্রস্তুত। তাকে রব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কি আছে? সে তো আমল দ্বারা উত্তর দিয়েছে। সে ঐ প্রভুরই বান্দা, যার জন্য নামায পড়তে প্রস্তুত হচ্ছে।' তৃতীয় জন বলবে– এ কথা ঠিক যে, সঠিক উত্তর দিয়ে দিবে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব, ডিউটি পালন করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, তিনটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর পেয়ে যাব। কবরে মুমিনের একথা বলা 'আমাকে নামায পড়তে দাও'– এ দ্বারা বোঝা যায় কবরে নামায পড়ার উদ্দীপনা থাকবে। তখন নামায পড়তে দেয়া হবে অথবা হবে না তা আল্লাহ তায়ালা জানেন, কিন্তু আবেগ উদ্দীপনা থাকবে। نية المرء خير من عمله

মানুষ যদি নিয়ত করে, তাহলে নিয়ত আমল থেকে উত্তম। নিয়তের কারণে ঐ সওয়াব দেয়া হবে যা আমলের জন্য দেয়া হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, কোন কোন মানুষ ময়দানে হাশরে হাজির হবে। আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, 'এদের আমলনামায় লিখে দাও, সারা জীবন তাহাজ্জুদ পড়েছে।' ফেরেশতাগণ বলবেন, 'হে আল্লাহ! এরা তো একদিনও তাহাজ্জুদ পড়েনি।'

আল্লাহ বলবেন, 'এদের প্রত্যেকে রাতে শোবার সময় এ আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে ঘুমাতো যে, আজ অবশ্যই তাহাজ্জুদ পড়বে, কিন্তু তাদের চোখ খুলেনি। চেতনা পায়নি। এতে তাদের কোন ত্রুটি নেই। জীবনভর নিয়ত করেছে। লিখে দাও, তারা সমগ্র জীবন তাহজ্জুদ পড়েছে।' মুমিনের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম। কবরে সে বলবে– আমাকে নামায পড়তে দাও– এতে বোঝা যায়, প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে এ আবেগ উদ্দীপনা থাকবে।

তবে এ উদ্দীপনা কোন্ মুমিনের অন্তরে থাকবে? যে দুনিয়াতে থাকাকালীন মাকরূহ ওয়াক্ত হতে বেঁচে থাকার জন্য যথাসময় নামায আদায়ে সচেষ্ট হত, সে ওখানেও এ কথা বলবে– আমাকে নামায পড়তে দাও। আর যে ব্যক্তি এখানে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে থাকে তার মুখ দিয়ে বের হবে না, আমাকে নামায পড়তে দাও।

আসরের নামায বোধ হয় এজন্য দেখানো হবে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে আসরের নামাযের সময় দু'ভাগে বিভক্ত। এক. সঠিক ওয়াক্ত; দ্বিতীয়. মাকরূহ ওয়াক্ত। রোদের রঙ যে পর্যন্ত হলুদ না হয় সে পর্যন্ত ওয়াক্ত কামেল বা পরিপূর্ণ। আর যখন হলুদ রঙ এসে যায়, তখন মাকরূহ ওয়াক্ত। আর যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে তখন মাকরূহে তাহরিমী।

ইমাম সাহেবের মাযহাব হচ্ছে, যখন আসরের নামায কারো উপর কামেল ওয়াক্তে ফরয হয়, তখন কামেল ওয়াক্তেই তা আদায় করা উচিত। যদি নাকেস (অপূর্ণাঙ্গ) ওয়াক্তে ফরয হয়, তাহলে নাকেসই আদায় করবে। তাই সূর্যাস্তের সময় যদি আদায় করে তাহলে নাকেস আদায় হবে। যেহেতু ফরয হয়েছিলো নাকেস। যেহেতু আসরের সময় দু'প্রকার– কামেল ও নাকেস বা মাকরূহ। কবরে মুমিনের ভয়ের কারণ হবে এই, এমন যেন না হয় যে, মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায়। আগে আমি এ নামায কেন আদায় করে নেব না? ফজরের নামাযে দু'প্রকার সময় নেই সূর্যোদয়ের আগে পড়ে নেব। যে পরিমাণ সময় আছে সবই কামেল। সূর্যোদয় হয়ে গেলে সময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসরের সময় এমন নয়; বরং দু'ধরনের সময় রয়েছে। এজন্য আসরের নামাযের সময় দেখানো হয়েছে। যেহেতু এখানে নাকেস ও কামেল দুটি অংশ রয়েছে। তখন মুমিন চিন্তা

করবে, আমি কামেল ওয়াক্তে নামায আদায় করে থাকি। এখন নাকেস সময় আসছে, আমার নামায যেন নাকেস না হয়। এজন্য ফেরেশতাদের বলবে– 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি নামায আদায় করে নিই।'

এই বর্ণনা দ্বারা অনুমান হয়, মুমিন একটি আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে কবরে যাবেন। তাঁর আবেগ হবে আমি নামায পড়ব। আম্বিয়ায়ে কেরাম মূলত নামাযে রয়েছেন আর মুমিনদের এ আবেগ থাকবে। যদিও আমলের অনুমতি দেয়া হবে না। অথবা এ সামর্থ্য থাকবে না। 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়ি'– এ আবেগই আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে যেন নামাযই পড়েছে। নামাযে রত আছে।

হাশরের মাঠে ইবাদতের আবেগ-উৎসাহ

আমার বলার উদ্দেশ্য, জীবনের কোন লক্ষ্য থাকা কর্তব্য, যা মানুষ পৃথিবীতে থাকার সময় উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত। যখন কবরে পৌঁছে যাবে, তখনও তার উদ্দেশ্য সাথে থাকবে। আর তা হলো একমাত্র ইবাদত। ইবাদতের উৎসাহ উদ্দীপনা যেমন এখানে রয়েছে, তেমনি ওখানেও থাকবে।

ময়দানে হাশরে যখন মানুষ উঠবে, ঐ অবস্থার উপর উঠবে যে অবস্থার উপর মৃত্যু হয়েছিল। যদি নামাযরত অবস্থায়, যিকিরে ব্যস্ত অবস্থায় অথবা হজ সম্পাদন অবস্থায় মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায় কবর থেকে আল্লাহু আল্লাহু অথবা লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে বলতে উঠবে এবং অন্তরে আকাঙ্ক্ষা থাকবে হাশরের ময়দানে নামায পড়ব।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) যিনি দারুল উলুমের শায়খ মুরব্বী এবং শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন। আমি আমার বুযুর্গদের কাছে তাঁর এ কথা শুনেছি। তিনি বলেন– কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইমদাদুল্লাহ! কি চাও? তোমার আকাঙ্ক্ষা কি? আরজ করবো, আমার জান্নাতের প্রয়োজন নেই, হুর গিলমানের দরকার নেই, আমাকে আপনার আরশের নিচে দু'গজ পরিমাপ জায়গা দান করুন, আমি নামায পড়তে থাকব।

নামাযের জন্য এত আগ্রহ, এত আকাঙ্ক্ষা। সেখানে যদি কোন জিনিসের প্রার্থনা হয়, চাহিদা হয়, তাহলে তা হবে নামায। নামায ও ইবাদত এত উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে, কবরে এবং হাশরের ময়দানেও সঙ্গে থাকবে।

বেহেশতে ইবাদত

জান্নাতেও ইবাদত সঙ্গে থাকবে। জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে– يلهون التسبيح যত জান্নাতী থাকবেন, সবার জবানে আল্লাহর যিকির জারি হবে। এ যিকির কারো ইচ্ছার অধীনে থাকবে না। ইচ্ছা, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীতে তারা আল্লাহু আল্লাহু যিকির করেছেন। ফলে আল্লাহর যিকির প্রাণের সঙ্গে মিশে গেছে। কাজেই যিকির আপনা আপনিই জারি থাকবে। শ্বাসের সঙ্গে যিকির জারি থাকবে। যেমন 'পাছ আনফাস' হয়ে থাকে। বহির্মুখী শ্বাসের সঙ্গে আল্লাহু আল্লাহু যিকির হয়ে, জান্নাতবাসীদের জবান দিয়ে তাসবিহ তাহলিল এবং আল্লাহ তায়ালার নাম জারি থাকবে। এসব তাদের পরিশ্রমের ফল। তাঁরা দুনিয়াতে থাকার সময় পরিশ্রম করে আল্লাহর যিকিরকে তাদের উদ্দেশ্য বানিয়েছিল। এভাবে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হাফেজদের বলা হবে, তেলাওয়াত কর এবং উপরে আরোহণ কর। তোমার সামর্থানুযায়ী দরজাত হাসিল কর। বোঝা গেল, জান্নাতে প্রতিদিন উন্নতি হবে। তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিদিন উন্নতি লাভ হবে। ইবাদত এমন উদ্দেশ্য যা দুনিয়া থেকে রওনা হয়েছে, কবর পর্যন্ত, হাশর পর্যন্ত, তারপর জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারপর জান্নাতে নতুন নতুন জাহান, নতুন নতুন মর্যাদা সর্বদা হাসিল হতে থাকবে। ইবাদতের এই উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

ঈমানের ফলে সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়

তাই আমি আরজ করছি, দীর্ঘ জীবনের জন্য দীর্ঘ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সাধারণ উদ্দেশ্য যা কিছুদিন পর শেষ হয়ে যাবে, তা জীবনের জন্য উপযোগী নয়। বরং জীবনের জন্য কলংকজনক। আপনি জীবনের উদ্দেশ্য পানাহারকে সাব্যস্ত করবেন, তা জীবনের জন্য অবমাননা। এজন্য যে, মানুষ খাদ্য সামগ্রী লাভ করে আবার অন্যান্য জীবজন্তুও তা লাভ করে। যদি সম্পদ উপার্জনকে উদ্দেশ্য স্থির করেন, তাহলে সম্পদ একটি মাধ্যম মাত্র, স্বয়ং উদ্দেশ্য নয়। মানুষের যখন জানের উপর বিপদ এসে যায়, তখন ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেয়। বোঝা গলে, ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য জানপ্রাণ। আবার যখন ঈমানের উপর আক্রমণ করা হয়, তখন নিজের জানপ্রাণকে কোরবান করে দেয়। যেন ঈমান রক্ষা পায়। বোঝা গেল ঈমান উদ্দেশ্য। সর্বোত্তম উদ্দেশ্য হলো ঈমান। ঈমান রক্ষার জন্য জানপ্রাণ ধন-দৌলতের পরোয়া করা হয়নি। পার্থিব জিনিসকে উদ্দেশ্য স্থির করার অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা। সুতরাং

দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত, যা জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী দৌলত ঈমান ও ইরফান। আল্লাহর মারেফত ও পরিচয় লাভ।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ সম্পদ খাটাবে, জানপ্রাণ ও মান-সম্মান খাটাবে, তাহলে তার প্রাণও মূল্যবান হয়ে যাবে। কেননা ঈমানের সঙ্গে হয়েছে। এতে তার মাল-সম্পদও পবিত্র হবে। তার সন্তানগণকেও পবিত্র করে দেয়া হবে। যেহেতু ঈমান ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়েছে।

এজন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

নেক মানুষের মাল নেক হয়, আর নেক মাল নেক আমলের মাধ্যম হয়।

মানুষ যদি (গুনাহ হতে) পাক পবিত্র থাকে তাহলে তার মাল সম্পদও পাক হবে। আর যদি মানুষ তার রূহ ও আত্মাকে গুনাহ দ্বারা নাপাক অপবিত্র করে দেয়, তাহলে তার মাল-সম্পদও অপবিত্র হবে। মানুষ যদি পবিত্র হয়ে যায়, গুনাহমুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত জিনিস পবিত্র হয়ে যাবে। দালানও পাক বাসভবনও পাক। সকল জিনিসই ভাল হয়ে যাবে। এসব তখনই হবে যখন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য স্থির করা হবে। আকবর এলাহবাদীর একটি কবিতা রয়েছে, যাতে বর্তমান যুগের একটি চিত্র বর্ণনা করেছেন। তবে উদ্দেশ্য বাকী থেকে গিয়েছিল। তাই আমি একটি কবিতা আমার পক্ষ হতে বাড়িয়ে দিয়েছি। এতে উদ্দেশ্যর বর্ণনা হয়ে গেছে। আকবর বলেন–

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے ☆ یعنی جینا ہے اور مرنا ہے

اب رہی بحث رنج وراحت کی ☆ یہ فقط وقت کا گذرنا ہے

না সুখ চিরস্থায়ী। না দুঃখ ও মসিবত চিরস্থায়ী। বিপদের সময় মানুষের সময় যেভাবে পার হয়ে যায়, বিপদ শেষ হয়ে নেয়ামত বা সুখ ভোগের সময়ও তার সময় তেমনি কেটে যায়। নেয়ামত শেষ হয়ে যায়। স্থায়িত্ব ও স্থিরতা কোন জিনিসের মধ্যে নেই। না আছে এ জগতের সুখ-ভোগের স্থায়িত্ব, না আছে দুঃখ-কষ্টের স্থায়িত্ব। সুখীজনও সব ত্যাগ করে চলে যাবে, দুঃখীজনও। আকবর বলেন–

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے ☆ یعنی جینا ہے اور مرنا ہے

اب رہی بحث رنج وراحت کی ☆ یہ فقط وقت کا گذرنا ہے

কিন্তু এখনও কবিতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সময় তো কেটে যাবে। কিন্তু মানুষ করবে কি? দুঃখ ও সুখ ভোগ হলো, এখন বলুন, আপনি কি চান? আমি তা সংযোজন করেছি। যদিও সংযোজন এমন হয়েছে, যেমন মখমলের মধ্যে টাটের পয়ওন্দ। যেহেতু আকবর ছিলেন লেছানুল আসর। যুগের মুখপাত্র, শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁর মোকাবেলায় আমাদের কবিত্ব অচল। কিন্তু যাই হোক, যোগ করে দিয়েছি। তা টাটই হোক না কেন। কারণ, মখমল যদি ছেঁড়া থেকে যায়, তাহলে দেহ খোলা থেকে যাবে। কাজেই টাট দ্বারা দেহ আবৃত্ত হয়ে থাকবে। পোশাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। এজন্য আমি সংযোজন করেছি। আকবর বলেছিলেন–

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے ☆ یعنی جینا ہے اور مرنا ہے

اب رہی بحث رنج وراحت کی ☆ یہ فقط وقت کا گذرنا ہے

তারপর আমি বলছি–

مقصد زندگی ہے طاعت حق ☆ نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے

জীবনের প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। তা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রতিটি বস্তু স্থায়ী ও উপকারী হবে। আর যদি আল্লাহর আনুগত্য না থাকে তাহলে মাল-সম্পদও বিপদ, জানও বিপদ, স্বাস্থ্যও বিপদ। সকল কাজকর্ম নকল ও হরকতই বিপদ, অন্তরে ঈমান থাকবে না। আর যদি অন্তরে ঈমান এসে যায়, তাহলে প্রতিটি জিনিস সুখ-শান্তির কারণ হয়ে যাবে।

জীবনের সঠিক মূল্যায়নের উপায়

এ দীর্ঘ আলোচনার সার হলো, আমাদেরকে জীবনের মূল্য অনুধাবন করতে হবে। এ হলো আল্লাহর এক নেয়ামত। মূল্যায়নের উপায় হচ্ছে, এ জীবনকে কোন একটি সঠিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যয় করতে হবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে যেন কোন কাজ করা না হয়। উদ্দেশ্য এমন হতে পারে না যেমন আমি সুখী হয়ে যাই। আমার জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত হোক, কাছে সম্পদের প্রাচুর্য হোক। আমার বাংলো ও প্রাসাদ হোক। এসব কোন উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি দান করেন, সবকিছু করে নিন। কিন্তু এসবও কোন

উদ্দেশ্যের অধীন হবে। প্রাসাদ নির্মাণে এ নিয়ত করবে– আমি এজন্য নির্মাণ করছি, বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হবেন। আল্লাহর যিকির ও স্মরণ করবেন। সময়ে জামাতে নামায হবে। তাহলে আর প্রাসাদ থাকবে না, ইবাদতগৃহ হয়ে যাবে। আপনি এত সওয়াব পাবেন যা মসজিদ নির্মাণ করে পাওয়া যায়।

رہ گیا عزو جاہ کا جھگڑا ☆ یہ تخیل کا بیٹ بہنا ہے

اور قابل ذکر بھی نہیں خورونوس ☆ بھی کی خو سے سڑنا ہے

থেকে গেল মান-সম্মানের বিষয়। এটা হলো কল্পনার উদরপূর্তি মাত্র। আর পানাহার উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় নয়। এ হচ্ছে পশুশক্তির সঙ্গে লড়াই করা মাত্র।

নেক নিয়ত

কোন বুযুর্গের এক খাদেম বাসভবন তৈরি করল। যখন ভবন নির্মাণ হয়ে গেল, তখন সে তার শায়খকে দাওয়াত করল। আপনি বরকতের জন্য আমার ভবনের উদ্বোধন করে দিন। শায়খ আসলেন, ভবন দেখে আনন্দিত হলেন। খুব সুন্দর মনোরম ভবন হয়েছে। শায়খ বললেন– ভাই! এত বড় বড় দরজা-জানালা কেন দিয়েছো?

মুরিদ বললেন– হযরত! আলো বাতাস প্রবেশ করার জন্য। পীর সাহেব বললেন– আল্লাহর বান্দা! এ নেয়ামতের কি দরকার ছিল? আলো বাতাস তো আসবেই। নিয়ত না করলেও আসবে। রৌশনদানে তুমি এমন নিয়ত কেন করনি, যার দ্বারা তুমি সওয়াব পেয়ে যেতে। এসব আলো বাতাস এমনিই আসত। তুমি এ নিয়ত কেন করনি, আমি দীর্ঘ রৌশনদান এ কারণে রেখেছি যাতে মুয়ায্যিনের আযানের আওয়াজ আসতে পারে। আমি দরজা এজন্য বড় রেখেছি, যাতে যিকিরকারীদের আওয়াজ দ্রুত আমার কানে এসে যাবে। যদি এ নিয়ত করতে তাহলে সওয়াবও পেয়ে যেতে, আর আলো-বাতাস নিয়ত ছাড়াই প্রবেশ করত। ভবনের শোভা-সৌন্দর্যে মানুষ যদি এই নিয়ত করে নেয়, আমি আমার ঘর তৈরি করছি না; বরং এ হলো আল্লাহর ঘর। এখানে নামায হবে, আল্লাহর যিকির ও স্মরণ হবে, ওয়াজ-নসিহত হবে। তাহলে এ ঘর সওয়াবের কারণ হবে। ঘর দ্বারা ঐ কাজ হয়ে যাবে যা মসজিদ ও খানকা দ্বারা হয়। সামান্য নিয়তের পরিবর্তনে মানুষের আদত (অভ্যাস) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর নিয়তের সামান্য ত্রুটির কারণে ইবাদত আদতে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ

সওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়। মুখের উপর নিক্ষেপ করে দেয়ার যোগ্য হয়ে যায়। নামায যদি এ নিয়তে পড়ে– মানুষ আমাকে ভাল বলবে, প্রশংসা করবে– সেটা হবে রিয়াকারী লোক দেখানো। নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আহার গ্রহণের সময় এ নিয়ত করে নাও। এজন্য আহার করছি যে, এর দ্বারা শক্তি পয়দা হবে, আর ইবাদত করতে পারব। তাহলে আপনার ভাত রুটি ইবাদত হয়ে যাবে। নিয়ত জিনিসকে এত পবিত্র করে দেয়। ইচ্ছা করলে আদতকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। আর যদি খারাপ ও মন্দ নিয়ত হয়, তাহলে ইবাদতও আদত হয়ে যায়। প্রতিদানের মোটেও যোগ্য থাকে না। তাই উদ্দেশ্য ও নিয়ত শুদ্ধ ও সঠিক হওয়া চাই। তাহলেই মানুষের সম্পূর্ণ জীবন উপকারী হয়ে যাবে।

কথা ক'টি এজন্য আরজ করলাম, মাহফিলে এমন সব ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছেন যাদের আল্লাহ তায়ালা নানা নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। ধন-সম্পদও দান করেছেন। এ হলো শুকর ও কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নেয়ামত দান করেন। এতে শুধু সে-ই খুশি হবেন তা নয়; বরং তার সকল ভাই খুশি হওয়া উচিত। এটা ভেবে যে, আমাদের ভাইকে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত দান করেছেন, ধন্য করেছেন এবং এমন মানুষও রয়েছেন, যাদের কাছে ধন-সম্পদ নেই, কিন্তু ঈমান ও ইলমের মত পরিপূর্ণ দৌলত রয়েছে। কিন্তু ঐ পার্থিব দৌলত তাদের কাছে নেই। আর অনেক মানুষ এমন রয়েছেন যাদের কাছে এ দৌলতও নেই, ঐ দৌলতও নেই। কিন্তু সবর ও ধৈর্যের দৌলত রয়েছে। তাদের কাছে তারা আক্ষেপ করেছেন, আমরা কিছুই পাইনি, আমরা বঞ্চিত। আর্থিক ইবাদত করতে পারিনি আমরা। তাদের আক্ষেপ ঐ দৌলতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এ আক্ষেপের কারণে তাদেরকে প্রতিদান ও সমৃদ্ধি দান করা হবে। নানা অবস্থার অনেক মানুষ এখানে রয়েছেন। তাই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মুশতরফ (মিলিত) থাকা উচিত যা সকলের জন্য উপকারী হবে। আর তা হলো, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। এ উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের সঙ্গে কায়েম থাকতে পারে। নিঃস্ব অবস্থায়ও থাকতে পারে। দুঃখ-কষ্টের সঙ্গেও কায়েম থাকতে পারে। সুখ-ভোগ, আনন্দ-উৎসবেও থাকতে পারে। তাহলে সর্বাবস্থায় আমাদের দীর্ঘ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে হবে।

ইবাদতের অর্থ

আসলে ইবাদতের অর্থ শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা বা যাকাত প্রদান করা নয়। ইবাদতের অর্থ হলো আদেশ পালন করা। আল্লাহ বলেন, আমার আনুগত্য কর।

আল্লাহ যদি বলেন, নামায পড়, তাহলে নামায ইবাদত। আল্লাহ যদি বলেন, নামায পড়ো না। তাহলে নামায ত্যাগ করাই ইবাদত হয়ে যায়। তিনি যদি বলেন, রোযা রাখ, তাহলে রোযা রাখা ইবাদত। পাঁচটি সময়ে নামায পড়ো তাহলে নামাযই ইবাদত। তিন সময় সাবধান, নামায পড়ো না। সূর্য অস্তকালে, উদয়কালে ও ঠিক দুপুরে, যখন সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থান করে। এ সময়গুলোতে নামায পড়লে মানুষ গুনাহগার হবে। বোঝা গেল নামায পড়া, নামায ত্যাগ করা কিছুই ইবাদত নয়ঃ আদেশ পালন করাই হল ইবাদত। রমযান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। ঈদের চাঁদ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। যদি কেউ ঐদিন রোযা রাখে, গুনাহগার হবে। বোঝা গেল রোযা ইবাদত না, রোযা ত্যাগ করা ইবাদত না, আদেশ পালন করা হলো ইবাদত। যখন আমাদেরকে বল হয়, রোযা রাখ। তখন রোযা রাখা ইবাদত। যখন বলা হয়, রোযা রেখো না, তখন না রাখা ইবাদত।

বলা হয়েছে– আত্মহত্যা করা হারাম, নিজেকে হত্যা করো না। কিন্তু যদি ব্যাপক যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং বলা হয়, যুদ্ধের ময়দানে জবাই হয়ে যাও। তখন তা ইবাদত হয়ে যাবে। বোঝা গেল, না জানের সংরক্ষণ করা ইবাদত, না বিলিয়ে দেয়া ইবাদত; প্রকৃতপক্ষে আদেশ পালন করা হলো ইবাদত। যখন আমি বলি জানের হেফাজত কর, তখন হেফাজত করা ইবাদত। আর আমি যখন বলি জানের পরোয়া করো না, জান বিলিয়ে দাও। তখন জান বিলিয়ে দেয়া ইবাদত। মোটকথা, ইবাদতের সার হলো– নিজের সম্পূর্ণ জীবনকে আল্লাহর আইন ও বিধানের অধীনে সমর্পণ করতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে হবে। নিজের ইচ্ছাকে শেষ করে দিতে হবে। এ হলো ইবাদত।

সারকথা, ইসলাম কোন অবস্থায় কাউকে নিরাশ করে না। মানুষ যে কোন অবস্থায় থাক, ঐ অবস্থায় থেকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার রাস্তা বলে দিয়েছে এবং মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতেও পারে।

এ কয়েকটি কথা আমি আরজ করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে শুধরিয়ে নিন এবং ঐ উদ্দেশ্যের উপর চলার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নসীব করুন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ সহজ করে দিন। আমিন!

একটি মূল্যবান পত্রের জবাব

বুযুর্গানে মুহতারাম!

করাচীর এক ভদ্রলোক এ. জি. সাহেব। বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমগণের খেদমতে একটি মুদ্রিত দরখাস্ত পেশ করেন। বর্তমান ফেতনাপূর্ণ অশান্ত ও বিশৃঙ্খল বিশ্বে মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করতে পারে– তাঁরা যেন এ বিষয়ের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন?

হযরত মুহতামিম সাহেব (রহ.)-এর কাছেও একটি পত্র আসে। ঘটনাক্রমে হযরতের কাছে পত্রটি যখন পৌঁছে তখন তিনি বিমানে বোম্বাই থেকে কলিকাতা সফর করছিলেন। ঐ সুযোগে তিনি প্রশ্ন ও পত্রের উত্তর লিখে ঐ সাহেবের কাছে করাচী প্রেরণ করেন। পত্রের উত্তর ছিল এ রকম–

باسمه سبحانه وتعالى

মুহতারামুল মোকাম!

হাদিয়ায়ে সালাম পেশান্তে নিবেদন এই যে, আপনার পত্র দারুল উলুম দেওবন্দের দফতরে যখন পৌঁছে তখন আমি সফরে ছিলাম। সফর দীর্ঘ হয়ে গেল। আপনার পত্র দেওবন্দ হয়ে বোম্বাইতে আমার কাছে পৌঁছে। ওখানেও ব্যস্ততার কারণে উত্তর লেখার সুযোগ হলো না। কলিকাতা রওয়ানা হয়ে গেলাম। এজন্য আজ কলিকাতা থেকে উত্তর লিখছি। উত্তর প্রদানে অনিচ্ছাকৃত এ বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাই।

আপনি পত্রে প্রশ্ন করেছেন যে, এ বিশৃঙ্খল অশান্ত বিশ্বে মানব সমাজ কিভাবে সুখ-শান্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে?

উত্তর হিসাবে আরজ করছি– প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান দুঃখময় অশান্ত বিশ্বের অধিকাংশ আত্মার এ যেন একটি সাধারণ প্রতিধ্বনি। এজন্য প্রশ্নটি বাস্তবিকই গভীর বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু এ প্রশ্নটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মনে হচ্ছে, ঠিক সে অনুযায়ী তার উত্তরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার। উত্তর ব্যক্ত করার আগে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অর্থ নির্ধারণ করে নিতে হবে। তাহলে এ থেকে আত্মরক্ষা করার এবং জীবনে সুখ-শান্তি লাভের পথও আপনা আপনি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ সাধারণত অশান্তি বা মসিবত হিসাবে দুঃখ,-বেদনা, রোগব্যাধি, অভাব-দারিদ্র, কারাবাস, মারধর, হত্যা, লড়াই, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ,

মহামারী ইত্যাদিকে মনে করে। অথচ এসবের মধ্যে একটিও মসিবত নয়। এসব হলো ঘটনা ও দুর্ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে দুঃখ, অশান্তি ও মসিবত বলা হয় ক্বলব ও আত্মার এসব ঘটনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, অশান্তিতে পতিত হওয়া, অন্তরে সংকোচ বোধ করা এবং দুঃখ চিন্তায় ডুবে যাওয়াকে।

সুতরাং এসব বস্তুকে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির উপকরণ বলা যেতে পারে, মসিবত বলা যেতে পারে না। মসিবত বলা হয় অন্তরের বিশেষ অবস্থাকে, বিশেষ অনুভূতি ও প্রভাবান্বিত হওয়াকে। কারাবাস ও কারাভোগের নাম মসিবত নয়; বরং এ দ্বারা অন্তরের অশান্ত হওয়া, দুঃখানুভব করাই হল মসিবত। দরিদ্রতা ও অসহায়ত্ব স্বয়ং কোন বিপদ বা মসিবত নয়; বরং এ দ্বারা অন্তরের আক্রান্ত হওয়া, অশান্ত হওয়া ও দুঃখানুভব করাই হলো মসিবত বা পেরেশানী। জ্বর বেদনা, কলেরা, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এসব মসিবত নয় এবং এসব দ্বারা অন্তরের ব্যথিত হওয়া, দুঃখানুভব করা ও পেরেশান হওয়াই হলো মসিবত। ফলে মসিবত হলো আমাদের আত্মার অন্তরের একটি অবস্থা। বিশ্বের ঘটনাবলী মসিবত নয়। এজন্য দুঃখ ও মসিবতকে শেষ করে দেয়ার এই তদবির ও পন্থা কখনো কার্যকরী হতে পারে না যা, আমরা সবাই বিশ্বের ঘটনাবলী নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে যাই। এজন্য যে, বিশ্বের ঘটনাবলী স্বয়ং মসিবত না; বরং তা প্রতিরোধ করাও আমাদের আয়ত্তে না। আর তা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বরং শুধু এটা হতে পারে যে, এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে আমাদের অন্তরে যেসব দুঃখ-ব্যথা ও পেরেশানী হয়, এই দুঃখ-ব্যথা অনুভব না করে বরং স্বভাবসম্মত করে নেয়া। যাতে অন্তর ব্যথিত না হয়ে বরং এসবের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করবে। তখন এসব ঘটনার মধ্যে বিপদ ও মসিবত হওয়ার যে দিক রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে এবং আত্মার প্রশান্তি লাভের কারণ এবং মাধ্যম হয়ে যাবে। মানব জীবন থেকে দুঃখ-পেরেশানী চিরতরে খতম হয়ে যাবে।

বর্তমান বিশ্ব মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিঃশেষ করে দেয়ার চিন্তায় মত্ত। কিন্তু এটা হলো অসম্ভবকে সম্ভব করে নেয়ার অপপ্রয়াস ও ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র, যা কখনো বাস্তবতার মুখ দেখবে না। এজন্য যে পরিমাণ এই উল্টা প্রচেষ্টা চালানো হবে, সে পরিমাণ বিশ্বের অবস্থায় অশান্তি, বিশৃংখলা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পাবে। কখনও অশান্তি ও পেরেশানী শেষ হবে না। যেমন বাস্তবে আমরা দেখছি, চাক্ষুস দেখছি। সুতরাং বিশ্বকে পরিবর্তন করে দেয়ার চেষ্টা ও তদবীরের নাম শান্তি নয়। বরং স্বয়ং নিজেদেরকে পাল্টিয়ে নেয়ার নামই হল সুখ শান্তি।

এ কাজের সহজ সরল পথ রয়েছে মাত্র একটি। তা হলো নিজেদের দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তিকে এসব ঘটনা থেকে সরিয়ে নিয়ে ঐ ভিত্তিমূল ও উৎসের উপর নিবদ্ধ করে দেয়া, যেখান থেকে তৈরি ও সৃষ্টি হয় এসব বিপদ ও মসিবত দুঃখ ও কষ্টের উপকরণ। আর উৎস হলো আল্লাহ তায়ালার বরকতময় সত্তা। আল্লাহ এই বিশ্বকে সীমাহীন হেকমত ও জ্ঞান দ্বারা পরস্পর বিরোধী শক্তি ও বস্তুর কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। সুখ-দুঃখ, নেয়ামত ও মসিবত, কষ্ট ভোগ, বিলাস, শান্তি ও অশান্তির লীলাভূমিরূপে এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, গঠন করেছেন। তাঁর সঙ্গে প্রেমপ্রীতি, দাসত্ব ও আনুগত্য, সন্তুষ্টি ও আত্মসম্পর্ক স্থাপন করার অপর নাম হলো ঈমান। চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ অবস্থাকে নিজের অনুকূলে টেনে নেয়া যায় ও মৌল প্রকৃতি করে নেয়া যায়। যদি তার সকল কার্যক্রম ও তকদীরের উপর বিশ্বাস ও সান্ত্বনা হাসিল হয়ে যায়। তাহলে এ মহব্বত ও ভালোবাসা সকল তিক্ত জিনিসকে সুমিষ্ট করে দিবে। সকল বিপদকে সুন্দর ও সুস্বাদু করে দিবে। ফলে অন্তর এসব ঘটনা হতে দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানী অনুভব করবে না। এই হলো মসিবতের প্রাণ, মসিবতের মূল কথা–

از محبت تلخها شیریں بود

প্রেম ও মহব্বতের কারণে তিক্ত জিনিসও মিষ্টি হয়ে যায়।

কেননা প্রেমিকের জন্য প্রিয় বন্ধুর পক্ষ হতে আগত সকল জিনিসই সুস্বাদু হয়ে থাকে। সে বন্ধুর প্রেরিত কষ্টকে নিজের জন্য এই মনে করে শান্তি ও সান্ত্বনার বস্তু মনে করে– বন্ধু আমাকে স্মরণ করছেন। তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য ও দৃষ্টিপাত করেছেন। আমাকে সম্বোধনের যোগ্য মনে করেছেন। এ ধারণা ও বিশ্বাস ঐ মসিবতকে তার জন্য সুখকর, আরামদায়ক ও শান্তির কারণ বানিয়ে দিবে। তখন মসিবত আর মসিবত থাকবে না।

সারকথা, মসিবত বলা হয় তবিয়ত ও মন মানসিকতা বিরোধী কাজকে। তবিয়তবিরোধী কাজকে তবিয়তের মোয়াফিক বানিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বিশ্বের গতি-প্রকৃতিকে পরিবর্তন না করে (যা শক্তি বহির্ভূত বটে) বরং নিজেদের তবিয়ত ও প্রকৃতিকে পাল্টিয়ে দেয়া যাক এবং তবিয়তের গতি প্রকৃতিকে মসিবত থেকে সরিয়ে মসিবত প্রেরণকারীর দিকে নিবদ্ধ করে দেয়া যাক। দৃষ্টি যেন মসিবতের উপর না হয় এবং মসিবতের স্রষ্টা ও প্রবর্তক আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী, সীমাহীন হেকমত ও তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়। পরিষ্কার কথা, এই অবস্থা ও বিশ্বাস আল্লাহর মহান সত্তাকে স্বীকার করে ও তাঁর প্রতিটি কার্যক্রমের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া হাসিল

হতে পারে না। বরং আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন দ্বারা তা হতে পারে, হবেও। অর্থাৎ সামনে অগ্রসর না হয়ে বরং পশ্চাৎমুখী হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তনের মধ্যে শান্তি নিহিত রয়েছে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ বিপদ-মসিবতে মূলোৎপাটনের জন্য যত সংগ্রাম যত প্রচেষ্টাই করুক না কেন, কখনো বিপদমুক্ত হতে পারে না। এর মূল কারণ, মানুষ বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কোনো না কোনো উপায়-উপকরণের মাধ্যমে করতে চাইবে। অথচ এই উপকরণ স্বয়ং একটি ঘটনা যার মধ্যে উপকারের সঙ্গে সঙ্গে অপকারেরও কোনো না কোনো দিক বিদ্যমান। তখন তাদের এ বিপদ প্রতিরোধ ও বিপদমুক্তি হবে না। ফল দাঁড়াবে, বিপদের মূলোৎপাটনের পরিবর্তে বরং বিপদ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। একটি মসিবত যদি কিছু পরিমাণ দূরও হয় তাহলে সেই মুহূর্তে অন্য মসিবত এ স্থান দখল করে নিবে।

گر گریزی بر امید راحتے ☆ ہم ازاں جاں پیش آید آفتے

শান্তির প্রত্যাশায় যদি অন্যখানে পলায়ন করো তাহলে সেখানেও অন্য আরেক বিপদ দেখা দিবে।

তবে যদি এসবের উর্ধ্বে উঠে সব ঘটনার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়া যায়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলমিভাবে এসব বিপদাপদের হেকমত ও রহস্য হৃদয়পটে প্রকাশ পেতে থাকবে। এতে এসব বিপদাপদ যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে অনুভব হবে। তখন এসবের কারণে বিরক্ত ও অতিষ্ট হওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকবে না। যার মাধ্যমে অন্তর ব্যথিত ও চিন্তিত হবে। তারপর আল্লাহপ্রেমের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিপদ ও মসিবত এবং আল্লাহর মর্জি অনুভব হবে, তখন এসবকে প্রিয় বন্ধুর দয়া ও করুণা মনে করে, প্রেমপ্রীতিপূর্ণ আত্মা এসব থেকে স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করবে। আর আত্মিক আনন্দ-উল্লাসে বিভোর হয়ে থাকবে। এসব হতে দুঃখানুভব করার অবসরই তখন তার হবে না। তাই নেয়ামত তো তার জন্য নেয়ামতই; বরং মসিবতও তার জন্য নেয়ামতের চেয়ে বেশি সুখকর হয়ে যাবে এবং জীবন থেকে দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানি চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং শান্তি প্রকৃতপক্ষে শান্তির উপকরণের মধ্যে নেই; বরং শান্তি রয়েছে উপকরণ সৃষ্টিকারী আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে।

ہیچ کنجے بے دور بے دام نیست ☆ جز مخلوت گاہ حق آرام نیست

কোনো স্থানই দুঃখ-কষ্ট মুক্ত নেই; আল্লাহপ্রেমের নির্জন আস্তানা ব্যতীত আরাম নেই।

আসল কথা, পথ হলো দু'টি। এক. বিপদে শংকিত হয়ে পার্থিব উপায়-উপকরণ দ্বারা তা প্রতিরোধের চেষ্টা তদবির করা ও মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা। আর দুই. উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ইশক ও মহব্বতের মাধ্যমে বিপদকে তাঁর দয়া ও করুণা মনে করে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে রাজি ও সন্তুষ্ট থাকা এবং আত্মসমর্পণের পথ গ্রহণ করে নেয়া। প্রথম পথ যুক্তি ও বুদ্ধির পূজারীরা গ্রহণ করেছেন কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিপদ থেকে মুক্তি ও অব্যাহতি পাননি। নিজেরাও শান্তি লাভ করতে পারেনি, অপরকেও শান্তি ও সান্ত্বনা দানে ব্যর্থ হয়েছেন। নিজেরা বিপদগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববাসীকেও বিপদগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এ কারণে দুনিয়া থেকে সুখ-শান্তি চিরবিদায় নিয়েছে। সুখ-শান্তির উপকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করেছে স্বয়ং সুখ-শান্তি।

দ্বিতীয় পথ আল্লাহর বিশেষ বান্দা তথা নবী ও ওলীগণ গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর ঘটনাবলীর মাধ্যমে দুঃখ-কষ্টবোধ না করে, বরং এসবকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে বিশ্বাস করে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছেন। দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানি তাদের অন্তরের ধারে কাছেও আসতে পারেনি। নিজেরাও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছেন, দুনিয়াতেও শান্তি ও স্বস্তির প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের এবং তাঁদের অনুসারীদের জীবন থেকে অশান্তি মসিবত চিরতরে দূর হয়েছে এবং তারা আনন্দ ও স্ফূর্তির সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ○ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِى الْـَٔاخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ○

নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী ও প্রিয়জনদের কোন চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নেই, যারা ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করে থাকেন তাদের জন্য ইহজগতেও সুসংবাদ রয়েছে, পরজগতেও। আল্লাহর সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। আনন্দ উৎসবের এ বিধান সব সময় ও অটল থাকবে। [ইউনুস : ৬২-৬৪]

হযরত মুসা (আ.)কে প্লেটো প্রশ্ন করেছিল– আকাশকে যদি কামান ধারণা করা হয় এবং বিপদ ও মসিবতকে ঐ কামান থেকে নিক্ষিপ্ত তীর মনে করা হয় এবং

আল্লাহ তায়ালাকে যদি তীর নিক্ষেপকারী মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ অবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় কি?

বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত উত্তর তো নৈরাশ্যজনক হত, আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। কেননা মানুষ আকাশের পরিধির বাইরে যেতে পারবে না। আল্লাহর বেষ্টনির বাইরেও যেতে পারবে না। কাজেই তাকে মসিবতের তীর ভোগ ও সহ্য করতেই হবে। আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। কিন্তু নবীগণ (আ.) এমন দার্শনিক নন যে জড় পদার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে এবং সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের ইলম ও আমলের পথ সীমিত করে নিবেন। তাঁদের সম্পর্ক রয়েছে বিবেকবুদ্ধির স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যে স্রষ্টার গুণাবলী ও কার্যাবলী সীমাহীন। সম্পর্কও আবার প্রেমপ্রীতি ও আসক্তির যা ছয় দিক ও উর্ধ্বের কথা–

عقل گوید شش جہت راہیست حد ہے بیش نیست

عشق گوید ہست راہے بارہا من رفتہ ام

বিবেকবুদ্ধি বলে ছয়টি দিকের বেশি কোনো পথ নেই, আর ইশক বলে একটি পথ রয়েছে এবং এ পথ দিয়ে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি।

হযরত মুসা (আ.) বললেন, মসিবতের তীর থেকে আত্মরক্ষার অত্যন্ত সহজ উপায় রয়েছে। আর তা হলো, মানুষ তীর নিক্ষেপকারীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে কোন তীর তার গায়ে বিদ্ধ হবে না। আর আল্লাহর পার্শ্ব হলো তাঁর যিকির, তাঁর স্মরণ। এতে আত্মবিলীন করে দিয়ে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিবে, আত্মসমর্পণ করবে। এ ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণ করাই আশেক ব্যক্তির এমন মহান কাজ, যার দ্বারা সব তিক্ত ও কষ্টদায়ক বিষয় তার জন্য মিষ্টি হয়ে যায় এবং তার আওয়াজ হয়ে যায় এমন–

ناخوش تو خوش بود بر جان من ☆ دل فدائے یار دل رنجان من

তুমি আমাকে কষ্ট দাও, তা আমার কাছে খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয়। আমার প্রাণ উৎসর্গ ঐ বন্ধুর চরণে যিনি আমার অন্তরকে ব্যথিত করেন।

এরপর আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির এ অবস্থা হয় এমন–

زندگی کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو ☆ دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

জীবিত রাখ তোমার দয়া, মেরে ফেল তাহলে তোমার উপর

উৎসর্গকৃত। অন্তর তোমার প্রেমে ব্যস্ত, যা কর তোমার ইচ্ছা।

সাফ কথা, আত্মসমর্পণের এ স্বাদ পেয়ে যাওয়ার পর আপদ বিপদ ও মসিবতের কি শক্তি থাকে তারা আশেক ব্যক্তির অন্তরকে অশান্ত পেরেশান করে দিবে? অন্তরে সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পেরেশানি সৃষ্টি করে দিবে? এ অবস্থায় আশেক ব্যক্তির অন্তরের সব দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি, সুখ ও শান্তিতে পরিণত হবে। এই হলো সুখ-শান্তির মূল কথা। এখন যদি তার অন্তরে কোন চিন্তা ও পেরেশানি থাকে তাহলে তা হবে প্রিয়জনের বিচ্ছেদের আশংকায়; নইলে তার জীবনের কোন মুহূর্তে পেরেশানির সংমিশ্রণ থাকবে না। ফলে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে বিবেকবুদ্ধির পূজারীরা কখনো আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। আর আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্তরে কোন প্রকার পেরেশানি বা শঙ্কা স্থান পেতে পারে না। সাবধান!

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

একমাত্র আল্লাহর যিকির ও স্মরণের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। [রা'আদ : ২৯]

বুদ্ধির পূজারীরা তাজভীজ (নিজের ইচ্ছা পোষণ করা)-এর পথ অবলম্বন করেন। তাই সব সময় অকৃতকার্য থাকেন। আর আল্লাহর বান্দারা সব সময় আত্মসমর্পণের পথ অনুসরণ করে চলেন, তাই সব সময় কৃতকার্য হন।

সুতরাং বিশ্ববাসীর চরম ভুল হলো– তারা শান্তির উপকরণকে শান্তি এবং বিপদের উপকরণকে বিপদ মনে করে নিয়েছেন। এজন্য বিশ্বকে সুখ-শান্তির উপায়-উপকরণ দিয়ে ভরে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ তা হলো জীবনে সমূহ অশান্তি ও পেরেশানির প্রধান দরজা, যে দরজা দিয়ে মুহূর্তের জন্যও শান্তি ও সুখ আসতে পারে না। তারা এ পথ ধরে যতই সুখ-শান্তি লাভ ও বিপদ প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, ততই সুখ-শান্তি ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভ থেকে অনেক দূরে চলে যান।

সুখ-শান্তি লাভের মাত্র একটি পথই রয়েছে। সামনে অগ্রসর না হয়ে বরং পেছন পথে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করে নেয়া। আর ঐ চিরসত্য আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে যাঁকে ত্যাগ ও বর্জন করে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। নইলে জীবনকে সুখময় করার অন্য কোন পথ নেই, কখনো ছিল না ভবিষ্যতেও হবে না। তাই বর্তমান অশান্ত-বিশৃঙ্খল বিশ্ব যদি সত্যিই সুখ-শান্তির প্রত্যাশী হয়ে থাকে তাহলে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে

হবে। বোমা, এটম বোমা তৈরি, চাঁদে যাওয়া এবং রকেট নিক্ষেপের মাধ্যমে সুখ-শান্তি অন্বেষণ না করে বরং পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার দিকে তাওয়াজ্জু করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর প্রেরিত অলঙ্ঘনীয় নীতি ও বিধানসমূহ গ্রহণ করতে হবে। এ দরবার হতে কখনো কেউ নিরাশ ও ব্যর্থ হয়নি, হবেও না। আর তাঁর থেকে বিছিন্ন হয়ে কেউ কখনো সফলকাম হয়নি, হবেও না।

ফিরে এসো, ফিরে এসো; যে অবস্থায় থাক ফিরে এসো। তুমি যদি কাফের ও মূর্তিপূজারীও হয়ে থাক, ফিরে এসো।

আমার দরগাহ নৈরাশ্যের দরগাহ নয়। শতবার তওবা ভঙ্গ করে থাকলেও ফিরে এসো।

اللهُمَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٌ وَّاٰلِه وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

বয়ান : ৭

অবয়ব ও চরিত্র

আল্লাহ তায়ালা নিরাকার ও অসীম। আমাদের কল্পনারও অতীত। কোন স্থান বা পাত্রে তাঁর সংকুলান হতে পারে না। অসীম যাত ও সত্তা সীমিত বস্তুর মাঝে আসতে পারে না। তাঁর তাজাল্লী এমন জিনিস যা বড় থেকে বড় জিনিসের তাজাল্লীও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে আসতে পারে। তাজাল্লীর অর্থ হলো ছায়া, প্রতিবিম্ব।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْن.

বাস্তব ঘটনাসমূহ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আজকের সভার প্রধান উদ্দেশ্য জামেয়া আশরাফিয়ার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের দস্তারবন্দী এবং তাদেরকে সনদ প্রদান করা। এ অনুষ্ঠান জামেয়ার গত এক বছরের কর্মকাণ্ডে সহায়তাকারীদের সামনে পেশ করা হবে। এ সভায় এখনই দস্তার বন্দী ও গত শিক্ষা বছরের ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং সভার কার্যবিবরণী শিগগিরই আপনাদের সামনে এসে যাবে। এর আগে আমি কয়েকটি কথা খুব সংক্ষেপে আরজ করতে চাই।

কম সময়ে কথাটি আরজ করার কারণ, প্রথমত আমি কিছুটা অসুস্থ ও দুর্বল। দীর্ঘ বয়ান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া উলামায়ে কেরামের এত বিরাট সমাবেশে আমার মতো তালিবে ইলমের কথা বলার সাহস হয় না।

হযরত মাওলানা থানভী (রহ.) একজন কামেল আলেম ও আরিফ বিল্লাহ। তিনি হযরত শাহ সাহেবের ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব অনুভব করেন। অথচ শাহ সাহেব হলেন তাঁর সহপাঠী। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ইলম দান করেন। হযরত থানভী (রহ.) শাহ সাহেবের ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অনুভব করতেন। আর যে মাহফিলে এত উলামায়ে কেরাম উপবিষ্ট সে মাহফিলে আপনারা বুঝতেই পারেন আমার অন্তরে কি পরিমাণ চাপ ও প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে।

এর প্রভাবের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, যোগ্যতার অভাবে কোন বিষয়বস্তু মাথায় না আসা। যেটুকু বা আছে তাও হারিয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু আপনারা এখানে আমাকে বসিয়েছেন, তাই এর স্বাভাবিক চাহিদা হলো কিছু না কিছু আরজ আমাকে করতেই হবে। তাই আরজ করছি, আমার বয়ান সংক্ষিপ্ত হবে। অসুস্থতা, দুর্বলতা এবং কিছুটা উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি এ কয়েকটি কারণে আমি হয়তো সবিস্তার আলোচনা করতে পারবো না। তাছাড়া সভার প্রধান কাজ হলো দস্তারবন্দী। এ কাজের জন্যও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে।

গোপন হাকিকতের জন্য শারীরিক কাঠামো প্রয়োজন

একটি বিষয় আপনাদের জানাতে চাই, পৃথিবীর অবস্থান ও বস্তুরাজির উপর আমরা যদি চিন্তা করি, তবে অনুভূত হবে যে, প্রতিটি বস্তুর একটি অংশ বাহ্যিক বা প্রকাশ্য, যাকে আমরা দেহ বলতে পারি। অপর অংশ গোপন বা দৃষ্টির আড়ালে থাকে যাকে আমরা রূহ বা প্রাণ বলতে পারি। সারকথা, প্রতিটি বস্তুই রূহ এবং দেহ দ্বারা গঠিত। এ বিশ্বের কোনো বস্তুই যেমন শুধু দেহ দ্বারা টিকতে পারে না, তেমনি কোন বস্তু শুধু রূহ নিয়েও থাকতে পারে না। বস্তু যদি শুধু শারীরিক হয় তাহলে এর পরিণতি হবে শুধু স্ফীত হওয়া এবং তৎক্ষণাৎ ফেটে গিয়ে মাটি হয়ে যাওয়া। আত্মা ছাড়া শরীর টিকে থাকতে পারে না। আর দেহ ছাড়া রূহ প্রকাশ লাভ করতে পারে না। তার রূহ গোপন ও চোখের আড়ালে থাকে। এজন্য দুনিয়াতে যখনই কোন জিনিস আসবে, সে তার কোনো না কোনো আকার নিয়ে আসবে।

এভাবেও বলা যায়, যখনই কোনো হাকিকত প্রকাশ পাবে, কোনো না কোনো আকার আকৃতি বা কাঠামো ধারণ করবে এবং ঐ কাঠামোটি অবশ্য তার অবস্থার

উপযোগী হবে, যা আল্লাহ তায়ালা তার জন্য মনোনীত করেছেন। যেমন গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ একটি অদৃশ্য হাকিকত। যখন তা প্রকাশ পাবে, তখন এমন হবে না যে, বাবলা গাছে তা প্রকাশিত হবে। বরং তার উপযোগী আকার আকৃতি ধারণ করবে। তরমুজের একটা বিশেষ স্বাদ রয়েছে। যখনই আপনি তরমুজ তালাশ করবেন তখন তার বিশেষ আকৃতি তালাশ করবেন। এমন হবে না যে আমের মধ্যে তরমুজ তালাশ করবেন। কারণ, এ স্বাদ আল্লাহ তায়ালা তার উপযোগী আকৃতিতে দান করেছেন। তাই অন্য আকৃতিতে সে প্রকাশ পেতে পারে না।

প্রকৃতির উপযোগী অবয়ব

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হাকীকতে জামেয়া বা সকল তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সব ধরনের যাহেরি ও বাতেনি কামালাত ও গুণাবলী সন্নিবেশ করেছেন। তার উপযোগী আকার-আকৃতি মানবজাতির রয়েছে। এই হাকিকত মানব ছাড়া অন্য জীবজন্তুর আকৃতিতে প্রকাশ পেতে পারে না। ঐ মানব আকৃতিতেই এর প্রকাশ হবে। অতএব প্রত্যেকটি হাকিকত স্বাভাবিকভাবে চায় আমার জন্য উপযোগী আকার আকৃতি হোক এবং প্রতিটি আকার আকৃতি চায় আমার উপযোগী হাকিকত আমার মধ্যে দেয়া হোক। আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনুচিত, অনুপযোগী ও বেমানান কিছুই নেই। হাকিকত হবে এক প্রকার আর তার দেহ হবে তার অনুপযোগী অন্য ধরনের তা হয় না। তিনি প্রত্যেককে হাকীকতের উপযোগী আকার আকৃতি এবং আকৃতির উপযোগী হাকিকত দান করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اِلْتَمِسُوْا اَلْخَيْرَ فِىْ حِسَانِ الْوُجُوْهِ

সুন্দর লাবণ্যময় চেহারা কল্যাণ তালাশ করো।

চেহারা যদি ভাল ও সুন্দর হয় তাহলে ভেতরেও খায়র ও কল্যাণই হবে। চেহারা যদি মন্দ ও কুৎসিত হয় তাহলে সে-ও ভাল হবে না। এটা সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। তিনি কারো অধীন নন; ইচ্ছা করলে উন্নততম দেহাকৃতিতে মন্দ ও নিকৃষ্টতম হাকিকত ঢেলে দিতে পারেন এবং খুবই মন্দ ও কুৎসিত দেহাকৃতিতে উন্নততম হাকিকত ঢেলে দিতে পারেন। আসলে সবই তাঁর ক্ষমতাধীন কিন্তু তার নিয়ম ও নীতি হলো– যেমন দেহাকৃতি হবে তেমনি হাকিকতও এতে প্রকাশ পাবে।

সুন্দর শরীরে কদাকার ও মন্দ হাকিকত

সম্ভবত ইমাম শাফী (রহ.)-এর যুগের ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– একটি সাধারণ সড়কের উপর একজন মহিলা পড়ে থাকত। অসুন্দর ও কুৎসিত হওয়ার মত উপকরণ সবই তার মধ্যে ছিল। রঙ কালো এবং ঠোঁটজোড়া মোটা। দাঁত কালো, নাক চ্যাপ্টা, চোখ পিঙ্গ। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে অবিরাম, চোখের উপর ময়লা জমাট বাঁধা। এক কথায়, তাকে দেখে ঘৃণা হয়। সড়কের পাশে সব সময় পড়ে থাকে। মানুষ তাকে ভিক্ষা দিত কিন্তু চোখ তুলে কেউ তাকে দেখত না। সবাই ঘৃণা করত।

এবার মানুষ বিস্মিত হলেন। এই জঘন্য কুৎসিত ও পঁচা নারীর দিকে কার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো! প্রশাসনেও এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। কুশ্রী নারীর প্রতি কে আকৃষ্ট হলো, এই রহস্য উদঘাটন করা হোক। দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা হোক। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে আনলো। সে খুবই সুশ্রী সুন্দর রূপবান ও আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। অবাক সকলে! এমন পাক পবিত্র চেহারার মানুষের দ্বারা এমন জঘন্য অপরাধ কীভাবে সংঘটিত হলো? ফেরেশতার মতো সুশ্রী ব্যক্তি নোংরা কুশ্রী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলো কেমন করে? পুলিশকে জিজ্ঞেস করা হলো– তোমরা কিভাবে নিশ্চিত হলে যে এই লোকটিই এ কাজ করেছে?

পুলিশ বললো– লোকটি দলিল লেখক। লোকের দলিল লিখে দেয়। বিনিময়ে কিছু পয়সা পায়। ফুটপাতের পাশ দিয়ে ড্রেন রয়েছে। ড্রেনের কাছেই লোকটির বসার জায়গা। একবার তার দোয়াত শুকিয়ে গেল। তখন ঐ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় ড্রেনে হাত দিয়ে প্রবহমান ময়লা দুর্গন্ধময় অপবিত্র পানি এনে দোয়াতে ঢেলে দিল। এটা দেখে আমরা গিয়ে তাকে পাকড়াও করলাম। এই কুৎসিত নারীর সঙ্গে এমন জঘন্য কাজ এ লোকই করতে পারে। এর স্বভাব প্রকৃতিতে দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা রয়েছে। গ্রেফতারের পর তদন্তের মাধ্যমে ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এ ব্যক্তিই অপকর্ম করেছে। আকার আকৃতি এত সুন্দর সুশ্রী, তাকে দেখে সূর্য লজ্জায় আত্মগোপন করে; অথচ তার দ্বারা এমন জঘন্য অপকর্ম সংঘটিত হলো! সে এত কুৎসিত দুর্গন্ধময় নারীর দিকে কি করে আকৃষ্ট হল?

আমি বলছিলাম, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। উন্নত ও উত্তম আকৃতিতে নিকৃষ্ট হাকিকত ঢেলে দিতে পারেন, আবার নিকৃষ্টতম আকৃতিতে সবচেয়ে উত্তম হাকিকত ঢেলে দিতে পারেন।

কদাকার শরীরে পবিত্র আত্মা

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ

আমি আমার যুগে আতা ইবনে আবি রাবাহ'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেম পাইনি। ইলম, যুহদ, ধর্মপরায়ণতা এবং যাহেরি ও বাতেনি কামালাত ও গুণাবলী হিসাবে আমি অন্য কোন ব্যক্তি পাইনি। আপনারা অনুমান করুন! ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে ব্যক্তির ইলম ও কামালের প্রশংসা করছেন, তার ইলম ও কামাল কোন স্তরের হবে! এমন ছিলো তার ইলম কামালের অবস্থা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর প্রশংসাকারী। কিন্তু আকৃতি ছিল অত্যন্ত বিশ্রী, কুৎসিত এবং ঘোর কালো। তাকে দেখে মানুষ পালিয়ে যায়। কিন্তু এ কালো আকৃতিতে এত পাক পবিত্র হাকিকত ঢেলে দেয়া হয়েছিল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন।

অবয়ব হাকিকতের ভাষ্যকার

এটা আল্লাহ তায়ালার কুদরত। ভাল আকৃতিতে মন্দ হাকিকত আর কুশ্রী ও মন্দ আকৃতিতে উত্তম হাকিকত তিনি ঢেলে দেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম হলো, ভাল আকার আকৃতিতে ভাল ও উত্তম হাকিকত থাকবে এবং দেহাকৃতি মন্দ হলে হাকিকতও সে অনুযায়ী মন্দ হবে। এজন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اِلْتَمِسُوْا الْخَيْرَ فِيْ حِسَانِ الْوُجُوْهِ

> সুন্দর সুশ্রী চেহারায় ভাল হাকিকত তালাশ কর, খায়র ও কল্যাণ সন্ধান কর।

বোঝা গেল, আকৃতির ক্ষেত্রে ব্যত্যয় অনেক সময় হয়ে থাকে। সাধারণভাবে হয় না, কোন না কোন অংশ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম– যেমন দেহাকৃতি তেমন হাকিকত আবার তেমনি আত্মা। সারকথা, প্রত্যেক দেহাকৃতির উপযোগী আত্মা ও প্রত্যেক আত্মার উপযোগী দেহাকৃতি দান করা হয়।

আকার আকৃতির কাজ হলো পরিচয় করিয়ে দেয়া। অর্থাৎ হাকিকত গোপন থাকলে তো পরিচয় করাতে পারবে না, যতক্ষণ না কোন আকৃতি সামনে

থাকবে। কারণ, দেহের আকার হলো হাকিকতের ভাষ্যকার। আকার দেখেই মানুষ বলতে পারে এ হলো অমুক জিনিস। গোলাপের পাতা দেখে তুমি তার পরিচয় পাবে। এতে গোলাপের ঘ্রাণ রয়েছে। আমের আকার দেখে আপনি চিনতে পারবেন। এটা অমুক স্বাদের ফল। এতে আপনি তরমুজের স্বাদ অনুভব করবেন না। অতএব এই জগতে আকার ছাড়া কোন হাকিকত নেই। আবার প্রতিটি হাকিকতের জন্য একটি আকৃতি তিনি দান করেছেন। যদি এমন কোন জগত থাকে যে আপনি আকার ছাড়া হাকিকতের পরিচয় করতে পারেন, তাহলে আকার-আকৃতির কোন প্রয়োজন থাকবে না। এটা শুধু পরিচয় লাভের জন্য রাখা হয়েছে।

বাইতুল্লাহিল করিমের হাকিকত

আপনারা হজ করতে যান। এখান থেকে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সেজদা করেন। এই বাইতুল্লাহ মাবুদ বা উপাস্য না। চারটি প্রাচীর বিশিষ্ট কালো গিলাফে আবৃত একটি দালান দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সেজদা তার জন্য নয়। এটা আমাদের উপাস্য নয়। বরং কাবা হল ঐ মোবারক স্থানটি। সে স্থানের উপর এই দালানটি দাঁড়িয়ে আছে। আর ঐ স্থানটিও প্রকৃতপক্ষে কাবা নয়। ঐ স্থানে আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লী হয়। ঐ তাজাল্লীকে আমরা সেজদা করি। উপাস্য হলো ঐ তাজাল্লী। ঐ তাজাল্লীর জন্য স্থানের প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ভূখণ্ডকে নির্ধারণ করেছেন। ঐ স্থানকে পরিচিত করার দরকার ছিল। তাই তার চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত কাবঘর হলো কেবল প্রতীক। মূল হচ্ছে ঐ তাজাল্লী। যাকে আমরা সেজদা করি। প্রকৃতপক্ষে উপাস্য হচ্ছে ঐ তাজাল্লী।

আল্লাহ তায়ালা নিরাকার ও অসীম। আমাদের কল্পনারও অতীত। কোন স্থান বা পাত্রে তাঁর সংকুলান হতে পারে না। অসীম যাত ও সত্তা সীমিত বস্তুর মাঝে আসতে পারে না। তাঁর তাজাল্লী এমন জিনিস যা বড় থেকে বড় জিনিসের তাজাল্লীও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে আসতে পারে। তাজাল্লীর অর্থ হলো ছায়া, প্রতিবিম্ব। যেমন সূর্য বিরাট কোন বস্তু। বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লাখ গুণ বড়। জমিনের একটি ক্ষুদ্র অংশ যাকে আয়না বলা হয়। এর মধ্যে সূর্যের সম্পূর্ণ ফটো এসে যায়। এ হলো সূর্যের প্রতিচ্ছবি, প্রকৃত সূর্য নয়। প্রকৃত সূর্য আয়নাতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখে আপনি বলেন, আমি আয়নার মধ্যে সূর্যকে দেখেছি। এর মধ্যে সূর্যের পূর্ণ আকার আকৃতি ও গঠনপ্রণালী বিদ্যমান রয়েছে। আয়নার সূর্য ঐ কাজ করে যা

প্রকৃত সূর্য করে থাকে। সূর্য তাপ ও আলো বিতরণ করে। ঐ আয়নাও আলো বিতরণ করে। আয়নার সামনে একাধিক আয়না রেখে দিন। সব আয়নায় একটি করে সূর্য দেখা যাবে। সুতরাং সূর্যের যে কাজ আলো ও তাপ পৌঁছানো ঐ কাজ প্রতিবিম্ব সূর্যও করবে। তাই প্রতিবিম্ব দেখেও আমরা বলি সূর্য দেখেছি। আপনি যদি কারো ছবি তুলেন– যদিও তা নাজায়েয, তাহলে ছবি দেখেই আপনি বলতে পারেন– এ হলো অমুক সাহেব। এর দ্বারা বোঝা গেলো, মূল বস্তু ও ছবি একই, পরস্পর বিরোধী নয়। সাদৃশ্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। যদি ভিন্ন হতো তাহলে প্রতিচ্ছবি দেখে মূল ব্যক্তিকে আপনি কখনো চিনতে পারতেন না। প্রতিচ্ছবি দেখা ও মূল বস্তুকে দেখা একই কথা।

আল্লাহ তায়ালা অসীম। অন্য কোন জিনিসের ঊর্ধ্বে। কিন্তু মাখলুককে পরিচয় দেয়ার জন্য নিজের প্রতিবিম্ব ঢেলে দিয়েছেন। আর বড়'র চেয়ে বড় জিনিসের প্রতিচ্ছবি ক্ষুদ্র জিনিসেও আসতে পারে। তাই প্রকৃত উপাস্য ঐ তাজাল্লী এবং খোদার প্রতিচ্ছাবি যা বাইতুল্লাহর মধ্যে অবতরণ করা হয়েছে। বাইতুল্লাহর দালানটি কেবল একটি চিহ্ন। যদি এ ঘর নাও থাকে তবু ঐ দিকে সেজদা করতে হবে। কারণ, যাঁকে সেজদা করা হয় তিনি বিদ্যমান আছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর খেলাফতের সময় যখন তিনি কাবাঘর নতুন করে নির্মাণ করলেন তখন পুরনো ঘরটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু নামায ও তাওয়াফ হতে থাকে। অথচ ঘরটি ছিল না। কাবা হলো ঐ তাজাল্লীর নাম যার চিহ্ন হলো ঘরটি।

কাবার কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা

তবে এ কথাটিও বলা প্রয়োজন, পরিচয় দানকারী চিহ্ন হওয়ার কারণে কাবাঘর কোন মর্যাদাপূর্ণ জিনিস নয়। বরং এই ঘরের প্রতি শ্রদ্ধা এ কারণেই আমাদের উপর ওয়াজিব যে, মূল তাজাল্লী আমাদের চোখের সামনে রয়েছে; আর এ তাজাল্লীর সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ঘরটি তাজাল্লীর সঙ্গে মিলিত। এ সম্পর্কের একটি মূল্য আছে। আর এ কারণেই কাবার প্রতিটি ইট সম্মানিত হয়ে গেছে। তাই এসবের প্রতি শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব।

কেবল বাইতুল্লাহ নয়, আপনি যদি বাইতুল্লাহকে গিলাফ দিয়ে ঢেকে দেন, তাহলে ঐ গিলাফ তৈরি করলেন আপনি; অথচ বাইতুল্লাহর উপর ছড়িয়ে দেয়ার কারণে বাইতুল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলো। এ সম্পর্কের কারণে গিলাফ প্রস্তুতকারককেও এর সামনে মাথানত করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে।

তাজাল্লীর কারণে ঐ ভূখণ্ডের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ ভূখণ্ডের কারণে বাইতুল্লাহর দেয়ালগুলোর সম্মান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এসব কারণে মসজিদে হারামের সম্মান কায়েম হয়েছে। মসজিদে হারামের কারণে সম্পূর্ণ মক্কার হিজায প্রদেশটি সম্মানিত হয়েছে। স্তরে স্তরে সবাই পবিত্রতার সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে। প্রকৃত সম্মান হল ঐ তাজাল্লীর। তারপর ধারাবাহিক সম্পর্ক অনুযায়ী সব জিনিস পবিত্রতা লাভ করেছে, সম্মানের পাত্র হয়েছে। এমনকি কেউ যদি হজ সমাপন করে আসে, আপনি তার হাতে চুমু খান। তার মধ্যে কি নতুনত্ব এসেছে?

ইবাদত! তা তিনি এখানেও করতেন। নামায আদায় করতেন। শুধু এ কারণে যে, বাইতুল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে। এখন তার চোখ বাইতুল্লাহর দীপ্তি দেখেছে। ঐ সম্পর্কের কারণে হাজী সাহেব সম্মানের পাত্র হয়েছেন। বিশ্বের সকল সম্মান ও শ্রদ্ধা এই সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে। নিসবত ও সম্পর্ক কায়েম হয় তখনই যখন সুরত ও হাকিকতের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। হাকিকত পাওয়া যায় বলে সুরত শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য হয়।

পবিত্র কুরআন যদি আল্লাহ কারো অন্তরে দান করেন এবং সে তা হেফজ করে নেয়, তাহলে ঐ হাফেজকেও আপনারা সম্মান করেন। হাফেজ তো রক্ত মাংসে গড়া। আপনিও রক্ত মাংসে গঠিত। তার মূল গঠনে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু তার মধ্যে নিজ কালাম ঢেলে দিয়েছেন, কালামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার শরীরও সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে। তাই আপনারা হাফেজের হাতে চুমু খান।

হাকিকত প্রকাশের লক্ষণ

প্রকৃতপক্ষে সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য ঐ হাকিকতই থয়ে থাকে, যা চামরার চোখে দেখা যায় না। তবে ঐ হাকিকতের পরিচয় দান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা একটা আকৃতি তৈরি করে দেন, যা পরিচয় লাভের মাধ্যম হয় এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এটা আল্লাহর নিয়ম ও বিধান। যখন কোন হাকিকত প্রকাশ লাভের উপযুক্ত হয়, তখন তাকে তিনি আকার আকৃতি দান করেন। একটি ছেলে যখন বালেগ হতে থাকে তখন সে এ কথা ঘোষণা করে বেড়ায় না যে, আমি বালেগ হয়ে গেছি। আমাকে বালেগ মনে করে ঐ সকল বিধিবিধান আমার প্রতি আরোপ কর। বরং তার আকার আকৃতি এমন হয়ে যায় যে, দেখামাত্র পরিচয় পাওয়া যায় সে বালেগ হয়েছে। মুখমণ্ডল প্রশস্ত হয়ে যায়, শরীরে নতুন শক্তি নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। সবাই বুঝতে পারেন, এখন সে বিয়ের যোগ্য

হয়েছে। এখন তার জন্য পাত্রী তালাশ করা দরকার। সে আর এখন ছেলে নয়, এখন তার যৌবনকাল শুরু হয়েছে। রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এ রূপ লাবণ্যের কারণে সবাই বুঝতে পারেন তার মধ্যে যৌবনের হাকিকত এসেছে। এখন সে বালেগের হয়ে গেছে। এখন সে ঐ স্তরে পৌঁছে গেছে, যদি তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার বংশ বৃদ্ধি শুরু হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে একজন তালেবে ইলম, যে আপনাদের এখানে আট দশ বছর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে এতদিন নাবালক ছিল। সে মিজান পড়েছে, বালেগ হয়নি। শরহে বেকায়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখনও বালেগ হয়নি। শেষ পর্যন্ত যখন 'বুখারী শরীফ' পড়ে ফেলে, তখন বলা হবে এ ছাত্র বালেগ হয়েছে। এখন কোন কিতাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে দাও, তার ইলমী বংশ বিস্তার লাভ করতে থাকবে। তার শাগরিদ জন্ম নিবে। আধ্যাত্মিক বংশ বিস্তার হবে। যেহেতু সে বালেগ হয়ে গেছে। এর জন্য আল্লাহ তায়ালা অনেক লক্ষণ রেখেছেন। তেমনি আধ্যাত্মিকভাবে একজন ছাত্র যখন বালেগ হয়ে যায়, পূর্ণতা লাভ করে, তার জন্য বুযুর্গানে দীন কিছু লক্ষণ ঠিক করে রেখেছেন, যার মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন একটি চিহ্ন হলো মাথায় পাগড়ি বাঁধা। এটা হলো ঘোষণা এবং ঐ কথার চিহ্ন যে, এ ছাত্রটি এখন ইলমীভাবে বালেগ হয়েছে। আমরা তার সাক্ষ্য প্রদান করছি। এখন তারই ইলমী ও আধ্যাত্মিক সন্তান হতে পারে। তাই বিয়ের জন্যও আপনারা সাক্ষী নির্ধারণ করেন যে বিয়ে হয়েছে। তার সন্তানগুলো বৈধ হবে। এভাবে এ ছাত্রদের জন্য উস্তাদগণ সাক্ষী হচ্ছেন যে তারা বালেগ। এখন সে যাকে শিক্ষা দিবে, সে তার থেকে ইলম হাদীস শিক্ষা করতে পারবে। ভাল পথে পরিচালিত হবে। সুতরাং পাগড়ি বেঁধে দেয়া অথবা সনদ প্রদান করা সবই আলামত বা চিহ্ন মাত্র।

হাকিকত লাভের মাধ্যমগুলোর সম্মান

তবে যেসব ছাত্রের দস্তারবন্দী হবে তাদের কামেল হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়ছি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। যদি তারা কামেল হতে চায়, পূর্ণতা অর্জন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে হতে পারবে। এখন তারা উস্তাদ ও কিতাবের মুখাপেক্ষী নয়। এ পরিমাণ শক্তি তাদের মধ্যে এসে গেছে। যদি মতালেয়ার পাঠ ও গবেষণা শুরু করে জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করতে চায় তাহলে পারবে। তাদের ইলম ও জ্ঞান সামনে অগ্রসর হবে। দস্তারবন্দী ছাত্ররা এ ধারণা যেন না করে, 'আমরা কামেল হয়ে গেছি'; বরং যাতে এ ধারণা করে, উস্তাদগণের বরকতে

এই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যদি আমরা পূর্ণতার পথ অতিক্রম করতে চাই তাহলে তা করতে পারব।

এর অর্থও এটা নয় যে, আমরা আসাতেযা থেকে সম্পূর্ণ বেনিয়াজ অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছি। বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উস্তাদগণের মুখাপেক্ষী থাকবে। কেননা আমাদের ইলম যতই বৃদ্ধি পাবে, উস্তাদগণের ইলমও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই তারা আরো অনেক অগ্রসর হয়ে যাবেন।

এখানে আমার ভাই ইদ্রিসের ঘটনা স্মরণ হলো। মাওলানা কান্দলভী (রহ.) বাস্তবিক একজন আদর্শ আলেম ছিলেন। তাকওয়া, তাহারত, জ্ঞানের গভীরতা, তাফাক্কুহ– মোটকথা একজন আলেমের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা প্রয়োজন, সবই আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছিলেন। তিনি তকদির সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখলেন এবং কবিতাও লিখলেন। মনে হয় ছাপাও হয়েছে। এর উত্তরে আমি একটি ভূমিকাও লিখেছিলাম। মাওলানা তকদিরের ব্যাখ্যা করেছেন। শুরুতে ভূমিকা হিসেবে আমিও কিছু লিখেছি। এ কিতাবখানা নিয়ে তিনি থানাভবন পৌঁছলেন। তার মনে ধারণা ছিল, আমি এমন সব অকাট্য কথাবার্তা লিখেছি, এগুলোতে মতামত দেয়ার বা কিয়াস করার কোন সুযোগ নেই। স্পষ্ট কথা শরীয়তের পরিষ্কার প্রমাণাদি পেশ করছি।

এসবের উপর কে মতামত বা সন্দেহ প্রকাশ করবে? হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে গিয়ে আরজ করলেন, হযরত! আমি এ পুস্তিকাটি লিখেছি। আপনি তা এক নজর দেখে দিন এবং আপনার মতামত সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখে দিন, যাতে এটি নির্ভরযোগ্য হয়।

হযরত বললেন, দুপুরবেলা কিছুটা বিশ্রাম করা আমার অভ্যাস। যাক, আমি তখন শুয়ে শুয়ে দেখে নিব, যদি মনে কোন কথা আসে তাহলে লিখে দিব।

তিনি পুস্তিকাটি হযরতের কাছে রেখে চলে আসলেন। হযরত দুপুরে সম্পূর্ণ পুস্তিকাটি পাঠ করলেন। যোহরের নামাযের পর সবাই একত্রিত হলেন। হযরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেবও আসলেন। হযরত থানবী (রহ.) বললেন– মৌলভী ইদ্রিস! এ রেসালা তুমি লিখেছ?

তিনি বললেন– জি হ্যাঁ।

হযরত বললেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই ভুল। আরও বললেন, উপকরণ সবই ঠিক যেহেতু কুরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াত ও হাদীস থেকে যেসব সূক্ষ্ম কথা বের করা হয়েছে এবং যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তারপর আপত্তি ও সমালোচনা শুরু

করলেন। বাস্তবিক এমন সব দুর্বোধ্য আপত্তি ও এতরোজ ছিল সেগুলোর কোন উত্তর ছিল না।

আমার ভাই ইদ্রিসের সেদিকে খেয়াল যায়নি। এবার হযরত একটি কথা বললেন, ভাই! তোমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তোমার দৃষ্টি অনেক তীক্ষ্ণ, তুমি অনেক বিচক্ষণ। আমাদের এসব নেই। কিন্তু আমরা যারা বৃদ্ধ তাদের থেকে বেনিয়ায হতে পারবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে। দশ বছর কিতাব পাঠ করে যে স্থানে পৌঁছবে, বুড়োদের কাছে এসে এক মিনিটে ঐ জিনিস পেয়ে যাবে। তোমরা বৃদ্ধদের থেকে বেনিয়ায হতে পারবে না।

সার কথা, যাদের দস্তারবন্দী হবে তারা যেন মনে না করেন, আমরা কামেল হয়ে গেছি। এখন কারো সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখনও তারা উস্তাদদের মুখাপেক্ষী। কারণ তারা যদি ইলমে উন্নতি করতে থাকেন তাহলে উস্তাদগণ তাদের থেকে দশ বছর বড় হওয়ায় তারাও উন্নতি করতে থাকবেন। আপনারা এখানে পৌঁছবেন। তারা আরো দশ গজ সামনে থাকবেন।

তাছাড়া ইলমের কোন সরহদ নেই। যে স্তরেই মানুষ পৌঁছে যাক, তারপরও ইলমের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী থাকবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন–

كُلَّمَا اَدَّ بَنِیْ دَهْرِ اَرَانِیْ نَقْصُ عَقْلِیْ ○ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمًا
ازْدَدْتُ عِلْمًا بِجَهْلِیْ

জামানা ও কাল আমাকে যতই ইলম শিখিয়েছে ততই আমার অনুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমার জাহালাত ও মূর্খতা আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যে স্তরে আমি পৌঁছেছি, সে স্তরের ইলম তো হাসিল হয়েছে; তবে সামনে হাজারো স্তর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এতে আমি বুঝতে পারি এখনও সেসব স্তরের ইলম হতে আমি মূর্খ ও অজ্ঞ। এ স্তর হতে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী স্তরে পৌঁছে যেতাম। তখন এর সামনে সীমাহীন স্তর থেকে যেতো, যেগুলো সম্পর্কে আমার ইলম নেই। তখন নিজের অজ্ঞতা আরো স্পষ্ট হত– এখন পর্যন্ত কেবল মূর্খই রয়ে গেলাম। এজন্য যে, ইলম আল্লাহ তায়ালার সিফত বা গুণ বিশেষ। তাঁর সকল সিফতই অসীম। মানুষ যতই উন্নতি করুক, সামনে অগ্রসর হোক, অজ্ঞ ও মূর্খতা তখনও থেকে যাবে। আল্লাহর আখলাক রব্বানী স্বভাব সীমাহীন। মানুষ যতই চরিত্রবান হয়ে যাক, খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হয়ে যাক সে কিন্তু নিচেই থেকে যাবে। যেহেতু আল্লাহর আখলাকের স্তর সীমাহীন।

কুরআনী হাকিকতের পরকালীন অবয়ব

সুফিয়ায়ে কেরাম (রহ.)-এর কাছে সুফী উপাধির অর্থ হচ্ছে অসম্পূর্ণতা। আসলে তা বাস্তবভিত্তিক। শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যাকে আমরা সফলকাম মনে করি, তারা তাকে নামুরাদ অর্থাৎ অকৃতকার্য মনে করেন। কারণ হলো, এই তরীকতপন্থী ব্যক্তি কখনো সম্পূর্ণ হতে পারেন না। আল্লাহ তায়ালার কামালাত ও গুণাবলী সীমাহীন। সুফী যে স্তরেই পৌছান না কেন তা হবে অসম্পূর্ণ। বুঝতে পারবে এখনও অনেক কিছু সামনে রয়ে গেছে। সে কখনো তার উদ্দেশ্যের শেষ প্রান্তে পৌছবে না, পৌছতে পারবে না। যেখানেই থাকবে অসমাপ্ত থাকবে। এজন্য তারা নামুরাদ বা 'অকৃতকার্য' উপাধি গ্রহণ করেছেন।

اے برادر بے نہایت درگے ست ☆ ہر چہ بروے تیری بروائے ماشیت

সীমাহীন দরগাহ বা স্তর রয়েছে। চরতে থাক। উন্নতি লাভ কর, কোন সীমা সরহদ নেই। এমনকি তুমি জান্নাতে পৌছে যাবে। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পৌছবে। সেখানেও তুমি উন্নতি লাভ করতে থাকবে, সামনে অগ্রসর হবে। কোন সীমায় গিয়ে থেমে যাবে না। এ জন্য সে জান্নাত আল্লাহ তায়ালার যাহেরি ও বাতেনি কামালাত ও গুণাবলীর প্রকাশস্থল। যেমন বাহ্যিক নেয়ামত জান্নাতে থাকবে সীমাহীন অসংখ্য অগণিত। বাতেনি নেয়ামতেরও কোন সীমা থাকবে না। মানুষের ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, কুরআনের হাফেজদেরকে বলা হবে। ورتل وارتق তেলাওয়াত করতে থাক এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি হাসিল করতে থাক। উপরে উঠতে থাক অর্থাৎ যে পরিমাণ আয়াত রয়েছে, যে পরিমাণ মাকাম ও মর্যাদা রয়েছে। এসব মাকামের সীমাহীন কাইফিয়াত ও অবস্থা রয়েছে। যে মাকামে পৌছবে সেখানেই সীমাহীন নেয়ামত ও কাইফিয়াত অনুভূত হবে। আর জানতে পারবে এখন পর্যন্ত কিছুই পাইনি। সামনে অগ্রসর হও। কখনো শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। হাফেজকে বলা হবে শক্তি ও সামর্থানুযায়ী তেলাওয়াত কর এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি হাসিল কর।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায়, পবিত্র কুরআনের যে পরিমাণ আয়াত রয়েছে সে পরিমাণ জান্নাতের দরজা রয়েছে। যেমন একটি আয়াতের লাখো ইলম রয়েছে। এই সমুদ্রে যতই ডুব দিবে, তলদেশ পাওয়া যাবে না। ইলমের ইলম বের হতে থাকবে। যতই গভীরে প্রবেশ করবেন, ইলমের নিচে ইলম প্রকাশ পাবে। এ কালাম আল্লাহ তায়ালার কালাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেযা। এভাবে যখন এক আয়াতের হাকিকত বিভিন্ন আকার আকৃতি ও কাইফিয়তসহ আত্মপ্রকাশ করবে, তখন এগুলোও উপর নিচে

সাজানো থাকবে। এগুলোর কোন সীমা সরহদ থাকবে না। একটি আয়াতের ইলম ও কাইফিয়াত হাসিল করতে হাজার বছর পেরিয়ে যাবে। এ থেকে স্বাদ গ্রহণ করে অবসর হতে পারবে না। সারকথা, সীমাহীন দরজাত ও মর্যাদা রয়েছে।

এজন্য বলছিলাম, জান্নাতে গিয়েও মাকামের শেষ প্রান্তে পৌঁছবে না। প্রতিদিন উন্নতি হতে থাকবে। আর ঐ সকল আয়াতের যা আপনি পাঠ করেছেন, এর মধ্যে এ সকল হাকিকত রয়েছে। আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে বাগবাগিচা ও ফল ফুলের রূপ নিয়ে। নেয়ামতের রূপ ধারণ করে আপনার সামনে আসতে থাকবে। وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا দুনিয়াতে যেসব আমল করেছিল, অবিকল এসব আমল নেয়ামতের বিভিন্ন রূপ ধারণ করবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَلسَّخَاوَةُ شَجَرَةٌ فِىْ الْجَنَّةِ

দানশীলতা জান্নাতে একটি গাছের আকারে প্রকাশ পাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপনি ভিখারির হাতে কিছু দিলেন, দান করলেন, এর আকার গাছের মতো হবে। এজন্য যে, ফল হয় আমল অনুযায়ী। মূলত আপনি ভিখারির মাথায় ছায়া দিয়েছেন। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করেছেন। তার দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানি লাঘব করেছেন, তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভিখারিকে আপনার আশ্রয় ও ছায়াতলে স্থান দিয়েছেন। সে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছে। এ আমল জান্নাতে গিয়ে একটি গাছের আকার ধারণ করেছে। আপনি গাছের ছায়ায় এসে গেলেন। যেভাবে আপনি ভিখারিকে ছায়া দিয়েছিলেন। তাকে আপনি ফল খাইয়েছিলেন, সে বেঁচে ছিল। ঐ গাছ আপনাকে ফল দান করবে। আপনার জীবন উন্নত হবে। এজন্য আপনার আমল গাছের আকারে প্রকাশ পাবে। গাছ যেমন ছায়া ফল ও আনন্দ দান করে, দানশীল ব্যক্তিও তেমনি প্রতিদান লাভ করবে।

ইলমী কালাম ও পূর্ণতার লক্ষণ

সব কথার সার হলো, যেভাবে যৌবনের কিছু আলামত প্রকাশ পায়, তেমনি মানুষের রূহানী ও আধ্যাত্মিক মাকামাত পূর্ণতা প্রাপ্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় কিছু চিহ্ন দ্বারা। যখন ইলমের দিক দিয়ে বালেগ হয়ে যাবে তখন উস্তাদগণ সাক্ষ্য দিবেন, এ বালেগ হয়েছে। এর চিহ্ন হলো, তার হাতে সনদ দিয়ে দেয়া হবে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেয়া হবে। এই হলো চিহ্ন। যেমন যুবকের মুখে গোঁফ ও দাঁড়ি গজায়। মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও লাবণ্যময় হওয়া যৌবনের লক্ষণ।

তবে যেমনটা আমি আরজ করেছি। যে কোনো জিনিসেরই হাকিকতের কোনো চিহ্ন থাকবে। যদি এ হাকিকত ভালো হয় তাহলে চিহ্নও ভাল হবে, সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হবে। গোলাপের ঘ্রাণ যেমন আপনার প্রিয়, তেমনি গোলাপ ফুলও আপনার প্রিয়। এমন হয় না যে, আপনি গোলাপ ফুলকে জুতা দিয়ে পদদলিত করবেন। যদি ঘ্রাণ প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে পাপড়িগুলো ঘ্রাণের পাত্র। যদি পাপড়িগুলো দলিত হয় তাহলে ঘ্রাণ থাকবে কোথায়? সুতরাং ইলমের ঘ্রাণের যেসব চিহ্ন রয়েছে তা দেহাকৃতিতে লুকিয়ে থাকবে। যদি ইলম সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয় তাহলে এ ব্যক্তিও শ্রদ্ধার যোগ্য হবে। যে সনদ পাবে, পাগড়ি লাভ করবে সবই মূল্যবান ও শ্রদ্ধার পাত্র হবে। এসব ঐ লুকিয়ে থাকা হাকীকতের চিহ্ন হবে যা মাধ্যমে আপনি দেখবেন এতে ইলম রয়েছে।

তাই বক্তার হাকিকত তার বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন যখনই আপনি বক্তৃতা শুনবেন আপনি বুঝতে পারবেন, বক্তাও বক্তৃতার মতোই হবে। যেমন চিহ্ন প্রকাশ পাবে আপনি বুঝতে পারবেন এর হাকিকত এর মধ্যে তেমনই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এই চিহ্ন আপনি দেখলেন যে মাথায় পাগড়ি বাঁধা হল। হাতে সনদ দিয়ে দেয়া হল। উস্তাদগণ সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এসব চিহ্ন বাস্তবিক এবং ভেতরে কোনো মাহাত্ম্য রয়েছে। ঐ হাকিকত ও মাহাত্ম্য শ্রদ্ধার বস্তু। সুতরাং চিহ্নগুলোও শ্রদ্ধার যোগ্য।

হাকিকত পরিবর্তনের কাজ

হযরত থানবী (রহ.) বর্ণিত একটি ঘটনা মনে হলো। হযরত বলতেন, যে বছর আমি দারুল উলুমে শিক্ষার্থী ছিলাম, সে বছর দাওরার জামাতে চৌদ্দজন ছাত্র ছিলেন। হযরত থানবীও তাদের একজন। তাদের দাওরা শেষ হলো। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন দস্তারবন্দীর জন্য জলসা করবেন। ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করবেন। ঘোষণা দেয়া হবে যে, এরা শিক্ষাজীবন শেষ করেছে। মাওলানা থানবী (রহ.) বলেন, আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমাদের মধ্যে কোন যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই। অথচ জনসমাবেশে আমাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে! (আল্লাহ না করুন) কে জানে আমরা উস্তাদের কলংক ও দুর্নামের কারণ হয়ে যাই কি না। এজন্য যে কোনোভাবে এ জলসা বন্ধ করাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমরা এ মর্যাদার যোগ্য নই। আমাদেরকে দস্তারবন্দী ও পাগড়ি প্রদান করা ঠিক হবে না। কিন্তু সময় ছিল খায়র ও বরকতময়। ছাত্রদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণ ছিল। হযরত বলেন, সবাই মিলে আমাকে

প্রতিনিধি বানালেন। তুমি হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহ.)-এর কাছে গিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে আরজ কর। তিনি দারুল উলুমের প্রথম সদর মুদাররিস ছিলেন। হযরত বলেন, আমি ছাত্তা মসজিদে হাজির হলাম এবং হযরতের কামরায় প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কিতাব দেখছিলেন। উঁচু বালিশ ছিল। তার উপর কনুই ঠেস দিয়ে এবং হাত দুটি ললাটের কাছে রেখে কিতাব পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। দু'তিন মিনিট পর হযরত আমাকে দেখলেন। তখন আমি সালাম করলাম। সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'ভাল আছ তো, কেন আসা হল?'

আমি আরজ করলাম– 'হযরত! শুনতে পেলাম দস্তারবন্দির জলসা হবে এবং আমাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে। এ যদি আপনাদের নির্দেশ হয়, তাহলে আমরা তা পালন করব। আপনাদের যা ইচ্ছা আমদের মাথায় বেঁধে দিতে পারেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ থাকে, তাহলে তা পেশ করার জন্য আমি হাজির হয়েছি। আমাদের সবারই এই মত– আমরা নালায়েক, অযোগ্য। আমরা এর যোগ্য নই। আমাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে। ভয় হয়, আমরা হয়ত আমাদের উস্তাদগণের জন্য কলংক ও দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবো। এজন্য জলসা বন্ধ করে দেয়া হোক।'

হযরত থানবী (রহ.) বলেন– 'মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের দয়া ও রহমতে জোশ দেখা দিল।' প্রথম বাক্য বললেন, 'মানুষ যে পর্যন্ত বড়দের আশ্রয়ে থাকে সে পর্যন্ত ছায়ার নিচে থাকে। বুঝতে থাকে, আমি নালায়েক, আমি অনুপযুক্ত। আর তাকে এসব মনে করা উচিত। এদিক দিয়ে তোমাদের মনোভাব সৌভাগ্যেরই লক্ষণ। তবে আমরা যা করছি তা দিয়ানতদারীর সঙ্গে ও পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে করছি। তোমদের যোগ্যতার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের পরিপূর্ণ শরহে সদর বা আত্মার সান্ত্বনা হয়েছে। এজন্য আমরা শুধু পাগড়িই বেঁধে দেবো না; বরং এ কথাও ঘোষণা করব, যে কোন বিষয়ে যে কেউ ইচ্ছা করেন, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারেন।

হযরত মাওলানা আরো বললেন, 'আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে অন্তরের প্রশান্তি সহ তোমাদের পাগড়ি প্রদান করছি। আমাদের অন্তরে পরিষ্কার বিশ্বাস রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে এবং আমরা মানুষের সামনে তা ঘোষণাও করব। যার ইচ্ছা যে কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে মুনাযারা করতে পারে।'

হযরত থানবী (রহ.) বলেন– 'আমি কেঁপে উঠলাম। এসেছিলাম নামায মাফ করাতে, এখন রোযাও গলায় বেঁধে দেয়া হলো। আমি এসেছিলাম সনদ যেন না

দেয়া হয়। এখন ঘোষণা হবে মুনাযারা করার। আমি আতংকিত হয়ে গেলাম।' তারপর হযরত মাওলানা আরো একটি কথা বললেন যা মহব্বতের ও দয়ার ছিল। তিনি বললেন– তোমাদের সৌভাগ্য, তোমরা নিজেদেরকে অযোগ্য ও নালায়েক মনে করছ। তাহলে সাধারণভাবে দুনিয়া গর্ব দ্বারা পরিপূর্ণ। যেখানে যাবে তোমরাই নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ দেখতে পাবে। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, 'আমরা তাই দেখেছি। যেখানেই গিয়েছি কেবল আমরাই নিজেদেরকে দেখতে পেরেছি, অন্য কারো নেতৃত্ব দেখিনি।'

এটা ছিল ঐসব বুযুর্গানের কথার প্রভাব এবং ঐ হাকিকতের যা তাদের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে এসেছিল। এজন্য আমি বলে থাকি– যাকে দস্তার দেয়া হয়, তার মধ্যে এই উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা উচিত যে, এ হলো বুযুর্গানের পক্ষ থেকে একটি উপহার। আমাদের জন্য তাবারুক। কিন্তু আমরা এর যোগ্য নই যে, এ উপহার সংরক্ষণ করতে পারব। হযরতের দোয়ার বরকতে আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে গুণ ও পবিত্রতা পয়দা করে দিবেন।

কৃত্রিমভাবে হাকিকত লাভ

সুতরাং যখন আকার আকৃতি ভাল হয়, তখন ভাল আকৃতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাল হাকিকত দিয়ে দেয়া হয়। যখন আকৃতি ভাল হবে, আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ভাল হাকিকত এর মধ্যে এসে যাবে।

এই ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। হাদীস শরীফে হযরত আবু মাহযুরা (রহ.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ অথবা অন্য কোন যুদ্ধ থেকে প্রতাবর্তন করছিলেন। তখন মদিনা কয়েক মাইল দূরে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– তিনি রাতের বেলা মদিনায় প্রবেশ করতেন না। চেষ্টা করতেন দিনে মদিনায় প্রবেশ করার। তাই মদিনার বাইরে থেকে গেলেন। পরদিন ভোরে মদিনায় প্রবেশ করবেন। সঙ্গে সেনাবহিনী ছিল। তাঁবু খাটানো হল এবং নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়।

কোন সেনাবাহিনী কোথায় যদি যায় তাহলে তাদের দেখার জন্য সাধারণত ছেলেরা জমায়েত হয়। আর এ বাহিনী হল সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী। সে যুগে সাধারণ খ্যাতি ছিল যে, একটি নতুন জাতির আবির্ভাব হয়েছে। এ বাহিনী হল তাদের। তাদেরকে দেখার জন্য হাজারো ছেলে জমা হয়ে গেল। যখন আযান হত তখন ছেলেরা আযানের পুনরাবৃত্তি করত। এতে শোরগোল হত।

কেননা প্রতিটি ছেলে যখন আল্লাহু আকবর বলত, তখন শোরগোল হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহু আকবর-এর আওয়াজ হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেদের ধরে নিয়ে আসতে বললেন। সাহাবীগণ ধরতে গেলেন। ছেলেরা পালিয়ে গেল। আবু মাহযুরা যুকবও ছিলেন না, আবার বাচ্চাও ছিলেন না। তিনি পালিয়ে যাওয়াকে লজ্জাকর মনে করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। একজন সাহাবা তাকে ধরে নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি করছিলে? তিনি সাহস করে উত্তর দিলেন– আযান দিচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আচ্ছা আযান দাও। আযানের আবৃত্তি কর। তিনি নিচু করে বললেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– উচ্চৈঃস্বরে বলছো না কেন? তিনি উঁচু স্বরে বললেন। যেমন মুয়াজ্জিন বলে থাকেন। তারপর 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইলাল্লাহ' তাওহিদ ও একত্ববাদের মাসআলা আসলো। তিনি বললেন, বলে যাও। এখন তিনি হতবম্ভ হয়ে পড়লেন। কেননা তাওহিদের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা ছিল। তিনি শিরকে লিপ্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নকল করছ না কেন? তিনি একটু নিচু হয়ে চাপা স্বরে বললেন–

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– উচ্চৈঃস্বরে বল। তিনি জোরে বললেন– اشهد ان محمدا رسول الله রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এরপর বলো। তারপর اشهد ان محمدا رسول الله ছিল– যা সকল ঝগড়া ও বিবাদের মূল। এ কারণে যে, মক্কার মুশরিকরা একটা সীমা পর্যন্ত তাওহিদে বিশ্বাসী ছিল। সম্পূর্ণ অস্বীকার করত না। তারা বলতো আল্লাহ খালেক 'সৃষ্টিকর্তা' ঠিকই। তিনি তাঁর অধীনে অনেক আল্লাহ নিজেই বানিয়ে রেখেছেন। তাদের মধ্যে নিজ ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছেন। কাউকে রুজি-রোজগার, কাউকে সন্তানের ক্ষমতা দান করেছেন। এভাবে ভাগ-বণ্টন করে দিয়েছেন। মূল কিন্তু একই। তাই তারা যখন হজ করতে যেত, তখন তাদের তালবিয়া এমনই হত, যার দ্বারা এ জাতীয় তাওহিদের স্বীকারোক্তি ছিল। তারা বলত–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হাজির হয়েছি। তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। হ্যাঁ তাহলে ঐ শরীক রয়েছে, যাদেরকে তুমি নিজেই অংশীদার করে নিয়েছ। অর্থাৎ তুমি নিজেই (মায়াযাল্লাহ) শিরকের দরজা খুলে দিয়েছ। ঐসব শরীক রয়েছে। তাবে স্বতন্ত্র কোন শরীক নেই।

সুতরাং তারা এক পর্যায়ে তাওহিদ ও একত্ববাদকে স্বীকার করত। বিবাদ ছিল রাসূলের রিসালতে। একে তারা স্বীকার করতো না। তাই اشهد ان لا اله الا الله পর্যন্ত নির্দ্বিধায় নকল করেছিল। যখন اشهد ان محمدا رسول الله বলার পালা আসলো। তখন তিনি সংকোচবোধ করতে লাগলেন। কি বলবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নকল কর। তিনি বললেন, কিন্তু অত্যন্ত চাপাস্বরে বললেন– اشهد ان محمدا رسول الله রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উচ্চৈঃস্বরে বল। তিনি উঁচু সুরে বললেন। এভাবে আযান পূর্ণ হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যাও!

তিনি আরজ করলেন– হযরত! এখন যাব কোথায়? আমি তো আপনার গোলাম হয়ে গিয়েছি।

তাওহিদ ও রেসালত যা মুখে উচ্চারণ করছিলেন, ঐ আওয়াজ অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। নবুওয়াতের আজমত, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে প্রবেশ করেছে। তাওহিদও অন্তরে ঢুকে পড়েছে। আরজ করলেন, আমি এখন কোথায় যাবো? আমি আপনার গোলাম হয়ে গিয়েছি। আমার অন্তরাত্মা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে তাওহিদ ও রেসালতের ঘোষণা দিয়েছি। মুখ যে কথা ঘোষণা করেছে তা অন্তরে ক্রিয়া করেছে। আকার আকৃতি ভাল ছিল, তাই অন্তরে ভাল হাকিকত সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আকার আকৃতি ভাল করে নিক। আল্লাহ তায়ালা এর মধ্যে উত্তম হাকিকত ঢেলে দিবেন।

বাইরের অবস্থার প্রতিক্রিয়া অন্তরে

এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত বাইরের অবস্থা, পোশাক পরিচ্ছদ, আকার আকৃতি, রং রূপ ও ইসলামী তাহযিব গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছে। 'তোমরা যেমন আকার আকৃতি গ্রহণ করবে তোমাদের অন্তরও তেমনি হয়ে যাবে।' মনে

করুন, কেউ বীর পাহলোয়ানদের মত পোশাক পরিধান করে ময়দানে এসে যায় তখন তার মন স্বভাবত কুস্তি লড়তে বা পাঞ্জা মারতে চাইবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী হবে। স্বাভাবিকভাবে সে এদিকে আকৃষ্ট হবে, ঝুঁকে পড়বে। এটা হলো তার বাইরের আকৃতি ও পোশাকের প্রতিক্রিয়া। তেমনি কেউ যদি মহিলাদের পোশাক পরে, হাতে চুড়ি লাগায়, রঙিন মেয়েলি কাপড় পরিধান করে, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে তার মন-মানসিকতায়ও মেয়েলিভাব এসে যাবে। মেয়েদের মত আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তার মন চাইবে মেয়েদের মত কথা বলতে, তাদের স্বরভঙ্গি গ্রহণ করতে। এটা হলো ওই বাইরের সুরত গ্রহণের প্রতিক্রিয়া। আবার কেউ যদি উলামায়ে কেরামের পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ গ্রহণ করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাকওয়া ও পরহেযগারির দিকে তার মন মানসিকতা ঝুঁকে পড়বে, যদিও তা বাহ্যিক হবে। আরে মিয়া, মৌলভীদের পোশাক পরিধান করেছ, যদি কোন মন্দ ও গর্হিত কাজ করো মানুষ কি বলবে? এ পোশাকে থেকে এই অপকর্ম? তাই অনিচ্ছায়ও মন চায় নেক কাজ করতে। মুত্তাকী পরহেযগারদের মতো কাজ করতে। অথবা যদি ওলী দরবেশদের মতো পোশাক পরিধান কর, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে যুহদ ও কানাআত, অল্পে তুষ্ট, দুনিয়ার মোহ থেকে মন অতিষ্ট হয়ে যাওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। মোটকথা, প্রতিটি আকার আকৃতি ও পোশাক পরিচ্ছদের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন আকার ও রূপ ধারণ করবে, তেমনি হাকিকত বনে যাবে। এজন্য জোর তাগিদ রয়েছে আল্লাহওয়ালাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আকৃতি প্রকৃতি গ্রহণ করো। আম্বিয়ায়ে কেরামের আকৃতি গ্রহণ করো। সাহাবায়ে কেরাম ও উলামায়ে রব্বানীর রূপ ধারণ করো। আকৃতি ও পোশাক গ্রহণ করো। এ অবস্থা ও আকৃতির উপর ভাল ও উত্তম হাকিকত ঢেলে দেয়া হবে। বাহ্যিকতার জন্য হলেও গ্রহণ কর, নিষ্ফল হবে না। এমন আকার আকৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করো না যার কারণে তোমাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।

কথা ও কাজের প্রতিক্রিয়া

জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলন ছিল– এভাবে যদি এই আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তরবারী বের হয়ে যেত। যেমন আমাদের দেশেও কাউকে যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয় তাহলে লড়াই বেঁধে যাবে। এটা হলো চড়াও হওয়ার লক্ষণ। এটা জাহেলিয়াতের যুগের চিহ্ন ও লক্ষণ ছিল। এই অঙ্গুল এভাবে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তরবারী বেরিয়ে পড়বে। এজন্য এ অঙ্গুলকে সাব্বাবা (شبابه) অর্থাৎ গালি

দেয়ার অঙ্গুল বলা হয়। এ অঙ্গুল দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে যেত। ইসলামী শরীয়ত এ প্রথা বদলিয়েছে। স্থান পরিবর্তন করেছে কিন্তু কোথায় উঠানো হবে? আঙ্গুল শাহাদত ও তাওহিদের জন্য التحيات এর মধ্যে উঠান হয়। আর এর নাম রেখেছে সব্বাহা سباحه অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী আঙ্গুল। বলা হয়, সাব্বাবা বলো না। তাহলে ঐ অর্থ স্মরণ হয়ে যাবে যা জাহেলিয়াতের যুগে ছিল। সাব্বাহা বলো; শব্দ যখন ভাল বলবে, তখন হাকিকতও ভাল আসবে।

ব্যবসায়ীদেরকে পবিত্র কুরআন তাজির বলেছে। জাহেলিয়াতের যুগে খিনচার বলা হতো, তখন বলা হলো খিনচার বলো না, তাজির বলো। এ হলো ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কথা–

لَا تَقُوْلُوْا خِنْسَارًا وَقُوْلُوا تَاجِرًا

খিনচার বলো না তাজির বলো। এ হলো জাহেলিয়াতের পরিভাষা।

তোমরা যখন এ শব্দ বলবে তখন তোমাদের মন মানসিকতাও অনিচ্ছাকৃতভাবে জাহেলিয়াতের দিকে ধাবিত হবে। এজন্য ঐ শব্দ বলো যে শব্দ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেছেন। তা হলে তোমাদের মানসিকতা কুরআন ও আল্লাহর হাকিকতের দিকে ধাবিত হবে। সারকথা, প্রত্যেক জিনিসের কথায় কাজে উত্তম ও ভাল আকার আকৃতি গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। এজন্য যে, দুনিয়াতে কোন জিনিস এমন নেই, যার কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নেই। আর প্রতিক্রিয়া শুধু বস্তুরাজির মধ্যেই নয়, আপনার দেহেও রয়েছে। আপনার প্রতিটি আকার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গিতেও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি যদি কারো সাথে হাসিমুখে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, তাহলে সেও খুশি হবে। আর যদি বিরক্ত ও বিশ্রী আকৃতি নিয়ে সাক্ষাৎ করেন তাহলে সে মনক্ষুন্ন হবে। লড়াইও বেঁধে যেতে পারে। বোঝা গেল, আকৃতি ও ভঙ্গির মধ্যে ক্রিয়া রয়েছে। এভাবে আপনার চোখও ক্রিয়াশীল। আপনি যদি নিচুদৃষ্টি নিয়ে কথাবার্তা বলেন তাহলে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর যদি উর্ধ্বমুখী হয়ে আলাপ করেন, তাহলে রাগ ও ক্রোধ পয়দা হবে। চোখ নিরব। কিন্তু এটা নিরবে কথা বলে কখনও রাগ ও ক্রোধ, কখনও মহব্বত পয়দা করে। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদ যেমন হবে সে অনুযায়ী অন্তরে প্রতিক্রিয়া হবে। যখন প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রয়েছে তখন একথা সম্ভব হতে

পারে না যে, পোশাক পরিচ্ছদ ও আকার আকৃতির মধ্যে কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া থাকবে না। শরীয়ত তাহযিব ও ভদ্রতা শিখিয়েছে। এমন কথা বলবে না যা মন্দ ও গর্হিত। যে কথা দ্বারা ভাল মন্দ দুটি অর্থ হতে পারে। আকৃতিও এমন গ্রহণ করো না যা দ্বারা কোন মন্দের সূচনা হয়। আকার আকৃতি কথাবার্তা, দৃষ্টি সবই ভাল রাখ। তাই বলা হয়েছে–

وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ.

চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর; টপ টপ করে চললে অহংকারী চলন হবে। বেশি নত হয়ে চললে পীড়িতদের চলন বলবে। মধ্যমভাবে চল। বিনয় ও নম্রতাও থাকবে সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও থাকবে। তোমাদেরকে যেন রোগা মনে করা না হয়, আবার অহংকারীও মনে করা না হয়। যেহেতু চাল-চলনেও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। তারপর বললেন–

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ.

আওয়াজেও কিছু নিচুতা ও নম্রতা গ্রহণ কর। চিৎকার করে কথা বলো না। এমন করলে অন্যেরা মনে করতে পারে আমাকে বধির মনে করছে। একজন ভাল মানুষকে আপনি অযথা বধির বানিয়ে ফেললেন, একজন ভাল মানুষ এতে রাগ করবে। তিক্ত ও কর্কশ আওয়াজ কান অপছন্দ করে। প্রয়োজন অনুযায়ী আওয়াজ কঠিন ও উঁচু করো। মধ্যমভাবে কথা বল, সম্পূর্ণ ভদ্র ও মুহাযযব বনে যাও। হাত পা, যবান, মুখমণ্ডল, আকার আকৃতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

ঈমানের প্রতিক্রিয়া

ইরশাদ হয়েছে–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِه وَيَدِه

প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। ঐ ব্যক্তি কেমন মুসলমান যে গালি গালাজ ও ভর্ৎসনা করছে, অন্যের মনে আঘাত দিচ্ছে, ব্যথা দিচ্ছে। আপনি তাকে ইসলাম থেকে খারিজ নাই করুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কোন কামাল ও গুণ নয়। প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ। আরেক স্থানে বলা হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَه النَّاسُ عَلى اَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ

প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষ তাদের জানমাল ইজ্জত আব্রু ও ধন-সম্পদ নিয়ে শান্তিতে থাকে, নিরাপদে থাকে। লখ টাকা তার কাছে রেখে চলে যাও। মুমিন খেয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। স্ত্রী-কন্যাদের রেখে নিরাপদ থাকুন। সে মুমিন, খেয়ানত করবে না। এখানে যে শব্দ বলা হয়েছে তা এ নয় امنه المؤمنون মুমিনগণ তার থেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ থাকেন; বরং বলা হয়েছে امنه الناس সাধারণভাবে সকল মানুষ নিরাপদ থাকেন। এ ব্যক্তি মুমিন। মুমিন বিশ্বাস ভঙ্গকারী নয়। অমুসলিমও শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। বাস্তবিক ঐ ব্যক্তিই ঈমানদার, সেই হলো মুমিন।

যদি মুমিন ও মুসলিম এমন হন, যাকে মানুষ ভয় করে। বলে– ভাই, এ ব্যক্তি হতে সাবধান! সতর্কতার সাথে চল। পকেট কাটতে পারে। যদি এমন হয়ে যায় তাহলে সে মুমিন কিসের। সে তো একটি বলদ। কারণ বলদ যখন চলাফেরা করে তখন মানুষ সাবধানে চলে। কারণ সে চতুষ্পদ জন্তু। লাথি মেরে দিতে পারে। লেজ দিয়ে আঘাত করতে পারে। প্রশ্রাব করে দিতে পারে, এর ছিঁটা লেগে যেতে পারে। মুমিন হতে যদি এভাবে সাবধান হয়ে চলতে হয়, সে ভর্ৎসনা করবে, পকেট মারবে, ছুরি মারবে– সে কেমন মুমিন? এ তো একটা আস্ত বলদ! মুমিন ঐ ব্যক্তি– মানুষ যার থেকে নিরাপদ থাকবে। তাদের হাতে নিরাপদ থাকবে মাল ও সম্মান। সে সত্যিকার মুমিন হতে পারে না, যার থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে না।

স্বভাব চরিত্রের প্রতিক্রিয়া

এমন ঈমান নিয়ে কোন মুসলমান অমুসলিমদের কাছে গেলে তার মাথা নত হয়ে যাবে। ইসলাম এভাবেই বিস্তার লাভ করেছে। চাপ প্রয়োগে নয়, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, কারবারে সততা ও সৃষ্টি জগতের কল্যাণকামিতার মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, বিস্তার লাভ করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এসব গুণাবলীসহ বিশ্বের যে স্থানেই পৌঁছেছে, মানুষের মাথা নত হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে সাহাবায়ে কেরাম এসেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– হাজারো মানুষ তাদের চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে যান। এসব চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়, হতে পারে না। এটা সত্যবাদীদের চেহারা, মুসলমানদের চেহারা ও মুবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারকদের চেহারা। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আকার আকৃতি, তাদের প্রতিটি নকল ও হরকত, কাজকর্ম সব মুবাল্লিগের কাজকর্ম। আসল কথা হলো– আমরা যদি চিন্তা করে দেখি, তাহলে

ইসলাম প্রচারে আমরা নিজেরাই অন্তরায় হয়ে রয়েছি। অমুসলিমরা আমাদের দেখে, আমাদের কাজকর্ম দেখে। ফলে ইসলাম গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদি শতকরা পাঁচ দশ জন লোক উন্নত ও পবিত্র স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হন, তাতে জাতিকে ও সমাজকে চরিত্রবান ও পবিত্র বলা যায় না। অন্তত বেশিরভাগ লোক তো ভাল হওয়া দরকার। অবস্থা এমন, আমাদের কাজকর্ম গর্হিত, আকার আকৃতি অপছন্দনীয়। বহু মন্দ জিনিস রয়েছে আমাদের মধ্যে। এজন্য অমুসলমানদের কাছে ইসলাম প্রচারে আমাদের কাজকর্ম বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে, বড় অন্তরায় হয়ে আছে। তারা আমাদের ধর্মকে কিতাব থেকে নয়, আমাদের কার্ম থেকে দেখতে চায়। যদি আমাদের কাজকর্ম মন্দ ও অসত্য দেখে তাহলে তারা বলবে– এদের ধর্মও এমনই। যদি আমাদের কর্ম সঠিক হয় তাহলে বলবে বাস্তবিক এদের ধর্মও ভাল। সারকথা, আমাদেরকে সামলে চলতে হবে। আমরা এমন হবো যে, শুধু মুখ দিয়ে তাবলিগ করব না; বরং আমাদের চেহারা দেখে মানুষ বলবে, সত্যিই মানুষটি মুসলমান।

আমাদের দেওবন্দের কাছে মুজাফফরনগরে আর্যদের সঙ্গে মুসলমানদের তর্কযুদ্ধ মুনাজারা হয়েছিল। ঐ মুনাজারায় হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর যৌবনকাল। কিছু কিছু দাড়ি বের হয়েছিল। একবারে প্রাথমিক জীবন ছিল। হযরত শাহ সাহেব সুন্দর চেহারার ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর সুশ্রী ছিলেন। সবুজ পাগড়ি বাঁধতেন প্রায়ই। তিনি খুব আকর্ষণীয় চেহারার ছিলেন। শাহ সাহেব ঐ মুনাজারায় গেলেন। কারণ, তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খুলহিন্দও গিয়েছিলেন। তখন আর্যদের ধর্ম প্রচারক বলেছিল– 'যদি কারো চেহারা দেখে ইসলাম গ্রহণ করা হত, তাহলে আমি মৌলভী আনোয়ার শাহের চেহারা দেখে ইসলাম গ্রহণ করে নিতাম।

তার চেহারাই বলছে, এ হল ইসলাম। মুসলমানদের চেহারা ও মুখমণ্ডল স্বয়ং মুবাল্লিগ। ইসলামে আকার আকৃতি ও ভদ্রতা, এমনভাবে বজায় রাখার জন্য তাগিদ করা হয়েছে যে, এসব দ্বারা ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

পোশাকের প্রতিক্রিয়া

সৈনিকরা যখন পরস্পরে দেখা হয় তখন ইউনিফরম দ্বারা তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি নিজেদের কোনো সৈনিক শত্রুদের ইউনিফরম পরিধান করে এসে যায় তাহলে তাকে গুলি করা হবে অবশ্যই। পরে হয়ত আক্ষেপও করতে পারেন, এ আমাদের সৈন্য ছিল। বোঝা গেল ইউনিফরমের উপরই বিষয়টা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

আপনারা আল্লাহর বাহিনীর সৈনিক। আল্লাহর বাহিনীর সৈনিক যদি শত্রুর ইউনিফরম নিয়ে আসেন, তাহলে আশংকা রয়েছে গুলি খেয়ে মরার। নিজের ইউনিফরমে থাকা উচিত। যেন নিজ বাহিনীর সৈন্য বোঝা যায়। শরীয়ত আকৃতি প্রকৃতির সংশোধন, তাহযিব ও ভদ্রতার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এজন্য আরজ করেছিলাম যে, ঐসব শিক্ষার্থী যাদেরকে সনদ প্রদান করা হবে তাদের আকৃতি প্রকৃতি এমন হবে– হাতে সনদ, মাথায় পাগড়ি এবং অন্তর থাকবে ইলমে পরিপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝা যাবে মাশাহআল্লাহ! এরা শিক্ষা সমাপনকারী। কিন্তু এ-ও তাদের দায়িত্ব, তারা এমন যেন মনে না করে– আমরা কামেল হয়ে গিয়েছি, পূর্ণতা লাভ করেছি। বরং মনে করবে, আমরা প্রথম ধাপে পা রেখেছি। এখন তাকমীল ও পূর্ণতার রাস্তা শুরু হলো। ইচ্ছা করলে পূর্ণতা অর্জন করতে পারি। এ ছিল আমাদের প্রাথমিক অবস্থা। উস্তাদগণ তাদের যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এদের অন্তরে ইলমের তলব ও আকাঙ্ক্ষা পয়দা হয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। সারকথা, এ সময়টি হবে আমাদের জন্য আনন্দময়। আমরা আমাদের ছাত্রদের পাগড়ি বেঁধে দিব। আলহামদুলিল্লাহ, জাতির মধ্যে এমন যুবক দল সৃষ্টি হয়েছে, যারা আগামীতে ইলম ও জ্ঞান বিতরণ করবে, শিক্ষা দিবে, তাদের ইলমী বংশ বিস্তার হবে।

ইলমের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী

সাফ কথা, ইলম এমন এক বস্তু, সমগ্র দুনিয়া এর সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। যে ইলমের সম্মান করে না, মূল্য দেয় না, সে ব্যক্তি অতি হীন ও নিকৃষ্ট। কারণ ইলম হিন্দী ও সিন্ধিও নয়, আফ্রিকিও নয়, আমেরিকানও নয়, এশিয়ারও নয়, ইউরোপেরও নয়; বরং তা সমগ্র মানব জাতির ইজমালী সম্পদ, সবাই এতে অংশীদার। এজন্য প্রতিটি মানুষ এর দিকে আকৃষ্ট হয়, মাথা নত করে। ইলমের ক্ষেত্রে কালো সাদা, বংশ, দেশ, জাতি ও অঞ্চলের কথা আসে না। ইলম সবার জন্য। এজন্য ছাত্রদের নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত রয়েছে। জ্ঞানার্জনের জন্য ইউরোপবাসী আপনাদের এখানে এসেছেন এবং আপনাদের শিক্ষার্থীরাও ইউরোপ যাচ্ছেন। যে কোনো ইলমই হোক তা প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক প্রিয়বস্তু। এতে এই শর্ত নেই যে, এ ইলম হিন্দুস্থানবাসীদের জন্য, এ ইলম হতে আমাদের বেঁচে থাকা বা সরে দাঁড়ানো উচিত। ইলমের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী ও পাকিস্তানীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ, ভাগ বাটোয়ারা নেই। ইলম

ভাগ বন্টনের উপরে। তাই এর প্রকি সবাই আকৃষ্ট হন। কারণ হলো, ইলম আমাদের সিফত ও গুণ নয়। যদি আমাদের সিফত হত, তাহলে এতে স্বজনপ্রীতি দেখা দিত। এ হলো আমাদের আল্লাহর সিফত ও গুণ। আর আল্লাহ তায়ালা সকল সীমা সরহদের উর্ধ্বে। ঐ সিফাত যখন আপনারা গ্রহণ করবেন, ইত্তেহাদ ও একতা পয়দা হবে।

একবার আমাদের আফ্রিকা যেতে হয়েছিল। আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয় জোহানেসবার্গে অবস্থিত। সেখানে একটি শিক্ষা সম্মেলন হচ্ছিল। অনেক ইউরোপীয় এসেছিলেন। ছয় সাত হাজার মানুষের সমাগম ছিল। ওখানে কালো সাদার ভেদাভেদ খুবই প্রকট। কালো মানুষের গাড়ি আলাদা। সাদাদের গাড়ি আলাদা, দোকান আলাদা। ষ্টেশনে কালো সাদাদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। রঙের কারণে মারাত্মক স্বজনপ্রীতি সেখানে বিদ্যমান। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলাম। জানতে পারলাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকল দেশের প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করছেন। আমরা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। অন্য কোন সময় এসে দেখে নেব। তখন দু'জন কিশোরী কোনো প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে আসছিল। তারা মনে করল আমরা রাস্তা ভুলে গেছি। তারা বলল– আপনারা উপরে যেতে চান, আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরাও সঙ্গে চললাম। উপরে গিয়ে দেখতে পেলাম আশ্চর্যজনক সম্মেলন। এখানে ছয় সাত হাজার সাদা পুরুষ ও মহিলা সমবেত। এভাবে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, যেমন সংসদ ভবনে তৈরি করা হয়। মঞ্চের উপরে তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি। তারপর নিচে আর একটি স্টেজ ছিল। এখানে পাঁচজন ছিলেন। এর নিচে আরেক স্টেজ। সেখানে সাতজন। যেমন সংসদের অধিবেশনে হয়। এমন ছিল। আমরা দেখার জন্য পেছনের সিটে বসে পড়লাম। তখন একজন প্রতিনিধি আমাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদে অন্য দেশের মনে করে আমাদের সম্পর্কে স্বাগতিক দেশের একজনকে জিজ্ঞেস করল, এরা কি এদেশের? সে বললো– না তারা হিন্দুস্থান থেকে এসেছেন। কোথাকার? সে উত্তর দিল, দারুল উলুম দেওবন্দের। সে বলল, 'দারুল উলুম দেওবন্দ' কি জিনিস? উত্তরে বললেন– ধর্মীয় ইউনিভার্সিটি। তিনি এর চ্যান্সেলর। তখন ঐ কিশোরীও সম্মান করল এবং বলল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর? সে বলল– হ্যাঁ। কিশোরী বলল, তাঁর আগমনবার্তা আমি যদি সভাপতিকে জানিয়ে দেই, তাহলে আপনার কোন আপত্তি হবে না তো? সে বলল– জানিয়ে দিন। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইংরেজিতে আলাপ হচ্ছিল। সে সভাপতিকে জানাল। সে দাঁড়িয়ে বলল। আমাদের শিক্ষা

সম্মেলনে সৌভাগ্যবশত হিন্দুস্তানের এক মনীষী যিনি সেখানকার এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল তিনি এখানে উপস্থিত। আপনারা অনুমতি দিন, আমি তাঁকে ষ্টেজে নিয়ে আসি। আসার জন্য তাঁকে অনুরোধ করছি।

পাবলিক স্বতঃস্ফুর্তভাবে সম্মতি জানালো। এবার মঞ্চ থেকে এক ব্যক্তি আসল। এখন তাদের ভদ্রতা দেখুন। আমার দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মাহফিল দাঁড়িয়ে গেল এবং হাত তালি দিতে লাগল। তাদের রীতি অনুসারে তারা ধন্যবাদ ও সংবর্ধনা জানাচ্ছে। যে পর্যন্ত আমি স্টেজের উপর পৌছাইনি একাধারে হাত তলি দেয়া হলো। যখন স্টেজে পৌছলাম, তখন উপরে চেয়ার ছিল। সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি। সেক্রেটারি মহিলা ছিলেন এবং তিনি মধ্যস্থলে বসা ছিলেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতি দু'পাশে উপবিষ্ট। আমার পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সেক্রেটারি চেয়ার ছেড়ে দিলেন। আমাকে বসিয়ে তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম, সাদা সরে গেল এবং কালো মানুষ তার স্থান দখন করল। আমি ভাবছিলাম, শুধুমাত্র সম্মান রক্ষার্থে এমন করা হয়েছে। কিন্তু সভাপতি ঘোষণা করলেন– তিনি হিন্দুস্থানের একটি ইউনিভার্সিটির দায়িত্বশীল পদে আছেন। আপনারা অনুমতি প্রদান করলে আমি তাঁকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করব।

উপস্থিত সবাই বললো– অবশ্যই অনুরোধ করা উচিত।

তিনি বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন আমি বুঝলাম উদ্দেশ্য এই ছিল। আমি কিন্তু শুধু সম্মান প্রদর্শন মনে করছিলাম। এরপরই তিনি আমাকে বললেন, কিছু বলুন। আমি সেখানে যে কথাগুলো বলেছিলাম তা শুনানোই উদ্দেশ্য। তাই আমি ভূমিকাস্বরূপ পূর্ণ ঘটনা বললাম। যেহেতু সেখানে কালো ও সাদার মধ্যে ভেদাভেদ রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম সরকারের শুকরিয়া আদায় করলাম। সরকার আমাকে এখানে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন। তারপর জনসাধারণের যেহেতু তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। তারপর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিলাম; কারণ তারা আমাকে এখানে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন। তারপর আমি বললাম–

আপনারা চিন্তা ও লক্ষ করে থাকবেন, কালো সাদা সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি। কি জিনিস আমাদেরকে সমবেত করেছে? আমি এ প্রশ্ন উত্থাপন করলাম।

আপনি যদি বলেন, রঙ এক হওয়ার কারণে একত্রিত হয়েছে। তাহলে আমি বলব, আমার রঙ ভিন্ন। আপনাদের রঙ ভিন্ন। আর রঙের অর্থই হল বিচ্ছিন্নতা,

শ্রেণীবিভক্তি। যে কালো সে সাদা হতে পারে না, আর যে সাদা সে কালো হতে পারে না। এরা সবসময় আলাদা থেকে যাবে। কাজেই রঙের মিলে যাওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না। এভাবে আমি বললাম– আমাকে এবং আপনাদেরকে দেশ ও অঞ্চল একত্রিত করেনি। আপনাদের দেশ আফ্রিকা আর আমার দেশ হিন্দুস্থান। আর দেশের অর্থই হলো সীমাবদ্ধতা সংকীর্ণতা। আফ্রিকা হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থান আফ্রিকা হতে পারবে না। আমরা পৃথক পৃথকই থেকে গেলাম, বিচ্ছিন্ন থেকে গেলাম।

আমি আরও বললাম– বংশও আমাদেরকে একত্রিত করেনি। আমার বংশ ভিন্ন, আপনাদের বংশ ভিন্ন। বংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এক খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য খান্দানের হতে পারবে না। পৃথক থেকে যাবে। তাহলে আমাদেরকে কি জিনিস একত্রিত করল? আমি বললাম– আমরা সমবেত হয়েছি, এভাবে নয় যে শুধু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসেছি; বরং মনে হয় আমাদের অন্তরেও মিল রয়েছে। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের স্থান রয়েছে। কি জিনিস আমাদেরকে একত্রিত করল?

আমিই বললাম– আসলে ইলম ও জ্ঞান আমাদেরকে একত্রিত করেছে। রঙ, বংশ, ভাষা, দেশ– কিছুই একত্রিত করেনি। ইলম একত্রিত করল কেন? এজন্য যে, ইলম আমাদের সিফত নয়। যদি আমাদের সিফত হতো, তাহলে আমার ইলম আলাদা হতো, আপনাদেরও আলাদা হতো। যার তার ইলম হতো। ইলমও বিভেদ বিচ্ছেদের কারণ হতো। ইলম হলো আল্লাহ তায়ালার সিফত বা গুণ বিশেষ। আমার আপনার নয়। আমি বললাম– এর ফল হচ্ছে এই, আমরা আমাদের গুণাবলীর উপর কখনো একত্রিত হতে পারব না; যে পর্যন্ত এসব বর্জন করে আল্লাহ তায়ালার কোনো গুণ ও সিফতকে গ্রহণ না করব। ব্যাপকতার শান এতেই রয়েছে। আমি আরও বললাম–

আল্লাহর সিফত ও গুণে যখন একত্রিত করার ক্ষমতা রয়েছে, তখন কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার মহান যাত ও সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহকে সামনে রাখে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তাহলে শুধু মানুষই নয়, জীবজন্তু সব একত্রিত হয়ে যাবে। সকলের সৃষ্টিকর্তা তিনিই, সবের মূল এক। আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফতে সমবেত ও একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। মানুষের যাত ও সিফাতের মধ্যে একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা নেই। যে পর্যন্ত আমরা আমাদের গুণাবলীকে ত্যাগ করে আল্লাহর গুণাবলী গ্রহণ না করব আমাদের মধ্যে একতা আসবে না। কেননা একতার মাধ্যম হলো আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফত। আর আল্লাহর যাত ও সিফাত একমাত্র ইসলামই বর্ণনা করে। ইসলামই হলো একত্রিত হওয়ার

মাধ্যম। অন্য কোন জিনিস সমবেতকারী নয়, হতে পারে না।

কথাটি এখন স্মরণ হয়ে গেল। আমি আরজ করছিলাম– ঐসব ছাত্রদের কথা যাদেরকে পাগড়ি দেয়া হচ্ছে। এতে একটি বাহ্যিক আকার আকৃতি রয়েছে। এর দ্বারা তাদের পরিচয় লাভ হবে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অনেক যোগ্যতা দান করেছেন। তবে তাদের গর্ব বা অহংকার করা উচিত নয়। আর একথাও মনে করা উচিত নয় যে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আমাদের হতে বেনিয়াজ। যত সময়ই পেরিয়ে যাক, তারা আমাদের শাগরিদ। বড়দের মুখাপেক্ষী তাদেরকে থাকতে হবে।

নিসবতের প্রতিক্রিয়া

এখানে আপনাদের (উপস্থিত সুধীদের) কর্তব্য হবে, চাঁদা দিয়ে আপনারা যাদেরকে তৈরি করেছেন, তাদের মূল্য দিবেন, সম্মান করবেন। সম্মান করা কর্তব্য। যেমন বায়তুল্লাহর গিলাফ আপনারা নিজ হাতে তৈরি করেন। কিন্তু যখন তৈরি করে বায়তুল্লাহর উপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তখন আপনি তাতে চুমু খান, কপালে লাগান। যেহেতু সম্পর্ক হয়ে গেছে। এসব ছেলেকে আপনারা শিক্ষা দিয়েছেন, পাগড়ি দান করেছেন; কিন্তু আপনাদেরকেও তাদের সম্মান করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। যেহেতু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাই ইলমের সামনে আপনাদের মাথা নত করতে হবে।

আপনি যদি কোন আলেমের সামনে মাথা নত করেন, আলেমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান, তাহলে তা তার চামড়া, রক্ত ও মাংস দেখে নয়। তার যেমন, আপনারও তেমন রক্ত মাংস রয়েছে। বরং ঐ ইলমের কারণে শ্রদ্ধা করেন, যা তার অন্তরে রয়েছে। ঐ ইলমই এসব ছাত্রের অন্তরে রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে যে পরিমাণ দান করেছেন, সে পরিমাণ যোগ্যতাই তাদের আছে। সেই ইলমকে শ্রদ্ধা করা আপনাদের কর্তব্য।

এদিকে লক্ষ করুন। একজন বাবা যার অক্ষর জ্ঞানও নেই কিন্তু তিনি ছেলেকে শিখিয়েছেন। স্টেজ যখন তৈরি হবে, ছেলে বসবে উপরে এবং বাবা বসবে নিচে। এ হচ্ছে ইলম যা তার ছেলেকে উঁচু করে দিয়েছে। আর যার কাছে ইলম নেই, সে নিচেই রয়ে গেছে। কেননা ইলম তার সত্তাগত সম্মান চায়। উঁচু স্থান চায়। ইলম হলো আল্লাহর সিফত। ইলম কখনো নিচু হয়ে থাকবে না; যদি প্রকৃতই আলেম হন। ইলমের মধ্যে স্বভাবতই উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের শান রয়েছে।

গন্তব্যে পৌছার পথ

তবে এ শংকাও হয়। মানুষের মধ্যে অহংকার যেন সৃষ্টি হয়ে না যায়। এজন্য এর বিপরীত হলো আবদিয়ত বা দাসত্ব। ইলমের সঙ্গে যে পর্যন্ত আবদিয়তের সংমিশ্রণ না হয়, সে পর্যন্ত অহংকার ও গর্ব গরিমা তার থেকে আলাদা হতে পারে না। আর আবদিয়ত হলো, কোন কামেলের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নিজেকে বিলিয়ে দিবে।

قال را بگزار مرا حال شو ☆ پیش مرد کاملے پامال شو

কথাবার্তা ও বাকপটুতা ছেড়ে দিয়ে নিজের মধ্যে হাল পয়দা কর। কোন কামেলের সামনে নিজেকে মিটিয়ে দাও। আলেম যদি কারো সামনে নত হয়ে নিজের চরিত্রের সংশোধন না করে, তাহলে ইলম তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। জানের বিপদের কারণ হবে। যেহেতু ইলম অহংকার গর্ব গরিমা সৃষ্টি করবে, কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করবে। যে আলেম চরিত্র সংশোধন করবে না, আখলাক গঠন করবে না, সে আলেম সাধারণত ফেতনা-ফাসাদ এবং কলহ-বিবাদের কারণ হবে। যে পর্যন্ত অসৎ চরিত্রকে নির্মূল করে সৎচরিত্র গঠন করবে না, লোভ-লালসার স্থলে অল্পে তুষ্ট হবে না, অহংকারের স্থলে বিনয়ী ও নম্র হবে না। কৃপণতার জায়গায় দানশীল হবে না। সারকথা, সৎচরিত্র ও উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি হবে না। ইলমের মূল ও মর্যাদা প্রকাশ হতে পারবে না। ইলম কোন কাজে আসবে না, উপকার হবে না, যে পর্যন্ত চরিত্র সংশোধন করা না হবে। কেবল ইলম দ্বারা মানুষ গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে না।

এজন্য মাদ্রাসাগুলোতে দুটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম তালিম হওয়া, যার মাধ্যমে ইলম বিস্তার লাভ করবে, দ্বিতীয় তরবিয়ত যা দ্বারা চরিত্র গঠন ও সংশোধন হবে। কেবল শিক্ষা প্রদান করলে ইলম এসে যাবে কিন্তু আখলাক আসবে না, চরিত্র গঠিত হবে না। ফলে ইলম জ্ঞানের জন্য ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি চরিত্র সংশোধিত ও গঠিত হয়ে যায় কিন্তু ইলম না আসে তাহলে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে মূর্খের মতো কাজকর্ম প্রকাশ পাবে। তার থেকে বিদআত ও গর্হিত কার্যাবলী সংঘটিত হবে। উভয় অবস্থাই ধ্বংসের কারণ। যে পর্যন্ত ইলম ও আখলাক মিলিত না হবে, সঠিকভাবে কাজ চলবে না। হিদায়া গ্রন্থের রচয়িতা কিতাবের ভূমিকায় কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তিনি লিখেন–

فَسَادٌ كَبِيْرٌ عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ ○ وَاَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ

هُمَا فِتْنَةٌ فِىْ الْعَالَمِيْنَ كَبِيْرَةٌ ০ لِمَنْ بِهِمَا فِىْ دِيْنِه يَتَمَسَّكُ

ঐ আলেম দুনিয়াতে বড় ফেতনার কারণ হবে, যে অন্যদের মানহানি ও অসম্মানী হওয়া পছন্দ করে। অহংকার গর্ব গরিমায় তার অন্তর পরিপূর্ণ। অন্যদেরকে তুচ্ছ, হেয় ও অপমান করার জন্য ব্যস্ত, সদা সচেষ্ট– এমন আলেম দুনিয়ার জন্য মহাফেতনা। আর এর চেয়েও মারাত্মক ফেতনা হলো ঐ আবেদ যে অজ্ঞতা ও মূর্খতার সঙ্গে ইবাদত করছে এবং দিনরাত বিদআত ও মুনকারাতে (গর্হিত কাজে) লিপ্ত রয়েছে।

উম্মতের ফাসাদ, ধ্বংস ও নষ্ট হওয়ার দুটি মাধ্যম বা পথ রয়েছে। এক জাহেল মৌলভী আর দুই জাহেল সুফী। ঐ আলেম যার কাছে ইলম রয়েছে কিন্তু আখলাক ও চরিত্র শূন্য। এক ঐ ইবাদতকারী সুফী যার ইবাদত আছে কিন্তু ইলম শূন্য। যখন ইলম ও চরিত্র এক সঙ্গে হবে তখনই উপকারী হবে। তাই তিনি বলেন–

هُمَا فِتْنَةٌ فِىْ الْعَالَمِيْنَ كَبِيْرَةٌ ০ لِمَنْ بِهِمَا فِىْ دِيْنِه يَتَمَسَّكُ

উভয় প্রকার মানুষই বিশ্বের জন্য ফেতনা। যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে তাদের আদর্শ অনুকরণীয় বলে গ্রহণ করবে সে ফেতনায় পতিত হবে। ঐ ব্যক্তিই আলেমে রব্বানী যার ইলম সত্য সঠিক। আখলাক ও চরিত্র সহীহ, স্বভাব ও নৈতিকতা পাক পবিত্র নিষ্কলুষ। সে ইসলাহ ও সংশোধনের কারণ ও মাধ্যম হবে। সে সৎপথ দেখাবে। তার দিকে রুজু করতে হবে।

আমাদের সন্তান যারা তৈরি হবে তাদের মধ্যে উভয় গুণ এসে যাওয়া দরকার। সঠিক ইলমও থাকবে, স্বভাব চরিত্র সংশোধিত ও সুগঠিত হবে। শিক্ষা গ্রহণের সময়ই চরিত্র গঠনের অনুশীলন করবে। বিনয়, নম্রতা, জনসেবা, দান-দক্ষিণা এবং সৃষ্টির সেবা ও যত্ন করার উৎসাহ উদ্দীপনা তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। তাকে উৎসাহিত করতে হবে। এতে তাদের চরিত্র গঠন হবে। আর যদি মনে করেন, তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে তাহলে তা পরে পূরণ করে নিবে।

ইবনে আবদুর রব (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানের অবস্থা ছিল এমন–

كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَ الْهُدىٰ كَمَا كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ

তাঁরা যেমন ইলম হাসিল করতেন, তেমনি হেদায়াতও লাভ করতেন। তাঁদের অবস্থা এমন ছিল, যখন আট দশ বছরে ইলম অর্জন করে নিতেন, তারপর

আমল শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে মাশায়েখের খেদমতে অবস্থান করতেন। যেন আমল ও আখলাক দুরস্ত হয়।

আমাদের এখানে দারুল উলুমেও আমার ছাত্রজীবন পর্যন্ত এদিকে সবসময় বিশেষ লক্ষ রাখা হত। শিক্ষা সমাপ্ত করার পরও ছাত্রদের সনদ দেয়া হতো না, যে পর্যন্ত আমাদের জামাতের কোন বুযুর্গের কাছে অবস্থান করে তাঁর কাছে মুরিদ হয়ে চরিত্র গঠন ও সংশোধন করে না নিত। কিন্তু পরে এ অবস্থা আর থাকেনি। তাই খারাপী পয়দা হয়েছে। সারকথা, যেমন ইলম হাসিল করা কর্তব্য তেমনি চরিত্রও গঠন করা প্রয়োজন।

আমাদের এসব ভাই যারা পাগড়ি বাঁধবেন, তারা এ কথা যেন মনে না করেন, আজ থেকে ইলমে পূর্ণতা লাভ করেছে, আখলাকেরও পূর্ণতা লাভ করেছে। বরং এমন মনে করবে, প্রথম সোপানে পা রেখেছি। এখন উপরে উঠতে হবে। তা হলে আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় হবে। আমরা প্রথম সোপানে তাদেরকে উঠিয়ে দিয়েছি।

দস্তারবন্দী সম্পর্কে এ ক'টি কথা মনে আসল। নিজের দুর্বলতার কারণে বিশেষ কোন নিয়মে সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু বলতে পারিনি। তাহলে খানা সম্পর্কে যেমন বলা হয়ে থাকে; خير الطعام ما حضر সর্বোত্তম আহার হলো– যা উপস্থিত থাকে, তাই মেহমানের সামনে পেশ করে দিবে। এখানে خير الكلام ما حضر যে কথা অন্তরে উদয় হয়েছে, তাই পেশ করে দিলাম। তাই কবুল ও গ্রহণ করা হোক। আল্লাহ তায়ালা মাদ্রাসাকে সবসময় কায়েম ও দায়েম রাখুন, দীর্ঘস্থায়ী করুন। মাদ্রসার শিক্ষকমণ্ডলী সাহায্যকারী ও ব্যবস্থাপক সবাইকে আল্লাহ বরকত দান করুন। আমিন!

اللهُمَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

বয়ান : ৮

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

কোন মুসলমানের প্রতি নেক ও সুধারণা পোষণ করার জন্য কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সঠিক প্রমাণ না পেয়ে কারো প্রতি কুধারণা বা অসৎ ধারণা পোষণ করো না। এসব তখনই সম্ভব হবে যখন নিজের নফসে তুচ্ছতা ও হীনতা এবং অন্যের আযমত শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন যখন মানুষ এমন বলে যে, আমি মহান, আমি বড় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যরা হীন ও নিকৃষ্ট। সে অন্যকে নিকৃষ্ট লাঞ্ছিত মনে করবে। আর নিজকে মনে করবে ভদ্র ও সম্মানিত। এ থেকেই ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّـــةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

اَمَّـــابَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَعْلٰهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الاِيْمَانِ اَوْ كَمَاقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনারা জেনেছেন যে, কিছুদিন আগে আমার চোখ অপারেশন হয়েছে। এ কারণে দুর্বলতা এখনও কিছু রয়েছে এবং এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান। ডাক্তারের নির্দেশ ছিল অন্তত তিন চার মাস অর্থাৎ মে-জুন পর্যন্ত জোরে কথা না বলা, বক্তৃতা না করা। কিন্তু এখানে আসার পর একে একে সকল নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করাতে হয়েছে। শক্ত কথা বলতে হবে, বক্তৃতাও করতে হবে– এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কথা বলতে হয়। তবু নিজ

সামর্থানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে চলি। এজন্য আরজ, হয়ত আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারব না। সহজভাবে যতটুকু সম্ভব হবে তাই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সামনে উপস্থিত করব। বর্ণিত ঐ হাদীস সম্পর্কে এখন কিছু কথা আরজ করব।

হাদীসের অনুবাদ

এটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস। শুরুতেই এর তরজমা শুনে নিন। তারপর কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হবে। তরজমা হচ্ছে– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো– 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া।' আরো বলেন– 'হায়া (লজ্জা) ঈমানের একটি বৃহৎ শাখা।' এটা হলো হাদীসের শাব্দিক তরজমা। এতে ঈমানে বিভাগ ও শাখা প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ঈমানের হাকিকত ও মাহাত্ম্য বুঝে নেয়া দরকার। তাহলে বিভাগ ও শাখা-প্রশাখাগুলো তিনভাবে বোঝা যাবে।

ঈমানের দুটি মূল-ভিত্তি

ঈমানের দু'টি ভিত্তি রয়েছে–

এক. التعظيم لامر الله

দুই. الشفقة على خلق الله

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধকে, তাঁর আইন-কানুনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, মান্য করা। দ্বিতীয় তাঁর মাখলুক ও সৃষ্টির প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করা। তাদের সেবা যত্ন করা। এ হলো ঈমানের অংশ দু'টির মৌল ভিত্তি। এক নম্বর ভিত্তির সারমর্ম হলো– মানুষ নিজ প্রভুর দিকে দৌড়াবে, ধাবিত হবে, তাঁকে পাওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকবে। তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের হক আদায় করবে। আর দ্বিতীয় ভিত্তির মর্ম হলো– তাঁর মাখলুকের সেবা ও যত্নের হক আদায় করবে। এক ব্যক্তি আল্লাহর পানে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দেয়, জুলুম ও নির্যাতন করে। তাকে দুর্বল ঈমানদার বলা হবে। তার ঈমান দুর্বল ত্রুটিপূর্ণ। আরেক ব্যক্তি দিনরাত জাতির সেবায় নিয়োজিত। তার সব সময়ের কাজ হলো জাতির সেবা কিন্তু আল্লাহর দিকে রুজু হয় না। ইবাদত-বন্দেগি আনুগত্য কিছুই করে না। সে পূর্বাপেক্ষা বেশি দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের

অধিকারী। পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তিকে বলা যাবে, যে একদিকে আল্লাহর দরবারে মাথানতকারী; অন্যদিকে মাখলুকের প্রতি রয়েছে তার সর্বদা শুভদৃষ্টি। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর অবস্থা ছিল। সবসময় আল্লাহর দিকে রুজু। আবার সর্বদা আল্লাহর মাখলুকের সেবায় ব্যস্ত।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির-শূন্য ছিল না। উঠায় বসায়, শয়নে জাগরণে, চলাফেরায়, ঘরে থাকার সময়, স্ত্রীগণের সঙ্গে মেলামেশার সময়– এক কথায় কোনো মুহূর্ত যিকির ছাড়া ছিল না। মুখ দিয়ে, আত্মা দিয়ে এবং আমল দিয়ে– মোটকথা, আল্লাহর স্মরণ সব সময়, সর্বক্ষণ হতে থাকত। এর সঙ্গে মাখলুকের তরবিয়ত (চরিত্রগঠন) তালিম, হেদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শন হতে কোন মুহূর্ত খালি ছিলনা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাটি জীবন আল্লাহর দিকে রুজু ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর দিকে রুজুর কারণে মাখলুকের খেদমত হতে গাফেল বা অমনোযোগী হননি। এভাবে সবসময় তিনি মাখলুকের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। এসব খেদমতের কারণে তিনি আল্লাহ থেকে উদাসীন হননি। উভয় কাজ এক সঙ্গে চলছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর আইনকে দলিল-প্রমাণের আলোতে গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন।

التعظيم لامر الله আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ঈমানের প্রথম অংশ। কিন্তু এ হলো স্বভাবজাত কথা যে, কোনো আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং গুরুত্ব তখনই দেয়া হয় যখন আইনের রচয়িতা বা আইনের প্রয়োগকারীর প্রতি গুরুত্ব ও সম্মান অন্তরে থাকে। যদি তার প্রতি তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা অন্তরে থাকে, তাহলে আইনের প্রতিও অন্তরে শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব আসতে পারে না। যদি আইন রচয়িতার গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা অন্তরে না থাকে, তাহলে আইন বাধ্যতামূলক ও জবরদস্তিমূলক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে লোকে আন্ত রিকতার সাথে আইনকে মান্য করে চলতে পারবে না।

শরীয়তের বিধি-বিধানকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে প্রেরণ করেননি; বরং সর্বপ্রথম অন্তরে আইন প্রদাতার প্রেম-ভালোবাসা পয়দা করা হয়েছে। ঐ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে আইন-কানুনের প্রতি মহব্বত পয়দা হয়ে যায়। মানুষ শরীয়তের বিধি-বিধান ও আইনকে তার আন্তরিক ভালোবাসা সন্তুষ্টি ও মহব্বতের সঙ্গে মান্য করে। বাধ্যতামূলকভাবে চাপের মুখে মান্য করে না। এমন হয়নি কখনো যে, তরবারী দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে মানুষকে বাধ্য ও অসহায়

করে দিয়েছে। বরং দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। দলিল-প্রমাণের সাহায্যে অনুধাবন কর। অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বুঝ। যখন অন্তর প্রসারিত হবে ও প্রশান্তি লাভ করবে, তখন কবুল ও গ্রহণ কর। নইলে ত্যাগ ও বর্জন কর। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

إِذَا ذُكِّرُوْا بِـاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا.

যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো তাদের সামনে পেশ করা হত, তখন তারা অন্ধ-বধিরদের মতো থাকতেন না; বরং দেখে শুনে, চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে স্বপ্রণোদিত হয়ে কবুল করে নিতেন। [ফুরকান : ৭৩]

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ০ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আমি ও আমার অনুসারীগণ এ দীনের উপর প্রশস্তচিত্তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কায়েম রয়েছি। কোন চাপ ও বাধ্য বাধকতার কারণে নয়; বরং অন্তরের আকর্ষণেই কায়েম রয়েছি। ইসলামী শরীয়ত অন্তর্দৃষ্টি পয়দা করতে চায়। কুরআন পাক যে যে স্থানে আল্লাহর অস্তিত্ব তাওহিদ ও একত্ববাদ তাঁর গুণাবলী স্বীকার করতে ও মান্য করতে বলেছে, সেখানে প্রমাণাদি পেশ করেছে। অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি ও জাগতিক সৃষ্টিসমূহের দ্বারা প্রমাণাদি পেশ করেছে। নিজের সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে এবং এ বিষয়ে গবেষণা করে, আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি পেয়ে যাবো। পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, বাতাসের আসা যাওয়া পেশ করা হয়েছে, আবার কোথাও সূর্যের প্রদক্ষিণকে পেশ করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ কর। সূর্য কত বড় নক্ষত্র। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ দাবি করেন– সূর্য পৃথিবী হতে (বিজ্ঞানীদের মতে) তের লক্ষ গুণ বড়। কোন কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে এগারো কোটি গুণ বড়। অর্থাৎ সূর্য হতে এগারো কোটি পৃথিবী তৈরি হতে পারে। এত বড় নক্ষত্র চব্বিশ ঘণ্টায় লাখো মাইল প্রদক্ষিণ করে। এত বড় নক্ষত্র কৃতদাসের মতো প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। তার নিয়ন্ত্রণে এমন কোন মহাশক্তি রয়েছে, যে শক্তি তাকে সর্বক্ষণ প্রদক্ষিণে ব্যস্ত করে রেখেছে। অতএব সূর্যকে দেখে তার মহান স্রষ্টার পরিচয় লাভ কর।

আর যদি পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণে রত আছে যেমন বর্তমানের বৈজ্ঞানিকগণ দাবি করে থাকেন, তাহলে এ বিশাল গ্রহ যার মধ্যে কোটি কোটি সৃষ্টির বসবাস– এ গ্রহকে কোন মহাশক্তি মহাচক্রে নিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে? কে ঘুরাচ্ছে?

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ.

সূর্যের এ ক্ষমতা নেই চাঁদকে ধরে ফেলবে, রাতেরও এ ক্ষমতা নেই দিনের আগমনে বাধা দেবে। নিজে এগিয়ে যাবে, এ ক্ষমতাও নেই। নিজ সময়ে দিন ও নিজ সময়ে রাত আসছে, এ সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কোন অন্ধ অজ্ঞজনের পরিচালনাধীন নয়; বরং চক্ষুষ্মান, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্তাই এর প্রতিষ্ঠাতা। এমন বিচক্ষণ এমন মহাজ্ঞানী, যার জ্ঞান সীমাহীন, যার কামালাত ও গুণাবলী সীমাহীন। ঋতুগুলো নিজ নিজ সময়ে আসছে। গ্রীষ্মকাল যথা সময়ে আসছে, শীতকাল, বর্ষাকাল নিজ নিজ সময়ে আসছে। এক সেকেন্ডও বিলম্ব হচ্ছে না। শাক-সবজি ও শস্যের যে নিয়ম করে দিয়েছেন, ঐ সময়ে বীজ জমি হতে নিজ মাথা বের করছে। প্রকাণ্ড গাছের আকার ধারণ করছে। গাছের শিকড় এবং তার বয়স নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এত নিখুঁত ও শক্তিশালী নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কোন মহাজ্ঞানী মহান সত্তা ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যার জ্ঞান ও শক্তি সীমাহীন। সারকথা, পবিত্র কুরআন সেখানেই আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্বের কথা বলছে। সেখানে এ কথা বলেনি, আল্লাহর কথা মানতে তোমরা বাধ্য। মানতে তোমাদেরকে হবেই। নতুবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; বরং দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা কর, বুঝতে চেষ্টা কর, বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমলের দরজা বৃদ্ধি কর ও মর্যাদা উঁচু কর।

বুদ্ধি-বিবেচনার ফজিলত আলাদাভাবে বর্ণিত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! দু'ব্যক্তির আমল একই রকম। একজন যে পরিমাণ নামায পড়ে অন্যজনও সে পরিমাণ নামায পড়ে। একজন যে পরিমাণ যিকির করে অন্যজনও সে পরিমাণ করে। অথচ কেয়ামতের দিনে একজনের মর্যাদা উপরে হবে আর অন্যজনের দরজা নিচে থেকে যাবে– এর কারণ কী?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবধানের কারণ সম্পর্কে জানান, যে ব্যক্তি বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে কাজ করে, তার মর্যাদা বেড়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দৃষ্টিহীনভাবে আমল করে সে নাজাত পাবে; কিন্তু মর্যাদা ও দরজাতের কোন প্রশ্নই উঠবে না। বিবেক-বুদ্ধিতে উঁচু মর্যাদা প্রদানের জন্য মাপকাঠি সাব্যস্ত হয়েছে। কথাটি এভাবে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِأُولِى الْأَلْبٰبِ.

নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, রাত দিনের পরিবর্তন, এর ভেতর আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত ও শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু কাদের জন্য? বুদ্ধিমানদের জন্য। যারা মনোযোগ সহকারে চিন্তা ও গবেষণা করে। যারা কেবল ললাটের চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য কোন নিদর্শনই নেই। যারা ললাটের 'চোখে দেখার পর অন্তরের চোখ দিয়েও দেখেন, চিন্তা-ভাবনা করেন, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী ধরা পড়বে।

ইসলামের আলোকে কে বুদ্ধিমান

বুদ্ধিমান কে? পরবর্তী আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ.

ঐসব মানুষ বুদ্ধিমান, যারা উঠতে বসতে শয়নে জাগরণে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকেন এবং সবসময় সৃষ্টি জগতের মধ্যেও আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। অন্তরে যিকির, স্মরণ ও চিন্তা-ভাবনা দুটিই থাকে তারাই বুদ্ধিমান। শুধু যিকিরকারীকে বুদ্ধিমান বলা হয়নি, শুধু চিন্তাশীলকেও বুদ্ধিমান বলা হয়নি। যদি শুধু চিন্তা-ভাবনাই থাকে, যিকিরুল্লাহ না থাকে তাহলে সে দার্শনিক হবে। আর যদি চিন্তা-ভাবনাহীন যিকিরই কেবল থাকে তাহলে সে জমাট ও স্থবির সুফী হবে। উভয়টা এক সঙ্গে হলে, অর্থাৎ যিকিরও করে চিন্তা-গবেষণাও করে তাহলে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় বুদ্ধিমান বলা হয়। তার উপর আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী খুলে যায়, প্রকাশ পায়। আমার বলার উদ্দেশ্য, পবিত্র কুরআন চাপ সৃষ্টি করে মানতে বাধ্য করেনি। যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ, তাই মেনে নাও। অথচ একথা বলার অধিকার তাঁর রয়েছে। আল্লাহর আদেশ হয়েছে, মানতে হবে। কিন্তু তিনি বলেছেন– আল্লাহর অস্তিত্বকে দলিল প্রমাণের দ্বারা বুঝে নাও। তাঁর আইনকে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রশস্ত চিত্তে মেনে নাও। চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহণ কর। অন্ধ বধির নির্বোধের মতো গ্রহণ করো না। বিবেক-বুদ্ধিকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সে চিন্তা-ভাবনা করবে। ইসলাম স্থবিরতা শিক্ষা দেয়নি। সারকথা, চাপ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং যিকির ও ফিকির করানো উদ্দেশ্য।

নাজাত লাভের একমাত্র উপায়

অধিক যিকির করো– من احب شيئا اكثر ذكر

যে জিনিসের প্রতি যার মহব্বত বেশি সে জিনিসকেই তো সে বেশি করে স্মরণ করে। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যখন ভালবাসা হবে, তখন তার যিকির ও স্মরণ বৃদ্ধি পাবে। তার যিকি ভাবনা বেড়ে যাবে, দিনরাত চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবে। তাহলে মূলত মহব্বত ও ভালোবাসাই প্রমাণিত হলো। এরপর তার আইন-কানুনের প্রতিও মহব্বত হবে, গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা হবে এবং التعظيم لامر الله যা ঈমানের একটি বড় অংশ, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

প্রথম কথা হলো, আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মান দিতে হবে। আর আদেশ নিষেধের গুরুত্ব ও সম্মান ততক্ষণ হবে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও সম্মান অন্তরে না হবে। এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, ময়দানে হাশরে এমন কিছু মানুষ থাকবে, যাদের মাথায় অসংখ্য গুনাহর বোঝা থাকবে। আল্লাহ তায়ালা এসব মানুষ সম্পর্কে বলবেন– হে বান্দা! যদি তুমি আমার সামনে এত বেশি গুনাহ নিয়ে আস যে, জমিন আসমান তোমার গুনাহের নিচে চাপা পড়ে যায়, তাহলে আমিও ততই বিশাল মাগফেরাত নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তবে শর্ত হলো আমার মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গুরুত্ব ও সম্মান তোমার অন্তরে থাকতে হবে। তোমাকে আমার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব মানতে হবে।

আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব এমন– এ বিশ্বাস থাকা অবস্থায় যদি ঘটনাক্রমে হঠাৎ গুনাহ হয়েও যায়, তাহলে চিন্তা করো না। সত্য সঠিক তাওবা করে নাও। আর আল্লাহ না করুন তাওবা না হয়, তাহলে এ সম্পর্কে বলেন–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

নেক আমল গুনাহকে শেষ করে দেয়, নির্মূল করে দেয়।

নেক আমলে লেগে থাক। নেক আমলে লাগানো হয়েছে যেন গুনাহ মুছে যায়। এরপরও যদি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে রাখ।

এর মানে একথা নয় যে, আজ থেকে গুনাহ ও পাপকর্মের দুঃসাহস করে নিবে– অন্তরে তো আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহব্বত রয়েছে। কাজেই আজ থেকে আমি স্বাধীন, যা ইচ্ছা তাই করব।

আমি বলি, যে ব্যক্তি গুনাহ করে তার অন্তরে আল্লাহর প্রেমের দারুণ ঘাটতি

রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মহব্বত নেই। যার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত মজবুতভাবে স্থান করে নেয়, সে নিজেই পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। এটা এমন হবে যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)কে বলেছিলেন, যাকেই ক্ষমা করা হবে, তা প্রকৃতপক্ষে তার আমলের কারণে নয়, আল্লাহর দয়া ও ফজল দ্বারা ক্ষমা করা হবে। যে পর্যন্ত আল্লাহর ফজল না হবে, সে পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় নেই। যত বড় নেকীই থাক কেন।

এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন–

وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কি আপনার মুক্তি ও নাজাত আল্লাহর ফজল দ্বারা হবে?

বললেন, আমার নাজাতও আল্লাহর ফজলেই হবে। যদি আল্লাহর ফজল না হয়, তাহলে আমার নাজাতেরও কোন উপায় নেই, পথ নেই। الا ان يتغمدنى الله برحمته যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়া ও মেহেরবানী না করবেন। এছাড়া নাজাতের কোন উপায় নেই।

তবে আমলেরও প্রয়োজন রয়েছে। একথা মনে করবেন না যে, দয়ার আশায় বসে থাকবেন এবং বলতে থাকবেন আল্লাহর দয়া হবে, নাজাত হয়ে যাবে। আমল করার প্রয়োজন কি?

আমি বলি, আমল করা হল প্রমাণ। আল্লাহর ফজল আকৃষ্ট হয়েছে। যদি আমল না হয় তাহলে এর অর্থ হল তার প্রতি আল্লাহর ফজল নেই বা আল্লাহর ফজল হচ্ছে না। আমল হল ফজল ও মেহেরবানীর লক্ষণ। আমল মূল্যহীন অনর্থক কোন জিনিস নয়, আমল করা এবং আমলকে কবুল ও গ্রহণ করা এ সবই ফজল ও মেহেরবানীর প্রমাণ। আমলের ফল ও প্রতিদান স্বরূপ নাজাত দান করা– এও ফজল ও দয়ার প্রমাণ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফজলের দ্বারা কাজ হবে। শুধু আমাদের আমলে কাজ হবে না, যার প্রতি আমাদের গর্ব ও অহংকার রয়েছে। আমাদের আমল এই স্তরের নয় যা আমাদের নাজাত দিতে পারে; যে পর্যন্ত আল্লাহর ফজল ও দয়া আমাদের প্রতি নিবিষ্ট না হবে।

অপারগতা স্বীকার করাই ইবাদতের প্রাণ

কারণ হলো– মানুষ যতই আমল করুক আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে না। যেহেতু আল্লাহর ইনাম বা দান সীমাহীন এবং আমাদের আমল সীমাবদ্ধ।

আমরা সকল দিক নিয়ে আমাদের শক্তি সামর্থ বুদ্ধি বিবেচনায় সীমাবদ্ধ। আমল যতই করব সীমিত হবে। আর আল্লাহর রহমত ও দয়ার কোন সীমা বা অন্ত নেই। প্রতি মুহূর্তে তাঁর দয়া বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে। আসলে এসব রহমতের হক আদায় করা মানুষের শক্তির বাইরে। কাজেই একমাত্র পথ হলো, আমল করে মানুষ এভাবে বলবে– হে আল্লাহ! আমার দ্বারা কিছুই হয়নি। নিজের অপারগতার স্বীকারোক্তিই হলো আল্লাহর হক আদায় করা। নইলে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর হক কে আদায় করতে পারবে?

হযরত দাউদ (আ.)কে বলা হলো– اِعْمَلُوا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا হে দাউদ! আমার শুকর আদায় কর। আসলে আল্লাহর কালামের অর্থ নবীগণই ভালো বুঝেন। দাউদ (আ.) আরজ করলেন– হে আল্লাহ! আপনার আদেশ শুকর আদায় করো। এখন শুকর আদায় করা আমার জন্য ফরয। কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, কিভাবে আদায় করব? এজন্যে যে, যখন শুকর আদায় করতে বসব, এ শুকর আদায়ের তাওফিকও আপনিই দান করবেন। তখন এ তাওফিকও আরেকটি নেয়ামত হয়ে যাবে। এ নেয়ামতের উপরও আমাকে শুকর আদায় করা উচিত। এর উপর যখন শুকর আদায় করতে বসবো তখন এ শুকরের তাওফিকও আপনি দেবেন। তখন আরেকটি নেয়ামত এসে গেল। তারপর এ নেয়ামতেরও শুকর আদায় করতে হবে। যেন প্রত্যেক শুকরের আগে এর শুকর বেরিয়ে পড়ে। এখন আমি শুকরের সূচনা করব কেমন করে? শুকর আদায় করব কিভাবে? আমার অপরাগতার স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমি আপনার শুকর আদায় করা থেকে সম্পূর্ণ অপারগ অক্ষম।

এবার আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসলো– হে দাউদ! তুমি যদি একথা বুঝতে পার যে, তুমি আমার শুকর আদায় করা হতে অপারগ, অক্ষম তাহলে এটাই হলো আমার শুকর আদায়; যেহেতু নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছ। অপারগতাকে মেনে নিয়েছ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকর আদায়কারীদের শিরোমণি। তাঁর চেয়ে বেশি শুকর আদায়কারী আল্লাহর অন্য কোন বান্দা নেই। তিনি নিজেই বলেছেন– اَللّٰهُمَّ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ হে আল্লাহ! তোমার সানা সিফাতে বয়ান করতে পারব এ ক্ষমতা ও সামর্থ আমার নেই। আর তোমার শুকর আদায় করতে পারব সে ক্ষমতাও নেই। اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ এছাড়া আমি আর কি বলব! তুমি এমনই যেমন তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ। আমার প্রশংসা করা থেকে তুমি অনেক অনেক উর্ধ্বে। তোমার প্রশংসা করার সাধ্য আমার

নেই। অপারগতার এ স্বীকারোক্তিকে আল্লাহ তায়ালা শুকর বলে সাব্যস্ত করেছেন। এটাই আমার শুকর আদায়, যেহেতু আমার হক আদায় করা মানুষের সামর্থাধীন নয়। আমলও আমাদের ত্রুটিপূর্ণ। শুকর আদায় করা হতে অপারগ। তাই অপারগতা ও অক্ষমতার স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কি পথ থাকতে পারে? এর নামই আল্লাহ তায়ালা শুকর ও ইবাদত রেখে দিয়েছেন। আমল করো এবং আমল করার পর বল, আমাদের দ্বারা কিছুই হয়নি।

ফেরেশতাগণ যারা হাজার বছর ধরে ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছেন, কোটি কোটি ফেরেশতা এমন রয়েছেন যারা তাদের জন্মের পর থেকে সেজদারত আছেন। কেউ কেউ রুকুতে আছেন, কেউ কেউ তাসবীহ ও তাহলিলে ব্যস্ত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের কেবলা রয়েছে। যাকে বায়তুল মামুর বলা হয়। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা একে তাওয়াফ ও প্রদক্ষিণ করে। যে সত্তর হাজার আজ তাওয়াফ করেন অনন্তকাল পর্যন্ত তাদের পুনর্বার তাওয়াফ করার সুযোগ হবে না। পরবর্তী দিনে নতুন সত্তর হাজার আসবেন। তার পারর দিন আরো সত্তর হাজার। কোটি কোটি ফেরেশতা রয়েছেন, যারা তাওয়াফে ব্যস্ত। এভাবে কোটি কোটি ফেরেশতা রয়েছেন যারা কাতার বন্দী হয়ে তাসবীহ ও তাহলিল পাঠ করছেন। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছেন। লাখ লাখ বছরের দীর্ঘ ইবাদতের পরও কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ বলবেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا حَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ.

হে আল্লাহ! আমরা তোমার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি এবং তোমার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও লাভ করতে পারিনি। তুমি আমাদের ইবাদত থেকে অনেক উর্ধ্বে। তারা অপরাগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিবেন। নিজ আমল দ্বারা তাদের কিছুই হবে না। এই হলো বিনয়, নম্রতা ও অপারগতার প্রকাশ। এই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের রূহ। এর মাধ্যমে মানুষের মকবুলিয়াত বৃদ্ধি পায়।

সারকথা, আমার আরজ করার উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর আইন-কানুনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব জানতে পারা যাবে না, যতক্ষণ না তাঁর আযমত ও গুরুত্ব অন্তরে না আসে। এ আযমতের দাবিই হলো, সর্বদা আমার অন্তর, মস্তিষ্ক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত থাকি তার জন্য সর্বোতোভাবে যেন কৃতজ্ঞ ও শুকর আদায় করি। শুকর আদায় মহত্ত্বের প্রকাশ ও স্বীকারোক্তি শুধু বয়ান দ্বারা হয় না। আত্মা দ্বারা এবং আমল দ্বারাও হয়ে থাকে। যে পরিমাণ

বন্দেগী ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে, আমলের শুকরও সে পরিমাণ বাড়বে। মুখ দ্বারা যে পরিমাণ الحمد لله বলবেন, তা আজমত প্রকাশের শুকর হবে। যে পরিমাণ মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা ও গবেষণা করে বলবেন, আল্লাহ সবচে' মহান সত্তা– সে পরিমাণে তা হবে আল্লাহর আযমতের প্রতি মস্তিষ্কের স্বীকারোক্তি। বিবেকবুদ্ধি দিয়ে তাঁর আযমত ও মহত্ত্বের যত প্রমাণ দাঁড় করাবেন তাঁর বিবেকের স্বীকারোক্তি হবে। বিবেকও তা অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে। মহা মহীয়ান সত্তা কেবল তিনিই। আপনার অন্তরাত্মায় আল্লাহর আযমত ও মহত্ত্ব যে পরিমাণ স্থান পাবে, তার অনুভূতিই আত্মার স্বীকারোক্তি হবে। আত্মা আল্লাহর মহত্ত্ব স্বীকার করছে। শরীরের অস্থি মজ্জা ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে আযমতের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকারোক্তি হওয়া কর্তব্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখ দিয়ে সর্বোতভাবে তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করা উচিত। যে পরিমাণ শুকর আদায় করা হবে, সে পরিমাণ আল্লাহর আযমত ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে। তারপরও একথা বলা কর্তব্য যে, আমরা হক আদায় করতে পারিনি।

এ আযমত ও মহত্ত্বের বর্ণনার পর বলা হয়েছে, যখন আযমতের ঐ স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন যদি তোমাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়েও যায়, তাহলে চিন্তা করো না। আমি এর চেয়েও বড় মাগফেরাত নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তাহলে শর্ত হচ্ছে, যদি আযমত ও মহত্ত্ব তোমার অন্তরে থাকে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের মজ্জাগত জিনিস। মানুষ সৃষ্ট এ দুটি দ্বারা। যে ভুল করবে, সে মানুষ। নিষ্পাপ কেবল নবীগণ (আ.)কেই বানানো হয়েছে। আর ওলীগণ হলেন মাহফুজ (সংরক্ষিত)।

আমরা আপনারা দিনরাত গুনাহে ডুবে আছি। এছাড়া আমাদের কোন পথ নেই যে, আল্লাহর ফজল ও মেহেরবানী আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর তা আল্লাহর আযমত ও মহত্ত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। এজন্য মহত্ত্বের বিশ্বাস যদি অন্তরে থাকে তাহলে আল্লাহর আইনের মহত্ত্বও অন্তরে থাকবে। তখন আইনের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের সাথে সাথে আমাদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আমলের ক্ষেত্রে দিয়ানত হোক, ইবাদত হোক, সামাজিকতা হোক, ব্যক্তিগত বিষয় হোক, দলগত বিষয় হোক– কানুনের গুরুত্ব যখন অন্তরে থাকবে, তখন মানুষ আইন ছাড়া চলতে পারবে না, কোন অবস্থাতেই তা পারবে না। প্রতিটি মুহূর্তে তার খেয়াল ও মনোযোগ থাকবে, এ সম্পর্কে আমার আল্লাহ কি বলেছেন, তার নির্দেশ কি– যা আমি মেনে চলব, আমল করব কিভাবে?

আল্লাহর আযমত ও মহব্বতই ঈমানের বুনিয়াদ। ঈমানের ভিত্তি হল التعظيم لامر الله। এ হলো ঈমানের প্রথম স্তম্ভ। যদি আল্লাহর আযমত ও গুরুত্ব অন্তরে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অন্তরে ঈমান নেই। তারপর আযমতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তর হলো যা সাধারণ মুমিনদের অন্তরে থাকে। এক হলো উলামা ও আউলিয়াদের অন্তরে থাকে। আরেক হল যা আ-ইম্মায়ে কেরামের অন্তরে থাকে। আরেক হলো যা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে থাকে। আরেক হলো যা আম্বিয়া (আ.)-এর অন্তরে থাকে। এভাবে ঈমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নবীগণের ঈমান সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান। তারপর তাবেঈনদের। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঈমান সর্বনিম্নে। তাই যেমন আযমতের স্তরে পার্থক্য রয়েছে, তেমনি ঈমানের স্তরেও পার্থক্য রয়েছে। আসলে যখন মূল আযমতে অংশ থাকবে, তখন কানুনে ও আযমতেও গুরুত্ব থাকবে। যখন গুরুত্ব থাকবে তখন মহব্বতও হবে। মহব্বত থাকলে মানুষের অন্তরে আইন মেনে চলার আবেগ উদ্দীপনাও সৃষ্টি হয়ে যাবে। মহব্বত বা ভালোবাসাই সাহাবায়ে কেরামকে বাধ্য করেছিল বাড়িঘর ত্যাগ করতে। তাঁরা বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করেছেন। দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হয়েছেন। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম আয়েশ বর্জন করেছেন। কেন করলেন? শুধু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলেন। তখন সবকিছু এর সামনে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তখন হিজরত করে দেশ ত্যাগ করে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে চলে গেলেন, জানপ্রাণ উৎসর্গ করলেন, ধন-সম্পদ ত্যাগ করলেন। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন সবাইকে ত্যাগ করলেন। যদি অন্তরে আযমত ও মহব্বত না থাকত তাহলে এত বড় ত্যাগ স্বীকার তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন বদর যুদ্ধ হল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছোট ছেলে তখন পর্যন্ত ঈমান কবুল করেননি; কাফেরদের বাহিনীতে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর ঈমান গ্রহণের তাওফিক হল। ঈমান গ্রহণের পর একবার পিতা হযরত আবু বকর (রা.)কে বললেন–

হে আমার পিতা! বদর যুদ্ধে কয়েকবার এ সুযোগ এসেছিল। আপনি আমার আঘাতের মধ্যে ছিলেন। যদি আমি তরবারি চালাতাম, এগিয়ে এসে আঘাত করতাম তাহলে আপনাকে শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি মনে করলাম আপনি আমার পিতা। আমার হাতে নিহত হওয়া উচিত না– এজন্য পিতৃত্বের

প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে আমি থেমে যেতাম। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন– হে আমার ছেলে! তুমি যদি আমার আঘাতের আওতায় এসে যেতে তাহলে আমি সর্বপ্রথম তোমাকে হত্যা করতাম। তারপর অন্যদের দিকে অগ্রসর হতাম। এজন্য যে, যখন অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এসে গেছে, তখন অন্যদের মহব্বত ও ভালোবাসার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ ক্ষেত্রে কিসের সন্তান আর বিনের বংশ? আমি যখন আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তিকে দেখব, যে আল্লাহর শত্রু আবার আমারও আপনজন। যাতে আমার প্রিয়জনদের জন্য ভালোবাসা আল্লাহর শত্রুতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে দিতে পারি। আমি প্রথম তোমাকেই হত্যা করতাম। সন্তানদের প্রতি এমন মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একমাত্র আল্লাহর আযমত ও মহব্বত ছাড়া হতে পারে না। এই পরিমাণ মহব্বত রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল যে নিজের মা-বাবা, সন্ত ান ও বংশধরদের মহব্বত অবশিষ্ট থাকেনি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন–

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين.

তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমার সঙ্গে এই পরিমাণ মহব্বত ভালোবাসা না হবে, যে পরিমাণ নিজ সন্তান, পিতামাতা ও অন্য কারো জন্য আছে। যে পর্যন্ত আমার প্রতি মহব্বত তাদের থেকে প্রবল, শক্তিশালী না হবে সে পর্যন্ত তোমরা মনে করবে না যে পূর্ণাঙ্গ ঈমান তোমাদের মধ্যে এসেছে। অতএব কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, ঈমানের মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ হল মহব্বত, ভালোবাসা। এটা যদি না থাকে তাহলে ঈমান প্রমাণিত হয় না, হবে না।

এক মহব্বত হল স্বভাবজাত, যা সন্তানের সঙ্গে হয়ে থাকে এবং সন্তানদের হয়ে থাকে নিজ বাবা-মা'র সঙ্গে। আরেক মহব্বত হল আকলি বা বিবেক বুদ্ধিপ্রসূত। এ মহব্বতকেই বলা হয় ঈমানে আকলি। স্বভাবগত মহব্বতকে ঈমানি মহব্বত বলা হয় না। জাত ও প্রকৃতিগতভাবে মানুষ তার সন্তানকে সবচে' মহব্বত করে। কিন্তু বুদ্ধিগতভাবে এ কথা বুঝে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচে' প্রিয় এবং তাঁর চেয়ে বেশি প্রিয় মহান রাব্বুল আলামীন। এজন্যই যখন আল্লাহর আদেশ ও সন্তানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখন সন্তান ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং আল্লাহর আদেশকে অগ্রাধিকার দান করে। এ হলো আকলি মহব্বত। এ শুধু স্বভাবজাত আবেগ নয়। তাই ঈমানে

আকলি হল মহব্বত ও আযমতের নাম এবং মহব্বত হলো ঈমানের প্রথম রুকন বা স্তম্ভ।

ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর

দ্বিতীয় রুকন ও স্তম্ভ হল– الشفقة على خلق الله

মানুষ যে পরিমাণ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, সে পরিমাণ মাখলুকের খেদমতেও সেবা যত্ন করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ يُّحْسِنُ اِلى عَيَالِه.

সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর আপনজন তাঁর মাখলুক। আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে তার মাখলুকের সঙ্গে মহব্বত করে ও সদ্ব্যবহার করে। কথা হল, যেভাবে আল্লাহর মহব্বত অত্যন্ত জরুরি, তেমনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেও মহব্বত ও মেহেরবানী করাকে জরুরি মনে কর।

যদি আল্লাহর সৃষ্টি নির্যাতিত হয়, অসহায়ভাবে নিপীড়িত হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের ফরয তাকে সাহায্য সহায়তা করবে। যদি কোন অমুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমান দেখে যে সে বিপদগ্রস্ত, তাহলে মুসলমানের কর্তব্য হবে সামর্থ মতো তাকে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। যে এমন করবে জুলুম ও নির্যাতন এবং পেরেশানি থেকে সেও উদ্ধার পাবে। মাখলুকের খেদমত ও সেবাযত্নের জন্য অন্তরে দয়া ও মেহেরবানী থাকা দরকার। সেবাযত্ন যদি না হয় তাহলে দয়া মেহেরবানী পাওয়া যাবে না।

সেবা ও খেদমতের দুটি স্তর রয়েছে। এক. উপকার করা। দুই. ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। উপকার করতে যদি না পার, ক্ষতি করো না। এক স্তর হলো كف الاذى অর্থাৎ কষ্ট দেয়া, ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা। কষ্ট দিও না। দুঃখ দিও না। দ্বিতীয় হলো এগিয়ে গিয়ে সৃষ্টির উপকার, শান্তি ও সান্ত্বনা দান।

প্রথম স্তর হলো তোমার দ্বারা কোন মাখলুকের যেন কষ্ট না হয়, ক্ষতি না হয়। যদি এও করতে না পার, তাহলে বুঝতে হবে ঈমান নেই। মানুষ যদি কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখে অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখে তখন তার দায়িত্ব হবে, ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়া। যদি সতর্ক না করে চোখ বন্ধ করে চলে যায় তাহলে বুঝে নিন তার অন্তরে ঈমান নেই। ঈমানের চাহিদা ছিল অন্যকে

সতর্ক করে দেয়া। এ পথ বিপদগ্রস্ত ও দুঃখ কষ্টের পথ। এ পথে যেয়ো না। এজন্য বলা হয়েছে–

اَدْ نَمَا اِمَا طَةُ الْاَذىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ

ঈমানের সাধারণ স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দিবে, যেন কারো কোন কষ্ট না হয়। কাঁচের টুকরা পড়ে থাকলে এসব সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিবে। ইটের টুকরা যদি পড়ে থাকে সেটা মানুষের পায়ে লাগতে পারে। তাই সরিয়ে দিবে যেন মানুষ কষ্ট না পায়। এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। এটুকুও যদি না থাকে তাহলে বলা হচ্ছে, এই ব্যক্তির অন্তরে ঈমান নেই।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, তিন ধরনের মানুষ রয়েছেন যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অভিযোগ করেন। এক. যারা রাস্তার উপর কষ্টদায়ক জিনিস ফেলে রাখে। দুই. সাধারণের গমন পথ যেখানে মানুষ বসে, বিশ্রাম করে– তেমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। অপরিষ্কার করে দেয়, যেমন গাছের ছায়া মানুষের উঠাবসা ও বিশ্রামের স্থান। সেখানে ময়লা ফেলে দিলে অথবা মলমূত্র ত্যাগ করলে। আল্লাহ বলেন এর প্রতি আমার পক্ষ হতে অভিশাপ। অথবা এমন কোন ব্যবস্থা করল যার দ্বারা মানুষের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষের পায়ে লাগবে, পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হবে– এমন ইচ্ছায় কেউ রাস্তায় কাঁটা ফেলে রাখল; চলার পথে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে আর সে আনন্দিত হচ্ছে। তার যেন চিত্তবিনোদন হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এমন ব্যক্তির মধ্যে ঈমান নেই। সে আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য। অতএব এ কথা যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহকে সম্মান শ্রদ্ধা ও মান্য কর; এখানে একথাও বলা হয়েছে যে, মাখলুকের খেদমত, সেবা ও যত্ন কর। আর খেদমতের সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں

তোমার থেকে খায়র ও কল্যাণের আশা নেই; অন্তত ক্ষতি করো না। অন্যদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ো না। এ কাজ অবশ্য কর্তব্য মনে করো। কথা দ্বারা, কাজ দ্বারা, ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা কাউকে কষ্ট দিও না। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَا تَلْمِزُوْٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَـٰبِ.

চোখের মাধ্যমে এমন ইশারা-ইঙ্গিত করবে না, যা দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়। সাধারণত ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্য এমন করা হয়। একে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

তোমার চোখের এ অধিকার নেই যে, তা অন্যকে কষ্ট দেয়ার কারণ হবে। وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ মন্দ ও খারাপ উপাধি দিয়ে কাউকে স্মরণ করো না, সম্বোধন করো না। হাদীস শরীফে এসেছে– কেউ অন্যকে ফাসেক, কাফের বলে সম্বোধন করবে না। ঈমান গ্রহণের পর এত খারাপ উপাধি بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ঈমানের 'পর ফিসক ও ফুজুর (পাপ ও পাপাচার) করো না। মানুষকে মন্দ উপনামে ডেকো না। কোন কোন মানুষ অন্যকে মন্দ উপাধিতে সম্বোধন করে। এতে ভদ্রলোক লজ্জিত হন। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

একে অপরের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না, মশকরা করো না। এমন কৌতুক করো না, যার দ্বারা অন্যে অন্তরে ব্যথা পায়, কষ্ট পায়। তুমি অপরকে বিদ্রুপ করছ, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছ। তুমি কি খবর রাখ, আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে তার মকবুলিয়ত বেশি হবে! এজন্য বললেন, বিদ্রুপ করো না, ইশারা ইঙ্গিত করো না। অপরের জন্য কষ্টদায়ক ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি করো না। যেমন জাহেলিয়াতের যুগে ছিল। আঙ্গুল দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বেরিয়ে পড়ত। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ইঙ্গিত মনে করা হত। শাহাদত আঙ্গুল দেখানোর অর্থ গালি দেয়া। এজন্য এ আঙ্গুলের নাম সাব্বাবা سبابه রাখা হয়েছে। অর্থাৎ গালি দেয়ার আঙ্গুল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম পরিবর্তন করেন এবং বলেন– সাব্বাহা سباحه আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী বল। নামাযে এ আঙ্গুল উত্তলন কর। যখন কালিমায়ে শাহাদাত اشهد ان لا اله الا الله পাঠ করো, তখন এর নাম রাখা হলো সাব্বাহা سباحه তাই এটা এখন আর গালি-গালাজের আঙ্গুল নয়; বরং তাসবীহ তাহলিল, ইবাদত ও বন্দেগীর আঙ্গুল। এ নামও বর্জন কর, যে নাম জাহেলিয়াতের যুগে ছিল।

ঈমানের পূর্ণতা লাভের উপায়

এমনভাবে ইশারা-ইঙ্গিত করো যেন কেউ ব্যথা না পায়। কোন যুগে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানোর প্রচলন ছিল– যার দ্বারা অন্যরা উত্তেজিত হয়ে পড়ত। বিষয়টি এমন ছিল– জাহেলিয়াতের যুগে শাহাদাত আঙ্গুল দেখানো হত। এসব থেকে বাধা

প্রদান করা হয়েছে, যাতে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য কষ্টের কারণ না হয়। বলা হয়েছে–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِه وَيَدِه

মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। জবান দিয়েও কষ্ট দেয় না, হাত দ্বারাও না।

অন্যখানে বলা হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ

মুমিন কে? ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্যরা তাদের জান ও মাল নিরাপদ মনে করে। শান্তিতে বসবাস করে। মানুষ মনে করে আমাদের জান নিরাপদ। যেহেতু ঐ ব্যক্তি মুমিন। এ আমাদের জানের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের মান-সম্মানও নিরাপদ। যেহেতু সে মুমিন, বিশ্বাসঘাতক নয়। এখানে শব্দ من امنه الناس বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ নিরাপদ থাকে, একথা বলা হয়নি শুধু মুসলমানগণই নিরাপদ থাকে; বরং মুসলমানও নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী নয়, সে ঈমানদার। ঈমানের লক্ষণ বলা হয়েছে, সর্বস্তরের মানুষ তার ব্যবহার ও আচরণ দেখে এ কথা বুঝে নিবে যে, এ ব্যক্তি মুমিন। জান, মাল, সম্মান– সবই তার হাতে নিরাপদ। তার থেকে কোন কিছু খেয়ানত হবার আশংকা থাকবে না। এমনই হবে মুমিনের অবস্থা। তার মধ্যে সৃষ্টির প্রতি সেবা-যত্নের উৎসাহ উদ্দীপনা থাকবে। কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই সকল সৃষ্টির শ্রেণী মতো সেবা ও যত্ন করতে ভালবাসবে। আর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকবে। কেউ যদি দুঃখ-কষ্টে থাকে তাহলে সে শান্তি পায় না। সে চেষ্টা করে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়ার জন্য, অথবা সে কারও দুঃখ-কষ্টের কারণ নয়। সকলের জানমালের নিরাপত্তা তার কাছে আছে।

আল্লাহ না করুন, যদি মুমিন এমন হয়ে যায় যে, মানুষ তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায় এই ভয়ে যে, সে যেন ছুরিকাঘাত না করে বসে, পকেট মেরে না বসে, বকাবকি না করে। ঐ ব্যক্তি কেমন মুমিন? সে তো ভাল একটি বলদ। বলদ যখন চলে, তখন মানুষ তার থেকে দূরে থাকে। এ হলো বলদ, লাথি মেরে দিতে পারে, গুঁতো মেরে দিতে পারে, পেশাব করে দিতে পারে। যদি মুমিনের বেলায়ও তেমনই আশংকা থাকে, ছুরি মারবে, পকেট মারবে, তাহলে সেও তো বলদই হল।

মুমিন হল ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিরাপদ থাকেন– এ আমাদের প্রাণের ও মান-সম্মানের ঘাতক নয়। মাল সম্পদেরও খেয়ানত করবে না, আমার অনুপস্থিতিতেও করবে না; বরং হেফাযত ও সংরক্ষণ করবে।

আমাদের হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর এক মুরীদ ছিলেন। অতি নেককার মানুষ ছিলেন। তিনি সাহারানপুর থেকে নিজ বাড়ি কানপুর যাচ্ছিলেন। সাহারানপুরের আখ প্রসিদ্ধ। তিনি যথেষ্ট পরিমাণ আখ কিনলেন। তখন তিনি ষ্টেশনে গিয়ে বুকিংয়ের জন্য কেনা আখ মাপতে কাটায় উঠালেন। ওজনকারী বাবু দেখল ভাল নেক ও সরল সোজা মানুষ মনে হচ্ছে। তার চেহারায় ঈমানের নূর রয়েছে। সে বললো, মৌলভী সাহেব! ওজন করে বুকিংয়ের দরকার নেই। আপনি এভাবেই নিয়ে যান।

তিনি বললেন, বাবু! আপনি তো বলছেন বুকিং ছাড়াই নিয়ে যেতে। আমি যদি এভাবে নিয়ে যাই এবং রেলের চেকার এসে পড়ে এবং মাল চেক করে তাহলে সে বলবে– অতিরিক্ত মাল, তখন সে আমার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করবে। যার পরিমাণ হবে আরও বেশি। সুতরাং আমি এখন কম পয়সায়ই সারতে চাই। আপনি কেন আমাকে বেশি পয়সা ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা করছেন?

বাবু বললো– না, এসব হবে না। আমি চেকারকে বলে দিব, সে আপনাকে কিছুই বলবে না। তিনি বললেন– গাজীআবাদে ট্রেন বদল হবে। তখন থাকবে অন্য চেকার। সে চেক করবে। পথ যত দীর্ঘ হবে, ভাড়া ও জরিমানা ততই বাড়বে।

বাবু বললো, আমি এ চেকারকে বলে দিব, সে ঐ চেকারকে বলে দিবে– ভাই, এ ভদ্রলোককে কিছু বল না, যন্ত্রণা করো না, মাল নিয়ে যেতে দাও।

তিনি বললেন– বাবু, সে ছেড়ে দিবে কিন্তু আমি যখন কানপুর ষ্টেশনে নামব আর আমার কাছে পরিমাণের বেশি ওজনের মাল থাকবে। তখন বাবু বলবে– এ হল তোমার টিকিট; মালের টিকিট কোথায়? তখন আমি কি করবো?

বাবু বললো– আমি ঐ দ্বিতীয় বাবুকে বলিয়ে দিব; সে ঐ বাবুকে বলে দিবে, আপনাকে পাশ করে দিবে। কোন অসুবিধা হবে না। নিশ্চিত থাকেন আপনি।

তিনি বললেন– তারপর কি হবে?

বাবু বললো– তারপর কি হবে? তারপর আপনি আপনার বাড়ি চলে যাবেন।

তিনি বললেন– আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন রেলওয়ের ভাড়ার খেয়ানত করেছিলে কেন? কেয়ামতের দিন এ প্রশ্ন করা হবে; তখন আমি কি উত্তর দিব?

বাবু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল। আর মনে মনে হয়তো বলছিল, কোন পাগল হবে হয়তো। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা তার কাছে পাগলামী ছিল।

اوست دیوانہ کہ دیوانہ شد☆اوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شد

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পাগল হয়নি সেই প্রকৃত পাগল।
বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে (সমাজে) বুদ্ধিমান (প্রমাণিত) হননি।

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– এত বেশি পরিমাণে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করো, মানুষ যেন তোমাকে পাগল মনে করে। তার অন্তরে একই বস্তু একই কথা। যখনই সুযোগ হয়, তখনই আল্লাহ আল্লাহ। মনে হবে যেন দেওয়ানা।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) তাঁর উস্তাদ হযরত নানতুবী (রহ.)-এর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন– আমাদের উস্তাদ (রহ.) বলতেন, ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এহইয়াউল উলুমে ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আওযায়ী তৃতীয় শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ইমাম ছিলেন। ইমাম আওযায়ী সেই যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখে বলেছিলেন, এখন যদি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কবর থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে আমরা তাদেরকে পাগল বলব, আর তাঁরা আমাদেরকে কাফের বলবেন। বলবেন, আমরা যে ইসলাম দুনিয়াতে রেখে গিয়েছিলাম সে ইসলামের অস্তিত্ব এখন কোথায়?

ইমাম গাজ্জালী ইমাম আওযায়ীর এ উদ্ধৃতি বলেছেন। একথা প্রসঙ্গে ইমাম নানতুবী (রহ.) বলেন– আমি বলি ইমাম গাজ্জালী যদি কবর থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান যুগ প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে কাফের বলতেন এবং আমরা তাঁকে পাগল বলতাম।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বলেন– যদি আমাদের উস্তাদ (রহ.) ও তার যুগের মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে আসেন, তাহলে তারা আমাদেরকে কাফের বলবেন এবং আমরা তাদেরকে পাগল বলব।

হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) একজন শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সাহেবে ছির' ছিলেন। তার উপাধি ছিল 'সাহেবে ছির'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেতনা ফাসাদ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেসব গোপন কথা তাঁর অন্তরে

মাওকুফ ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বলতেন। এ কথাও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিবে, সব আমাকে বলেছেন। অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক ফেতনাকারীর আবির্ভাব হবে। তবে আমি মুখ দিয়ে তাদের নাম উচ্চারণ করতে পারছি না। ফেতনা-ফাসাদ সম্পর্কে তাঁর মাধ্যমে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথাবার্তার আমানতদার তিনি। তার অন্তরে নবুওয়তের গোপন রহস্যাবলী রয়েছে। তাঁর জীবনী ও ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখা হয়েছে– যখন ইরান জয় করা হলো তখন এর রাজধানী ছিলো বাগদাদে। তিনি সেখানে পৌঁছলেন। তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। একজন পারসিক কৃতদাস সামনে দাঁড়ানো ছিল। সে আহারের ব্যবস্থা করছিলেন। পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় হযরত হুজাইফা (রা.)-এর হাত থেকে হঠাৎ এক লোকমা খাবার নিচে পড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ লোকমা খাবার উঠিয়ে নিলেন এবং ধুলাবালি পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। তখন ঐ ফার্সি গোলামটি বললো, আপনি এ কি কাজ করলেন? এদেশ হলো সম্ভ্রান্ত লোকের দেশ। এখানে ভদ্রতা ও সভ্যতার বিকাশ ও প্রসার অনেক বেশি। হাত থেকে ছিটকে পড়া লোকমা উঠিয়ে খাওয়া এদেশের লোকের চোখে নিন্দনীয় ও নীচতা বলে গণ্য হয়। এ ব্যবহার ভদ্রতা ও সামাজিকতার খেলাপ। তারা বলবে– লোকটি অনেক লোভী। মাটিতে পড়ে যাওয়া রুটির টুকরা তুলে খেয়ে ফেলছে। এ হলো ভদ্রতার পরিপন্থী। আপনি এমন করবেন না। এমন করলে মানুষ আপনাকে মন্দ বলবে। হাসি ঠাট্টা করবে।

উত্তরে হযরত হুজাইফা (রা.) বললেন–

أَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِهؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সুন্নতকে এসব নির্বোধ লোকের কথায় ছেড়ে দিব কি? এ সুন্নতে খায়র ও বরকত রয়েছে তা পূর্ণ দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদরাজিতে নেই। সুবহানাল্লাহ।

যে পর্যন্ত এ পরিমাণ পাগলামী মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে না যাবে, এক একটি সুন্নাতের উপর এ জাতীয় দৃঢ়তা আস্থা ও বিশ্বাস না হবে, দাঁত দিয়ে আঁকড়ে না ধরবে। মানুষের সমালোচনা ও দোষারূপ পেছনে করবে না। আমি বলি, ঈমানের নামই হলো পাগলামী, কিন্তু পাগলামী হবে প্রেমের, এশকের ও মহব্বতের। এশক ও প্রেম হবে আল্লাহর জন্যে, অন্য কারো প্রেমের নাম ঈমান নয়। প্রেম ও এশক যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন করে নেয়, তখন আসক্তজন

সত্যি পাগলের মত হয়ে যায়। প্রেমিকজন ছাড়া অন্য সবাইকে তার অন্তর থেকে মুছে ফেলে দেয়। যদি কোন আলোচনা হয় তাহলে তা হবে তার প্রিয়জনের। যদি চিন্তা-ভাবনা হয় তাহলে তাও হবে তার প্রিয়জনের।

সারকথা, যে ব্যক্তি এশক ও প্রেমের দৌলত লাভ করতে পারেনি, সে তাদেরকে পাগল না বলে কি বলবে? এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

قُلْ اللهُ اللهُ حَتّٰى تُقَالَ مَجْنُوْنٌ

এ পরিমাণ আল্লাহর যিকির করো, মানুষ যেন তোমাদের পাগল বলতে থাকে।

এ কারণেই ইমাম আওযায়ী বলেছিলেন, আজ যদি সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসেন, তাহলে আমরা তাদেরকে পাগল এবং তারা আমাদেরকে কাফের বলবেন। শয়নে জাগরণে তাদের একই ধ্যান ছিল। তাই সাহাবীগণ আমাদেরকে কাফের বলবেন। বলবেন যিকিরুল্লাহর ঐ আকর্ষণ এবং ঐ ইসলাম কোথায় গেল, যা আমরা রেখে গিয়েছিলাম। আসলে অন্তরের সম্বন্ধ ও আকর্ষণের নাম হল ঈমান। তার অন্তরে এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং আল্লাহর দিকে এরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে নাওয়া-খাওয়ার সময়, জাগরণে সবসময় একজনের নাম, একজনেরই আলোচনা হতে থাকবে।

মুমিনের কোন মুহূর্ত যিকির-শূন্য থাকা উচিত নয়

হাদীস শরীফে বিভিন্ন সময়ের জন্য যিকির ও দোয়া বলে দেয়া হয়েছে। যেন মুমিনের একটি মুহূর্ত এমনভাবে কাটে যে সে আল্লাহর যিকির করেনি, আল্লাহর ধ্যান করেনি। ঘর থেকে বের হলে দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللهِ اٰمَنَّا بِاللهِ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ইস্তেঞ্জা করতে যাবে তখন বলবে–

اللهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বেরিয়ে এসে পড়বে–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

পোশাক পরে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মুসাফাহা করে বলবে–

نَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى وَنَسْتَغْفِرُه

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যখন খেতে বসবে, বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَتِ اللّٰهِ

খাবার শেষ করে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا

তারপর ওয়াদা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করে এবং আলহামদুলিল্লাহ কাছিরা বলে শেষ করে তাহলে তার পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এখানে গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। মুমিনের কোন মুহূর্ত যিকিরশূন্য না থাকা উচিত। নিদ্রা যাওয়ার জন্য যখন শয়ন করবে তখন বলবে–

اللهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ

হে আল্লাহ! তোমার নামের উপর মৃত্যুবরণ করছি। তোমার নামের উপরই জীবিত হয়ে উঠব।

ভোরে যখন নিদ্রা ত্যাগ করবে তখন বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ.

সকল প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহর জন্য যে আল্লাহ মৃত্যুর পর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সবাইকে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং বিশাল বিস্তৃত মাঠে একত্রিত সমবেত হতে হবে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَنَا الْيَوْمَ عَافِيَةً وَجَاءَ بِا لشَّمْسِ مِنْ مَّطْلَعِهَا اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُشْهِدُ حَمَلَتَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعِ خَلْقِكَ اَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি দিনকে আলোকময় করেছেন, সূর্য উদয় করেছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী করছি, তোমার আরশ বহনকারীদের সাক্ষী করছি, তোমার ফেরেশতাদের সাক্ষী করছি, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তোমার কোন শরীক কোন অংশীদার নেই; তুমি লা শরীক।

এভাবে বলা হয়েছে– যখন স্ত্রীর কাছে গমন করো তখন এ দোয়া পাঠ করো–

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا

সন্তান জন্ম লাভের সংবাদ শুনে দোয়া পাঠ কর, নতুন ফল যখন সামনে আসে তখন দোয়া পড়। মোটকথা, সকল সময়ের জন্য হাজারো দোয়া রয়েছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যিকিরের জন্য বানানো হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সে খোদার দিকে মুতাওয়াজ্জু থাকবে। তাওহিদ ও একত্ববাদের পাঠ গ্রহণ করবে। একই পানে ঝুঁকে থাকা, একই উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা, মৃত্যুবরণ করা একই জনের জন্য– এরই নাম হল ইসলাম। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ.)কে বলা হয়েছিল–

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

হে ইবরাহিম! মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমান হয়ে যাওয়ার অর্থ এটা নয়, কালেমা পড়ে আজ মুসলমান হয়ে যাও। তিনি তো পয়গাম্বর এবং শীর্ষস্থানীয় পয়গাম্বর। হাজারো পয়গাম্বরের পিতা। তাঁর উপাধি খলিলুল্লাহ। আল্লাহর অন্ত রঙ্গ বন্ধু। এ অর্থ তো ছিল না যে, তিনি এখন পর্যন্ত মুসলমান নন, এখন কালেমা পড়ে মুসলমান হবেন। মুসলমান হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো– মাথা নত করে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। আপনি আপনার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে আমার হাতে অর্পণ করে দিন। আপনার কোন ইচ্ছা, কোন মর্জি ও সন্তুষ্টি থাকবে না। যা-ই হবে আমার ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক হবে। ইবরাহিম (আ.) আরজ করলেন–

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ.

হে আল্লাহ! আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। বিশ্ব প্রভুর হাতে

আত্মসমর্পণ করলাম। আমাকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। আপনি যা ইচ্ছা তা-ই করুন।

যখন এ কাজ করেছেন তখন ঘোষণা হলো–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

হে ইবরাহিম! পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দাও, আমার নামায, আমার হজ, আমার মরণ, আমার জীবন এবং জন্ম-মৃত্যুর মাঝের সব কাজ এরই মধ্যে এসে গেছে। অতএব শয়ন-জাগরণ, খানাপিনা, আহার-নিদ্রা, ওঠাবসা– সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আমার নফসের জন্য কিছুই নেই। যে মহাপ্রভুর কোন শরীক, কোন অংশীদার নেই। আমাকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আর আজ আমিই প্রথম মুসলমান।

সুতরাং ইসলামের অর্থ মাথানত করে দেয়া, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালারই স্মরণ রাখা। আর ব্যাখ্যা হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিভিন্ন সময়ের যিকির ও দোয়া বর্ণনা করেছেন। ফরয, সুন্নত ও ওয়াজিবের নির্দিষ্ট সময় ও স্থান রয়েছে। সে অনুযায়ী আমল কর। কিন্তু তোমাদের জীবনের যত মুহূর্ত রয়েছে প্রতি মুহূর্ত দোয়া ও যিকির করতে থাক। আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। তা হলে একজন মুসলমানের জীবন ঘুম থেকে জাগার পর থেকে শুরু করে রাতে ঘুমে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকির ও স্মরণে পরিপূর্ণ থাকবে। আসলে এ-ই হল ইসলাম। এখন ইসলাম যখন মানুষের হবে তখন মানুষ অবশ্যই পাগল বলবে। নিদ্রায় যাচ্ছে তখনও 'আল্লাহ' 'আল্লাহ', জাগছে তখনও 'আল্লাহ আল্লাহ', পোশাক পরছে তখনও 'আল্লাহ'! পানাহার করছে তা-ও 'আল্লাহ আল্লাহ'!

মুমিনের আত্মারও যিকির করা উচিত

এ কথা সত্যি, যে ব্যক্তি অনুশীলন করে যিকিরের পাবন্দী করে তার আত্মা যাকির হয়ে যায়। তারপর যদি ইচ্ছা না-ও করে তবুও অনিচ্ছায় তার মুখ দিয়ে আল্লাহর যিকির হতে থাকে। তার আত্মা যিকিরে নিমগ্ন থাকে। হযরত গঙ্গুহী (রহ.)-এর খাদেমদের মধ্যে একজন এমন ছিলেন, আল্লাহর যিকির তার রক্ত-

মাংসের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। শয়নকালে জাগরণের সময়, উঠতে বসতে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতেন। একবার তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। অপারেশনের প্রয়োজন দেখা দিল। হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বললেন– সম্পূর্ণ নীরব থাকুন, নড়াচড়া করবেন না, আমি অপারেশন করছি। আমি প্রথম আপনাকে অজ্ঞান করব, তারপর আপনার জন্য বার ঘণ্টা নড়াচড়া না করা অবশ্যই পালনীয় হবে। তিনি 'বহুত আচ্ছা' বলে সম্মতি জানালেন।

ডাক্তার অজ্ঞান করার ওষুধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলব থেকে اللہ اللہ এর আওয়াজ আসতে শুরু হলো। ডাক্তার বললেন– এ কি করছেন! তাঁর কোন খবরই ছিল না, কি করছেন। তিনি তো অজ্ঞান। ডাক্তার পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এ-কি করছিলেন? তিনি বললেন– কী হয়েছে? বললেন, আপনি তো আল্লাহ আল্লাহ করছিলেন। তিনি বললেন– আমি তো টের পাইনি। ডাক্তার বললেন– দেখেন আল্লাহ আল্লাহ করার জন্য সম্পূর্ণ জিন্দেগি রয়েছে। অন্তত কিছু সময় নিরব থাকুন। ডাক্তার আবার তাকে অজ্ঞান করলেন; কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলব হতে اللہ اللہ-এর আওয়াজ আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চোখের অপারেশন হলো না। ডাক্তার বললেন, এ অবস্থায় আমি অপারেশন করতে পারব না। মানুষ যখন জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিকিরের অনুশীলন করে; দিনরাত যিকিরে ব্যয় করে তখন অনিচ্ছায়ও তার জবান দিয়ে যিকির জারি হয়ে যায়। সবসময় সে যাকরা থাকে। এ অবস্থায় তাকে পাগলই বলা হবে। এটা আশ্চর্যজনক পাগলামী। সবসময় ইল্লাল্লাহ! শোয়ার সময় 'ইল্লাল্লাহ', জেগে থাকলে 'ইল্লাল্লাহ', ঘর থেকে বের হলে 'ইল্লাল্লাহ'। ইল্লাল্লাহ হল মুসলমানের জীবন, মুসলমানের প্রাণ।

সমাজ জীবনের সব শাখায় আল্লাহর যিকির বিদ্যমান

তবে এর অর্থ এ নয়, ইসলাম পার্থিব জীবনকে একেবারে বাদ দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করো না, ক্ষেত-খামার, কৃষি কাজ করো না, বসে আল্লাহ আল্লাহ করতে থাক। তেজারত ও সেরাওত, ব্যবসা ও কৃষিকে ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ'র কাজ বানিয়ে দিয়েছেন, যদি তা সঠিক নিয়তসহ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী করা হয়। কৃষি কাজ হবে, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠবে– তবে সবই আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তা সুন্নতের অনুসরণে হবে তখন সবকিছু যিকির বলে গণ্য হবে। সারকথা, সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে এমন কোন শাখা নেই যেখানে যিকির বিদ্যমান নেই। সামান্য চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। অন্তরে এ ধ্যান

ও প্রেরণা থাকতে হবে– আমি আল্লাহ আল্লাহ বলার জন্য এসব কাজ করছি। মানুষ যে কাজই করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে সামনে রেখে করবে। তখন তার সম্পূর্ণ জীবন আল্লাহর যিকিরে পরিণত হবে। তাকে যাকির বলা হবে। গাফেল বলা হবে না। আল্লাহর আমানত ও মহব্বত, প্রেম ও মহত্ত্ব যখন অন্তরে স্থান করে নেয়, তখন এমন ব্যক্তির দ্বারা যে কাজ সম্পাদিত হবে যিকির বলে গণ্য হবে। সাফ কথা, এমন ব্যক্তি সৃষ্টির সেবায় দৃঢ়পদ থাকবে, মজবুত থাকবে। একদিকে আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগি করবে, অন্যদিকে সৃষ্টির সেবাও করতে থাকবে। একটি অন্যটিকে গাফেল ও উদাসীন করবে না, করতে পারবে না– যা আম্বিয়া (আ.)-এর অবস্থা। নবীগণের পদাঙ্কানুসরণ করে মানুষ বেলায়েতের শীর্ষ স্থানে পৌঁছে যায়। এ স্তর ও স্থানের মর্ম হলো– আল্লাহর যিকির তার রক্তে-মাংসে শিরা-উপশিরায় মিশে যায়। সে যদি চেয়ারে বসে থাকে তখনও তার ভেতর আল্লাহর যিকির থাকে। আর যদি মাটির ফরাশে বসে তখনও যিকিরে রত থাকে। মূল্যবান পোশাক পরিধান করেও যিকির করে, পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরিধান করলেও তার কলব যিকিরে ব্যস্ত থাকে। কোন জিনিসই তাকে যিকির থেকে গাফেল রাখতে পারে না; বরং পোশাকই তাকে স্মরণকারী যাকির বানাতে সাহায্য করে।

ওলীদের মধ্যে বুযুর্গির দু'টি অবস্থা

আমি হযরত মাওলানা কাসিম নানতুবী (রহ.)-এর ঘটনা শুনেছি। এক দাওয়াত উপলক্ষে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী ও তাঁর পর্যায়ের আরো অনেক বুযুর্গ সাহারানপুর জেলার রামপুরে সমবেত হয়েছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম (রহ.)-এর অবস্থা ও অভ্যাস ছিল– তিনি অত্যন্ত যাহেদ ও দুনিয়াবিরাগী ছিলেন। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা ছিলেন। আমাদের বাড়িতে তাঁর যেসব ঘটনা আমি শুনেছি তা হল– হযরতের এক জোড়ার বেশি পোশাক ছিল না। একখানা কুরআন শরীফ, একখানা বুখারী শরীফ এবং মুহিউদ্দিন ইবনে আরবীর ফুতুহাতে মাক্কিয়ার একটি কপি ছিল। এ চারটি জিনিস তাঁর ছিল। পোশাক জোড়া পুরান হয়ে ফেটে যেত এবং পরিধানের অযোগ্য হয়ে যেত। তখন দ্বিতীয় জোড়া তৈরি করতেন। এ জোড়াও মোটা কাপড়ের হত। উন্নত কাপড়ের হত না। হযরতের নিয়ম ছিল– আচকান পরিধান করতেন জামাবিহীন। একটা বড় পাজামা ছিল যা আগের দিনের মানুষ ব্যবহার করত এবং পুরাতন একটি লুঙ্গি– যা কাঁধের উপর থাকতো। কাপড় ধুয়ে নিতেন এবং শুকিয়ে গেলে পরিধান করতেন। এই জোড়াই ছিল, যখন এ জোড়া ফেটে গিয়ে পরার অযোগ্য হয়ে

যেতো তখন অন্য জোড়া তার জন্য তৈরি হত।

আমি রামপুরের দাওয়াতের কথা বলছিলাম। হযরত এ দাওয়াতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে পোশাক অত্যন্ত পুরনো ছিল। পাগড়ি থেকে কয়েকটি ছেঁড়া ঝুলে গিয়েছিল। এই ছিল তাঁর অবস্থা। আর ঘটনাক্রমে মাওলানা গাংগুহী সেদিন অত্যন্ত মূল্যবান সুন্দর পোশাক পরিহিত ছিলেন। অনুমান পাঁচশত টাকা মূল্যের পোশাক ছিল। উন্নতমানের জুব্বা পাগড়ি ছিল। মানুষ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মজলিসে বসে নানা আলাপ আলোচনা পর্যালোচনা শুরু করলেন। একজন বললেন– মাওলানা রশীদ আহমদ অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় আলেম। কিন্তু বুযুর্গীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বুযুর্গ হলেন মাওলানা কাসিম সাহেব। সম্পূর্ণ দুনিয়াবিরাগী, পোশাক পরিচ্ছদ দেখ। অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর মধ্যে রয়েছে বুযুর্গীর শান। আর তিনি তো পাঁচশত টাকা মূল্যের পোশাক পরিধান করে বসে আছেন।

সাধারণ মানুষ পোশাক দ্বারা বুযুর্গীর পরিমাণ করছে। পোশাক উন্নত হলে বুযুর্গী শূন্য। ফাটা পুরনো হলে বুযুর্গীতে পরিপূর্ণ। তারা এসব আলোচনা করছিল। এ আলোচনার আওয়াজ হযরত নানতুবীর কানেও গেলো। একথা শুনে রাগে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল এবং ঐ ব্যক্তিকে বললেন– জাহেল! তুমি কি জান, বুযুর্গী কাকে বলে? তুমি পোশাককে বুযুর্গী মনে করছ? পোশাক দিয়ে বুযুর্গী পরিমাণ করছো, পরখ করছ! বললেন, আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি যদি পুরনো কাপড় পরিধান না করি তাহলে আমার নফস আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। এ পোশাকই একে ধরে রেখেছে, আয়ত্বে রেখেছে। মাওলানা গাংগুহীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– আর ইনি হলেন এমন, যদি লাখ টাকা মূল্যের পোশাক পরিয়ে দাও, তবু অন্তরে কোন পরিবর্তন হবে না, তাঁর নফস ফুলে যাবে না, অন্তরে অহংকার আসবে না। তাঁর নফস আত্মসংবরণের এই স্তরে পৌঁছে গেছে যে, রাজসিংহাসনে বসিয়ে দাও, তিনি যাহেদ দুনিয়াবিরাগী থাকবেন। অল্পেতুষ্ট থাকবেন। লক্ষ টাকা মূল্যের পোশাক পরিয়ে দাও, তবুও তাঁর অন্তরে যুহদ ও কানায়াত হতে থাকবে।

আসলে আল্লাহর যিকিরকারীগণ ছেঁড়া পুরাতন পোশাক পরেও যিকির করতে থাকেন। উন্নত মূল্যবান পোশাক পরেও যিকিরে ব্যস্ত থাকেন। লাখ টাকা দামের পোশাকেও যিকির। যিকির হলো কলব ও আত্মার কাজ। আত্মা যখন আল্লাহর পানে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তখন তাঁর অবস্থাও অন্য রকম হয়ে যায়।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমামদের স্তরে ছিলেন। পোশাক পরতেন উন্নত মানের, খুব মূল্যবান। মানুষ আরজ করল,

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব যুহদ ও কানায়াতের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়। আপনি নবাবদের মতো পোশাক পরিধান করে থাকেন। শুনে তিনি বললেন– আমি এজন্য এমন পোশাক পরি, আমি যদি ছেঁড়াফাঁড়া পুরাতন পোশাক পরি তাহলে–

لَوْ لاَ هٰذِهِ الدُّنْيَا نِيْرُ لَتَمَنَّدَ لَتْ بِنَا هو ءُ لاَ ءِ الْمُلُوْكُ.

এসব শাহজাদা ও আমিরজাদাগণ আমাকে নাক পরিষ্কার করার রোমালে পরিণত করে নিবেন। এজন্য আমি উন্নত, মূল্যবান পোশাক পরে থাকি। তাদের আমি বলে দিতে চাই, তোমাদের কাছে যে জিনিস রয়েছে তা আমাদের কাছেও রয়েছে। আমরা তোমাদের কোনভাবে মুখাপেক্ষী নই। আমরা বেনিয়াজ, আমি এ নিয়তে পরিধান করে থাকি। এ নিয়তে উন্নত পোশাক পরিধান করাও ইবাদত। আল্লাহওয়ালাদের কোন পদক্ষেপই ইবাদতশূন্য হয় না। আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যারা উন্নত পোশাক পরতেন। এমনও অনেক ছিলেন, যারা পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরতেন। কিন্তু বুযুর্গী সকলের মধ্যে ছিল। এখানেও ছিল ওখানেও ছিল; এখানে এক নিয়ত, ওখানে অন্য নিয়ত।

হযরত মির্জা মাজহার জানজানান (রহ.) নকশবন্দী সিলসিলার উচ্চমার্গের ওলী ছিলেন। কিন্তু রাজা-বাদশাহদের এত শান-শওকত ছিল না যা তাঁর ছিল। আসন আলাদা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাদেমগণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দরজায় পৃথক দারোয়ান। আর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, একটি ধূলিকণা চোখের সামনে পড়ে গেলে মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে যেত। বলতেন– আবর্জনা দিয়ে ঘর ভরে রেখেছে। অত্যন্ত নাজুক ছিলেন তিনি। সে সময়ের বাদশাহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন; কিন্তু অনুমতি দেয়া হলো না। বাদশাহ অনেক আবেদন নিবেদন করলেন কিন্তু অনুমতি মিলেনি। শেষ পর্যন্ত মির্জা সাহেবের বিশিষ্ট খাদেমকে তার দরবারে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি তাঁর অন্তরে স্থান করে নিয়েছো। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তোমাকে আমার অনুরোধ, আমার জন্য পাঁচ মিনিটের অনুমতি হাসিল করে দাও।

সেই খাদেম নরমে গরমে হযরতের খেদমতে আরজ করল; তখন পাঁচ মিনিটের জন্য অনুমতি দেয়া হল। বাদশাহ আসতে পারেন। বাদশাহ সালামত আসলেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নতজানু হয়ে এক পাশে বসলেন। মির্জা সাহেব কিছু নসীহত করলেন, উপদেশ প্রদান করলেন। এ সময় মির্জা সাহেবের পানির পিপাসা হলো। খাদেমকে পানি আনতে ইশারা করলেন। বাদশাহ তা বুঝতে

পেরে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আরজ করলেন, আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। অনুমতি দেয়া হলো, আচ্ছা পানি আনো। বাদশাহ পানি আনতে গেলেন। কলসের মুখে যে পেয়ালা রাখা ছিল পানি যখন পেয়ালায় ঢাললেন তখন কিছুটা বাঁকা হয়ে পড়ে। ব্যাস, মিয়াজী বিগড়িয়ে গেলেন, পরিবর্তন হয়ে গেল তাঁর মেজাজ।

বললেন– পানি পান করাতে জান না, তুমি রাজত্ব পরিচালনা করছো কিভাবে? এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তাঁর বিশেষ খাদেমকে পানি পান করাতে নির্দেশ দিলেন; সেই পানি পান করাবে। এ রকম বুযুর্গ ছিলেন তিনি। অথচ তাঁর বেলায়তে কোন ত্রুটি ছিল না। পূর্ণাঙ্গ ওলী ছিলেন তিনি। তাঁর সংস্পর্শে ও তরবিয়াতে হাজারো মানুষ ওলী হয়েছেন। এটা ছিল এক অবস্থা।

আরেক অবস্থার লোক ছিলেন হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.)। তিনি মির্জা সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ, হযরত শাহ গোলাম আলী ও হযরত মির্জা মাজহার জানজানান (রহ.) এক যুগের বুযুর্গ ছিলেন। শাহ গোলাম আলী (রহ.)-এর অবস্থা ছিল এমন– তাঁর ঘর ছিলো না, বাড়ি ছিল না, পোশাক ছিল না, ছিল যুহদ ও কানায়াত। উপবাসের পর উপবাস, আর মেহামানদের আধিক্য। তিন চারশ' মেহমান প্রতি ওয়াক্তে তাঁর দস্তরখানায় থাকতেন। কিন্তু জীবিকা নির্বাহের দৃশ্যত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। টংক রাজ্যের নবাব মীর খান হযরতের মুরীদ ছিলেন। তিনি দেখলেন হযরতের তিন চারশ' মেহমান সবসময় থাকেন। এত খাদ্যসামগ্রী কোথা থেকে আসবে। অত্যন্ত অভাব অভিযোগের ভেতর দিন যাচ্ছে। খুব পেরেশানি সহ্য করতে হচ্ছে। টংক রাজ্যের কোন একটি জেলার বার্ষিক আয় ছিল কয়েক লাখ টাকা। তিনি সম্পূর্ণ জেলা পিতলের পাতের উপর লিখে হযরতের খেদমতে পাঠালেন। লিখলেন, আপনাকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলাম যেন পরিবারবর্গ ও মেহমানদের ব্যয় নির্বাহ হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি তা গ্রহণ করুন। শাহ গোলাম আলী (রহ.) এ পিতলের উপর উত্তর লিখে পাঠালেন এবং একটি কবিতা লিখে দিলেন–

ما بروئے فقر و قناعت نمی بریم ☆ با بر خاں بگرے گر روزی مقرر است

আমি আমাদের অভাব ও উপবাসের মানহানি করতে চাই না। আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে দাও, রুজি মোফাদ্দর রয়েছে; তোমার জেলার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

একদিকে এ রকম যুহদ ও কেনায়াত, অন্যদিকে এত ঠাটপাট– যা হযরত মির্জা সাহেবের ছিল। উভয়ই কামেল ওলী। লেবাস ও পোশাকে ভিন্নতা মাত্র।

বেলায়তের সম্পর্ক পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে নেই। তা হলো আত্মার সঙ্গে। আত্মা যখন আল্লাহর কাছে পৌছে যায় তখন কামেল ওলী উন্নত পোশাক পরলেও তাতে নেক নিয়ত থাকতে পারে, মুসলিহাত থাকতে পারে। তাছাড়া যুহদ ও কেনায়াতের আধিক্যও থাকতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের বুযুর্গির দু'টি অবস্থা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)। মহান সাহাবী। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষ দোয়া করেছেন। اللهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ হে আল্লাহ! ইবনে আব্বাসকে কুরআন পাকের আলেম বানিয়ে দাও, তাকে হেকমত শিখিয়ে দাও। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বড় মুফাসসির এবং ইলমে তাফসীরে একক ছিলেন। তবে পোশাক পরতেন কেমন? তাঁর পোশাক ঐ যুগের সর্বোত্তম কাপড়ে প্রস্তুত করা হতো। অতি মূল্যবান সুন্দর ও মানানসই হত তাঁর পোশাক এবং যে মজলিসে বসতেন উন্নত আতরের সুগন্ধিতে সকলেই মোহিত হয়ে যেত।

অন্যদিকে ছিলেন হযরত আবু যর গিফারী (রা.)। শরীরে যে পোশাক ছিল তাই তাঁর মাযহাব ছিলো। দুয়ের বেশি পোশাক রাখা জায়েজ নয়– এই ছিলো তাঁর অবস্থা। যখন সিরিয়া জয় হলো, তখন সিরিয়া উন্নত ও ভদ্র ছিল। হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন গভর্নর ও হযরত ওসমান (রা.) ছিলেন খলিফা। এ সময় হযরত আবু যর গিফারী (রা.) সিরিয়া গেলেন। সেখানে তাহজীব ও তামাদ্দুন, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য এবং উন্নত ঘরবাড়ি সকলেরই ছিল। কিন্তু তাঁর ছিল যুহদ বা সংসারের প্রতি বৈরাগ্যভাবের প্রাধান্য। যে বাড়িতে যেতেন দস্তরখানায় উন্নত খাবারের প্রাচুর্য দেখতেন। তিনি লাঠি নিয়ে রেগে যেতেন। বলতেন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তারখানায় একাধিক আহারের ব্যবস্থা কখনো ছিল কি? তোমরা যে এসব খাবার যোগাড় করেছ? শুধু আমর বিল মারূফ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না; বরং লাঠি নিয়ে মারধর করার জন্যও তেড়ে যেতেন। মানুষ সম্মান করত। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর সম্মানার্থে দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়া হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ল। এভাবে কারো শরীরে দামী পোশাক দেখলে লাঠি হাতে নিতেন এবং বলতেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পোশাক কখনও পরেছিলেন কি? কারো ঘরে বাক্সের মধ্যে কয়েক জোড়া পোশাক রয়েছে শুনতে পেলে লাঠি নিয়ে পৌছে যেতেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চার জোড়া পোশাক রেখেছিলেন কি? তোমরা এত জোড়া রাখছ কেন? মারধর করার জন্য তৈরি হয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) এসব ঘটনাবলী হযরত উসমান (রা.)কে লিখে জানালেন এবং বলে দিলেন– তাঁর কারণে সাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ তাঁর মত যুহদ ও কানায়াত করবেন কেমন করে? ঐ যুহদ ও কানায়াত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল! উম্মতের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষ রয়েনে। কাজেই হযরত আবু যর গিফারী (রা.)কে আদেশ দেয়া হোক, তিনি যেন শহরে অবস্থান না করেন। অতএব খলিফার দরবার থেকে তাঁকে আদেশ দেয়া হল– রাবাকা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করুন। তিনি তাই করলেন। যেহেতু আমিরুল মুমিনীনের আদেশ ছিল অবশ্য পালনীয়– তাই মাথা পেতে নিলেন এবং সারা জীবনের জন্য শহর ত্যাগ করে জনমানবশূন্য ময়দানে চলে গেলেন। তাঁর হাতে টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। তাঁর মাযহাব ছিল সকালের আহারের পর বিকালের জন্য কিছু রেখে দেয়া জায়েয নয়। কিছু রেখে দেয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। শরীরে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অন্য কোন কাপড়ও ছিল না।

ওফাতের আগে আগে তিনি স্ত্রীকে বললেন, কেঁদো না, দরজায় বসে থাক। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে একটি কাফেলা আসছে। তাদেরকে তুমি বলবে– আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবীর ওফাত হয়েছে। আপনারা নেমে আসুন এবং তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করুন।

স্ত্রী বাইরে গিয়ে বসে থাকলেন। সত্যিই কিছুক্ষণ পর একটি কাফেলা দৃষ্টিগোচর হলো। ধুলাবালু উড়ছিলো, উটের উপর পাঁচ ছয়জনের একটি কাফেলা আসতে দেখলেন। যখন কাফেলাটি তাদের ঘরের কাছে আসল স্ত্রী বললেন– হে লোক সকল! আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী আবু যর গিফারী– তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী। আপনারা অবতরণ করুন এবং তাঁর দাফন কাফনের ব্যবস্থা করুন। জানাযার নামায পড়ুন। এ উষ্ট্রারোহী কাফেলার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও ছিলেন। তিনি উঁচুস্তরের সাহাবী ছিলেন। আবু যর নাম শুনে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললেন– صَدَقَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم আল্লাহর রাসূল সত্য বলে গিয়েছেন। وَيْحَكَ اَبِىْ ذَرٍّ يَعِيْشُ فَرِيْدًا وَيَمُوْتُ فَرِيْدًا ওহে! আবু যর একাকী জীবন যাপন করবে এবং মৃত্যুও আসবে একাকী। কাছে কেউ থাকবে না। আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন। ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে গেল।

তারপর ভেতরে প্রবেশ করলেন। দেখা হল। হযরত আবু যর তাঁকে পেয়ে

আনন্দিত হলেন। বললেন– আমার শেষ সময় আমার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করে দিন, আমার কাছে কাফনের কোন ব্যবস্থা নেই। একটি জামা ও একখানা লুঙ্গি– যা পরনে রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন কাপড় নেই। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)সহ সবাইকে সম্বোধন করে একথা বললেন। কোন ব্যক্তি আমাকে একটি চাদর দান করুন! তা হলে ঐ চাদর দিয়ে আবৃত করে আমাকে দাফন করে দেয়া হবে। যদি সুন্নত কাফন পাওয়া না যায়, তাহলে কোন মতে আবরণ হয়ে যাক। সুন্নত কাফনে তিনটি কাপড়ের প্রয়োজন হয়। ইজার, চাদর ও কাসিম। আর কাফনে কিফায়াত হলো একটি কাপড় দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে কাফন দেয়া। তাই বললেন, অন্তত কাফনে কিফায়াত যদি না মিলে তাহলে এ নিয়েই চলে যাই। আমার কাছে তো আর কিছু নেই। তাঁর যুহদ্ ও কানায়াত, তাকওয়া ও পবিত্রতার এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি বললেন, তোমাদের কেউ আমাকে একটি চাদর দান করো। এমন ব্যক্তি দান করবে, যে রাজকর্মচারী বা যাকাতের উসুলকারী নন। বললেন, যারা অর্থ দফতরের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা অসাবধানতার সঙ্গে কাজ করেন। হয়তো অতি উন্নত মূল্যবান মাল উসূল করেন, প্রজাগণ বিরক্ত হন। অথবা অনুগ্রহ ও ভদ্রতা দেখান এবং অল্প মূল্যের জিনিস গ্রহণ করেন। এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। ন্যায় ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন না। এজন্য এমন ব্যক্তির চাদর আমি গ্রহণ করব না যিনি অর্থ দফতরে নিয়োজিত রয়েছেন। অথচ তখন খেলাফতে রাশেদার যুগ। তাঁরা সকলেই সাহাবী। যাঁদের তাকওয়া ও পরহেজগারী বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ। কিন্তু হযরত আবু যর (রা.)-এর তাকওয়া ছিল এমন যে, তিনি তাদের মতো রাজকর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ করাকে তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আমার কাছে দুটি চাদর রয়েছে। এগুলো আমার আম্মা তার নিজ হাতে সুতা কেটে ঘরেই তৈরি করেছেন।

আবু যর (রা.) বললেন, হ্যাঁ যথেষ্ট হবে। আমাকে একটি চাদর দিয়ে দিন। তারপর তাঁর ওফাত হয়ে গেল। এ চাদর দিয়ে ঢেকে তাঁকে দাফন করা হল। উপস্থিত পাঁচ ছয়জন তাঁর জানাযার নামায পড়লেন।

আমি বলছিলাম, একদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পাঁচশ' টাকার পোশাক পরে আছেন, অন্যদিকে হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর কাছে ছেঁড়াফাঁড়া পুরনো কাপড় ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাপড় নেই। কিন্তু তার বুযুর্গী সর্বসম্মত। তিনিও শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ, ইবনে আব্বাসও শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। উভয়ই সাহাবী। আর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইজমা– الصحابة كلهم عدول رضى الله عنهم সকল সাহাবী মুত্তাকী পাক

পবিত্র নিষ্কলুষ ও কামেল ওলী। উম্মতের কোন বড় হতে বড় ওলী কুতুব সাহাবাগণের মর্যাদায় পৌছতে পারেননি; বরং সাহাবিয়াতের মর্যাদার ধূলিকণা পরিমাণও লাভ করতে পারেননি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও দু'অবস্থাই রয়েছে। পোশাকের উচ্চমান ও নিম্নমানের কোন সম্পর্ক বুযুর্গীর সঙ্গে নেই। বুযুর্গীর সম্পর্ক হল আত্মা ও কলবের সঙ্গে। উন্নত ও মূল্যবান পোশাক পরিধানেও তাদের নিয়ত নেক ও ভাল থাকে, বুযুর্গী উভয়ের মধ্যে সমান রয়েছে।

নবীগণের মধ্যেও বুযুর্গির দু'টি অবস্থা

আর আমি বলি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) থেকে বড় বুযুর্গ কে হতে পারে? তাঁদের জুতার তোফাইলে দুনিয়াতে বুযুর্গ পয়দা হন। বুযুর্গী বণ্টন করার জন্যই তাদের আগমন। তাঁদের ঘর থেকে বুযুর্গী বণ্টন করা হয়। নবীগণের (আ.) মধ্যেও দুটি অবস্থা রয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরের বাদশাহ। সিংহাসনে বসে আছেন। হযরত সুলাইমান (আ.) রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রাসাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনা নদী। অন্য দিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীরে যা ছিল তার অতিরিক্ত কোন কিছু তাঁর ছিল না। তাঁর সর্বমোট সামান কি ছিল? কাঠের একটি পেয়ালা, খাবারের বরতন ও ওজু করার পানির একটি পাত্র। এ দিয়ে পানি পান, ওযু, আহার সব কিছু করে নিতেন। জীবনের সরঞ্জাম একটি কাঠের পেয়ালা, চামড়ার বালিশ একটি। যেখানেই ঘুম আসে মাথার নিচে ফেলে ঘুমিয়ে পড়তেন। মাটির উপরে হলেও আপত্তি নেই। এই ছিল তাঁর সর্বমোট সম্পদ, সর্বমোট সামান।

একদিন কোথাও তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অঙ্গুল দিয়ে পানি পান করছে। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহু আকবার। এত দুনিয়া, আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছি। এসব ছাড়াও দুনিয়ায় চলতে পারে। এই ব্যক্তি পেয়ালা ছাড়াই পানি পান করছে। তাঁর নিজের পেয়ালাটি ফেলে দিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেন রাখবেন। থাকলো কেবল বালিশ। আরেক দিন দেখেন, এক লোক মাথার নিচে হাত রেখে ঘুমিয়ে আছে। বললেন, আল্লাহু আকবর! বালিশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামান, যা আমি রেখে দিয়েছি। এছাড়াও চলা যায়। মাথার নিচে হাত রেখেও ঘুমাতে পারি। এ দিন থেকে বালিশও ত্যাগ করলেন। তারপর আবরু ও ছতর ঢাকা বা লজ্জাস্থান আবৃত করার বস্ত্র ছাড়া আর কোন বস্তু তাঁর কাছে অবশিষ্ট থাকেনি। তিনি আল্লাহ তায়ালার শীর্ষস্থানীয় একজন পয়গাম্বর।

হযরত সুলাইমান (আ.) শীর্ষস্থানীয় পয়গাম্বর ছিলেন। এক স্থানে রাজকীয় আড়ম্বর, জাঁকজমক। অন্য স্থানে নেহায়েত দরবেশী; অথচ দু'জনই নবী, দু'জনই বুযুর্গ।

আসলে পোশাক দিয়ে যাচাই করা উচিত নয়। তবে যদি শরীয়তবিরোধী পোশাক হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। এ জাতীয় পোশাক নাজায়েয। কেউ পাজামা পরে এবং পায়ের গোড়ালির নিচে চলে যায়, তাহলে আপনি তাকে নসীহত করতে পারবেন। উপদেশ দিতে পারবেন– এ অধিকার আপনার রয়েছে। বলতে পারেন এমন করা জায়েয নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কেয়ামতের দিন এমন তিন ব্যক্তি হবেন যাদের দিকে আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি করবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো– المبل ازاره যার কাপড় গোড়ালির নিচে থাকে, হেঁচড়িয়ে চলাফেরা করে। এ হলো অহংকারের পরিচায়ক। অহংকারী ব্যক্তির প্রতি রহমতের নজর করা হবে না। আপনি এখানে আপত্তি করতে পারেন, কোন ব্যক্তি যদি রেশমের পোশাক পরে থাকে, তাহলে তা নাজায়েয। আপনার অধিকার রয়েছে, আপনি তাকে বলতে পারেন। পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক পরা জায়েয নয়। তাহলে যদি চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম হয়, কোন কারুকাজ করা হয়, তাহলে তা জায়েয। খালি রেশম জায়েয নয়। কেউ যদি শরীয়তবিরোধী কোন পোশাক পরে তাহলে আপনি আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু উন্নত ও মূল্যবান পোশাক পরার কারণে এ কথা বলা যায় না যে, এ ব্যক্তির অন্তরে বুযুর্গী নেই। তাহলে বলতে হয় هل شققت قلبه আপনি তার অন্তরে প্রবেশ করে দেখে আসুন যে, তার অন্তরে বুযুর্গী নেই। পোশাক দ্বারা বুযুর্গীর প্রমাণ হতে পারে না। ঘরবাড়ি উন্নতমানের হলে বুযুর্গীর স্বল্পতা বা শূন্যতা মানা যায় না। নবীগণ (আ.)-এর মধ্যে উভয় অবস্থাই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়া সকল শ্রেণীতেই উভয় অবস্থা বিদ্যমান ছিল। দেখতে হবে আত্মার অবস্থা কেমন, কোন স্তরের।

বিনয় ও নম্রতা বুযুর্গির প্রধান লক্ষণ

আসল আত্মা হল ঐ আত্মা যাতে বুযুর্গী রয়েছে। পোশাক যে কোন ধরনের হোক। এ আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত নানতুবী ও হযরত গাংগুহীর ঘটনা স্মরণে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, মূর্খ! তুই কি জানিস, বুযুর্গী কাকে বলে? আমার জন্য এ পুরাতন ও ছেঁড়া পোশাকও নিজ প্রকৃত্তিকে আয়ত্বে রাখা কষ্টকর। আর

তিনি এমন ব্যক্তিত্ব যে লাখ টাকা মূল্যের পোশাক পরিয়ে দাও, তবুও নফসে কোন পরিবর্তন হবে না।

এ কথা তো এভাবেই বলেছেন, মাওলানা গাংগুহীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল- মাওলানা কাসেম কোন স্তরের ওলী? তিনি বললেন, ভাই, আমরা একই সঙ্গে পড়াশুনা করছি। একই উস্তাদের ছাত্র, একই শায়খের মুরিদ। জীবন যাপন করছি একই সঙ্গে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তিনি এত এগিয়ে রয়েছেন যে, আমি তাঁর ধুলিকণাও পাইনি। তিনি কোথায় পৌঁছে গেছেন! একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলে অপর জনকে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে বলে বর্ণনা করতেন। বলতেন, আমি তার পায়ের ধুলাও পাইনি। কিন্তু বুযুর্গীর সর্বপ্রধান লক্ষণ হল বিনয় ও নম্রতা। নিজের নফসের নিকৃষ্টতা, হীনতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস থাকতে হবে এবং অপরের বুযুর্গী সম্পর্কে বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি একব্যক্তি অপরজনের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে এবং দাবি করে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম- তাহলে এ দাবিই বলে, তার অন্তরে বুযুর্গীর হাওয়া লাগেনি। বুযুর্গীতে দাবি দাওয়া থাকে না, অহংকার ও আস্ফালন থাকে না। দাবি আস্ফালন ও অহংকার ত্যাগের নাম বুযুর্গী। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বলা হবে বুযুর্গী অটুট আছে।

আজ আমরা আমাদের অবস্থার প্রতি তাকাই। প্রত্যেকেই বলছি, আমিই সর্বোত্তম, অমুক বা অন্য ব্যক্তি খুব খারাপ। আগের যুগের মুসলমানদের এই রীতি ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করতো অন্য সকলে ভালো, সব মন্দ নিজের মধ্যেই রয়েছে। বিনয় ও নম্রতার ফলেই বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। এখন আমরা অপরকে তুচ্ছ হেয় মনে করি এবং নিজেকে মনে করি সর্বোত্তম। নিজেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যের উপর সর্ব ধরনের জুলুম ও নির্যাতন করাকে বৈধ মনে করি। তাই বিশ্ব আমাদের নির্যাতনের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আমরা ফেতনা-ফাসাদ দিয়ে দুনিয়াকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর আগের বুযুর্গরা পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁদের এবং আমাদের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। তাঁদের কাছে বুযুর্গীর অর্থ ছিলো নিজের নফসের হীনতা দীনতাকে স্মরণ করো এবং অন্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করো। বলা হয়েছে ظنوا بالمؤمنين خيرا প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে ভাল ও নেক ধারণা পোষণ করো। যদি কোন মন্দ কথা শোন তাহলে তাবিল করে নাও, তার অর্থ বের করে নাও। ভাল অর্থ গ্রহণ কর। কিন্তু আমরা কারো ভাল ও নেক আমল দেখলে জোর জবরদস্তি করে হলেও এমন অর্থ করি যার দ্বারা তার উপর কোন দোষ আরোপিত হয়। এ হলো অপরিচ্ছন্ন ও কালিমাযুক্ত

অন্তরের পরিচায়ক। নইলে মুমিনের কাজ হলো কথাবার্তা কাজকর্ম অথবা ইবাদতে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে অর্থ বর্ণনা করবে এমনভাবে যাতে তার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। সে যেন দোষী অপরাধী সাব্যস্ত না হয়।

এজন্য উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– কোন মুসলমানের প্রতি নেক ও সুধারণা পোষণ করার জন্য কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সঠিক প্রমাণ না পেয়ে কারো প্রতি কুধারণা বা অসৎ ধারণা পোষণ করো না। এমন কথা জায়েয নয়। তাহলে এসব তখনই সম্ভব হবে যখন নিজের নফসে তুচ্ছতা ও হীনতা এবং অন্যের আযমত শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। মানুষ এ কথা বিশ্বাস করবে, আমি ছোট অন্যরা বড়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন যখন মানুষ এমন বলে যে, আমি মহান, আমি বড় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যরা হীন ও নিকৃষ্ট। সে অন্যকে নিকৃষ্ট লাঞ্ছিত মনে করবে। আর নিজকে মনে করবে ভদ্র ও সম্মানিত। এ থেকেই ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে। আপনি যখন অন্যজনকে বললেন, আপনিই বড়, আপনিই মহান। সেও উত্তরে যদি বলে আপনিই বড়, আপনিই মহান– তা হলে ঝগড়া ফাসাদ হয় কি করে? লড়াই হবে কি করে? কাজেই বিনয় ও নম্রতার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত শান্তি। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা রয়েছে অহংকার ও গর্ব গরিমার মধ্যে। যেখানেই আপনি ফাসাদ বিশৃঙ্খলা ও রক্তারক্তি দেখবেন, মনে করবেন এর মধ্যে কোন অহংকারী ঢুকে পড়েছে। বিনয় থাকবে যে জায়গায় সেখানে অশান্তি আসতে পারে না। সেখানে থাকবে কেবল শান্তি আর শান্তি; কল্যাণ আর কল্যাণই থাকবে। মুমিনকে বিনয় ও নম্রতা শেখানো হয়েছে। অহংকার ও গর্ব শেখানো হয়নি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার : কেবলই আল্লাহর শান

অহংকার আল্লাহর শান। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য অহংকার করা উচিত নয়। তিনিই কেবল অহংকার করতে পারেন। وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ আকাশে পাতালে, আসমান জমিনের সকল বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁরই জন্য। তাঁরই নাম আল মুতাকাব্বির। তিনি অহংকার ও গর্ব করতে পারেন।

হয়তো কারো মনে ছাত্রসুলভ প্রশ্ন জাগতে পারে। হাদীস শরীফে আদেশ করা হয়েছে– تخلقوا باخلاق الله আল্লাহর আখলাক ও গুণে নিজেকে গুণান্বিত করো। তিনি রহিম ও করিম। তোমরাও নিজেদের মধ্যে রহম ও করম, দয়া ও দানশীলতা সৃষ্টি কর। তিনি আলেম খবির– সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানী। তোমরাও

নিজেদের মধ্যে ইলম ও খবর পয়দা কর। জাহালত ও মূর্খতা দূর কর। তিনি লতিফ, তোমরাও নিজেদের মধ্যে লতাফত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন কর। তিনি হাফিজ– রক্ষাকারী; তোমরাও তোমাদের ভাইদের মধ্যে রক্ষক হয়ে যাও। আমাদের জন্য যখন এ আদেশ রয়েছে, তাহলে আল্লাহর সিফত ও গুণাবলীর মধ্যে মুতাকাব্বিরও একটি গুণ, একটি সিফত। কাজেই প্রত্যেকের অহংকারী হওয়া উচিত। তাহলে কেন বলা হয় যে অহংকার করা খুবই খারাপ। কারো অন্তরে এমন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর হলো– অহংকার করা মন্দ কাজ নয়। অহংকার করা আল্লাহর সিফত। আল্লাহর শান। তা মন্দ হয় কেমন করে? তাহলে মিথ্যা বলা খারাপ ও জঘন্য কাজ। এজন্য যে, আল্লাহ যখন বলবেন, আমি বড়। তখন তিনি সত্য বলছেন, আর আমি যখন বলবো আমি বড়, তখন তা মিথ্যা হবে। আর মিথ্যা বলা জঘন্য অপরাধ। অহংকার করা মন্দ নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অহংকার করবে, বড়ত্বের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী হবে। মিথ্যা বলা থেকে মানুষকে রক্ষা করা হয়েছে। এ জন্য تخلقوا باخلاق الله যথাস্থানে ঠিকই আছে। আর গর্ব অহংকারের অর্থ কি হলো। এ অর্থ হলো কখনো গর্ব অহংকার করো না, মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু যখন বিনয় ও নম্রতা করবে তখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। বিশ্ববাসী তোমাকেই বড় মনে করবে। তোমার মধ্যে তখন বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এসে যাবে। এক হলো বড়ত্বের দাবি করা, আরেক হলো আল্লাহর কাছে বড় হয়ে যাওয়া। অতএব আল্লাহর কাছে বড় হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাকে বড় করে দিবেন– এ বড়ত্ব গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তুমি যদি নিজেই দাবি করো আমি বড়, আমি শ্রেষ্ঠ তাহলে তা গ্রহণীয় হবে না। এ হলো আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলা করা। এমনটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে–

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيْ وَمَنْ نَازَعَنِيْ فِيْهِمَا قَصَمْتُهُ

অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি এটা নিয়ে যেতে চাইবে নিশ্চয়ই আমি তার গর্দান ভেঙ্গে দেব, আর অপদস্ত করে দেব। যে ব্যক্তি বড় কথা বলে, নগদ সাজা পেয়ে যায়। মানুষ দাঁড়িয়ে যায় তার বিপক্ষে। তাকে হেয় অপদস্ত করে দেয়। তার পেছনে লেগে থাকে। আর যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে বলে– আমি অধম, আমি নিকৃষ্ট, তাহলে অন্যরা তার প্রশংসা করে বলে– না আপনি বড়। আপনি বুযুর্গ, আপনি এমন, আপনি তেমন। বড় কথা বলা বড়ত্বের দাবি করা, নিচতা ও নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। এ কারণে অন্যরা তাকে অবশ্যই নিকৃষ্ট হীন মনে করবে। ছোট হও, তাহলে অন্যরা

বড় মনে করবে। বড়ত্ব লাভের নিয়ম দাবি করা নয়, বড়ত্ব দাবি ত্যাগ করা। এতে বড়ত্ব এসে যাবে। تخلقوا باخلاق الله দ্বারা যদি বুযুর্গী হাসিল করতে হয় তাহলে এর পথ হলো বিনয় ও নম্রতা; গর্ব অহংকার নয়।

আপনি যখন কোন পাহাড়ে আরোহণ করবেন তখন সামনের দিকে ঝুঁকে আরোহণ করতে হবে। আর যখন অবতরণ করবেন তখন মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে। নইলে অবতরণ করা দুষ্কর হবে। এ হলো লক্ষণ, তখনই উপরে উঠতে পারবে, যখন মাথা নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে চলবে। তা না হলে উপরে উঠতে পারবে না। কোনো এক কবি চমৎকার বলেছেন–

پستی سے سربلند ہو اور سرکشی سے پستی ☆ ہر راہ کے عجیب شیب و فراز ہے

যত বড় হতে চাও নিচে নিক্ষিপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি নিজেই পড়ে যায় তাকে উপরে উঠিয়ে দেয়া হয়। উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়া হয়। من تواضع لله رفعه الله যে খোদার জন্য বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে উপরে উঠিয়ে দেন।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তি যদি দাবি করে বলে, হে আল্লাহ! আমি নামায পড়েছি, হজ করেছি, আমি এত নেকি করেছি, আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ বলেন, অপদার্থ! তুমি কি করেছ? তাওফিক আমি দিয়েছি, বিবেক-বুদ্ধি আমিই দান করেছি, ইচ্ছাশক্তি আমি সৃষ্টি করেছি, তুই কি করেছিস!

আর যদি কেউ বলে– হে আল্লাহ! আমি তো কিছুই করিনি, আমি যে নামায পড়েছি, তাওফিক তুমিই দিয়েছ। তুমিই পথ প্রদর্শন করেছ, তুমিই আমাকে সাহস ও হিম্মত দান করেছ। সকল ভালো কাজ তোমার পক্ষ থেকেই হয়েছে, আমার দ্বারা কিছুই হয়নি। আল্লাহ তার প্রশংসা করেন, তার কাজকে অনুমোদন করেন। তাকে বলেন– না না, তুমি পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়েছ। হজের ইরাদা ও নিয়ত তুমিই করেছিলে। যে ব্যক্তি নত হয়ে যায়, ঝুঁকে যায় তাঁকে উঁচু করে দেন। আর যে ব্যক্তি নিজেই উঁচু হতে চায় তাকে নিচু করে দেন। এজন্যই সম্মান লাভের পথ হল বিনয় নম্রতা ও নিচু হয়ে যাওয়া। সম্মান এভাবে লাভ করা যায় না যে, আপনি ডান্ডা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, আমাকে সম্মান কর। নইলে আঘাত করব। এ পথ সম্মান লাভের নয়। সম্মান লাভের পথ হচ্ছে– আপনি অন্যদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করুন, তারা আপনাকে সম্মান করবে। আপনি সম্মানিত হয়ে থাকেন। তুমি ডাণ্ডা দিয়ে অন্যদেরকে অপদস্ত করে বলবে, আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করো; এ দ্বারা নিজের জন্য যিল্লত, অপদস্ততা ও অপমান সংগ্রহ করা হয়।

বিনয়-নম্রতা : মানবতার লক্ষণ

আসলে যে পর্যন্ত বিনয় ও নম্রতা, অন্যের খেদমত ও সেবাযত্ন না হবে, সে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সঠিক বন্দেগি পয়দা হতে পারে না। মাখলুককে অপদস্ত অপমানিত ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মানুষ নিজের অপমান, হীনতা ও নিকৃষ্টতার পথ পরিষ্কার করে। অন্তরে থাকবে আল্লাহর আযমত ও মহত্ত্ব, অন্যদিকে থাকবে তাঁর সৃষ্টিকুলের খেদমত, সেবা ও যত্নের আবেগ ও আগ্রহ। সৃষ্টিকুলের খাদেম ও সেবক হতে পারবে না, যে পর্যন্ত বিনয় নম্রতা হৃদয়ে না হবে। যে পর্যন্ত এই বিশ্বাস না হবে, সবার মধ্যে আপনিই ছোট, খুব মর্যাদাহীন। আমার কর্তব্য হল, তাদের খেদমত করা, সেবা ও যত্ন করা। এখন যদি রাস্তায় কাঁটা, কাঁচভাঙ্গা টুকরা পড়ে থাকে তাহলে একজন অহংকারী তা উঠিয়ে ফেলার জন্য নত হবে না। সে মনে করবে, এ কাজ আমার মর্যাদা ও পজিশনের পরিপন্থি। আমার সামাজিক মর্যাদা অনেক উপরে। মানুষ আমাকে কি বলবে? কিন্তু যদি বিনয়ী হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে ভাঙ্গা টুকরাগুলো নিজ হাতে উঠিয়ে ফেলে দিবে। যেন কারো কোন কষ্ট বা ক্ষতি না হয়। এ খেদমত সে করবে যার অন্তরে বিনয় ও নম্রতা থাকবে। যার মধ্যে অহংকার, গর্ব ও রিয়া থাকবে, সে কখনও এ খেদমত আঞ্জাম দিতে পারবে না। সৃষ্টির প্রতি সেবাযত্নের আবেগ উদ্দীপনা তখনই হবে, যখন অন্তরে আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা থাকে। অন্যভাবে এমনও বলা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হলে বিনয়ী অবশ্যই হবে। আর যদি নিজের বংশ শয়তানের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে তাহলে কখনও বিনয়ী হবে না; এজন্য যে, উভয়ের ত্রুটি হয়েছে। আদম (আ.)-এর থেকেও এবং শয়তান ইবলিশ থেকেও। আদম (আ.)-এর নিয়ত, অন্তর পাক পবিত্র ছিলো। ভুল করে একটি ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। আদেশ করা হয়েছিল এ গাছ থেকে ফল খেয়ো না। ভুল করে খেয়ে ফেললেন। এ তার নাফরমানি বা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দেশ অমান্য করা। এটা নির্দেশের বিরোধিতা ছিল না। তিনি জানতেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন; কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছিল, আমি তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। আদম (আ.)-এর সত্যবাদী হৃদয়। তিনি কোন প্রকার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সম্পর্কে অবহিত নন।

জান্নাতের চিরশান্তি ও সম্মানের স্থানে অবস্থান করছেন। এ সন্দেহও করতে পারেননি যে, কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে মিথ্যা বলতে পারে। যখন অন্তরে ঈমান থাকে তখন অন্যের প্রতি ধারণাও থাকে ভালো। অন্যকেও মানুষ সত্যবাদী ভালো মানুষ বলে বিশ্বাস করে। সে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করছে,

আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলার দুঃসাহস কেমন করে হতে পারে! তিনি মনে মনে এমনটাই ভেবেছিলেন।

আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন। নাম হযরত মিয়াজি মোল্লা শাহ মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব। তিনি দারুল উলুমের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নানা মাদারজাত ওলী ছিলেন। নিষ্পাপ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছেলেদের পড়াতেন। ঐ যুগে ঘড়ি ঘণ্টা ছিল না। এক স্থানে একটি খুঁটি পুঁতে রেখেছিলেন। যখন সূর্যের ছায়া ঐ স্থানে পৌঁছে যেতো তখন বলতেন, যাও এখন ছুটির সময় হয়েছে। ছেলেরা দুষ্টুমি করে খুঁটি অন্যখানে সরিয়ে গেড়ে দিত। ছায়া তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেত। ছেলেরা বলতো, মিয়াজি, ছুটি দিয়ে দিন, সময় হয়ে গেছে। বলতেন– আচ্ছা যাও। মানুষ বলতো– হযরত! ছেলেরা মিথ্যা বলছে। তারা খুঁটি সরিয়ে পুঁতে দিয়েছে। তখন বলতেন– মুসলমানের ছেলে মিথ্যা বলতে পারে না। মুসলমান ছেলেদের কাজ এটা নয়। বললেন– আচ্ছা ভাই, তুমি যাও।

সত্যিই যার অন্তরে ইসলাম এবং সত্য আছে তার মধ্যে নেক ও সুধারণার এতই প্রাবল্য থাকে যে, অন্য কেউ মিথ্যাবাদী, তা কল্পনাও করতে পারে না। বিশ্বাস করে যে সত্যই বলেছে। যখন আল্লাহর কসম করে বলে তখন তোমার ধারণাও হয় না যে সে মিথ্যা বলছে। শয়তান হলো অভিশপ্ত। সবকিছু যখন আল্লাহর কসম করে বলছে, তখন হযরত আদম (আ.)-এর মন গলে গেছে। বললেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলা মুসাফিল মনে হয়।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও হয়েছে, আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে– এ গাছ থেকে খেয়ো না। আদেশের বিরুদ্ধাচরণ যেন না হয়ে যায়। তখন শয়তান নিষেধের অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়ে বললো, এ আদেশ চিরস্থায়ী ছিল না। সবসময় তা থাকবে না। সময়ের জন্য এ আদেশ ছিল। এটা এজন্য করা হয়েছিল যে, ঐ গাছ থেকে খাওয়ার যোগ্যতা আপনার মধ্যে ছিল না। এখন জান্নাতে থেকে সে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। ঐ গাছ থেকে খেতে পারেন। যখন আপনি খেয়ে নিবেন, তখন থেকে চিরকাল জান্নাতে থাকবেন। জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে যাবেন।

জান্নাত শান্তি ও সম্মানের স্থান। এখানে চিরকাল বসবাস করার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা হযরত আদম (আ.)-এর স্বভাবজাত ছিল। শয়তান আল্লাহর কসম করে তাকে শুভাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলপ্রার্থী প্রমাণ করল, তাবিলও বলে দিল– নিষেধ হলো সাময়িক। সবসময়ের জন্য নয়। এসব কথার ফলে গাছ থেকে ফল খেয়ে ফেললেন। এ কে নাফরমানি বলা হয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নাফরমানি মনে হয়,

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাফরমানি ছিল না। একে ত্রুটি বা ভুল চিন্তা-ভাবনা ও বুঝের ভুল বলা হয়। একে নাফরমানি বা অবাধ্যতা বলা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন– وعصى ادم ربه فغوى । আদম নাফরমানি করলেন। প্রকৃতপক্ষে আদম শীর্ষ নবীও ছিলেন এবং আল্লাহর বান্দাও ছিলেন। নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দাদের থেকে সামান্য ত্রুটি হলেও তাদের সাথে সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় সম্পর্কের কারণে অধিক কঠোরতা করা হয়। যদি কোন শত্রু আপনাকে গালি দেয় আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কিছুই মনে করবেন না। শত্রুর কাজই হল এসব করা; কিন্তু যদি ছেলে সামান্য বাঁকা চোখে আপনাকে দেখে তাহলে মারধর করার জন্য তৈরি হবেন। তুই ছেলে হয়ে এমন কাজ করলি? সম্পর্কের দৃঢ়তার কারণে সামান্য কথাও বড় বলে অনুভূত হয়। আদম (আ.) নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন, পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি ভুল করে গাছ থেকে খেয়ে ফেলেছেন। তখন কঠোর ভাষায় সম্বোধন করে বলা হলো– তুমি নাফরমানি করছো? অর্থাৎ এত আপনজন হয়ে কেন তোমার ত্রুটি হল, তোমার জন্য এ ত্রুটিকেও নাফরমানি বলা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাফরমানি ছিল না। চিন্তা ও বুঝের ভুল হয়েছে মাত্র।

একদিকে শয়তানের ভুল হয়েছে; তাকে বলা হয়েছিল, তুমি আদমকে সেজদা করো। সে করেনি। আদম থেকেও ভুল হল, কিন্তু পার্থক্য কি ছিল? আদম (আ.) ভুল করে বললেন– رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا হে আল্লাহ! আমি জুলুম করেছি। আমি অপরাধ যদি নাও করি, তবুও দোষী। যতক্ষণ আপনি ক্ষমা না করবেন আমার কোনো আশ্রয় থাকবে না।

وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে সর্বাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমার উদ্ধার লাভ ও উন্নতির কোন উপায় থাকবে না। সর্বাবস্থায় আমি অপরাধী।

তিনি দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন। তখন খেলাফতের রাজমুকুট মাথায় রেখে দেয়া হল। সর্বকালের জন্য আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে গেলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কোটি কোটি আল্লাহর মকবুল বান্দা জন্ম নিলেন। তাদের দ্বারা জান্নাত আবাদ হবে।

শয়তান অপরাধ করে একথা বলেনি– আমার ভুল হয়েছে; বরং আল্লাহর আদেশের ত্রুটি অন্বেষণ করতে লেগে গেল। আপনি বলছেন, আমি আদমকে সেজদা করব। আমাকে আগুন দিয়ে এবং আদমকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

নত হওয়া মাটির কাজ। আগুনের কাজ নয়। আমি কেমন করে আদমের কাছে নত হবো। ঝুঁকে যাবো? সে সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সেজে গেলো। পরিণামে সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হলো।

আদম (আ.) ভুল স্বীকার করলেন। বিনয় নম্রতা ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করলেন। লাভ করলেন খেলাফতের মহা সম্মান। শয়তান করল অহংকার, লাভ করলো চিরকালের জন্য অভিশাপ। সে বলেছিলো انا خير منه আমি শ্রেষ্ঠ, আদম শ্রেষ্ঠ নন। সেখান থেকে আনা নিয়ত বা আমিত্ব চালু হল। যে ব্যক্তি আমিত্ব দেখাবে সে যেন তার বংশ শয়তানের সঙ্গে জুড়ে নিলো। আর যে বলে, আমি অধম আমি নিকৃষ্ট; সে আদমের সন্তান। কেননা অনুনয় বিনয় করা, আল্লাহর জন্য তাওয়াজু করা, আদম (আ.)-এর কাজ ছিল। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

كلكم بنو ادم من تراب

তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি দ্বারা সৃষ্টি, মাটির কাজ এটা নয়– গর্ব করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে।

মাটি যত পদদলিত হবে, উপকারী হবে। মাটি যদি লাফ মেরে কাপড়ে লেগে যায় তাহলে অভিশাপ করা হবে। কাপড় ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হবে। যদি চোখে লাগে তাহলে ক্ষতি হবে। চোখ ধুয়ে পরিষ্কার করা হবে। জুতা নিচে থাকলে সম্মানিত থাকবে। উপরে উঠলে অপমানিত হবে।

মানুষ তেমনি বিনয় করে মাটি হয়ে যাবে। তাহলে মাথার উপর উঠিয়ে রাখা হবে। আর যদি অন্যের উপর থাকতে চায় তাহলে ধাক্কা মেরে নিক্ষেপ করে পদদলিত করা হবে। অহংকার করার আসল অর্থ হল, নিজের বংশকে শয়তানের সঙ্গে জুড়ে দেয়া। আর বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করার অর্থ আদম (আ.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আমরা যতই আদমের সন্তান হতে পারব, ততই সম্মানের পাত্র হব। যে পরিমাণ নিজেকে অহংকার ও আমিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করবে সে পরিমাণ অপদস্ত হবে।

আল্লাহর মাখলুকের খেদমত ও সেবা ঐ ব্যক্তি করতে পারবে যার মধ্যে আমিত্ব না থাকে। যে ব্যক্তি বলবে– انا خير منه (আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ) তার কি প্রয়োজন অন্যদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য মাটি, ঢেলা, কাঁটা, কাঁচের টুকরা উঠিয়ে ফেলে দেয়ার? সে বলবে– আমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সবাই আমার বাহবা করবে। আমি কারো খেদমত কেন করব? কাঁটা উঠিয়ে রাস্তা পরিষ্কার কেন করব? কিন্তু বিনীত ব্যক্তি বলবে– আমি মাখলুকের খেদমতের

জন্য জন্ম লাভ করেছি। খেদমত করাই আমার কাজ।

আসলে আমার আরজ করার উদ্দেশ্য হলো– ঈমানের দুটি রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে। এক. التعظيم لامر الله আল্লার নির্দেশাবলীর আযমত করা, গুরুত্ব দেয়া। আর তা হতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহর আযমত, বুযুর্গী ও বড়ত্বে অন্তর পরিপূর্ণ না হবে। দ্বিতীয় হলো الشفقة على خلق الله আল্লাহর মাখলুকের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করা। তাদের জন্য ব্যথিত হওয়া তার খেদমত ও সেবা করা। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা না হবে। আমিত্ব ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে না থাকবে। এ দুটি কথা অন্তরে একত্রিত হয়ে গেলে বলা হবে– এ ব্যক্তির মধ্যে ঈমান রয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ শান রয়েছে। একদিকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক এবং অন্যদিকে মাখলুকের সঙ্গেও মিল রয়েছে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে তার মধ্যে অহংকার আসে না। আমি আল্লাহর মকবুল বান্দা। মাখলুক আমার সমপর্যায়ের নয়। একে পদদলিত করে দাও। আবার মাখলুকের কাছে গিয়ে একথা বলো না, আমি দিনরাত পরিশ্রম করেছি, সুখ-শান্তি ত্যাগ করেছি। আল্লাহর বন্দেগীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? বন্দেগি ও খেদমত যার পূর্ণাঙ্গ, ঈমানও তার কামেল ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

লজ্জাশীলরাই ইবাদত ও খেদমত করতে পারে

কিন্তু এ কাজ কে করতে পারবে? যার মধ্যে আল্লাহর প্রতি লজ্জা রয়েছে সেই পারবে। কেউ যদি লজ্জাহীন হয়ে পড়ে তাহলে সে ইবাদত করবে না, খেদমতও করবে না। হায়া ও লজ্জা একটি মহান বস্তু। হায়ার তাৎপর্য হলো বিনয়, নম্রতা ও নতিস্বীকার। নফসে বিনয় নম্রতা থাকবে, মন মানসিকতা এমন হবে– অন্যের মান-সম্মানের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করবে।

ঐ অন্তরে ঈমান অবতরণ ও অবস্থান করে যে অন্তরে হায়া ও লজ্জানুশীলতা থাকে। ঐ হৃদয়ে বাসা বাঁধে যে হৃদয়ে হায়া আছে ও থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন–

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً

ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি বিভাগ ও শাখা রয়েছে। সবচে' উপরের শাখা হলো– لا اله الا الله –আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এটা হলো প্রমাণ, আল্লাহর আযমত অন্তরে এই পরিমাণ স্থান করে নিয়েছে– তিনি ছাড়া অন্যকে মাবুদ বলে

স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। আর ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো– الاذى عن الطريق অর্থাৎ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস তুলে ফেলে দেয়া, যাতে মাখলুকের কোন কষ্ট না হয়। ঈমানের উপরের প্রান্ত যা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত এবং উভয়ের মূল বলা হয়েছে–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ الْاِيْمَانِ

এ দুটি কাজ ঐ ব্যক্তিই করবে যার মধ্যে হায়া, বিনয় ও নতিস্বীকার করার মানসিকতা রয়েছে। যার মধ্যে হায়া নেই– اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ যখন মানুষের মধ্য থেকে হায়া চলে যায় তখন সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। দেহ যখন প্রাণহীন হয়ে পড়ে যা করে করতেই থাকে। এ হাদীসে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়ে যাওয়ার অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে, এর জন্য একদিকে আল্লাহর ইবাদত রয়েছে। এর সর্বোত্তম কথা হল– لا اله الا الله উচ্চারণ করা। যখন মুখে পাঠ করতে থাকবে তখন অন্তরেও স্থান করে নিবে। আর অন্তরে যখন স্থির হয়ে যাবে অবশ্যই তখন প্রত্যেক কাজে একত্ববাদ প্রকাশ পাবে। সবসময় যিকির হতে থাকবে। উঠা-বসায়, চলা-ফেরায়; যাকির হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় হলো, সৃষ্টির সেবা করা; এর সম্পর্ক হায়ার সঙ্গে। যে পরিমাণ হায়া থাকবে সে পরিমাণ সৃষ্টির প্রতি দয়া ও মেহেরবানী থাকবে। তাদের সেবা করবে। আমি এই হাদীস পাঠ করেছিলাম এবং এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরজ করলাম। আমি আরজ করেছিলাম, দীর্ঘ সময় বলতে পারব না, তবু কিছুটা দীর্ঘ হয়েই গেল। এর উপরই কানায়াত করলাম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও হায়া নসীব করুন। আমিন, আমিন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. اَللّٰهُ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَذَ ايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ اٰلِه وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ৯

শিক্ষা ও প্রচার

সত্য কথা অন্যদের কাছে পৌঁছানো, দীনের তাবলীগ প্রচার ও প্রসারের কাজ খুবই আমানতদারী ও সতর্কতার সঙ্গে করাই আল্লাহর নির্দেশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজ করবে সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। যদি অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাহলে ভয় কিসের? চিন্তা কিসের?

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه وَنَعُوْذُ بالله منْ شُرُوْر اَنْفُسنَا وَمنْ سَيِّات اَعْمَالنَا، مَنْ يَّهْده اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ الهَ الاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللهُ الىٰ كَافَّــة لِّلنَّاس بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعيًا اِلَيْه باذْنه وَسرَاجًا مُّنــيْرًا. صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْه وَعَلىٰ اٰله وَ اَصْحَا بِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّــا بَعْدُ:

وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الإِنسَــٰنَ لَفِى خُسْرٍ ○ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّــٰلِحَــٰتِ ○ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ○

বুযুর্গানে মুহতারাম!

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নবুওয়াতি জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। মক্কী জীবন এবং মদনী জীবন। মক্কী জীবন ছিল তেরো বছর এবং মদনী জীবন দশ বছর।

মক্কী জীবন

দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা, জুলুম ও নির্যাতনের এক দীর্ঘ করুণ জীবনেতিহাস হলো মক্কী জীবন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন– 'কোন নবী নিজের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেননি, যা আমার জাতি ও সম্প্রদায় আমাকে দিয়েছে।' তবে এত দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতেনের পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের প্রচার ও প্রসার, তাবলীগ ও ইশায়াতের কাজ পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সঙ্গে করতে থাকেন। মুশরিকদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণে তাঁর অন্তরে যে ব্যথা ও দুঃখ-কষ্ট জন্মেছিল, তার প্রেক্ষিতে খোদ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– আপনি আপনার অন্তর ব্যথিত ও বিষণ্ন করবেন না; বরং নিজের কাজে ব্যস্ত থাকুন। আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপর আমল করতে থাকুন। তাঁর হামদ ও সানা, প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করতে থাকুন। তাঁর প্রেরিত দীনের তাবলীগ ও প্রচারে লেগে থাকুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল, গণক জাদুকর– আরো কতকিছু বলা হয়েছে। তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁকে বিষ খেতে দেয়া হয়েছে। এমন কোন অভদ্র আচরণ নেই যা তাঁর সঙ্গে করা হয়নি। এত কিছুর পরও তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের মিশনকে সফলকাম করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। চেষ্টা ও তদবিরে লেগে থেকেছেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও তাঁকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ جَمِيلاً.... فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ.

আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন আপনার আগে অন্যান্য মহান ও সাহসী পুরুষগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। ধৈর্যের দামন হাত ছাড়া করবেন না। তারপরও মূর্খরা যদি সত্য গ্রহণ না করে, সন্দেহ ও আপত্তি করে তাহলে আপনি আপনার

অন্তরকে ব্যথিত ও বিষণ্ন করবেন না। لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি।

জেহাদে কবির বা মহান জেহাদ

এটা ইসলামের পরিপন্থী বলে মনে হয়– প্রহৃত হবে, দুঃখ-কষ্ট, আপন-বিপদ সহ্য করবে– এর উদ্দেশ্য কি তা বুঝে আসে না। আসলে তা নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার আদেশ এই ছিল– সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর। মুখ দিয়ে উহ্ করো না। এর অর্থ এই নয়– প্রতি উত্তর দিবে না। উত্তর দিতে হবে এবং কঠোরভাবে দেয়া হবে। যদি তরবারি দিয়ে দেহে আক্রমণ করা হয়, তাহলে কথা দিয়ে তাদের আত্মার উপর আক্রমণ করে উত্তর দেয়া হবে। দীনের কথা তাদের কাছে পৌঁছলে তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়া হবে।

এক আরবি কবি চমৎকার বলেছেন–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيْئِكَام ○ وَلاَ يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

বর্শার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত শুকিয়ে যায়, ভরে যায়, কিন্তু জবান দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত থেকে সবসময় রক্ত ঝরতে থাকে, শুকায় না।

মুখের জেহাদই প্রধান জেহাদ। একে জেহাদে কবির বলা হয়েছে। কেননা তলোয়ার দিয়ে যে জেহাদ করা হয় তা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র, কষ্টও কিছুক্ষণের জন্য হয়। কিন্তু দীনের দাওয়াতের যে জেহাদ জবান দিয়ে করা হয় তা কষ্ট ও বেদনার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোরতম হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে আঘাত হতে থাকে। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– বীর কে? মানুষ উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে হত্যা করে ফেলে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না, বীর ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসকে হত্যা করে দেয়। দাওয়াতের কাজ হল জেহাদে কবির। এতে মানুষকে গালি শুনতে হয়, দোষারূপ সহ্য করতে হয়, দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত সহ্য করতে হয়। আর যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে মানুষ লড়াই যুদ্ধ করে, তারপর হত্যা করে অথবা নিজেই নিহত হয়।

মহাবিপ্লব

ইসলাম তার অনুসারীদের সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা দিয়ে কাপুরুষতা ও ভীরুতার প্রতি আহ্বান করেনি; বরং সাহস ও বীরত্বের দাওয়াত দিয়েছে এবং নিজেদের মিশনকে সফলকাম করার জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়ার ও ধৈর্য ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। আর বলে দিয়েছে– এভাবে ধৈর্য ধারণে সফলতা লাভ করা যায়। মক্কার জিন্দেগি দেখুন– মোট ১৩ জন ইসলম গ্রহণ করেছেন। এ সময় তিনি দারে আরকামে বন্দি হয়ে থাকতেন। সংখ্যাও অল্প, প্রভাব প্রতিপত্তি শূন্যের কোঠায়। কিন্তু দীনের তাবলীগ ও প্রচারে সর্বদা ব্যস্ত। সত্যের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকলেন। দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে থাকলেন এবং নিজেদের জবান ও কথা দিয়ে কাফেরদের অন্তরে অস্ত্রপচার করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অবিরাম পরিশ্রম ও চেষ্টার বরকতে মহাবিপ্লব হয়ে গেল। সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হলো, অপমান নির্যাতনের পরিবর্তে সম্মান ও সমৃদ্ধি আসল। এ বিপ্লব ও পরিবর্তন তলোয়ারের জেহাদে হয়নি; বরং জবানের ঐ জেহাদে হয়েছিল, যাকে জেহাদে আযিম– মহাবিপ্লব বা জেহাদ বলা হয়েছে। কীভাবে হলো? সাহাবীগণ কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু সাহস হারাননি। মক্কী জিন্দেগির সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা মিল রয়েছে। আমাদের বিষয় সম্পত্তি রয়েছে। আইনানুগ মৌলিক অধিকারসমূহ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যর স্বাধীনতা রয়েছে। অথচ ইসলামের প্রাধান্য, ইসলামের বিধান প্রচলিত নয়। তাহজিব ও তামাদ্দুনের সব কথাই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ কথাই আল্লাহর নামে গ্রহণ করা হয় না। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কোন কথাই মানানো যাবে না। তাহজিব ও তামাদ্দুনের নামে সব কথাই মানানো যাবে। وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ সব ক্রোধ সব অভিযোগ শুধু এ কারণে যে আল্লাহর নাম বলা হয়। এখানে হল জড়বাদী ও আঞ্চলিকতার উপাসনা। শুধু আল্লাহর উপাসনা আমাদের জীবনে নেই। আজ আমরা তলোয়ার দিয়ে শক্তি পয়দা করতে পারব না। বরং এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে শক্তি ও সামর্থ পয়দা করতে পারি। আজ আমাদের কামিয়াবী, সফলতা ও কল্যাণ দাওয়াতের মধ্যেই নিহিত। দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ আমাদের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে সক্ষম। আমাদের ঐ শক্তি পয়দা করে দিতে পারে, যে কোনো শক্তি আমাদের মোকাবিলা করলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

নাজাত ও মুক্তির উপায়

সত্য কথা অন্যদের কাছে পৌঁছানো, দীনের তাবলীগ প্রচার ও প্রসারের কাজ খুবই আমানতদারী ও সতর্কতার সঙ্গে করাই আল্লাহর নির্দেশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজ করবে সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। যদি অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাহলে ভয় কিসের? চিন্তা কিসের? সরকারের সাধারণ কর্মচারী যখন সরকারি কাজে যায় তখন তার কত সাহস থাকে! তার সাহস শুধু এ কারণে হয়, সে রাজকর্মচারী। যদি কেউ তার উপর আক্রমণ করে তাহলে এর অর্থ হবে, সে সরকারের উপর আক্রমণ করেছে। দীনি কাজ সম্পাদন করে আমাদের অন্তরে এ ধারণা ও বিশ্বাস থাকা উচিত। আমরা এ দেশে এবং বর্তমান অবস্থায় যদি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি তাহলে কেবল মাজহাবের নামে রক্ষা করতে পারি। এছাড়া আমাদের মুক্তির অন্য কোনো উপায় নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ○ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

কালের শপথ! সময় চলে আসছে এবং চলে যাবে। সময় সব জড় পদার্থকে বেষ্টন করে রেখেছে। স্থান ও পাত্র নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, আর জমানা অনবরত ঘোরপাক খাচ্ছে। সবচেয়ে প্রশস্ত হলো জমানা। জমানার বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তায়ালা জমানার শপথ করে বলছেন। শপথ হলো সাক্ষ্যের স্থলবর্তী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জমানাকে সাক্ষী রেখে বলছেন, মানুষ জাতি অত্যন্ত লোকসানে আছে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে অর্থাৎ ঈমান গ্রহণকারী ছাড়া সবাই ক্ষতি ও লোকসানের মধ্যে আছে।

ঈমানের শক্তি

ইতিহাস দেখুন, হযরত আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত জয় ও সফলতা ঐসব মানুষের হয়েছে, যারা ঈমানদার ছিলেন। আর যেসব মানুষ ঈমানদারদের বিরোধিতা করেছে, তাদের উপর জুলুম ও নির্যাতন করেছে, তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তারা অপদস্ত লাঞ্ছিত হয়েছে। ফেরাউন, হামান, আবু জাহল, আবু লাহাব এবং তাদের মত বিত্তশালীকে যারা নিজ নিজ যুগে ঈমানওয়ালাদের কষ্ট দিয়েছে, জুলুম ও নির্যাতন করেছে– পরিণামে নিজেরাই অপদস্ত লাঞ্ছিত হয়েছে, কষ্ট পেয়েছে।

একটি সংশয় ও তার মোচন

সফলতা অর্জন যদি করতে হয়, তাহলে ঈমানদার হতে হবে। পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে– لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ মানুষ তার চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই উপকৃত হবে। অন্যের শ্রমে তার কোন উপকার হবে না। কিন্তু হাদীস শরীফে এর বরখেলাফ বলা হয়েছে। যদি সওয়াব অন্যকে দান করা হয় তাহলে সওয়াব ঐ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে। এর অর্থ হলো– একজনের শ্রম দিয়ে অন্যের উপকার হয়। তাহলে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থেকে যায়।

মুফতি আজিজুর রহমান সাহেব একজন আল্লাহভীরু আলেম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন, আমি জালালাইনে এ আয়াত পাঠ করলাম এবং হাদীসের কিতাবে ইসালে সওয়াবের এ হাদীস দেখলাম। উভয়ের মধ্যে বিরোধ মনে হলো। অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম, অনেক কিতাব পাঠ করলাম, কিন্তু কোনভাবেই বষিয়টি পরিষ্কার হল না। রাতে শোয়ার জন্য ঘরে গেলাম, শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ খেয়াল হল, যদি রাতে মারা যাই তাহলে দু'টির একটি অবশ্যম্ভাবী। হয়তো হাদীস অস্বীকার করতে হবে অথবা কুরআন। কোনভাবেই ঈমানের নিরাপত্তা নেই। এ খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে হেঁটে রওনা হলাম গংগুহ। বাইশ কিলোমিটার সফর রাতেই শেষ হলো। ভোরে গংগুহ গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাওলানা গংগুহী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছিল। তখন তিনি ওজু করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন– কেন এসেছো? আরজ করলাম– আয়াত ও হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ মনে হচ্ছে। তার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। এজন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। মাওলানা গাংগুহী বললেন– কুরআনের আয়াত لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ দ্বারা ঈমান মুরাদ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ঈমান গ্রহণ না করে তাহলে অন্যের ঈমান দিয়ে তার কোনো উপকার হবে না। আর হাদীস দ্বারা মুরাদ হলো আমল। ঈমান অন্যকে দান করা যায় না, তবে আমল দান করা যায়।

সাধারণ তাবলীগ সবারই কর্তব্য

আল্লাহ তায়ালা যুগ ও কালের শপথ করে বলছেন, মানবজাতি ক্ষতি ও লোকসানে রয়েছে। তবে শুধুমাত্র ঈমানদারগণ এবং সেসব মানুষ এ থেকে

নিরাপদ রযেছেন, যারা একে অন্যকে হক ও সত্য, সবর ও ধৈর্যের অসিয়ত করে থাকেন এবং অন্যদেরকে নেককার বানানোর জন্য চেষ্টা করেন। দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ এজন্য শুরু করা হয়েছে। কেননা সাধারণত মনে করা হয়, তাবলীগের কাজে শুধু আলেমরা আসলে তাবলীগের সময় ঐসব মাসয়ালা যেন বর্ণনা করা না হয়, যেগুলোতে মতবিরোধ রয়েছে এবং এগুলো প্রয়োজনবোধে উলামায়ে কেরাম বয়ান করবেন। সাধারণ তাবলীগ সবার জন্য জরুরি। উম্মতের সকলের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

এ আয়াতে এই উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং لِلنَّاسِ মানুষের জন্য বলা হয়েছে لِلْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের জন্য বলা হয়নি।

তাবলীগের জন্য জামাতবদ্ধ হওয়ার নিয়ম

কয়েক বছর আগে হিন্দুস্থানের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ মাওলানা ইলিয়াস সাহেব শুরু করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে এ পদ্ধতি ঢেলে দিয়েছেন। তিনি তাবলীগের জন্য জামাতের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কেননা নিয়ম রয়েছে, যখন কিছু মানুষ দলবদ্ধ হয়ে এক কথা বলেন বা কোন কাজ করেন তাহলে এর বিশেষ প্রভাব হয়। একই কথা যখন বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেন, তখন এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইয়াসিনে বলেন–

ذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ.

আমি যখন তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ করলাম, তখন তারা অগ্রাহ্য করল, মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল, মিথ্যাবাদী বলল। যখন তৃতীয় রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে ধন্য করলাম, তাঁরা বললেন– আমাদেরকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এজন্যই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য জামাতী নিয়ম গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি অনুভব করেছেন– বর্তমান যুগ হলো সাংগঠনিক যুগ। খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারিগরি, কৃষি– মোটকথা সব বিষয়ে সাংগঠনিকতা রয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, জনসভা করা হয়, সব বিষয়ে দলই কার্যকর হয়। দলবদ্ধ পরিবেশে ব্যক্তি বিশেষের কথা ও কাজ ক্রিয়াশীল হয় না। এসব চিন্তা-ভাবনা করে

মাওলানা মরহুম জামাতকে দলবদ্ধ রূপদান করে কাজ শুরু করেছেন। যখন জামাতবন্দী হয়ে কারো কাছে যাবেন এবং বিছানায় গাঁট কাঁধে নিয়ে পায়দল চলবেন, ক্লান্তি ও পরিশ্রমের চিহ্ন চেহারায় দেখা যাবে, তখন ঐ ব্যক্তি অবশ্য এ চিন্তা করবে– এসব মানুষ আমার কাছে কেন আসবেন? আমার সঙ্গে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত নেই। তাহলে কী জিনিস তাদেরকে এত সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করল? তারা যা বলছে, নিশ্চয়ই তা সঠিক হবে। এ দ্বারা সে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে।

তাবলীগ জামাত এবং মহাবিপ্লব

মনে হয় আমি কোথাও লিখেছি, তাবলীগকে আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয় হিসাবে ঢেলে দিয়েছেন। এতে তালিম ও তরবিয়ত এমন– আত্মার প্রশান্তি, শরীরের ব্যায়াম সব কিছু রয়েছে। বর্তমান যুগে এ কাজ অত্যন্ত উপকারী ও অবশ্য করণীয় হয়ে পড়েছে। এ কারণে এ কাজটি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক জনপদ এবং হিন্দুস্থানের বাইরে, আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই তাবলীগী জামাত, তাবলীগী কাজ দেখেছি। লোক দেখানো কাজ এভাবে বিশ্বব্যাপী হতে পারে না। এতে নেই কোন ফেতনা ফাসাদ, হাঙ্গামা। আপনারা কোথায়ও শুনেন নি, তাবলীগ জামাতের মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করছে, ফাসাদ সৃষ্টি করছে। এ এক নীরব তাবলীগ, যা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। এ জামাতের মকবুলিয়ত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাবলীগে বের হওয়ার উপকারিতা

তাবলীগের কাজ মানুষকে তার ঘর থেকে বের করা। সেখানে সে অন্য পরিবেশ পায়। উভয় পরিবেশে অনেক পার্থক্য। এখানে তাকে আহ্বানকারী এবং আমলকারী দু'টিই হতে হয়। আহ্বানকারী হয়ে আসে এবং আমলকারী হয়ে ফিরে যায়।

তাবলীগের উদ্দেশ্য

হযরত সুফিয়ান সাওরী একবার বললেন, আমার ইলম হাসিল গায়রুল্লাহর জন্য। কিন্তু যখন ইলম হাসিল হয়ে গেল, তখন তা কেবল আল্লাহর জন্য। এ তাবলীগী কাজের একটি নীতি রয়েছে। সময় বের করারও রীতিনীতি রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য হলো, আত্মার পরিশুদ্ধি হোক। দুনিয়ার সকল কলুষ থেকে মুক্ত হোক। আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতি হোক এবং শয়তানি শক্তি পরাভূত হোক।

নিঃস্বার্থ খেদমত

বর্তমানে অনেক আন্দোলন চলছে, কিন্তু এ আন্দোলন আদর্শ ভিত্তিক, নজিরবিহীন। এখানে পদ লাভের কোন ঝামেলা নেই। কোন পদবিও নেই। কোন সিট নেই, কোন আনন্দ নেই। বরং নিজের টাকা ব্যয় করতে হয়। নিজের পকেট শূন্য করতে হয়। এ সংগঠন ও আন্দোলন বর্তমান যুগে দীন রক্ষার জন্য এক বিরাট আশ্রয় কেন্দ্র। কোন কোন রাজ্যের মূলনীতি হয়ে থাকে কল্পনার উপর এবং টিকে থাকতে হয় সংগ্রামের উপর। এখানে কিন্তু এর বিপরীত। এখানে স্থায়িত্বের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, উৎসর্গ করার মূল কার্যকর রয়েছে। দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পরিবর্তে প্রেমপ্রীতি রয়েছে। ক্ষমতা লাভের জন্য দল গঠন করা হয়। আর এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দল হয়ে যায়।

দু'টি আশ্রয় কেন্দ্র

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি, এ যুগে মুসলমানদের জন্য দুটি আশ্রয় শিবির রয়েছে। দীনি মাদ্রাসা ও তাবলীগী কেন্দ্র। তাবলীগী কাজকর্ম তালিমদাতাগণ বাইরে থেকে মানুষ একত্রিত করেন। তারপর শিক্ষা প্রদান করেন। তাবলীগের লোকেরা সমবেত মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান।

শরীক হবার আহ্বান

তাবলীগী কাজ একটি মৌলিক কাজ। এর উপর জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভরশীল। যারা এ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, নিজের সময় ব্যয় করেন, তাঁরা আরও সময় ব্যয় করেন। এতদিন যদি অল্প ব্যয় করে থাকেন, তাহলে এখন আরো বেশি সময় ব্যয় করুন। প্রধান প্রমাণ হল, নিজের আমল। আমলের অনেক ফায়দা হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ তার কথা সুন্দর করে পেশ করে। কিন্তু যদি তার কথা তার আমল অনুরূপ হয়, তাহলে ভাল। নইলে তার ধ্বংসের কারণ হবে। এভাবে প্রত্যেক কাজের কিছু নিয়ম আছে, নীতি আছে, বিধি-বিধান আছে। সীমা থাকে– এভাবে কাজ করতে

হবে, যেন অন্যের হক নষ্ট না হয়। মানুষের উপর তার নফসের, তার প্রাণের, তার স্ত্রীর, ছেলে মেয়ের, নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির হক রয়েছে। মানুষ যদি একটি হক আদায় করে এবং অন্য অনেক হক পদদলিত করে, তাহলে তা ভাল কথা নয়। ভালভাবে হক আদায় করবে এবং অন্যের হক নষ্ট করবে না। পানাহার করো, এ হলো নফসের হক। রোযাও রাখ এবং আল্লাহর হকও আদায় কর।

দাওয়াতি কাজের মুনাফা

আজ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে ভারতে মুসলমানদের জন্য মুক্তি ও কল্যাণের একই পথ, দাওয়াতি কাজ করে যাওয়া। এ কাজ মুসলমান সম্প্রদায়কে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে। এ কাজ যারা করে তারাই উন্নতি লাভ করে। এ কাজ যারা করে তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. اَللّٰهُ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَذَ ايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ اٰلِه وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ১০

তাবলীগ জামাত ও সংশোধন

মন্দ, অকল্যাণ ও ধ্বংস বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তখন খায়র ও কল্যাণ আসে; আর যদি পরিশ্রম না করে তাহলে তা আসে না। বরং আপনা-আপনিই মন্দ, অকল্যাণ ও ধ্বংস ভেতর থেকেই প্রকাশ পাবে। এটা জগতের একটা সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তায়ালার সুন্নত এভাবে চলে আসছে। এ বিশ্বের প্রধান সৃষ্টি মানবজাতি। মানবজাতির পক্ষেও নীতি থেকে আলাদা থাকা সম্ভব নয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِه وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّـــابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এখন তাবলীগ সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করা আমার উদ্দেশ্য। কথাগুলো এবং উদ্দেশ্যাবলী নতুন কিছু নয়। তবে শিরোনামে পার্থক্য আছে। আমি উদ্দেশ্য বর্ণনার আগে ভূমিকা হিসেবে একটি মূলনীতি বর্ণনা করতে চাচ্ছি। মূলনীতি বুঝে নেয়ার পর উদ্দেশ্যগুলো সহজে বুঝে আসবে।

এ মূলনীতি হলো– এ পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা পরস্পর বিরোধী শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মৌলিক বস্তুর মোকাবেলায় একটি বিপরীত বস্তুর সংঘাত সর্বদা চলছে। আপনারা দেখছেন ইসলামের বিরুদ্ধে কুফর; তাওহিদ ও একত্ববাদের বিরুদ্ধে শিরক ও বহুত্ববাদ রয়েছে। এখলাছের বিরুদ্ধে নেফাক বা কপটতা রয়েছে। সত্যের বিপরীতে মিথ্যা; অন্ধকারের বিপরীতে আলো; দিনের পরিবর্তে রাত রয়েছে। এভাবে দুনিয়াতে খায়র-শার্র, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দ সবই সমানভাবে রয়েছে। পৃথিবীকে কেবল খায়র ও কল্যাণের স্থান বলা যায় না। শুধু শার্র ও অকল্যাণের স্থানও বলতে পারবেন না। শুধু খায়র ও কল্যাণ, সুখ ও শান্তির জগত হলো জান্নাত। আর কেবল মন্দ ও দুঃখ-কষ্টের জগত হলো জাহান্নাম। এ বিশ্বকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যই এখানে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ দু'য়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

চিন্তাযোগ্য হাকিকত

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে শার্র বা মন্দ ও অকল্যাণ দুনিয়াতে পাশাপাশি রয়েছে। আর এ শার্র বস্তুর মধ্যে নিজ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু খায়র বা ভাল ও সৎ গুণাবলী পরিশ্রম করে হাসিল করতে হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় দেখি যে, মানুষ পরিশ্রম করলে তার মধ্যে উত্তম গুণ পয়দা হয়। যদি পরিশ্রম না করে তাহলে মন্দ ও অকল্যাণ নিজে থেকে সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনা আপনিই গজিয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– আমাদের খাদ্যদ্রব্য; খাদ্যদ্রব্যকে আমরা সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ও সুস্বাদু রাখার জন্য ডাইনিং রুম তৈরি করি। একে এমন কামরায় রাখি যেখানে মুক্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। তারপর খাদ্যদ্রব্য তার গুনাগুণসহ অটুট থাকে। কিন্তু যদি মেহনত ও পরিশ্রম না করা হয়, তাহলে খাদ্য নিজে নিজে পঁচে যাবে। দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যকে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত করার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই।

তেমনি মনে করুন, একটি বাগান– তার সৌন্দর্য হল তার লতাপাতা ডালপালা সবুজ সতেজ থাকবে। ফুলগুলো ফুটে থাকবে। তাহলে তার দৃশ্য নয়নাভিরাম হবে। দেখলে চোখ জুড়াবে, নয়ম শীতল হবে। ঘ্রাণ নিলে সুঘ্রাণ পাবে। কিন্তু এসব গুণাগুণ তখনই পয়দা হবে যখন আপনি বাগানের জন্য মালি নিয়োগ করবেন। সে সবসময় দেখাশুনা করবে। আগাছা ফেলে দেবে। পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখবে। পানি দেবে। প্রয়োজনে কেটে ছেটে সুন্দর করে দেবে। কিন্তু আপনি যদি বাগানকে জংগলে পরিণত করতে চান, তাহলে এর জন্য মালি বা চাকর নওকর রাখার প্রয়োজন হবে না। সুন্দর করার জন্য যে প্ররিশ্রম তা বাদ দিন। ব্যাস! কয়েক দিনের মধ্যে বাগানের সব সৌন্দর্য, সজীবতা শেষ হয়ে যাবে।

তেমনি ঘরবাড়ি। বাসা-বাড়ির সৌন্দর্য হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা; রঙ ও ডিজাইন মনোমুগ্ধকর হওয়া; প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা। এসবের জন্য আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি দিয়ে ঘর তৈরি করাতে হবে। ঘর তৈরি হয়ে গেলে কার্পেটের প্রয়োজন হবে। সবসময় একে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে। তা হলে এসব সৌন্দর্য ও গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আপনি যদি ঘরকে উজাড় ও বিরান করে দিতে চান, তাহলে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না। ঘরকে সুন্দর রাখার জন্য আপনি যে পরিশ্রম করছিলেন, তা বাদ দিন। কিছু দিন পর ঘরের ফ্লোর ভেঙ্গে যাবে; ইটগুলো খসে যাবে। তারপর একদিন ছাদও ধসে পড়বে। এভাবে ঘরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যাবে।

বোঝা গেল, মন্দ, অকল্যাণ ও ধ্বংস বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তখন খায়র ও কল্যাণ আসে; আর যদি পরিশ্রম না করে তাহলে তা আসে না। বরং আপনা-আপনিই মন্দ, অকল্যাণ ও ধ্বংস ভেতর থেকেই প্রকাশ পাবে। এটা জগতের একটা সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তায়ালার সুন্নত এভাবে চলে আসছে। এ বিশ্বের প্রধান সৃষ্টি মানবজাতি। মানবজাতির পক্ষেও নীতি থেকে আলাদা থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং সহজেই একথা বলা যায়, খারাবী, মন্দতা ও কুস্বভাব মানুষের মজ্জাগত এবং ভাল ও উত্তম গুণাবলী চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করে। আপনি তাকে লালন পালন করেন। শিক্ষা দান করেন। তার পর সে প্রকৃত মানুষ হয়। আপনি যদি পরিশ্রম না করেন তাহলে শিশুর মধ্যে যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্যের শক্তি রয়েছে সেগুলো প্রকাশ ও কার্যকর করার জন্য কোন পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। মহৎ গুণে গুণবান আলেম ফাজিল বানানোর জন্য হাজারো মাদ্রাসা শিক্ষাগার রয়েছে। কিন্তু মূর্খ জাহেল, অশিক্ষিত বানানোর জন্য কোন মাদ্রাসা আপনারা দেখেছেন কি? মানুষ জন্মগ্রহণই করে মূর্খ ও জাহেল হয়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ

لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করেছেন, যে অবস্থায় তোমাদের সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না। তারপর তোমাদের মধ্যে শ্রবণশক্তি দান করেছেন। দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, অন্তর দান করেছেন, যেন তোমরা শুকর করতে পার। [নাহল : ৭৮]

বোঝা গেল আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ইলম ও জ্ঞানের যোগ্যতা রেখেছেন। কিন্তু মাতৃগর্ভ থেকে কেউ ইলম ও জ্ঞান নিয়ে আসে না। এ হলো মানুষের ইলমের অবস্থা। আর আমল সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে–

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوٓءِ.

আমি আমার নফস ও প্রবৃত্তিকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত, পাক-পবিত্র বলছি না। কারণ প্রবৃত্তি মন্দ কাজেরই আদেশ করে থাকে। [ইউসুফ-৫৩]

বুঝা গেল, মানুষের প্রবৃত্তিতে মন্দ ও শার্র সত্তাগতভাবে বিদ্যমান। এজন্য প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ ও খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আপনি যদি প্রবৃত্তির তরবিয়ত করেন, তাকে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেন, তা হলে ঠিক হয়ে যাবে। ভাল ও সৎ কাজের দিকে এসে যাবে। মন্দ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের জন্য কোন মাদ্রাসা বা কলেজের প্রয়োজন হয় না। কোন এক রা'বি কত উত্তম কথা বলেছেন–

ونہا باید یاک سنگ خارا زافتاب ☆ لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن

পাথরের একটি মূল্যহীন খণ্ড বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ রোদে পড়ে থাকে, সুর্যের উত্তাপ সহ্য করতে থাকে। তারপর এই পাথর খণ্ডটি একটি মূল্যবান লাল মণি-মানিক্যের রূপ ধারণ করে।

ماہا باید کہ تایک پنبہ دانہ بعد کشت ☆ جامہ گردد شاہدے رایا شہیدے راکفن

তুলা গাছের একটি দানা প্রিয়জনের দেহের উপযুক্ত তখনই হয় যখন মাসের পর মাস পার হয়ে যায়। মানুষ কৃষি কাজে পরিশ্রম করে। হালচাষ করে। বীজ বপনের উপযুক্ত করে। বীজ জমিনে বপন করে। তার পর অঙ্কুর গজায়। ক্রমে গাছের রূপ ধারণ করে। তারপর তুলা সৃষ্টি হয়। গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে

আনা হয়। তারপর তা মিলে পাঠানো হয়। মিলে তা পরিষ্কার করে সুতা তৈরি করা হয়। তারপর প্রস্তুত হয় কাপড়। এরপর দরজি তা কাটছাট করে পোশাক তৈরি করে। এসব ঘাট অতিক্রম করার পর প্রিয়জনের জামা বা পোশাক তৈরি হয়। নইলে তুলা বীজের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। হয়ত কোন মহিষ খেয়ে ফেলত। এরপর কবি বলেন–

سالہا باید تا یک کودکے از درس علم ☆ عالمے گردد نکو یا شاعر شیرین سخن

একজন জ্ঞানহীন শিশু যখন বছরের পর বছর কোন আলেমের ক্লাসে পড়াশুনা করে (উস্তাদের মারধর, রুক্ষ ব্যবহার সহ্য করে) তারপর হয় আলেম বা মিষ্টি কথার কবি।

সুতরাং আলেমের সৎ চরিত্র গঠনের জন্য অনেক বছর ধরে পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। তারপর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে মানুষ মানুষ হয়। কিন্তু মূর্খ ও চরিত্রহীন করার জন্য কোন মাদ্রাসা, কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। সারকথা, কোন বস্তুকে মূল্যবান করার জন্য সময় ও শ্রমের প্রয়োজন নেই; মূল্যহীন করার জন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারক তার গুণাবলী

আপনাদের জানা আছে, আল্লাহ তায়ালার মধ্যে কামালাত ও গুণাবলী সত্তাগতভাবে বিরাজমান। আর মানুষের মধ্যে সত্তাগত কোন গুণ ও কামালাত নেই। আর একথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, দুনিয়াতে প্রতিটি জিনিসের মূল্য ও মর্যাদা হয় তার গুণাবলীর কারণে। যে জিনিসের গুণাগুণ বেশি তার মূল্য ও মর্যাদা, মান-সম্মানও বেশি। সে অনুযায়ী উঁচু মর্যাদা ও শীর্ষ স্থান লাভ করবে। এক ব্যক্তি যদি আলেম হয়, আপনি তাঁকে সম্মান করবেন। ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যদি আপনার উস্তাদ হন তাহলে সম্মানের পরিমাণ বেড়ে যায়। যদি ঐ ব্যক্তি আপনার শাসক হন, তাহলে তার সম্মানের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

মোটকথা, মানুষের গুণাবলী যতই বৃদ্ধি পাবে, সেই অনুপাতে তার মূল্য মর্যাদা, ইজ্জত ও সম্মানও বৃদ্ধি পাবে। এটাও জানা হয়ে গেল যে, সত্তাগতভাবে মানুষের মধ্যে কোন কামালাত ও গুণ নেই। কামালাত হল একটি অনুপস্থিত জিনিস, যা পরিশ্রম করে হাসিল করা হয়। এজন্যই আপনার সন্তানের তরবিয়ত

করতে হয়। প্রশিক্ষণের দরকার হয়। বাচ্চা যদি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী না হয়, পালিয়ে যেতে চায়, তাহলে আপনি তাকে লোভ দেখান এজন্য যে, আপনার সন্তান ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী হোক– এ ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত আগ্রহী থাকেন।

সারকথা, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের মূল্য ও মর্যাদা তার গুণাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) নিঃসন্দেহে পবিত্রতম মানব। তাঁদের মধ্যে সাইয়েদুল আম্বিয়া (আ.)-এর পবিত্র যাত পরম পবিত্র, পরম বরকতময়। কিন্তু এসব বরকত ও পবিত্রতা নবুওয়ত ও রিসালাতের কারণে ছিল। রিসালাতের দায়িত্ব এবং এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই তিনি ওয়াজিবুল ইতায়াত বা অবশ্য অনুকরণীয়। এ কারণেই তিনি একবার ইরশাদ করেছিলেন, হে লোক সকল! আমি যদি শরীয়তের বিধান বর্ণনা করি, তাহলে তা মেনে নেয়া তোমাদেরই জন্য জরুরী বা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন পরামর্শ দান করি, তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরী নয়। তবে এ কথা অবশ্য ঠিক যে, প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রয়েছে। এ ভালোবাসার কারণেই তাঁর ইশারা ও ইঙ্গিতকেও আদেশের মতো গ্রহণ ও অনুকরণ করতে সকলে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু প্রকৃত আইন যা ছিল তা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরিরা (রা.)কে (হযরত আয়েশা (রা.)-এর দাসী) হযরত মুগিছের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত বরিরা (রা.) খুব সুন্দরী ছিলেন। আর হযরত মুগিছ ছিলেন সাধারণ চেহারার। এ কারণে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক মিল মহব্বত হচ্ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। তারপর হযরত আয়েশা (রা.) বরিরা (রা.)কে আযাদ করে দিলেন। শরীয়তে এ মাসয়ালা রয়েছে যে, বাঁদী যখন আযাদ হবে তখন সে তার বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বা তা ঠিক রাখতে পারে। হযরত বরিরা (রা.) মনে করলেন সুবর্ণ সুযোগ হাতে এসেছে। এ সুযোগের দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। তাই তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। হযরত মুগিছ হযরত বরিরার প্রতি মনেপ্রাণে আসক্ত ছিলেন। তিনি যখন বরিরার ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন, তখন (হাদীসে বর্ণিত আছে) অলিগলি দিয়ে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করছিলেন। পেরেশান হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বরিরার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আপনিই তা টিকিয়ে রাখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরিরাকে

ডেকে পাঠালেন এবং মুগিছের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করলেন। তিনি নানাভাবে বরিরাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন। বললেন– বিয়ে ভেঙ্গো না। বিয়ে টিকিয়ে রাখ। বরিরা খুব বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! একি শরীয়তের নির্দেশ না আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ। তখন হযরত বরিরা বললেন, তা হলে আমি গ্রহণ করতে পারছি না। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণে তিনি একটুও অসন্তুষ্ট হননি। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা যদি বলেন, তাহলে তা গ্রহণ করা, মান্য করা জরুরি নয়; তবে মহব্বত ও ভালবাসা হিসাবে আপনি যা বুঝেন বা করেন সেটা আলাদা। অতএব, নবীগণেরই (আ.) যখন এই অবস্থা, তখন আমি আপনি কোথায় রয়েছি? আমরা গণ্য হব কোথায়?

মানবতার আসল মাহাত্ম্য

উপরের আলোচনার সার হলো– মানুষের গুণাবলী ও পূর্ণতা এসে গেলে ইলম, জ্ঞান এবং মহৎ গুণের অধিকারী সে হবে। তখন মানুষ তাকে সম্মান করবে এবং শ্রদ্ধা জানাবে।

আমি একথা বলছিলাম যে, মন্দ ও খারাবী হলো জগতের মূল। একে প্রকাশ ও কার্যকরী করার জন্য কোন চেষ্টা বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। আর খায়র, কল্যাণ ও মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে হয়। এজন্য পরিশ্রম করতে হয়। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। এসব না হলে জগতে শিক্ষাগার ও খানকার অস্তিত্ব থাকতো না। এ জাতীয় তাবলীগী সমাবেশও হত না। শিক্ষার প্রয়োজন হওয়া প্রমাণ করে, মানুষ তার সত্তাগতভাবে কিছুই না। বরং তাকে ক্রমান্বয়ে গঠন করে মানুষ করতে হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মানুষের আকৃতির নাম মানুষ নয়; বরং মানুষ বলা হয় উন্নত নৈতিকতা ও গঠিত স্বভাব চরিত্রকে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী বলেন–

گر بصورت آدمی انساں بودے ۔۔۔ احمد و بو جہل ہم یکساں بودے

যদি মানুষের আকৃতির নামই মানুষ হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহেল ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না। আকৃতি সবার একই রকম। এতে বোঝা গেল, ইনসানিয়াত ও মানবতা আসে নৈতিকতা

ও উন্নত স্বভাব-চরিত্র দ্বারা। যদি আকার-আকৃতি সুন্দর হয় আর অন্তর থাকে মন্দ, বাইরে দেখতে ঠিকঠাক কিন্তু অন্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে এতে কাজ হবে না। বরং এ অবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও দোষণীয় হবে। এটাকে গুণ বলে গ্রহণ করা হবে না। তেমনি অন্তরকে মন্দ ও খারাপ অবস্থায় রেখে বাইরের আকৃতি সুন্দর করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাটা তেমনই হবে। যেমন নাজাসাত (মলমূত্র)-এর উপর রূপার পাত লাগিয়ে দেয়া হল। এভাবে নাজাসাত তো পাক হবেই না; বরং রূপাও নাপাক, অপবিত্র হবে। ব্যবহারের অযোগ্য হবে। তেমনি কেউ যদি অত্যন্ত মূল্যবান উন্নতমানের পোশাক পরিধান করে, আর অন্তরে থাকে অপবিত্রতা, তাহলে পোশাকের কারণে সে সম্মানের পাত্র বা শ্রদ্ধার যোগ্য হবে না। পোশাকের কারণে তার গুণাগুণ বৃদ্ধি পাবে না; বরং উল্টো হবে।

এরিস্টোটল ছিলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। রাত-দিন তৃণলতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। দ্রব্যগুণ জানার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দিন-রাতের খবরও থাকত না। একবার এমন হলো, সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে সেদিন শাহীবাহিনী বেরিয়েছিল। বাহিনীর সামনে সশস্ত্র নকীব দলপতি। উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো– সরে যাও, রাস্তা ছেড়ে দাও! এরিস্টোটল এত গভীর ঘুমে অভিভূত ছিলেন যে তিনি কিছুই টের পাননি। এমন মানুষের তো কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না। তার কাছ দিয়ে বাদশাহর সওয়ারী যাচ্ছিল। তাকে এভাবে শোয়া অবস্থায় দেখে বাদশাহ রেগে তাকে একটি পদাঘাত করলেন। বললেন– হে বেয়াদব! অভদ্র! তুই জানিস না আমি কে? এরিস্টোটল উত্তর দিলেন– আপনি মনে হয় জঙ্গলের হিংস্র জন্তু হবেন। এজন্য যে, হিংস্ররাই পদাঘাত করে চলে। বাদশাহ তার অভদ্রতাসুলভ কথা শুনে আরো রাগান্বিত হলেন। বললেন– অভদ্র, বেতমিজ! আমার কাছে কোষাগার রয়েছে, সামরিক বাহিনী রয়েছে, দুর্গ রয়েছে, সিংহাসন ও রাজমুকুট রয়েছে। এত কিছু থাকার পরও তুই আমার সঙ্গে অভদ্রভাবে কথাবার্তা বলছিস? এরিস্টোটল বললেন, এসবই তো বাইরের জিনিস। তোমার ভেতরে কি জিনিস, কি গুণ ও কামালাত রয়েছে? তুমি বিশ্বাস কর, যে দিন তোমার দেহ থেকে শাহী পোশাক খসে পড়বে, সেদিন তুমি অপদস্ত ও সম্মানহীন হয়ে পড়বে। কেউ তোমাকে জিজ্ঞেসও করবে না। নিজের ভেতরের জিনিসের গৌরব করা উচিত। তোমার ভেতর যখন কিছু নেই। তখন রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন দিয়ে তোমার সম্মান হবে না; তুমি শাহী পোশাক ত্যাগ করে লুঙ্গি পর। তারপর এসো উভয়েই সাগরে ঝাঁপ দেই। তখন বোঝা যাবে, তুমি কে আর আমি কে? তোমার মধ্যে কি গুণ রয়েছে আর আমার মধ্যে কি গুণ রয়েছে।

সারকথা, মানব আকৃতির নাম মানুষ নয়। আর এই আকৃতির কারণে মানুষ সম্মানের পাত্রও হয় না, জ্ঞানী গুণী হয় না। মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ বাইরের জিনিস। আর ধন-দৌলত আরো বাইরের। তাই এসব জিনিসের কারণে মানুষ জ্ঞানী গুণী হয় না। জ্ঞান-গুণ ও পূর্ণতার উৎস হলো আল্লাহ তায়ালার মহান যাত, মহান সত্তা। আমাদের মধ্যে যে গুণ ও পূর্ণতা আসবে তা আল্লাহর কাছ থেকেই আসবে। এজন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা খুবই জরুরি। আর সাফকথা হলো, নৈকট্য লাভের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সাধনা করতে হবে। শ্রম-সাধনা যত বাড়বে, ততই নৈকট্যও বাড়বে। গুণ ও পূর্ণতা আসতে থাকবে। আর আল্লাহ থেকে দুরত্ব যত বাড়বে ততই কমবে গুণ ও পূর্ণতা।

মানুষের গুণাবলী ও পূর্ণতা

মানুষের দুটি গুণ বা কামাল থাকে। এক. ইলমী কামাল বা জ্ঞানজনিত গুণ। দুই. আমলী বা কাজকর্ম সম্পর্কীয়। ইলমী কামাল বা জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনের জন্য মক্তব, মাদ্রাসা এবং ইউনিভার্সিটি রয়েছে। আর আমলী পূর্ণতা হাসিল করার বিভিন্ন পদ্ধতি বা মাধ্যম রয়েছে। ইমাম গাযালী (রহ.) নিজের লেখা কিতাব এহইয়াউল উলূমে আমলী পূর্ণতা অর্জনের চারটি পদ্ধতির কথা লিখেছেন।

ওলী-দরবেশদের সাহচর্য

প্রথমটা হলো, আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে থাকা। এসব মহামনীষীর সাহচর্য যত বেশি লাভ করবে সেই পরিমাণ সৌভাগ্য নসীব হবে। তাদের রঙ নিজের আত্মায় প্রবেশ করবে। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে– খরবুজাকে দেখে খরবুজা রঙ গ্রহণ করে। নেক ও সৎ লোকের সাহচর্যে মানুষের ভেতরে খায়র ও সততা সৃষ্টি হয়। সততা ও মহৎ গুণ সৃষ্টি হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَ اِمَّا اَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ وَ اِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبًا وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يَّحْرُقَ ثِيَابَكَ وَ اِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

ভালো ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে এমন– একজন মেশক সুগন্ধির বাহক এবং অন্যজন কামারের ডাটিতে বাতাসকারী। মেশক বাহক যদি তোমার কাছ দিয়ে চলে যায় আর তুমি যদি কাছ থেকে তার কিছু কিনে নাও তাহলে তোমার উপকার। আর যদি নাও কেনো তবুও লাভ। সর্বাবস্থায় তোমার মন-মস্তিষ্ক সুগন্ধিতে সুবাসিত হবে। আর কামারের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হলে তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে। যদি তা নাও করে তবুও দুর্গন্ধে মন মস্তিষ্ক বিষণ্ন হয়ে যাবে।

ভাইয়েরা! প্রতিটি জিনিসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি যদি নদীর তীরে বসবাস করেন তাহলে আপনার তবিয়তে আর্দ্রতা দেখা দিবে। যদি শুকনা অঞ্চলে বসবাস করেন, তাহলে মিজাযে রুক্ষতা আসবে। গোলাপ ফুল কাপড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখুন এবং তারপর বের করুন। কাপড় থেকে গোলাপের ঘ্রাণ আসবে। সিল্কের কাপড়ে মহিলারা বর্ষাকালে এক ধরনের ন্যাপথলিন জাতীয় বস্তু রেখে দেন। পরে যখন কাপড় বের করেন তখন কাপড় থেকে এর দুর্গন্ধ আসতে থাকে। অথচ কাপড়ের মধ্যে বাস্তবে কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ নেই। এটা হলো সাহচর্যের ফল। সাহচর্যের ক্রিয়ায় ন্যাপথলিনকে কাপড়ের সহচর বানিয়ে দেয়া হয়। আর তাই এর দুর্গন্ধ কাপড়ে ঢুকে পড়ে। কাপড় থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। এভাবে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও সাহচর্যও ক্রিয়াশীল হয়। মানুষ এতে প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকতে পারে না। একজন আলেম ও একজন দরবেশের কাছে থাকলে এ অবস্থা হয় যে, তাদের কাছে বসলে আল্লাহর স্মরণ হবে। তাদের আলোচনা আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরের জন্য উপায়স্বরূপ। কোন এক কবি বলেছেন–

خاصان خدا خدا نہ باشند ☆ ولیکن از خدا جدا نہ باشند

আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা, তারা আল্লাহ নন। কিন্তু আল্লাহর দেয়া মেহেরবানী থেকেও তারা দূরে নন, পৃথক ও সম্পর্কহীন নন।

আপনি যদি আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে থাকেন, তাহলে কামালতে রাব্বানী আপনার মধ্যে এসে যাবে। নেককারদের সাহচর্যের ফল খায়র ও বরকত আকারে আপনার ভেতর প্রকাশ পাবে।

রাসূল (সা.)-এর মহব্বতের ফয়েয

শুধু এই কারণে সে মর্তবা ও মর্যাদা সাহাবায়ে কেরাম লাভ করেছেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি। যে যত বড় কুতুব গাউস হোক না কেন, সাহাবিয়াতের স্তর ও মর্যাদায় তারা পৌঁছতে পারবে না। কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত লাভ করেছেন। তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর মজলিসে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁর কামালত ও গুণাবলী বর্ণনাতীত।

এক ব্যক্তি সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে। সে যে তাপ পাবে, তা ঐ ব্যক্তি পাবে না, যে ঘরে বসে আছে। আর যে ব্যক্তি তার বৈঠকখানায় বসে থাকবে সে রোদের তাপ আরও কম পাবে। যতই সূর্যের কাছাকাছি হবে, ততই আরও তাপ বাড়তে থাকবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন রবুওয়তের সূর্য। তাঁর থেকে প্রত্যক্ষভাবে যারা ফয়য লাভ করেছে তাদের ফাযাইল ও কামালাত, গুণ ও মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর হবে। আর যারা পরোক্ষভাবে লাভ করেছেন তাঁরা হবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাদের থেকে যারা ফয়য লাভ করেছেন তাঁরা হবেন তৃতীয় শ্রেণীর। এভাবে স্তরে স্তরে ফয়য হ্রাস পেয়েছে।

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। তারপর নিকটবর্তী সময়; তারপর তার নিকটবর্তী সময়। আগের যুগে উস্তাদ ও শাগরিদের পরিভাষা ছিল না। বরং শাগরিদগণকে আসহাব নামে স্মরণ করা হত। বলা হতো এসব ইমাম আবু হানিফার (রহ.)-এর আসহাব। আসহাবে মালিক, আসহাবে অমুক। এর অর্থ ছিল– এসব মানুষ নিজের উস্তাদ ও শায়খ থেকে শুধু কিতাবের শব্দ ও অর্থ শিক্ষা করেননি; সঙ্গে সঙ্গে তারা উস্তাদের আমল আখলাক দিয়ে নিজেদেরকে রঞ্জিত করে নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এ রঙ গ্রহণ করেছিলেন, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ছিল।

সবচে' মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হল সোহবত। সাহচর্যের মাধ্যমে একজনের মন-মানসিকতা, আবেগ-উদ্দীপনা, স্বভাব-চরিত্র অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। মোহাম্মদ হোসাইন আহমদ আজাদ সহজ সরল ভাষায় একটি কবিতা বলেছেন–

ملنے والوں سے راہ پیدا کر ☆ اسکے ملنے کی اور صحبت کیا

তুমি যদি প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করতে চাও, তাহলে প্রিয়জনের কাছে যাতায়াতকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর। সে কোন একদিন তোমার কথা বলে দিবে। তুমিও প্রিয়জনের দরবারে পৌঁছে যাবে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌঁছার জন্য প্রথমে আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশা করো। তাঁদের রঙ, তাঁদের রীতিনীতি গ্রহণ করো। নিজের আত্মাকে আল্লাহর প্রেমিক এবং স্বভাব-চরিত্র ও আখলাককে সংশোধন করো, তাহলে নিঃসন্দেহে একদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কবুল করে নিবেন। আপন করে নিবেন।

কারও কাছে যদি ইলম থাকে কিন্তু সে শায়খের সাহচর্য লাভ না করে, শায়খের রঙ গ্রহণ না করে তাহলে তার ইলম কেবল শাব্দিক হবে। প্রকৃত ইলম হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ.

> আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎসঙ্গ গ্রহণ কর। নেক ও সত্যবাদী মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করলে তার প্রভাব পড়বে তোমার অন্তরে। সততা তোমার অন্তরেও সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নিবে।

এই হলো সাহচর্যের কথা। মুহাদ্দেসীনের নীতি অনুযায়ী ঐ বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েত বেশি গ্রহণযোগ্য, যে উস্তাদের কাছে শুধু হাদীস শুনেনি; বরং দীর্ঘদিন শায়খের সোহবতে অবস্থান করে, দীর্ঘ সাহচর্য লাভে উস্তাদ থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে।

সত্যিকার ইলম

ভাইয়েরা! দেখুন, এক ইলম হচ্ছে পুঁথিগত সাধারণ ইলম বা পদ্ধতিগত ইলম– যা বই-পুস্তক বা কিতাবের মাধ্যমে আসে। আরেক হলো, ইলমে হাকীকী বা প্রকৃত ইলম– যা উলামায়ে রব্বানী ও আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে লাভ হয়। এমনও অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা আলেম নন; অথচ শুধু মূর্খদের নয়, বরং আলেমদের রাহনুমা বা পথ প্রদর্শক হয়ে আছেন। হাজী আমির খান সাহেব আমাদের দেওবন্দের বুযুর্গানের একজন প্রসিদ্ধ ও পরিচিত খাদেম ছিলেন। তাঁর ঘটনাবলীর সংকলন আমি নিজেই করেছি। হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.) এ সংকলনের উপর নিজ হাতে ভূমিকা লিখেছেন। তিনি প্রচলিত অর্থে আলেম

ছিলেন না। তিনি যথারীতি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদও ছিল না। কিন্তু হযরত নানতুবী ও হযরত গাঙ্গুহীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের বরকতে তার ইলম ও যিকিরে এমন গভীরতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আল্লামা আনোয়ার শাহ (রহ.)-এর মত বিদ্যার সাগর কিতাবাদির হাফেজও তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

এক লোক আসলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। তিনি ছিলেন চরিত্রহীন মুশরিক। কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত হয়ে ফয়েজ লাভ করেন, তখন আলেম হয়ে যান। তখন চরিত্রবানও হয়ে যান, ভদ্র ও সম্মানিতও হয়ে যায়। নেক সাহচর্যে চরিত্র গঠন হয়, আত্মার পরিবর্তন ও উন্নতি হয়। আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজারো মুজেযা ছিল। কিছু সময়ের জন্য বাদ দিন মুজেযার কথা। আরবের মত সভ্যতা ও সংস্কৃতিহীন, তাহযিব ও তামাদ্দুন বর্জিত জাতির অন্তর অমূল পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এটা কি সাধারণ ব্যাপার? লোহা নরম করে দেয়া সহজ। কিন্তু রূহ ও আত্মাকে পাল্টে দেয়া খুবই কঠিন। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর প্রত্যেক সাহাবী এক একটি মুজেযা।

ভ্রাতৃত্ব স্থাপন আল্লাহর জন্য

ঘটনাক্রমে যদি কেউ কামেল শায়খের সাহচর্য লাভ করতে না পারে, কামেল শায়খ না পায় এবং সে বলে আমার জনপদে আমার অঞ্চলে কোন আলেম নেই, কোন কামেল শায়খও নেই সে অবস্থায় আমার নফস ও প্রবৃত্তির সংশোধনের কি উপায় হবে? এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন– সে যেন নিরাশ না হয়। তার দ্বিতীয় পথ হলো– তার অঞ্চল বা গ্রামে তাঁর কোন বন্ধু প্রিয়জন থাকলে কাতের দু'একজনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব করে নিবে এবং পরস্পরে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবে যে, যদি আমি কোন মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে হাত ধরে জোর করে হলেও বাধা দিবে। আর যদি তুমি কোন ত্রুটি করো, তাহলে তোমাকেও সতর্ক করে দেয়া হবে। এমন বন্ধুত্ব যদি গড়ে নেয়া যায়, তাহলে বেশি দিন নয়, চল্লিশ দিনের মধ্যে অনেক মন্দ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। যদি কোন আলেম বা শায়খ পাওয়া না যায়, তাহলে এভাবে নিজের প্রবৃত্তি সংশোধন করে নেয়া যাবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে মুয়াযাত বিল্লাহ– আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বলা হয়।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন সাত দল মানুষ এমন হবেন– যাদেরকে ঐ কঠিন দিনে, যেদিন কোন ছায়া থাকবে না– আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে স্থান দেয়া হবে। তাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

قَا لَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلُّه، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ بِا لْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَاللهَ خَالِيًا فَفَا ضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ وَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمُ شِمَا لُه مَا تَنْفَقَ يَمِيْنُه.

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– সাত ধরনের মানুষ এমন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান নিবেন– যখন আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। এক. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দুই. ঐ যুবক যার যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও দাসত্ব করার মধ্য দিয়ে। তিন. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে আটকে আছে। যখনই মসজিদ থেকে বের হয়, পুনরায় মসজিদে না আসা পর্যন্ত পেরেশান ও অস্থির থাকে। চার. এমন দু'ব্যক্তি– যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পাঁচ. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। ছয়. ঐ ব্যক্তি যাকে সুন্দরী ও খান্দানী নারী কুকাজের প্রস্তাব করলো অথচ সে জবাব দিলো– আমি আল্লাহর ভয় করি। সাত. ঐ ব্যক্তি যে সদকা করল এবং এত গোপনে যে তার বাম হাতও বুঝতে পারেনি, ডান হাতে কি দান করেছে।

হাদীস শরীফে রয়েছে– এমন দু'ব্যক্তি যাদের মধ্যে আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ছিল। যদি তাদের কারো ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে সে দোয়া করে– হে আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধুকেও এখানে নিয়ে আসুন। তারই কারণে আমি এই স্থান লাভ করছি।

বন্ধু নির্বাচন

আমি যা আরজ করলাম তা আত্মসংশোধনের জন্য। এর দ্বিতীয় পন্থা হলো- কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। তার সাহায্য গ্রহণ করা। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, দুনিয়াতে বন্ধু একই প্রকৃতির, একই মন-মানসিকতা ও একই স্বভাবের হবে না। বরং তাদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য, অনেক প্রভেদ থাকবে। তাই বন্ধু নির্বাচন করতে হবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে। এক কবি বলেছেন-

دلا اندر جہاں یاراں سہ قسم اند ☆ زبانی اند و نانی اند و جانی

بنانی ناں بدہ از در بدر کن ☆ یک جلف تلطف کن بیاراں زابانی

ولیکن یار جانی را بدست آر ☆ مدارانش بگیری تانوانی

বন্ধু তিন ধরনের। এক হলেন দস্তরখানের বন্ধু। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনার দস্তরখানা নিরাপদ রাখেন, তাহলে আপনার জন্য বন্ধুর অভাব হবে না। যত ইচ্ছা বন্ধু করে নিতে পারেন। আরেক বন্ধু হলেন মৌখিক বন্ধুত্ব। দুনিয়াতে এদেরও অভাব নেই। আরেক হলেন আন্তরিক বন্ধু বা প্রকৃত বন্ধু- যারা কেবল সুদিনের ও সুসময়ের নয়; বরং দুঃখে-কষ্টে বিপদে-আপদে সবসময় পাশেষ থাকেন। এমন বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম।

যারা দস্তরখানের বন্ধু তাদের কথা কর্ণপাত করবেন না, একদম বিশ্বাস করবেন না। এজন্য যে, যেদিন আপনার দস্তরখানা উঠে যাবে, সেদিন তাদের বন্ধুত্বও শেষ হয়ে যাবে। এমন বন্ধুদের চাহিদা মতো কিছু দান করে বিদায় দিন। আর যাদের বন্ধুত্ব কেবল মৌখিক জমা-খরচ, শুধু বাক্য-বচনে সীমাবদ্ধ- তাদের সঙ্গে মৌখিক বন্ধুত্ব প্রকাশ করুন। এতে কার্পণ্য করবেন না। কিন্তু মৌখিক সৌজন্যের সীমা যেন লঙ্ঘন করা না হয়।

একজন কবি ছিলেন। তিনি এক আমিরের শানে একটি কবিতা লিখে তা পাঠ করলেন। ঐ কবিতায় তিনি ইরান তুরান, আকাশ পাতাল এক করে ফেললেন। বললেন- আপনার সিংহাসনের পায়াগুলো সপ্তাকাশের উপরে। আপনার রাজ-মুকুটের মানিকগুলো আকাশের তারকারাজির মত- ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন কবিতা পাঠ শেষ হলো, তখন আমির সাহেব বললেন- পরশু আসবেন। আপনাকে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। এ কথায় কবি খুব খুশি হলেন। বাড়িতে গিয়ে তৃতীয় দিনের অপেক্ষা করতে থাকলেন। তৃতীয় দিন আসার আগেই তিনি আশার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়ার আশায়

পাঁচশ' টাকা ধার করলেন। এবার বাড়িতে ধুমধাম ও উন্নত মানের খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। নতুন নতুন পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। তৃতীয় দিন আমিরের দরবারে হাজির হলেন। আমির সাহেবকে সালাম দিলেন। কিন্তু আমির চোখ তুলেও দেখলেন না। দ্বিতীয়বার সালাম করলেন। এবারও আমির সাহেব ভ্রুক্ষেপ করেননি। তৃতীয়বার সালাম করলেন। কিন্তু আমিরের চোখ নিচেই আটকে রইলো। শেষ পর্যন্ত মুখেই বললেন– বান্দা হাজির হয়েছে। আমি ঐ দিন কবিতা পাঠ করেছিলাম, আর আজ আপনি দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। আমির সাহেব মাথা তুলে বললেন– ভাই! তুমি কবিতা পাঠ করেছিলে, ঠিক আছে। কিন্তু সে কবিতার মধ্যে শুধু শব্দই ছিল, বাস্তবতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তুমি আমাকে শব্দ শুনিয়ে খুশি করেছিলে; আমিও তোমাকে শব্দ দিয়ে খুশি করেছি। যেমন তুমি দিয়েছিলে, তেমনি আমিও দিয়েছি। এখন আর কি চাও?

আমি বলছিলাম– এক প্রকার বন্ধু হলো যারা মৌখিক জমা খরচ করেন। বাস্তবতার সঙ্গে তাদের কথার কোন সম্পর্ক থাকে না। এ জাতীয় বন্ধুদের কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু এমন বন্ধু যারা বিপদে সাহায্য করে, নিজেরা কষ্ট সহ্য করে কিন্তু বন্ধুকে কষ্ট সহ্য করতে দেয় না, তা হাজারে একজন হবে।

তৃতীয় প্রকারের বন্ধু সম্পর্কে কবি বলেছেন– এমন বন্ধুর মহব্বত ও ভালোবাসার মূল্যায়ন করো, কদর করো, বন্ধুত্বকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখো।

সারকথা, আত্মসংশোধনের জন্য কোন শায়খ যদি পাওয়া না যায়, তাহলে বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা নিজের সংশোধন করিয়ে নিন।

শত্রুর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

তবে কেউ যদি বলেন, আমার কোন বন্ধু নেই; তা হলে তার জন্য তৃতীয় উপায় হচ্ছে, শত্রুর মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিবে। বর্তমান যুগে এমন ব্যক্তি পাওয়াই যাবে না, যার কোন দুশমন নেই। আপনারা শত্রু তালাশ করুন। সে আপনার দোষ ত্রুটিগুলো বের করবে এবং প্রকাশ ও প্রচার করবে। তখন আপনার কাজ হবে, আপনার মধ্যে যে মন্দ স্বভাব ও কাজ রয়েছে, তা বর্জন করে চলা। এভাবে যদি আপনি একচিল্লা, দু'চিল্লা সময় পার করেন, তাহলে

আপনার মন্দ স্বভাবের অনেকাংশের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং আপনি নেক ও সালেহ হয়ে থাকবেন।

প্রবৃত্তির হিসাব নেয়া

যদি কেউ বলে, আমি পর্বত শিখরে বসবাস করি। আমার পক্ষে না কোন শায়খের সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব, আর না আছে কোন বন্ধু বা শত্রু। তাহলে আমার সংশোধনের উপায় কি? এমন ব্যক্তিরও নিরাশ হওয়া উচিত না। তার জন্য চতুর্থ পথ হচ্ছে, মুহাসাবায়ে নফস। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে অন্তত পনের মিনিট চিন্তা করবে, ধ্যান করবে, আজ আমি কতটি নেক ও ভাল কাজ করেছি। আমার থেকে কতটি গুনাহর কাজ হয়েছে। যে পরিমাণ নেক ও ভাল কাজ হয়েছে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার শুকর আদায় করবে। এজন্য যে, শুকর আদায় করা হলে আল্লাহ তায়ালা নেক কাজ করার তাওফিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ.

অর্থাৎ তোমরা যদি শুকর আদায় করো তাহলে আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো। যে পরিমাণ শুকর আদায় করবেন, আল্লাহ তায়ালা সে পরিমাণ নেয়ামতকে বাড়িয়ে দিবেন। আর যে সমস্ত গুনাহ হয়ে গেছে, সেগুলোর জন্য আন্তরিকভাবে তাওবা করবেন। যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করেন তাহলে সব গুনাহ ঝরে যাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ

গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন, যেন তার কোন গুনাহই হয় নি। যদি সবসময় এই আমল করতে থাকে তাহলে গুনাহ শেষ হয়ে যাবে এবং নফসের সংশোধন, তাকওয়া ও পরহেযগারিতার শক্তি পয়দা হবে।

মোটকথা, শায়খের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করুন। আর যদি শায়খ পাওয়া না যায় তাহলে বন্ধুদের মাধ্যমে সৎ গুণাবলী অর্জন করুন। যদি বন্ধুত্ব না থাকে তাহলে শত্রুকে হাতিয়ার বানিয়ে নিজেকে সংশোধন করে নিন। যদি শত্রুও না থাকে তাহলে নিজেকে নিজের শায়খ বানিয়ে নিন। প্রচলিত নিয়মে আত্মশুদ্ধির এ চারটি পদ্ধতি রয়েছে। এসবের যে কোন একটির উপর যদি আমল করা হয়, তাহলে নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি চারটিই ভাগ্যে জুটে যায়, তা হলে সোনায় সোহাগা। ১. শায়খ আছেন, ২. আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্বও রয়েছে, ৩.

শক্রও আছে, ৪. মুহাসাবাও রয়েছে। যদি কারো মধ্যে এই চারটিই থাকে তাহলে সে অত্যন্ত ভাগ্যবান, খোশ নসীব।

আত্মশুদ্ধির সব পথ তাবলীগ জামাতে

চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন, তাবলীগ হচ্ছে উপর্যুক্ত চারটি উপায়ের সমন্বিত রূপ বা একটি ব্যবস্থাপত্র। এটি এমন একটি ওষুধ যার মধ্যে আত্মশুদ্ধির চারটি উপায়ই একত্রিত হয়েছে। এক কথায়, এ জামাতের সঙ্গে সহযোগিতা ও পরিশ্রম করা হলে অনেক উপকার ও ফায়দা হবে। আপনারা বলতে পারেন, তাবলীগে বের করা হয়েছে কন? তাবলীগে বের করা হয় এজন্য যে, এর মাধ্যমে বুযুর্গানে দীনের সোহবত ও সাহচর্য লাভ হয়। ভাল ও নেককার সাথী পাওয়া যায়– যারা একে অপরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারপর যখন নিজের পকেটের টাকা খরচ করবে, তখন দীনি আবেগ ও উদ্দীপনা জাগ্রত হবে। আত্মশুদ্ধির খেয়াল ও অনুভূতি সৃষ্টি হবে। নিজের ঘর সংসার ত্যাগ করে নানা কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা হয়েছে। তাই কিছু না কিছু পরিবর্তন নিয়েই বাড়িতে ফিরবে। এসবের পরও যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে সে মানুষ নয়। পাথর যদি মানুষ হতো তাহলে অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে যেত, যেহেতু সে নেক ও সৎ লোকের সাহচর্যে থেকে এসেছে।

জামাতের খায়র ও বরকত

হতে পারে, এই জামাতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের ইরাদা দুর্বল ও আমলে ক্রটি আছে। তার জ্ঞান ও ইলম অসম্পূর্ণ রয়েছে। যাদের কারণে তাবলীগের নিশ্চিত উপকার ও মুনাফা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। এ সন্দেহ ও আশংকার উত্তর হলো– দুর্বলদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা ও সংগঠন ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাকের কারণে এক প্রকার শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। যেমন এর দৃষ্টান্ত আমাদের হাদীসশাস্ত্রেও রয়েছে। কোন হাদীসের যদি দুর্বল কয়েকটি সনদ একত্রিত হয়ে যায় তাহলে হাদীসের মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুযায়ী ঐ সনদ সবল ও শক্তিশালী হয়ে যায়। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, একজন ভিখারি এক পয়সা দু'পয়সা করে ভিক্ষা করে; অথচ অনেকের আহারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। যদি পৃথক পৃথক থাকে, তাহলে কারো আহারের ব্যবস্থা হয় না। উদরপূর্তি হয় না। এভাবে যদি কয়েকজন দুর্বল আমল ও দুর্বল রূহানিয়তের অধিকারী সৎ ও নেক নিয়ত করে একত্রিত হয়, তাহলে একজনের উপর

অন্যজনের প্রভাব পড়বে এবং সকলের মধ্যেই শক্তি এসে যাবে। আর তাদের নিয়ত যে সৎ ও নেক– এতে কোন সন্দেহ নেই। পরিস্কার কথা, এসব লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত-খামার বা অন্য কোন কাজ কারবারের জন্য জমায়েত হন না।

তাছাড়া এটাও চিন্তা করুন, দশ পনের জনের জামাতে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আল্লাহর মকবুল বান্দা হবেন। এক সঙ্গে থাকার কারণে তার প্রভাব পড়বে অন্যদের উপর। তাই মুমিনদেরকে জামাতে নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে। একজন নামাযী যতই দুর্বল হোক না কেন, জামাতে অংশগ্রহণকারী সকল নামাযীই দুর্বল হোক না কেন, সমষ্টির মধ্যে আল্লাহর এমন কোন মকবুল বান্দা নিশ্চয়ই থাকেন, যার কারণে সম্পূর্ণ জামাতের নামাযই কবুল হয়ে যায়। বোঝা গেল, জামাতবদ্ধ মানুষ যতই দুর্বল হোক না কেন, আল্লাহর কোন মকবুল বান্দা নিশ্চয়ই থাকেন, যে কারণে জামাতেরও মকবুলিয়ত হয়ে যাবে।

নেক নিয়তের ফল

তাছাড়া তারা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বের হন না। বরং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হন। এ নেক নিয়তেরও একটা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তারা আল্লাহর নাম শিখতে বের হন। আল্লাহকে স্মরণ করতে বের হন। যখন এমন নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় বের হবেন তখন অবশ্যই তার প্রতিক্রিয়াও হবে। এভাবে শায়খ ও নেক লোকের সাহায্য লাভ হয়ে যাবে। সারকথা, প্রথম বিষয়ই হলো আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য লাভ করা।

জামাতী ভাই

তাছাড়া সকলের আবেগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা যখন একই হয় তখন ভ্রাতৃত্বও কায়েম হবে। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও পয়দা হয়ে যাবে। তাই ফিরে আসার পর একে অপরকে 'জামাতী ভাই' বলে স্মরণ ও সম্বোধন করে থাকেন। তারা একে অপরের ভাই হয়ে যান। তাদের পরস্পরে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়ে যায়।

জামাতের নামাযেও বিশেষত্ব রয়েছে। মানুষ যখন মসজিদে আসেন, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয়, পরস্পরে মিল-মহব্বত ও ভালোবাসা পয়দা হয়, তখন তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে একে অপরের খোঁজ-খবর নেন। জিজ্ঞেস

করেন, অমুক ব্যক্তি প্রতিদিন নামাযে জামাতে হাজির হন। আজ আসেননি কেন? মনে হয় অসুস্থ। তারপর তাকে দেখার জন্য, তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য লোক পাঠানো হয়। রোগীর সেবা করা ও ইবাদতের সওয়াবও তারা পেয়ে যান। আল্লাহ তায়ালার কুবর ও নৈকট্য তারা লাভ করেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– রোগাক্রান্ত মানুষ আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। হাদীসে এ-ও বলা হয়েছে– নেয়ামত দ্বারা মানুষ আল্লাহর এত নৈকট্য লাভ করতে পারবে না, যে পরিমাণ নৈকট্য অসুখ ও পীড়িত থাকার কারণে লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ময়দানে কোন কোন মানুষকে বলবেন– আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনার মহান সত্তা এসব জিনিস থেকে পাক-পবিত্র; আপনি পীড়িত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ বলেন, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিলো। যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছেই পেতে এবং তুমিও এই নৈকট্য লাভ করতে যা আমার ঐ বান্দা লাভ করেছে।

রোগী দেখার বিনিময়ে সওয়াবের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যও লাভ হয়। আল্লাহ না করুন, যদি লোকটির মারা যান, তাহলে সকলে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থায় লেগে যাবে। এতেও অনেক সওয়াব হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল সওয়াবই পাওয়া যাবে। এসব হলো মসজিদে উপস্থিত হওয়া, জামাতে নামায পড়া ও মুসলমানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার বরকত। এখন আপনারা দেখুন, তাবলীগ-ওয়ালাদের মারকাজ (কেন্দ্র) মসজিদেই থাকে। মসজিদের ঐসব বরকত– যা মসজিদে আগমনকারীদের জন্য নির্ধারিত– তাবলীগ-ওয়ালারা সে বরকত সবটুকু বরং কিছু বেশি লাভ করে থাকেন। তারপর আহার-নিদ্রা এক সঙ্গে হওয়ার কারণে ভ্রাতৃত্বের যে সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়, তা থেকেও কোন তাবলীগ-ওয়ালা বঞ্চিত থাকতে পারেন না। ফলে তাবলীগে বের হলে শায়খও পাবেন, বন্ধুও পাবেন। নিয়তও ভাল হবে, সেই সঙ্গে ভাল ও নেক কথাবার্তা বলার ও শোনার সুযোগ হবে।

জামাতে শত্রুদের থেকে উপদেশ নেয়া

জামাতে গিয়ে যখন সৎ ও ভাল কথা বলবেন, তখন সকলেই ঠাণ্ডা মাথায় মনোযোগ দিয়ে শুনবে না; বরং কেউ কেউ বিরোধীও হয়ে যাবেন। তাই এ জামাতের সাথী হয়ে শত্রুদের থেকেও উপকৃত হওয়া ও উপদেশ গ্রহণ করার উত্তম সুযোগ লাভ করা যায়। কারণ, আপনি দশজনের কাছে যাবেন। দশ মুখ

থেকে দশ ধরনের কথাবার্তা হবে। কেউ বলবে বেদাতি, কেউ বলবে ওহাবী। আরো নানা ধরনের ভাল মন্দ কথা আপনাদেরকে বলা হবে। আপনাদের দোষ-ত্রুটি বের করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালানো হবে। আপনি যখন এ জাতীয় কথা বার বার শুনবেন, চিন্তা করবেন– নিজের মধ্যে কি দুর্বলতা আছে, কি ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, তখন নিজেই নিজের ত্রুটি বের করে তা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। চিন্তা-ভাবনা করবেন।

মোটকথা, এই জামাত থেকে সৎ ও নেক লোকের সাহচর্য, বন্ধুত্বের পাশাপাশি শত্রু থেকেও উপদেশ গ্রহণের উত্তম সুযোগ লাভ করা যায়।

তাবলীগে নফসের হিসাব-নিকাশ

তাদের সঙ্গে যখন আপনি রাত কাটাবেন, তখন অবশ্যই চিন্তা করবেন– আজ আমি ক'টি নেক কাজ ও কটি মন্দ কাজ করেছি। তারপর আপনার অন্তরে খেয়াল আসবে– এখন রাত। আল্লাহর রহমত ও নৈকট্যের সময়। সুতরাং নেকীগুলোর শুকর ও মন্দ কাজগুলোর তাওবা করে নিই। এভাবে নেকীর পথ প্রশস্ত ও সুগম হবে এবং বদী ও মন্দ আমলের সংখ্যা কমে আসবে। সুতরাং এ জামাতে চারটি ওষুধ রয়েছে যা হেদায়াতের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এই ওষুধ চারটির পর অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে না।

তাবলীগ ও আত্মশুদ্ধি

মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে আমাদের নিজেদের দীন ও ঈমান ঠিক হোক। তাই ইসলামে নিজের থেকে শুরু করতে হয়। প্রথমে মানুষ নিজে নেককার হবে, তারপর অন্যদের নেককার ও সৎ বানানোর জন্য চেষ্টা চালাবে। একজন অন্যজনকে দেখে আমল করবে। এভাবে উভয়ে নেককার হয়ে যাবে। অন্যজনকে আমল করার জন্য আহ্বান করবে এবং নিজেও সংশোধন হবে।

কিছু সমালোচনা ও তার নীতিগত মৌলিক উত্তর

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যে কারণে জামাতের সমালোচনা করা হয়। এমন কোন কাজ এবং কোন কি আছে যার সম্পর্কে কোন সমালোচনা করা হয়নি? আপনারা সমালোচনা বাদ দিয়ে কাজ করতে থাকুন। যেমন- অনেকে বলে থাকে– তাবলীগ-ওয়ালারা শুধু ফযিলত বর্ণনা করেন।

মাসাইল বর্ণনা করেন না। অথচ দীন সঠিক রূপ লাভ করে মাসাইলের মাধ্যমে। ফযিলত শোনে অন্তরে আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মাসআলা অজানা থাকার কারণে মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে মনগড়া আমল করতে শুরু করে দিতে পারে। এর প্রবল সম্ভাবনাও রয়েছে। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে বিদআত। মানুষ বিদআতে লিপ্ত হয়ে যাবে।

মানুষ একথা বলে– এভাবে কাজ করলে মানুষ বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এটা একটি কাল্পনিক কথা। একটি আশংকা মাত্র। বাস্তব অবস্থা দেখতে হবে। বিগত চল্লিশ বছরে ক'জন মানুষ বিদআতে লিপ্ত হয়েছেন? তবে মাসাইল বর্ণনা করা হয় না, এর উত্তর হলো– আমরা প্রথমে ফযিলত বর্ণনা করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চাই। এতে মানুষ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। তারপর মাসাইল বর্ণনা করব। এ কথাও সঠিক নয় যে, চল্লিশ বছর ধরে তাবলীগ চালু রয়েছে, তাহলে এখনও মাসাইল বর্ণনা করার সময় হয়নি কেন? এখনও কি আবেগ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়নি?

এই সমালোচনার সঠিক উত্তর হলো– তাবলীগ-ওয়ালারা ফাযাইল বর্ণনা করেন ঠিকই; কিন্তু মাসাইলকে অস্বীকার তো করেননি। তারা কি একথা বলেন, মাসআলা শিখো না। কারো কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করো না? কখনো তারা একথা বলেননি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দীনি কাজ করার বিভিন্ন পথ ও পন্থা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্নতা। কেউ শিক্ষাদানের পথ অবলম্বন করেছে, কেউ ওয়াজ ও নসিহত; কেউ তাবলীগ, কেউ রাজনীতি। সুতরাং তাবলীগের বুযুর্গরাও একটি পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছেন। তারা আমলের ফযিলত বর্ণনা করেন। মানুষের মধ্যে দীনের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। সব কাজ তারাই করবেন– এটা হয় না। হওয়া সম্ভবও না। আপনারা যখন কোন কাজ শুরু করেন তখন এর আগে উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করেন। নিজের কাজের জন্য পথ ও পন্থা স্থির করে নেন। তখন আপনি দুনিয়ার সব কিছুকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন না। তা হলে আপনি তাবলীগে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করছেন কেন?

আসলে কেউ যদি সমালোচনা করে, তাহলে তা শুনে নেয়া উচিত এবং নিজে কাজকর্ম চলিয়ে যাওয়া উচিত। কাজ ও আমলের মাধ্যমে সব সমালোচনার উত্তর হয়ে যাবে।

তাবলীগের উদ্দেশ্য

তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের মধ্যে দীনের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেয়া। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বারা মানুষ দীনের যে কোন লাইনে উপকৃত হতে পারবে। যে কোন দীনি কাজে সময় লাগাতে পারবে। তাছাড়া বাস্তবে দেখা যাবে, যখন কোন কাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন মানুষ নিজেই সঠিকভাবে কাজ সম্পাদনের চেষ্টায় লেগে যায়। নিজের শক্তি সামর্থ ব্যয় করে। যদি আপনার অন্তরে সঠিক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মাসআলা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে আলেমগণের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করুন, মাদরাসায় যাতায়াত করে মাসাইল শিখে নিন। কাজ না করে কেবল সমালোচনা করা প্রতারকদের কাজ, অলস ও কামচোরদের কাজ।

যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বলেছি। প্রত্যেক দলের কিছু না কিছু উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নীতি ও বিশেষ কর্মপদ্ধতি থাকে। তাদের এ কাজের মধ্যে আপনি যদি অন্য জিনিস ঢুকিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেন, তবে তা কোনভাবেই সমীচীন হবে না। এ জামাত যখন নিজেদের জন্য একটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিয়েছে, তখন আপনারও সে নীতি অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া উচিত। নীতি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাদেরকেও তাদের নীতি অনুযায়ী কাজ করতে দেয়া কর্তব্য।

সারকথা, তাবলীগের উপকারিতা সূর্যের মতো স্পষ্ট। লাখো মানুষের অন্তরে দীনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আর এ আগ্রহ ও তলবের কারণে অনেক বিদআত সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। নইলে লাখ লাখ মানুষ শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের জন্য নিজের পকেটের পয়সা ব্যয় করে দেশ থেকে দেশান্তরে সফর করে নিজের পয়সায় খাবার খায়। এর আগে এই আগ্রহ উৎসাহ ও উদ্দীপনা কোথায় ছিল? তাদের দ্বারা যে উপকার হয়েছে, তা আপনি বলবেন না; আর যে জিনিস তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, সেই জিনিসকে পুঁজি করে সমালোচনা করবেন– তা উচিত নয়।

নিজে যোগ দিয়ে ভালমন্দ দেখা উচিত

সারকথা, আত্মশুদ্ধির চারটি উপায় রয়েছে। আর সৌভাগ্যক্রমে তাবলীগের মধ্যে চারটিরই মিশ্রণ ঘটেছে। নেক লোকের সাহচর্যও রয়েছে, যিকির ও ফিকিরও রয়েছে। দীনি ভ্রাতৃত্বও রয়েছে। প্রতিদিন নফসের হিসাব-নিকাশ নেয়া– সেটাও রয়েছে। শত্রু থেকে উপদেশ গ্রহণ, সাবধান সতর্ক হওয়া তা-ও

রয়েছে। এ চারটির সমষ্টির নাম হলো তাবলীগ জামাত। সাধারণ মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির উপায় হিসাবে এরচে' উত্তম কোন পথ নেই, হতে পারে না। তাবলীগের মাধ্যমে দীনের ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। সব দেশে দীনের আওয়াজ পৌঁছতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে মানুষের আকিদা ঠিক হচ্ছে। মানুষ নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে এবং নিজেদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাঁচে গড়ে তোলার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব বাস্তব কার্যক্রমকে সামনে রেখে সমালোচনাকারীদের উচিত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা।

এ কাজে নিজেরা যোগ দিয়ে এর বাস্তব উপকারিতা বুঝে নেয়া উচিত। আপনি জামাতে যোগদান করুন, তখন এ কাজের উপকারিতা অনুভব করতে পারবেন। বুঝতে পারবেন আপনার কি উপকার হয়েছে। আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে জেনে নিন। যে ব্যক্তি নেক ও সৎ নিয়তে একাজে অংশ গ্রহণ করবে তার উপর উবশ্যই এ কাজের শুভ প্রতিক্রিয়া হবে। একাজে لا اله الا الله এর দাওয়াত রয়েছে। নামাযের অনুশীলনী রয়েছে। সাথী ভাইদের সাহচর্য যিকির মুসাহাবা ও আত্মজিজ্ঞাসা রয়েছে। আরো অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এ পথের শ্রম ও সাধনায় মানুষের ভেতর অনেক খায়র ও সৎগুণ সৃষ্টি হচ্ছে। কত খারাপ মানুষ তাবলীগের বরকতে ভাল হয়েছেন। তাছাড়া ভুল আকিদার মানুষ সঠিক আকিদা গ্রহণ করে নিয়েছে।

অকারণ সমালোচনা

তাছাড়া সমালোচনা তো সেগুলো গ্রহণযোগ্য, যা কাজে যোগ দেয়ার মাধ্যমে করা হয়। বাইরে থেকে যেসব সমালোচনা করা হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। ভেতরে প্রবেশ করে যদি কেউ সমালোচনা করে তবে তা ঠিকই হয়। কেউ যদি কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে তার সমালোচনা করে তবে তা ঠিক হয়। কিন্তু যারা এ কাজে অংশ গ্রহণ না করে সমালোচনা করে তাদের সমালোচনা সঠিক নয়। অথচ ভেতরে প্রবেশ করার পর তারা এ কাজের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয়, এসব বাইরের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষের সমালোচনা থেকে মাদ্রাসাগুলোও নিরাপদ নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সমালোচনা থেকে রক্ষা পাননি। আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার পুত্র কন্যা রয়েছে। অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এসব কথা বলা, গালমন্দ করার চেয়ে কম নয়। বুখারী শরীফের হাদীস উল্লেখ রয়েছে–

قَالَ اللهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّه ذَا لِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه ذَالِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُه اِيَّاىَ فَقَوْلُه لَنْ يُّعِيْدَ نِىْ كَمَا بَدَأَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِه وَ اَمَّا شَتْمُه اِيَّاىَ فَقَوْلُه اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। অথচ তার জন্য উচিত ছিলো না আমার সম্পর্কে অসত্য বলা। সে আমাকে গালমন্দ করেছে অথচ তার জন্য এমন উচিত ছিল না। অসত্য বলা, যেমন একথা বলা- আল্লাহ আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন না। অথচ প্রথম বারের তুলনায় দ্বিতীয়বার জীবিত করা সহজ। আর আমাকে গালমন্দ করা হয় এই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা সন্তানের জনক। অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, আমার না আছে কোন জনক, না কোন পুত্র সন্তান, না আছে আমার কোন শরীক, না আছে আমার কোন অংশীদার।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন, এর চেয়ে বেশি কি গালি ও ভৎর্সনা হতে পারে যে, কোন মানুষ সম্পর্কে এমন বলা– সে সাপ জন্ম দিয়েছে! তার জন্য কত লজ্জার কথা হবে। অথচ সাপ একটি প্রাণী। আর প্রাণী হিসাবে উভয়ের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা হলেন– নূর জ্যোতি। তার জন্য পুত্র-কন্যা থাকার কি অর্থ? কত লজ্জাজনক কথা! এভাবে নবী রাসূলগণকেও বৎর্সনা করা হয়েছে। সমালোচনার পাত্র বানানো হয়েছে। কেউ বলেছে, গণক ঠাকুর, কেউ বলেছে যাদুকর ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমালোচনা থেকে রক্ষা পাননি। আমাদের ও আপনাদের কি মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে? কথা হলো, সমালোচনাকারীরা সবারই সমালোচনা করে। এতে ঘাবড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সমালোচনার তাৎপর্য

সমালোচনার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং অনেক সহজও বটে। হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন– ইলমী লাইনে ফতোয়া দেয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ।

যেহেতু যে কোন বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার সময় অনেক শাখা মাসআলা সামনে রাখতে হয়। সব শাখা মাসআলা যদি সামনে না থাকে, তাহলে ফতোয়া দেয়া কঠিন হয়। কোন সময় এমনও হয়, দুটি ঘটনা, দুটি মাসআলা একই রকম মনে হয়। কিন্তু দু'টির হুকুম আলাদা হয়ে থাকে। হযরত বলতেন– বড় আলেম ও মুফতি হওয়া জরুরী নয়। তারপর বলতেন, দরস দেয়া অনেক সহজ কাজ। ফতোয়া দেয়ার সময় অনেক শাখা মাসআলা সামনে রাখতে হয়। চিন্তা-ভাবনা করতে হয় অনেক। দেমাগের উপর চাপ দিতে হয় অনেক। দরস প্রদানকারী কিতাবের ইবারত পাঠ করে তার সারাংশ বর্ণনা করেছেন। আর এর চেয়েও সহজ কাজ হলো বক্তৃতা করা; তা-ও আবার সাধারণের মাহফিলে। এর সঙ্গে আমি অতিরিক্ত একটি কথা বলছি– এসবের চেয়েও সহজ হল এতরাজ করা, সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি বের করা। আপনি ইচ্ছামতো যার তার সমালোচনা করতে পারেন। সাহাবায়ে কেরাম আইম্মা মুজতাহেদীন– সবার সমালোচনা করতে পারেন। মজার ব্যাপার, সমালোচকগণ ক্লান্ত হন না। ক্লান্ত হওয়ার কোন কারণও নেই। সামালোচনায় কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বিবেক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সব বিষয়ে বলে দেন– এ কথা ঠিক নয়, এটা ভুল ভ্রান্তিতে পূর্ণ।

সমালোচনা করার জন্য ইলমেরও প্রয়োজন হয় না। সমালোচনা করে ঐ সব মানুষ যাদের ডিগ্রী নেই। সনদ ও সার্টিফিকেট নেই, ইলম ও আমল কোন বিষয়েই কোন সনদ নেই। সমালোচনা করা হল সহজ কাজ, যে কেউ সমালোচনা করতে পারে।

এ জাতীয় হীন ও সহজ কাজ যদি কেউ করতে চায়, করতে দিন। আপনার এতে কি ক্ষতি? আপনি আপনার কাজ ও দায়িত্ব যথাযথভাবে সমাধা করতে থাকুন। কাল কেয়ামতের ময়দানে সমালোচকগণও দণ্ডায়মান হবেন এবং তাদেরও কাতার হবে– যারা কাজ করেছেন। প্রত্যেকের কৃতকর্মের ফল তার হাতের সামনে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালার দান

এ হল আল্লাহ তায়ালার দেয়া তাওফিক ও আপনার ভাগ্য। কাজ করা আপনার ভাগে এসেছে এবং সমালোচনা করা তাদের ভাগ্যে জুটেছে। এতে আপনি আনন্দিত থাকুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন এবং অন্যের সমালোচনা করা থেকে হেফাযত করেছেন। এখন অন্যরা আপনার

সম্পর্কে যে সমালোচনা করে, আপনার আমল ও কাজ এর সঠিক উত্তর। প্রবাদ আছে, নীরব থাকা শতজনকেও পরাজিত করে দেয়। আর নীরব থাকার চেয়েও উত্তম কাজ হচ্ছে কাজ করে যাওয়া। এর মাধ্যমে সব এতরাজ, সব ধরনের সমালোচনা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

সারমর্ম

আমি আরজ করছিলাম আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আত্মশুদ্ধির পথ ও পদ্ধতিও আমি বয়ান করেছি। আর তাবলীগ জামাতে আত্মশুদ্ধির সব পথই রয়েছে। যে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবে, সে ততটাই উন্নতি লাভ করবে। আপনি যখন আমল করবেন, অবশ্যই এর ফল পাবেন; নিঃসন্দেহে লাভ করবেন এর প্রতিদান।

সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এটাই বলা হয়েছে যে, তাদের সমালোচনা গ্রহণ করার তেমন যুক্তি নেই। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে তাদের এতেরাজ ও সমালোচনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ জামাতে প্রবীণ ও জ্ঞানী মানুষ রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে এ কাজের মূলনীতি জানা যেতে পারে। নীতি অনুযায়ী কাজ করলে উন্নতি হয়। অনেক মানুষ শিক্ষাদানের কাজে রত আছেন, অনেকে আছেন ফতোয়ার কাজে। আপনাদেরকে তাবলীগ জামাত তাদের কাছে যেতে বাধা দিচ্ছে না। ইলম হাসিল করার আগ্রহ থাকলে আলেমদের কাছে যান। মাসআলা জানতে হলে মুফতিদের কাছে যান।

যারা কাজ করে তাদের জন্যই কাজ, তাদের জন্য পরিশ্রম ও সাধনা। আর যারা কাজ করতে চায় না, তাদের জন্য থেকে যাক এতেরাজ করা, সমালোচনা করা। পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে, যদি মন না চায় তবে ভিন্ন কথা। এটাই সঠিক কথা–

اگر تو ہی چاہے تو بہانے ہزار ہیں

বক্তারা সব কথাই বলে দিয়েছেন। ঘোষণাকারীরা সব ঘোষণা করে দিয়েছেন। কাজের ফলাফল ও গন্তব্যস্থল সবই বলে দিয়েছেন। আপনি চলুন। সবই সামনে আসবে। তাদের কাজ বলে দেয়া, আপনার পরিবর্তে পথ চলা তাদের কাজ নয়। আপনি কাজ করবেন, পথ চলবেন, ফলাফল লাভ। যদি করেন তাহলে অবশ্যই ফলাফল ও উপকার ব্যাপক। কজেই সবারই এ কাজে যোগদান করে আত্মনিয়োগ করা উচিত। আপনি যদি তালিমে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হন তা-

ই করুন, গাশতে অংশ গ্রহণ করতে পারলে, তা-ই করেন। কিছু সময় নিয়ে বের হতে পারেন। বের হয়ে পড়ুন।

ভাইয়েরা! এ কাজ থেকে বঞ্চিত থাকা, নেহায়েত দুর্ভাগ্যের কথা। চিন্তা গবেষণা দিয়ে হোক, কাজে যোগদান করে হোক, যেভাবে যে পরিমাণ সম্ভব– একাজে অংশ গ্রহণ করা বর্তব্য।

এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত শায়খের সাক্ষাৎ লাভ। তারপর আপনাদের আবদার রক্ষা করাও দরকারী ছিল– সে উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, নফসের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি হলে মানুষ কামেল হবে। আর তা লাভ হবে ঐসব পদ্ধতি অবলম্বনে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ কথাগুলোকে কবুল করুন এবং সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন। করুন। আমিন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. اَللّٰهُ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَذَ ايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ১১

দলবদ্ধ তাবলীগ

শরীয়ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মন মানসিকতা, পরিবেশ আবহাওয়া ও মেজায অনুযায়ী বিভিন্ন হয়েছে। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সে অনুযায়ী আমল দেয়া হয়েছে। রোগ অনুযায়ী ওষুধ দেয়া হয়েছে। যদি কোন জাতি কঠোর স্বভাবের হয়, মন-মানসিকতায় থাকে কঠোরতা, তাহলে তাদের জন্য কঠোর শরঈ আহকাম বা আইন অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন জাতির মন-মানসিকতা নরম কোমল হলে তাদেরকে কোমল শরীয়ত তথা নরম বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

দীন একই ছিল; অবস্থাভেদে শরীয়ত ভিন্ন ছিল

বুযুর্গানে মুহতারাম ও প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহ তায়ালার দীন হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে তা শেষ হয়েছে। সকল নবীর দীন একই ছিল, তবে শরীয়ত ছিল বিভিন্ন। মোটকথা, মূল দীন একই ছিল।

মূল দীনের মধ্যে মৌলিক জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, বড়ত্ব, নবুওয়ত, আলমে বরযখ, মৃত্যুর পরের জগত, আলমে হাশর, বেহেশত-দোযখ, মিজান (দাঁড়িপাল্লা) পুলসিরাত– এসব জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সব নবীর দীনেই ছিল। এগুলো হলো দীনের মূলনীতির বিষয়। তারপর হলো শরীয়ত– যা আমল করা বিধান, রীতি নীতি ও পদ্ধতি যা ঐ সকল মৌলিক নীতির অধীন। শরীয়ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মন মানসিকতা, পরিবেশ আবহাওয়া ও মেজায অনুযায়ী বিভিন্ন হয়েছে। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সে অনুযায়ী আমল দেয়া হয়েছে। রোগ অনুযায়ী ওষুধ দেয়া হয়েছে। যদি কোন জাতি কঠোর স্বভাবের হয়, মন-মানসিকতায় থাকে কঠোরতা, তাহলে তাদের জন্য কঠোর শরঈ আহকাম বা আইন অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন জাতির মন-মানসিকতা নরম কোমল হলে তাদেরকে কোমল শরীয়ত তথা নরম বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে। যাদের স্বভাব প্রকৃতি ও মন মানসিকতায় এতদাল বা সংযত মধ্যম ছিল তাদের শরীয়তও মধ্যম সংযত করে দেয়া হয়েছে। কথা হল, আমল সম্পর্কীয় আদেশ নিষেধ জাতির মন মানসিকতা ও স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

এ কথাটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে– (আমাদের পিতা একজন কিন্তু মাতা ভিন্ন ভিন্ন) اَبُوْنَا وَاحِدٌ وَاُمَّهَاتُنَا شَتّٰى পিতা শব্দ দ্বারা মূলের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দীন সবারই এক, আর মা দ্বারা শরীয়তের বিভিন্নতার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক নবীর যুগে শরীয়তে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন- হযরত আদম (আ.)-এর যুগ বরকতময় যুগ ছিল। তাকে এভাবে বুঝে নিন, যেমন আদম (আ.)-এর যুগে মানব সম্প্রদায়ের শৈশবকাল ছিল। মানব জাতি যেন একটি বালক। পরবর্তীতে সে যুবক হবে। তারপর বৃদ্ধ হবে। কাজেই সে অনুযায়ী তার আদেশ-নিষেধ বিধি-বিধানও হালকা হবে। وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا সব জিনিসের নাম তাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ছেলে মেয়েদেরকে প্রাথমিকভাবে আপনারা জিনিসপত্রের নাম মুখস্থ করিয়ে থাকেন। যেমন- এ হলো আকাশ, এ হলো পৃথিবী, এ হলো রুটি, এ হলো মোটা ইত্যাদি। তখন আমল হিসেবে শুধু ছিল– আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি নাম শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। সকাল সন্ধ্যা কয়েকবার করে ঐ নাম জপ করে নেয়া হত। এ আমলই তারা করতো। তখন মানব জাতি ও মানব সভ্যতা সরল সোজা ছিল। যেমন শিশুদের থাকে। তাদের প্রতি আহকামও ছিল শিশুসুলভ। ঐসব পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান ছিল না, যা পরবর্তী

শরীয়তসমূহে অবতরণ করা হয়েছিল।

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর যুগ এলো। তখন মানুষ সৌর বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। চন্দ্র সূর্যকে উপাসনা করতো, গ্রহ নক্ষত্রকে ক্রিয়াশীল ও ক্ষমতাধর বলে ভাবত। তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) ঐ যুগের মানসিকতাকে সামনে রেখে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বকে বুঝিয়ে দিলেন।

পবিত্র কুরআন এর আলোচনা করেছে–

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّيٓ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ○ وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ○

ইবরাহিমকে (আ.) গ্রহ-নক্ষত্র ও সৌরবিজ্ঞান শিখিয়ে দেয়া হল। তিনি সেই পদ্ধতিতে জাতির সংশোধন করলেন এবং সে অনুযায়ী আদেশ নিষেধও দেয়া হল। [আনআম : ৭৫-৭৬]

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগ এলো। ইহুদীরা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ছিল। জন্মলগ্ন থেকে এ সম্প্রদায়ের কঠোর স্বভাব ছিল। তাদের মধ্যে অহংকার ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরের অধিকাংশ ছিলেন বুযুর্গ। বুযুর্গজাদাদের অন্তরে কিছুটা গর্ব গরিমা থাকে। তাই তারা বলত– نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তান এবং বন্ধু। আমরা নবীগণের বংশধর। অন্যকে সহজে মেনে নেয়া স্বভাববিরুদ্ধ। তাই তারা অনেক নবীর মোকাবেলা করেছে, হত্যাও করেছে এবং কাফের বলেছে। তারা নবীদের সঙ্গে এসব করেছে। অভদ্র ব্যবহার করেছে। যখন কোন আদেশ দেয়া হতো, তখন এর জোর বিরোধিতা করত, আনুগত্য করত না। তাই তাদের জন্য কঠোর শরীয়ত বা বিধি-বিধান নাযিল করা হল। তারা গো-শাবককে পূজা করল। তখন তাদেরকে আদেশ দেয়া হল তোমরা পরস্পর অন্যকে হত্যা কর। তখন পিতা পুত্র, পুত্র পিতাকে হত্যা করল। এভাবে হাজারো মানুষ নিহত হল। কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে– তারা রাতে যে বদ আমল করত, ভোর বেলা তাদের দরজার উপর তা লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। অপকর্মের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতেই লজ্জিত অপমাণিত করে দেয়া হত। এত কঠোর আহকাম দেয়া হয়েছিল তাদেরকে।

কাপড়ে যদি নাজাসত বা ময়লা লেগে যেতো, তাহলে পানি দিয়ে তা পাক হতো

না। বরং কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলতে হত। শরীরে নাজাসাত লাগলে পানি দিয়ে পরিষ্কার বা পাক হতো না; বরং চামড়াকে আঁচড়ে ফেলতে হত। এমন কঠোর নির্দেশ ছিল। যেহেতু তাদের মানসিকতা ও স্বভাব প্রকৃতিতে কঠোরতা ছিল।

তারপর এলো হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ। এ যুগে পূর্ববর্তীদের বিপরীত আমল ছিল। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত নরম ও কোমলতা ছিল। তাই তাদের জন্য বিধি-বিধান ছিল নরম ও কোমল। বলা হয়েছিল– তোমার ডান গালে যদি কেউ চপেটাঘাত করে তাহলে তোমার বাম গালও তার সামনে পেশ কর আর বল, ভাই! আর একটি চপেটাঘাত কর। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। প্রতিশোধ গ্রহণ যেন ঐ শরীয়তে নিষেধ ছিল। ইহুদীদের ধর্মে প্রতিশোধ গ্রহণ ওয়াজিব ছিল। যদি কেউ তোমার দাঁত ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তোমার কর্তব্য হলো তার দাঁত ভেঙ্গে দেয়া, যদি চোখ উপড়ে ফেলে তাহলে তোমারও কর্তব্য তার চোখ তুলে ফেলা।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ○

তাদের জন্য বিধান দেয়া হয়েয়িল– জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং ক্ষতের বদলা আছে। সারকথা, যেমন কাজ করবে তেমন প্রতিশোধ নিতে হবে। মাফ বা ক্ষমা করা জায়েয ছিল না। ক্ষমা হল কোমল হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য। যাদের কাঠোর হৃদয় তাদের জন্য ক্ষমা কার্যকর নয়। সেখানে প্রতিশোধ নিতেই হবে। তা হলে কঠোর হৃদয় ব্যক্তি সোজা হবে। মুসা (আ.)-এর শরীয়তে প্রতিশোধ গ্রহণ ওয়াজিব ছিল। ক্ষমা করা জায়েয ছিল না। ঈসা (আ.)-এর শরীয়তে এর বিপরীত ছিলো। শুধু প্রতিশোধ গ্রহণই নাযায়েজ ছিল না; বরং ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব ছিল।

এক স্থানে আদেশ ছিল, যদি কাপড়ে নাজাসাত লেগে যায়, তাহলে কাপড় কেটে ফেলতে হবে। আর এক স্থানে হুকুম ছিল যদি সমস্ত দেহে নাজাসাত লেপটে যায়– অসুবিধা নেই; অন্তরকে পাক পবিত্র রাখ। ইবাদত করতে থাকো, শরীর যেমনই হোক। এত সহজ করা হয়েছিল। অর্থ হলো জাতির মন মানসিকতা ও স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। দীন ও মৌলনীতি সবারই এক ও অদ্বিতীয়।

আর বর্তমান যুগের উম্মতকে আমল কম অথচ প্রতিদান বেশি দেয়া হয়েছে।

সবশেষ যখন উম্মতে মুহাম্মাদিয়া আসল তখন উম্মত হল বৃদ্ধ। বুড়ো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা বেড়ে যায়। তবে কর্মক্ষমতা কমে যায়। বৃদ্ধদের দিয়ে আমল ও কাজকর্ম হওয়া কষ্টকর হলেও তাদের অভিজ্ঞতা বেশি থাকে। তাই যুবকদের কর্তব্য হলো তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা। তাঁদের মত অনুযায়ী কাজ করা। তাঁরা বিভিন্ন যুগের ভাল-মন্দ দেখে এসেছেন। উত্থান-পতনও দেখে এসেছেন। তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেন। এ যুগের উম্মত বয়স্ক ও বৃদ্ধ উম্মত, সর্বশেষ উম্মত। এ উম্মতের উপরই বিশ্বের ধ্বংস। এ যেন মানব সম্প্রদায়ের বৃদ্ধকাল। যেমন আদম (আ.)-এর যুগে শৈশবকাল ছিল। সে যুগে শিশুদের উপযোগী আহকাম ছিল। আর এ উম্মতের জন্য বৃদ্ধদের উপযোগী আদেশ-নিষেধ রয়েছে। বয়স্কদের জন্য এমন হয়– যেমন কাজের চাপ কম দেয়া হয়, কিন্তু ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ দেয়া হয় বেশি। যদি বিয়ে-শাদীতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তখন বড়মিয়াকে বলা হয়, আপনার প্রধান কাজ হল বসে বসে পর্যবেক্ষণ করা। যুবকরা খাবার বণ্টনের দায়িত্ব পালন করবেন। বড় মিয়া সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চেয়ারে বসে থাকেন। কিন্তু বিকাল বেলা মানুষ বলে, বড় মিয়া অনেক কাজ করেছেন। উত্তম ব্যবস্থাপনা করেছেন। অত্যন্ত কাজের মানুষ তিনি। নেহায়েত সাহসী ও কর্মঠ ব্যক্তি। অথচ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চেয়ারে বসা ছিলেন। বড় মিয়া কি কাজ করেছেন? অথচ বলা হয়, অনেক কাজ করেছেন। খুবই কর্মঠ ও সাহসী ব্যক্তি। অথচ একটি বাসনও উঠিয়ে তিনি কাউকে দেননি। মোটকথা, বৃদ্ধদের উপর কাজের চাপ কম থাকে। আর ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ দেয়া হয় বেশি। আর যুবকদের দায়িত্ব হলো তাঁদের কথা ও পরামর্শ মেনে চলা। যেহেতু তাদের কথার মূল্য ও ওজন রয়েছে।

শেষ উম্মতের অবস্থাও তাই। সব উম্মতের অবস্থা তাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এ উম্মতের ইলম ও জ্ঞান পরিপূর্ণ। তাদের অভিজ্ঞতার পরিধিও অনেক বিস্তৃত। আগের উম্মতের সামনে অনেক সূক্ষ্ম মাসাইল সম্পর্কে কোন বিধান ছিল না। এগুলো এ উম্মতের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। অন্যদের বেলায় তা প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, এ উম্মতের সামনে হযরত আদম (আ.)-এর উম্মত, হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মত, হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মত, হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের সব অবস্থাই রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এক একটি জিনিসকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সব ঐতিহাসিক জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এ উম্মতের সামনে সকল উম্মতের সকল অবস্থা রয়েছে। এজন্য উম্মত রওশন জামির বা উজ্জ্বল হৃদয়। তাদের জ্ঞান প্রগাঢ়।

এ কারণেই কেয়ামতের দিনে এ উম্মতের সাক্ষ্যে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ফয়সালা হবে। যেহেতু এরা সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত রয়েছে। যে উম্মত সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, বাতেল ও পথভ্রষ্ট ছিল, তারা আল্লাহর দরবারে বাতেল বলে গণ্য হবে। আজাব ও সওয়াব, শাস্তি ও প্রতিদান সব বিষয়ের ফয়সালা এ উম্মতের সাক্ষ্যে করা হবে। যেহেতু সকলের অবস্থা সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞ অন্য কেউ থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا○

এ মধ্যপন্থী উম্মতকে বিশ্ববাসীর জন্য আমি সাক্ষী নিয়োগ করেছি, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আমার উম্মত সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করেছে। [বাকারা : ১৪৩]

সারকথা, এ উম্মতকে ইলম দান করা হয়েছে। কিন্তু আমলের বোঝা দেয়া হয়েছে কম। যেসব শক্ত কঠোর ও শ্রমসাধ্য আমল আগের উম্মতগণকে দেয়া হয়েছিলো, তার এক দশমাংশ; বরং এর অর্ধেকও এ উম্মতকে দেয়া হয়নি। বরং সহজ সহজ আমল দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান দেয়া হয়েছে বেশি। একটি নেকীর বদলে দশটি পাবে। বরং তা দশটিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাতশ' পর্যন্ত হতে পারে। وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ সাতশ'তেও সীমিত নয়; বরং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন বাড়িয়ে দিবেন। কমপক্ষে এক নেকী দশ নেকীর সমান। তা হবে আবার সাতশ'র সমান। তারপর হাজারো হাদীসে বলা হয়েছে– تصدقوا ولو بشق تمر দান করো, যদিও খেজুরের একটি দানা হয়। এ দানকে আল্লাহ প্রতিপালন করেন। কেয়ামতের দিন উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য করে পেশ করা হবে। মানুষ অবাক হবে। এত বিরাট প্রতিদান? আল্লাহ বলেন– আপনি একটি দানা দান করেছিলেন। এখন দানাটিকে উহুদ পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করুন। একটি পাহাড় কি পরিমাণ দানার তুল্য হতে পারে? কোটি কোটি বহু কোটি বললেও হবে না।

উম্মতের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ

অর্থাৎ এই একটি খেজুর দানার প্রতিদানকে কোটি কোটি গুণ দান করা হয়েছে। এ উম্মতের কাজ সহজ কিন্তু প্রতিদান অনেক বেশি করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করেন, কাজ এখনও করেননি, তখনই একটি নেকী লিখে দেয়া হয়। তারপর যদি নেক কাজ করেন তাহলে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিদান দেয়া হয়। ইনসাফের কথা হলো, গুনাহর বেলাও তেমনি করা হবে। কিন্তু তা করা হয় না। ইচ্ছা করার পর যদি পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, তাহলে একটি নেকী লিখে দেয়া হয়। আর পাপ থেকে বিরত থাকা একটি নেকীর কাজ। আল্লাহ না করুন, যদি পাপকর্ম করে ফেলে, তাহলে হাদীসে বলা হয়েছে– ফেরেশতাগণ অপেক্ষায় থাকে। তৎক্ষণাৎ লিখেন না। সম্ভবত সে তাওবা করে নিবে। التائب من كمن لا ذنب له গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন হয়ে যায়, যেন সে গুনাহই করেনি। এর হিসাব করা হবে না। যদি তাওবা করে নেয় তাহলে আমলনামা পরিষ্কার। সে যেন কোন গুনাহ করেনি। যদি তাওবা নাও করে তাহলে ওয়াদা করা হয়েছে–ان الحسنت يذهبن السيئات তোমাদের নেকী যদি বেশি থাকে তাহলে তোমাদের পাপকে মিটিয়ে ফেলবে। এভাবে ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে। এ উম্মতকে নেহায়েত সহজ করে দেয়া হয়েছে। আমল ও কাজের চাপ কম দেয়া হয়েছে। আর প্রতিদান দেয়া হয়েছে অনেক অনেক বেশি।

আগের উম্মতদের বলা হয়েছিল– তোমরা যদি নবীর অবাধ্য হও, নাফরমানি কর, তোমাদের উপর আজাব নাজিল করা হবে। কওমে আদকে তুফান দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। কওমে শোয়াইবের উপর অগ্নি বর্ষণ করা হয়েছে; তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। ফিরাউনের কওমকে সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের উপর কঠোরতম আজাব অবতীর্ণ হত। এ উম্মতের বেলায় রাহমাতুল্লিল আলামিনের তুফায়েলে লোকেরা অহরহ গুনাহ করছে, মন্দ কাজও করছে; কিন্তু বলা হয়েছে–

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ○

আল্লাহ এ উম্মতকে আজাব দিবেন না। যে পর্যন্ত নবী তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। যে পর্যন্ত তারা ইস্তেগফার করতে থাকবে সমগ্র উম্মতকে আজাবে লিপ্ত করা হবে না। [আনফাল : ৩৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন– আমার উম্মতের মূল উৎপাটন হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় একটি জামাত হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হক ও সত্য থেকে এ উম্মত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। لا تجتمع امتی علی ضلالة আমার সমগ্র উম্মত কখনো ভুল কথার উপর একতাবদ্ধ হবে না। দল উপদল হবে, সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু এক জামাত সব সময় হকের উপর থাকবে। এ জামাত ঐ কাজই করবে যা আমি করেছি। ঐ সব কথাই বলবে, যা আমি বলেছি। এতেকাদ (বিশ্বাস) ও আমলের ঐরূপ রেখাই থাকবে, যা আমি তৈরি করেছি।

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

> আমার উম্মতের একদল সব সময় হকের উপর থাকবে। এখানে 'তা-ইফা' বলা হয়েছে। 'তা-ইফা' ছোট দলকে বলা হয়। অর্থাৎ ছোট দলই হোক কিন্তু হকের উপর থাকবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। কেউ তাদেরকে অপদস্থ করতে পারবে না। মানুষ তাদের বিরোধিতা করবে। কিন্তু তারা হক থেকে বিচ্যুত হবেন না। সব সময় এগিয়ে যেতে থাকবেন।

সারকথা, রাহমাতুল্লিল আলামীনের তুফায়েলে এ উম্মতকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। নেক কাজের প্রতিদানে এবং পাপকর্মের ক্ষমা মার্জনায় আরো অনেক জিনিস রয়েছে।

দীনে একত্ব ও শরীয়তের বিভিন্নতার দলিল

একথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আদম (আ.) থেকে এখন পর্যন্ত দীন একই রয়েছে। তবে শরীয়ত ছিল ভিন্ন। সকল নবীর একই দীন ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর তাওহিদ ছিল এক। তারপর এ তাওহিদকে ভিত্তি করে আমলসমূহ নির্ধারিত করা হয়েছে। এ কথাই বলা হয়েছে– كَانَ دِيْنُ الْأَنْبِيَاءِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ অর্থাৎ সকল নবীর দীন ছিল لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, কিন্তু শরীয়ত বিভিন্ন।

যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কুরআনে এ বিষয়ের প্রতি

ইঙ্গিত রয়েছে–

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِىَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ○

আমি যে অসিয়ত হযরত নূহকে করেছিলাম সেই অসিয়ত আপনাকেও করেছি, ঐ অসিয়ত হযরত ইবরাহিম ও হযরত মুসা, হযরত ঈসাকেও করেছিলাম। বলেছিলাম, দীন কায়েম কর। এতে মতভেদ করো না। বিভিন্নতা করো না। দীন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একই ছিল, شَرَعَ لَكُمْ শব্দ বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সকলের জন্য একই দীনকে নির্ধারিত করেছেন। দীনে কোন পার্থক্য নেই। [শুয়ারা : ১৩]

আর শরীয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لِكُلٍّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি তাদের উপযোগী শরীয়ত ও কর্মপন্থা দান করেছি। যেখানে দীন শব্দ বলা হয়েছে, সেখানে সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। তোমাদের দীন এক। আর যেখানে শরীয়ত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে لِكُلٍّ أُمَّةٍ বলা হয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক উম্মতের জন্য বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, দীন একই ছিল এবং শরীয়ত ছিল বিভিন্ন এবং জাতিসমূহের মন-মানসিকতা ও স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্নতার কারণে এমন হয়েছে।

ফিকহে পথ ভিন্ন; তবে মূল একই

তাহলে স্পষ্ট কথা, আমাদের শরীয়ত একই। কোন নতুন নবী আসবেন না। নতুন কিতাব অবতীর্ণ হবে না। নতুন শরীয়ত আসবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষ নবী। পবিত্র কুরআন সবশেষ কিতাব। ইসলামী শরীয়ত সবশেষ শরীয়ত। এ সবকিছু পূর্ণতার চরম সীমায় অবস্থিত। এ শরীয়তের পরে কোন নতুন শরীয়ত আসবে না। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের লোকের মন-মানসিকতা এক রকম নয়। দীন ও শরীয়ত একই তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী বিভিন্ন সমাজের জন্য শরীয়ত হল পয়গামে

হিদায়ত। অথচ এদের মন-মানসিকতা স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্ন। ইউরোপে বসবাসকারীদের স্বভাব প্রকৃতি পৃথক, এশিয়াবাসীদের আলাদা, আফ্রিকানদের আলাদা, অথচ সকলের জন্যই শরীয়ত এক।

এজন্য প্রয়োজন ছিল, শরীয়তের অধীনে এমন সব ইমাম জন্মগ্রহণ করবেন যাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতি ও মন-মানসিকতা অনুযায়ী শরীয়ত তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। যেহেতু আইম্মায়ে হিদায়ত বিভিন্ন। হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল। এ চার ইমাম যেন চাঁদ সূর্যের মতো সম্পূর্ণ। তাঁদের আলোই বিদ্যমান রয়েছে। আরো অনেক ইমাম ও ফকীহ রয়েছেন যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম হাম্মদ, ইবনে সালমা সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না– এঁরা সকলেই ইমামে ফেকাহ ছিলেন। কিন্তু এ সকল ফেকাহ চাপা পড়ে গেছে এবং ঐ চার ইমামের ফেকাহ প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সাধারণত বিশ্ববাসী এ চার জনকে ফকীহ বলে গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ তুর্কিস্থান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের এক বিরাট অংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। পশ্চিমা দেশগুলো অধিকাংশ ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুসারী। নজদে হাম্বলীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। হেজায ও মিশরে শাফেঈদের প্রাধান্য। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্ব এ চার ইমামের অনুসারী। তাঁদের ফিকহ অনুসরণ করেছে। এ চার দলের সমষ্টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয়। যেমন বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের মাযহাবই প্রচলিত রয়েছে।

কোন নতুন নবী আর আসবেন না। কোন নতুন কিতাব আসবে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনকে এত পূর্ণাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে যে, কুরআন হতে বিভিন্ন ফকীহ'র পথ ও মত বেরিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি ফিকাহ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপযোগী। একটি হলো ফিকহে শাফেঈ। এ ফিকাহ যাদের উপযোগী হয়, তারা সে অনুযায়ী আমল করবে। যাদের উপযোগী হয় ফিকহে হানাফী, তারা তাঁর অনুসরণ করবে। মালেকী ফিকহ রয়েছে, যাদের মুনাসরত হয় এর সঙ্গে, তারা এর অনুসরণ করবে। এভাবে ফিকহে হাম্বলী রয়েছে। সারকথা, মূল শরীয়ত এক, এক হল তার শাখা-প্রশাখা। মূল শরীয়ত এক এবং অভিন্ন– যা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দান করেছেন। আর অন্যগুলো হল বিভিন্ন অর্থাৎ গবেষণামূলক বিষয়ে মতভেদ। ইমামগণ বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর হুকুম কুরআন হাদীস থেকে আহরণ করেছেন– যা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফিকহের রূপ ধারণ করেছে। এসব ফিকাহ'য় স্পষ্ট কথাটি বিভিন্ন সমাজের মন-মানসিকতার প্রভাব রয়েছে। কাজেই যে সমাজে যেমন

মানসিকতা থাকবে, লোকেরা সে সমাজের উপযোগী ফিকহের অনুসরণ করবে। যেহেতু সব ফিকাহই সত্য ও সঠিক এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল।

তাসাওউফে পথের বিভিন্নতা : মূল এক

এ অবস্থা সুফী সাধকদের মধ্যে দেখা যায়। সুফী সাধকদের মূল তরিকা, যাকে এহসানে সুলফ বলা হয়, তা একই। আর তা কুরআন হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যার অর্থ হলো আত্মাকে পবিত্র করো, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো। এ হলো মৌলিক জিনিস। এখন আত্মাকে পাক পবিত্র করার পন্থা কি? এতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। চিশতিয়াগণ এক নিয়ম রেখেছেন। নকশবন্দীগণ অন্য নিয়ম রেখেছেন। সোহরাওয়ার্দীগণ অন্য নিয়ম রেখেছেন। এসব হলো আত্মাকে পরিষ্কার করার বিভিন্ন পথ ও উপায়।

আত্মা পরিষ্কার করার জন্য আল্লাহর যিকির করো, যা কুরআন হাদীসে রয়েছে। এসব হযরত নতুন কোন যিকির প্রস্তাব করেননি। বরং ঐ আযকার এ আশারা (দশটি যিকির) তাসবীহ তাহযিদ তামজিদ তাহলীর, তাকবীর–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

সুতরাং লা হাওলা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ইস্তেগফার, দরূদ শরীফ– এসবই কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সকল তরিকার বুযুর্গান এসব যিকিরই বলে থাকেন। তাহলে যিকিরের নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন– যার অন্তরে যা রয়েছে তা ঘষে মেজে পরিষ্কার করা হোক। ঘষা মাজার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন, জিয়ারত ও সাধনা ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছে। কিন্তু এসব হল তদবির, কর্মপদ্ধতি। যদি কেউ এসবের বিরোধিতা করেন, তাহলে তিনি (আল্লাহ না করুন) ইসলাম হতে বহিষ্কার হবেন না। যেহেতু মূল দীন এসব নয়। এ হলো দীনদার হওয়ার একটি তদবির বা পন্থা।

সারকথা, ফিকাহ'য় বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। তাসাওউফে বিভিন্ন রিয়াযত ও সাধনা রয়েছে। ফিকহ ও তাসাওউফে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কিন্তু মূল ভিত্তি সকলের এক ও অভিন্ন।

তাবলীগ ও প্রচারের পদ্ধতি বিভিন্ন : উৎস এক

ঠিক একই অবস্থা হয়েছে বর্তমান যুগে দীনের তাবলীগ ও প্রচারের। দীনকে সবার কাছে পৌছাতে হবে– এতে কোন দ্বিমত নেই। এ হলো এক। এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছা পৌছে দিন। যিকির আযকার, নামায, রোযা, যাকাত হজ– এগুলোকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু এসবকে অন্যদের কাছে পৌছানোর জন্য কি পথ ও পন্থা গ্রহণ করা হবে? যেমন- তিতা ওষুধ ক্যাপসুলের মাধ্যমে সেবন করতে পারেন অথবা অন্য কোন পন্থায় সেবন করতে পারেন; আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতা ওষুধ সেবন। তারপর পথ ও পদ্ধতিতে প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু এসব পথ ও পন্থার মাধ্যমে যে জিনিসটি সেবন করানো হয় তা একই। এতে সামান্যতম পার্থক্য নেই।

তাহলে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রিওয়ায়েতের বর্ণনার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়া হতো, যতক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রিওয়ায়েত সহীহ শুদ্ধ না হবে, মানুষ তা মানবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা মুহাদ্দিসীনে কেরামদের পয়দা করেছেন। তাঁরা অনুসন্ধান করে করে শুদ্ধকে অশুদ্ধ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। 'আসামাউর রিজাল' বা বর্ণনাকারীদের আত্মজীবনী হচ্ছে এর স্বয়ংসম্পূর্ণ ফল। তাঁরা এ বিদ্যা আবিষ্কার করেছেন; যেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা হাদীসের বর্ণনাকারী তাদের নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতা সব কিছু লেখা রয়েছে। এমন পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবনী লেখা রয়েছে।

এছাড়া হাদীসেরও স্তরভেদ ও শ্রেণী-বিন্যাস রয়েছে। শক্তিশালী ও দুর্বল (কাভী ও জঈফ) মাতরুক (বর্জিত) মাজহুল (অপরিচিত) ইত্যাদি বহু পরিভাষা তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। সনদ যদি মুত্তাসিল (মিলিত সংলগ্ন) হয়, তাহলে হাদীসকে মারুফ মুত্তাসিল বলা হবে। যদি সনদ মাঝখানে কাটা থাকে তাহলে মুনকাতে (কর্তিত) হয়ে যাবে। যদি সাহাবীতে মুনকাতে হয়, তাহলে মুরসাল বলা হবে। প্রভৃতি পরিভাষা তৈরি করে একটি দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত করে দেয়া হয়েছে। যেন সঠিক হাদীসে বেঠিক হাদীস প্রবেশ করতে না পারে। ঐ দাঁড়িপাল্লায় মেপে নাও, ঐ কষ্টি পাথরে পরখ করে নাও। তাহলে ভাল মন্দ আলাদা হয়ে যাবে। অতএব প্রাথমিক যুগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রিওয়ায়েতের উপর ছিল। তখন রিওয়ায়েত ও ইতিহাসের মূল নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণনা হিসাবে দীনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সন্দেহ সংশয় মুক্ত করে পেশ করা হয়েছে এবং মানুষ তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এরপর আসলো দেরায়ত (অর্থ ও মর্মানুভব)-এর যুগ। সকল হাদীস ও রিওয়ায়েত কিতাবাদিতে সংকলিত হয়েছে; একত্রিত হয়েছে। কিন্তু এসব রিওয়ায়েত থেকে আহকাম ও মাসাইল বের করতে হবে। তাই প্রয়োজন দেখা দিল ইজতেহাদের (মাসাইল উদ্ভাবন করার)। সুতরাং এ যুগ ছিল আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ। ইমামগণ মাসাইল উদ্ভাবন করলেন। একথা জানালেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে। মুল কারণ কি ছিল? যার উপর ভিত্তি রয়েছে এ মাসআলার। ঐ ইল্লত (মুল কারণ)কে উদ্ভাবন করেছেন। ঐ ইল্লতে মতবিরোধ হয়েছে। কাজেই পরবর্তী শাখা-প্রশাখায়ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন মাযহাবে মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু সবাই হকের উপর রয়েছেন। যেহেতু সকলের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ যুগ ছিল ইজতেহাদের যুগ। এ যুগে রিওয়ায়েত ও বর্ণনাভঙ্গির প্রাধান্য ছিল না। তারা দেখতেন বর্ণনাকারীর জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি কেমন। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি, জ্ঞান বুদ্ধি ও মর্মানুভব শক্তি কি রকম? তারপর যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা হত।

এরপর আসলো তাসাওউফের যুগ। যে পর্যন্ত কুরআন হাদীসকে সুফিদের পরিভাষায় বুঝানো না হবে, মানুষ তা বুঝবে না। সমগ্র পৃথিবীতে সুফিদের প্রাধান্য ছিল। ঐ যুগে ইমাম গাযালী, মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী প্রমুখ জন্মগ্রহণ করলেন– যাঁরা কুরআন ও হাদীসকে সুফি সাধকের পরিভাষায় তাদের রং-ঢংয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝালেন। সারকথা, বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে সত্য, কিন্তু কুরআন ও হাদীস ঠিকই রয়েছে; বর্ণনার ভঙ্গি আলাদা আলাদা ছিল, শাখা-প্রশাখা পৃথক হয়েছে। কিন্তু মূল উৎস সকলের এক ও অভিন্ন ছিল। ভিত্তি এক ছিল, তাই সকলেই আহলে হক ছিলেন।

এরপর আসলো বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের যুগ। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যে পর্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা না হবে, মানুষ বুঝবে না। তখন শাহ ওলীউল্লাহ ও ইমাম গাযালীর মত মহামনীষীগণ জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁরা দীনকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। যেখানে নকলী (কুরআন হাদীসের) প্রমাণাদি ছিল সেখানে যুক্তিতর্কের প্রমাণ পেশ করলেন। কিন্তু যুক্তিতর্ককে কুরআন হাদীসের অধীন রাখলেন। জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিতর্ক দীনের অধীন, দীনের উপর কর্তা ও হাকিম হবে না, হতে পারবে না। দীনই হবে নির্দেশদাতা, তাঁর কর্মচারী হিসাবে বুদ্ধি তার পেছনে চলবে। দীন একটি দাবি করবে এবং বুদ্ধি তা সমর্থন করে প্রমাণ ও স্পষ্ট করে দিবে। খেদমত করাই হলো বুদ্ধির কাজ। তাই বুদ্ধিকে খাদেম বানানো হয়েছে। এ যুগ ছিল এমন, যে পর্যন্ত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে

বুঝানো না হবে, মানুষ তা মেনে নিবে না।

এরপর এলো বিজ্ঞানের যুগ। এখানে জ্ঞান বুদ্ধি থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বাস্তবতাকে, জড় পদার্থকে। বাস্তব ও চাক্ষুস বস্তু দিয়ে যে কোন বিষয় বুঝাতে হবে। তাহলে মানুষ তা মেনে নিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা এমন উলামা পয়দা করলেন, যেমন- হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী, হযরত মাওলানা নানুতবী (রহ.); তাঁরা বাস্তবতার নিরিখে দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝালেন। বাস্তব উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণ করলেন যে, দীনই সত্য সঠিক। যেমন দীন একটি কথা বলে, দাবী উত্থাপন করে; আর বস্তুজগত ও বাস্তবতা এর সেবা ও সমর্থন করে এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ করে দেয়। যারা নাস্তিক ছিল, তারা এসব দেখে শুনে মেনে নিতে বাধ্য হল। যেমন মিরাজ। আগের যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বলত, এ অসম্ভব ব্যাপার, হতে পারে না। তারা পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করত এবং বলত আগুনের মধ্যে স্তর রয়েছে। মানুষ এ স্তরকে অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং মিরাজ হতে পারে না। এখন মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছে, চাঁদের পিঠে খনন করে শিলা মাটি নিয়ে এসেছে। এখন মানুষ মিরাজকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বাস্তব জগতে এর একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েছেন একথা বলতে যে, মিরাজ সত্য সঠিক। যখন জড় পদার্থের মাধ্যমে আপনি চাঁদে পৌছতে পারেন, তাহলে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো এর চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও এগুলোর মাধ্যমে কেন উর্ধ্বে পৌছতে পারবেন না? মোটকথা, এই দীন একটি দাবী করবে আর পাশ্চাত্যের অনুসারীরা তা প্রমাণ করবে, যেন তাদের উপর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। তারা নতশিরে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেওবন্দের আনোয়ার সাবেরী হিন্দুস্থানের প্রখ্যাত ও শীর্ষ স্থানীয় কবি। যখন চাঁদে ভ্রমণ করে নভোচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসলেন, তখন তিনি একটি কবিতা লিখলেন। সে কবিতার একটি পংক্তি আমার স্মরণ আছে–

سفر سے چاند کے لوٹے جو منکر معراج

شکست عقل نے کہائی بڑے غرور کے بعد

মি'রাজ অস্বীকারকারীগণ যখন চাঁদে ভ্রমণ করে ফিরে আসলেন, পৃথিবীতে অত্যন্ত অহংকার ও গর্ব গরিমার পর পরাজিত হল বুদ্ধি ও যুক্তিতর্ক। বিবেক-বুদ্ধি এতদিন অস্বীকার করত, এখন নতশিরে মেনে নিতে হল তাকে।

ইবরাহিম (আ.)কে আল্লাহ আদেশ করলেন– বাইতুল্লাহ নির্মাণ কর। তিনি নির্মাণ করলেন। আল্লাহ বললেন, সাধারণ ঘোষণা করে দাও– হে লোক সকল! বাইতুল্লাহ নির্মিত হয়েছে। এসো হজ কর।

আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে?

আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি ঘোষণা কর, আমি পৌঁছে দেবো। ইবরাহিম (আ.) ঘোষণা করলেন– হে লোক সকল! বাইতুল্লাহ তৈরি হয়েছে, এখন হজ কর।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যাদের ভাগ্যলিপিতে হজ লেখা রয়েছে, তখন তারা সবাই লাব্বাইকা বলেছে। এমনকি যে সন্তান মায়ের পেটে ছিল, তারাও লাব্বাইকা বলেছে। আরো বলা হয়েছে– যে যতবার লাব্বাইকা বলেছে, ততবারই হজ তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। দশবার বলে থাকলে দশবার হজ করবে। বিশ বার বলে থাকলে বিশ বার হজ করবে।

একথার উপর মানুষ এক সময় সন্দেহ পোষণ করত। এ কেমন করে হতে পারে? ইবরাহিম (আ.)-এর মাকামে ইবরাহিম হতে এ ঘোষণা– এ কথা সমগ্র দুনিয়াতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশন সংশয় মোচন করে দিয়েছে। বর্তমান যুগের মানুষ রেডিও ও টেলিভিশনে কথা বলে। মুহূর্তের মধ্যে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সবখানে আওয়াজ পৌঁছে যায়। যখন জড় জগতের উপকরণ ও মাধ্যমগুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এত শক্তি দান করেছেন যে, একটি আওয়াজ গোটা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে; তাহলে আধ্যাত্মিক উপায় উপকরণগুলোর এ শক্তি কেন হতে পারবে না? মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বিশ্বের সবখানে আওয়াজ পৌঁছে দিবে। আসল কথা হলো, নবীগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এমন সব কাজ করেন, যেগুলোর বাস্তব উদাহরণ জড়বাদী শক্তি দ্বারা পেশ করা হচ্ছে। এখন উম্মতের মন-মানসিকতা এমন হয়েছে– যে পর্যন্ত বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দীন বুঝানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা বুঝবে না। আল্লাহ তায়ালা এমন সব আলেম পয়দা করেছেন যাঁরা বাস্তব ও জড়বাদী উদাহরণ দিয়ে দীন বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বিবেক-বুদ্ধি ও দর্শনের যুগ আসলো। এখন দার্শনিকগণ জড়বাদের যুগ আসলেন। তখন বৈজ্ঞানিকগণ দাঁড়িয়ে গেলেন। সুফিবাদের যুগ আসলো, তখন মোতকাল্লিমীন দাঁড়িয়ে গেলেন। দারায়তের যুগ আসলো, তখন ফকীহগণ দাঁড়িয়ে গেলেন। রিওয়ায়েতের যুগ আসল, মুহাদ্দিসগণ দাঁড়িয়ে গোলেন। মোটকথা, দীন সর্বাবস্থায় সজীব ও সচল থাকল এবং প্রতি বিভাগে প্রকাশ লাভ করতে থাকল।

গণতান্ত্রিক যুগে তাবলীগ-জামাতই বেশি কার্যকর

বর্তমন অবস্থা হলো, কিভাবে দীন অন্যদের কাছে পৌছানো হবে? তাবলীগ করা হলে কি আকার আকৃতিতে করা হবে। দাওয়াত দেয়া হলে কি পদ্ধতিতে দেয়া হবে। উলামায়ে কেরাম সব সময় দাওয়াত দিয়ে আসছেন। দাওয়াতের কাজ সর্বদা চালু রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক যুগের বিশেষ অবস্থা, বিশেষ চাহিদা থাকে। এখন হলো গণতন্ত্রের যুগ; যে পর্যন্ত কোনো বিষয় দলীয় ভিত্তিতে পেশ করা না হয়, মানুষ তা গ্রহণ করতে রাজি নয়। এক ব্যক্তি যতই বিশ্বাসযোগ্য হোন না কেন, শীর্ষ মার্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাঁর কথা সহজে মেনে নিতে রাজি হবে না। যদি তিনি কোন কথা বলেন, তখন মানুষ বলবে, এক ব্যক্তির কথা। দু'জন মানুষ হলে বলবে, যা হোক মন্দ না। আর যখন জামাত ও দলবদ্ধভাবে কিছু বলা হবে, তখন মানুষ তা মেনে নিতে, মাথা নত করতে বাধ্য হয়। একটি জামাত ভুল করবে কেমন করে। সারকথা, ব্যক্তিগতভাবে আলেমগণ সদ সময় দীনের তাবলীগ করে আসছেন। যদি না করতেন তাহলে আজ আপনার সামনে মুসলমান আসতেন কোথা থেকে? এটা তাঁদেরই পরিশ্রমের ফসল। কিন্তু দীনের পথ রুদ্ধ না করে ভবিষ্যতে ও দীনকে বিস্তার ও প্রসার লাভ করাতে হবে।

জামাতে জড় ও আধ্যাত্মিক শক্তি উভয়ই থাকে

এখন এই পদ্ধতি এসে গেছে। যে পর্যন্ত দলগতভাবে কোন কাজ করা না হবে, মানুষ তা মানবে না। জড় পদার্থে বরং ক্রীড়া অনুরাগীদেরও টিম থকে। হিন্দুস্থানের হকি টিম খেলার জন্য পাকিস্তানে যাচ্ছে। পাকিস্তানের টিমগুলো হিন্দুস্থানে আসছে। উকিলদের সংগঠন রয়েছে। জজদের সংগঠন রয়েছে। শ্রমিকদের সংস্থা রয়েছে। শ্রমিকদের কোন অভিযোগ থাকলে, যদি এক ব্যক্তি অভিযোগ করে তাহলে কেউ কানে তুলবে না। কিন্তু যদি শ্রমিক ইউনিয়ন থাকে, তাহলে মানবেন। বাধ্য হবে মেনে নিতে। কাজেই বর্তমান যুগ সাংগঠনিক যুগ। তবে এ কথা আলাদা যে, বর্তমান যুগে কি জাতীয় গণতন্ত্র রয়েছে, আর ইসলাম কোন ধরনের গণতন্ত্রের প্রচার করে তা আলাদা আলোচনার বিষয়। সে দিকে আমি যেতে চাই না। কিন্তু সংক্ষেপে কথা হলো, যে পর্যন্ত গণতন্ত্রে কোন জিনিস সাংগঠনিক আকার ধারণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ জিনিস গ্রহণযোগ্য হবে না। মানুষ এর উপর সন্তুষ্ট হবেন না। এসব যুগের অবস্থা। এখন যদি দীন

পৌছানোর জন্য এক ব্যক্তি গমন করে, তাহলে মানুষ বলবে– হ্যাঁ, ভাই নেক মানুষ। তারা একটুও প্রভাবিত হবে না। কিন্তু যদি একটি জামাত যায় তাহলে প্রভাব পড়বে। নিশ্চয়ই কোন মহৎ কারণ রয়েছে। পবিত্র কুরআন এর মূল ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَـٰبَ الْقَرْيَةِ.

হে নবী! আপনি ঐ গ্রাম নবীগণের উদাহরণ বর্ণনা করুন। এই একটি বিশেষ গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের উদাহরণ বর্ণনা করা হচ্ছে–

إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ যখন আল্লাহ তাদের হেদায়াত করার জন্য নবীগণকে প্রেরণ করলেন, إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ তখন ঐ গ্রামে দু'জন নবী প্রেরণের আদেশ হল। এদেরকে সৎপথ প্রদর্শন কর। তাবলীগ করো, আল্লাহর আদেশ নিষেধ পৌছে দাও। فَكَذَّبُوْهُمَا দু'জনকে তারা মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করল। فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ আমি তাদের শক্তি বাড়িয়ে দিলাম। তৃতীয় একজন নবী প্রেরণ করলাম। এখন জামাতের আকার ধারণ করল। اَلْاثْنَانِ اَوْفَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ দুই অথবা এর বেশি হলে জামাত হয়ে যায়। জামাতকে আপনি প্রত্যাখান করতে পারেন। হয়ত সে সন্দেহে পড়েছে। কিন্তু যখন তিন চার ব্যক্তি দলবদ্ধ হয়ে বলবেন, একজন অন্যজনকে সমর্থন করবে, তখন এ সন্দেহ থাকবে না। সন্দেহ দূর হবে। মনে করবে, একজন বা দু'জন হয়ত ভুল বলেছে। কিন্তু ভুলই যদি হত, তাহলে চার ব্যক্তি একত্রে ভুলের উপর রয়েছেন কেমন করে? বিবেকের বিচারে তা অসম্ভব।

পরিষ্কার কথা, নবীগণ (আ.)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা এজন্য নয় যে, একজন নবীর শক্তি যথেষ্ট নয়। সকল নবী সবগুণে গুণান্বিত। তাঁদের চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অন্য কে হতে পারে? হকের শক্তি জেনে নেয়ার জন্য একজন নবীই যথেষ্ট। তারপর একজনের সাথে অন্যজনকে কেন প্রেরণ করা হল? সাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। তারা যেন মেনে নেয়। নইলে একজন নবীই যথেষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন দু'জনকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হল, তখন আমি তৃতীয় একজন প্রেরণ করলাম। এখন জামাত হয়ে গেল। জামাতকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া, অস্বীকার করা, মানুষের বিবেক-বহির্ভূত কাজ। যতই একগুঁয়ে হিংসুক হোক না কেন। যখন একটি জামাত কথা বলবে। তখন কিছু একটা চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কথাটি সত্য বলেই মনে হয়। অনেক মানুষ একত্রিত দলবদ্ধ হয়ে এসেছেন। দলগত কাজে প্রভাব বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ হয়। একটি হাদীসে বলা হয়েছে– يَدِ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ জামাতের

উপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে।

কোন কোন আলেম তো এমনও লিখেছেন– কোন হাদীসের অভিজ্ঞতার কথা। যদি চল্লিশজন মুসলমান একত্রিত হন, তাহলে তাদের মধ্যে অন্তত একজন নিশ্চয়ই আল্লাহর মকবুল বান্দা হবেন। চল্লিশ জন মানুষ যখন আসবেন তখন ঐ মুকবুলিয়ত সবার মধ্যে কার্যকর থাকবে। ঐ কাঙ্ক্ষিত বস্তুকেও মকবুল বানিয়ে দিবে। সারকথা, জনসংখ্যা ও জামাতবন্দির মধ্যে বিশেষ বরকত রয়েছে। দৈহিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবেও। বৈষয়িকভাবে এরূপ হবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তাদের কথা অস্বীকার করার থাকে না, আধ্যাত্মিকভাবে হবে। এমন আহলে হকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, হক ও সত্য শক্তিশালী হবে। হক সমৃদ্ধ হবে। সারকথা, জামাত এমন একটি জিনিস যা জাগতিকভাবে সুদৃঢ় হয়ে থাকে, আধ্যাত্মিকভাবেও শক্তিশালী থাকে।

তাবলীগ জামাতের বরকতে আমলের পরিবেশ সৃষ্টি

আমাদের হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তায়ালা তাবলীগকে একটি কৌশল হিসাবে ঢেলে দিয়েছেন। যদিও তাবলীগ চলছিল এবং আলেমগণ দাওয়াত দিচ্ছিলেন। মাওলানার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ইলহাম করলেন। তিনি একটি নিয়ম ও পদ্ধতি স্থির করলেন, যা বর্তমান যুগে অত্যন্ত কার্যকর। এতে জামাতী ও দলীয় ভাব রয়েছে। এক একজন করে যাবে না; বরং জামাতবদ্ধভাবে যাবে। আর মানুষকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং জামাতবদ্ধ করবে। জামাতবদ্ধ হয়ে যখন আপনি গাশত করবেন, জামাত একবাক্যে কথা বলবে– তখন স্বভাবতই এর প্রভাব পড়বে। কোন হিংসুক শত্রু যদি না মানে, তাহলে ভিন্ন কথা। দুনিয়াতে হিংসুক ও শত্রু সব যুগেই ছিল। কিন্তু এদের কোন মূল্য নেই। মর্যাদা হল বিবেকবান লোকের। বিবেকবানদের কাছে দলীয় প্রোগ্রাম ও মতামত কখনো অগ্রহণীয় হয় না, হতে পারে না। সুতরাং মাওলানার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা এ পদ্ধতিকে ইলহাম করেছেন।

জামাতের সঙ্গে যখন কেউ চলে যায়– ঘরে থাকার সময় আমলে বাধা প্রদানকারী জিনিস আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাস সবই থাকে। ঘরে আরামে থাকা অবস্থায় কখন নামায কাযা হয়ে যায়, কখনো বা অন্য কোন আমল ছুটে যায়। কিন্তু যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে– তখন আরাম-আয়েশের সামান ও উপকরণগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর যিকির ও স্মরণ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। অনিচ্ছায়ও আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়। বাড়ি থেকে

বেরিয়ে যখন মসজিদে এসে গেলো তখন খোদার নাম স্মরণ না করে আর কি করবে; সে যেন আল্লাহর যিকির ও আমলের জন্য বাধ্য হয়ে পড়েছে। শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যই জামাত তৈরি করেননি; বরং আমলের জন্যও একটি কাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ইবাদত করতে বাধ্য।

কারণ, পরিবেশের একটি প্রভাব রয়েছে। পরিবেশ যখন আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়, তখন মানুষও আল্লাহর নাম নিতে বাধ্য হয়ে যায়। হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) বিয়ে উপলক্ষে থানাভবন গিয়েছিলেন। বিয়ের মজলিসে অংশগ্রহণ করবেন। যেমন প্রথা রয়েছে– বিয়ের মজলিসে যাওয়ার পথে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি থাকলে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাওয়ার নিয়ম আছে। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.) তখন থানাভবনে ছিলেন। বরযাত্রীরা বললেন, চলো হাজী সাহেব (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাই। মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) হাজী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলেন। হাজী সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহীকে তাঁর অন্ত র্দৃষ্টি দিয়ে চিনে নিলেন। এ ব্যক্তির অন্তরে মানিক বিদ্যমান। নিজেই বললেন, কারো কাছে মুরিদ হয়েছো? তিনি বললেন– না, হইনি। বললেন, আমার কাছে মুরিদ হয়ে যাও। কি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন। আমার কাছে মুরিদ হয়ে যাও। তিনি বললেন– মুরিদ হওয়ার জন্য আমি আসিনি। আমি তো বরযাত্রী হয়ে এসেছি। হাজী সাহেব বললেন, এ দু'য়ের মধ্যে কোন সংঘাত আছে কি? ঠিক আছে, বরযাত্রী হিসেবে এসেছিলে এখন মুরিদ হয়ে যাও।

তিনি বললেন– আমি মুরিদ হয়ে যাব। তখন আপনি বলবেন, আল্লাহ, আল্লাহ যিকির কর। এ কাজ আমার জন্য অনেক কঠিন। আমি ছেলে-পেলেদের লালন পালন করবো, না এখানে বসে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকব?

হাজী সাহেব বললেন, আমি একথা বলছি না, তুমি এখানে অবস্থান কর। এখন হাজী সাহেব বার বারই বলছেন, তুমি মুরিদ হয়ে যাও। আর মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) অস্বীকার করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুরিদ হয়ে গেলেন।

তারপর বললেন– অন্তত চল্লিশ দিন আমার এখানে অবস্থান কর। বললেন– এজন্যই তো আমি বাইয়াত হতে রাজি ছিলাম না। আমি এখানে অবস্থান করতে পারব না। বললেন– ঠিক আছে, বিশ দিন থেকে যাও। তিনি আরজ করলেন– আমার কাছে বিশ দিন সময়ও নেই। বললেন, দশদিন থেকে যাও। শেষ পর্যন্ত তিন দিন স্থির হল। তিন দিন তিনি অবস্থান করবেন।

আমি একথা শুনাতে চাচ্ছি যে, বরযাত্রীগণ চলে গেলেন। মাওলানা গাঙ্গুহী

(রহ.) তিন দিনের জন্য খানকায় অবস্থান করলেন। রাত যখন তিনটা বাজল, তখন কেউ তাহাজ্জুদ পড়ছে। কেউ যিকির করছে। মাওলানা লজ্জানুভব করলেন। সবাই আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে। আর আমি শুয়ে আছি। উঠে পড়লেন, অযু করলেন, চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়লেন।

দ্বিতীয় দিন মনস্থ করলেন, আমি তাহাজ্জুদ পড়বো না। অন্যরা উঠুক বা নাই উঠুক। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত যখন তিনটা হল, অন্যরা উঠে পড়লেন। ইচ্ছা করলেন, তিনি উঠবেন না। কিন্তু অবস্থা ও পরিবেশের কারণে তিনি বাধ্য হলেন, উঠতে হল। তাহাজ্জুদ পড়লেন। আল্লাহ আল্লাহ যিকিরও করলেন। এভাবে যখন তিন দিন পার হল তখন অন্তরে স্পষ্ট প্রভাব পড়ল। এবার হাজী সাহেবের কাছে আরজ করলেন– হযরত যদি অনুমতি হয় তাহলে আরো কিছুদিন থেকে যাব। বললেন, আমি তোমাকে থেকে যাওযার জন্য বলিনি, তোমার মর্জি। তারপর দশ দিন অবস্থান করার ইচ্ছা করলেন। তারপর বিশ দিন, তারপর চল্লিশ দিন বা আরো বেশি দিন অবস্থান করলেন। শেষ পর্যন্ত খেলাফত লাভে ধন্য হয়ে গাঙ্গুহে ফিরে আসলেন।

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব যেমন জামাতী রং দিয়েছেন, তেমনি একটি আমলী পরিবেশও তৈরি করেছেন। এ পরিবেশের কারণে মানুষ বাধ্য হবে। সে আল্লাহর যিকির করবে। ইবাদত-বন্দেগি করবে।

পরিবেশের প্রভাব

পরিবেশ দেখেছি, দারুল উলুম দেওবন্দের পরিবেশ। গাঙ্গুহের পরিবেশ এবং থানাভবনের পরিবেশ। আমার বয়স আট নয় বছর। তখন গাঙ্গুহের পরিবেশ এমন ছিল– মনে হতো পশমে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের আওয়াজ আসছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে। এর প্রভাব কি ছিল?

গাঙ্গুহের খানকার সামনে একটি পুকুর ছিল। শহরের সকল ধোপা ঐ পুকুরে কাপড় কাঁচত। ষাট সত্তর জন ধোপার কাপড় এখানে রাখা ছিল এবং মাটির নির্মিত বড় একটি পাত্র ছিল। এতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে কাপড় কাচা হত। ধোপারা অশিক্ষিত ছিল। তারা কিছুই জানত না। কিন্তু আমি দেখেছি, তারা যখন কাপড় মারছে, তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জবাবে পুকুর প্রকম্পিত হয়ে উঠত। অথচ তারা জাহেল ছিল। কিন্তু এ ছিল পরিবেশের প্রভাব। পরিবেশের প্রতিক্রিয়া। খানকা থেকে সব সময় আল্লাহ আল্লাহ'র আওয়াজ আসত। তখন ধোপাদের মধ্যেও এ আওয়াজ চালু হয়ে গেল। তারাও কাজের সঙ্গে সঙ্গে

ইল্লাল্লাহ'র আওয়াজ বুলন্দ করত। এ ছিল এখানকার পরিবেশের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া।

দারুল উলুম দেওবন্দে দেখেছি। সেখানে কোন বেনামাযী থাকতে পারবে না। থাকা খুবই কঠিন হবে। যেহেতু প্রত্যেক নামাযের জন্য হাজার, দেড় হাজার মানুষ নিজ নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে মসজিদে আসছেন। এ অবস্থায় কেউ বেনামাযী থাকতে পারবে? চোখের লজ্জায় হলেও নামায পড়বে। এখানে বেনামাযী অবস্থান করা দুষ্কর। ঘটনাক্রমে কারো নামায যদি কাজা হয়ে যায়, সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা; কিন্তু নামায বর্জনকারী থাকতে পারবে না, নামায আদায়ে বাধ্য হবে। এ হলো পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

থানাভবনে এ পরিবেশ ছিল। কারবারে ও ব্যবহারে দিয়ানত ও সততা এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। সেখানে সব ধরনের মানুষ থাকতো। ধনীও ছিল গরীবও ছিল। কোন কামরায় তালা লাগানোর প্রয়োজন হয়নি। তালা লাগাতে দেখিনি। কারো কোন অভিযোগ ছিল না। সেখানে এ শিক্ষাই ছিল। সততা ও দিয়ানতের সঙ্গে থাকো। এক জনের কারণে অন্যজনের কোন কষ্ট যেন না হয়। কারো কোন জিনিস পড়ে গেলে, উঠিয়ে আনার অনুমতি ছিল না যে, উঠিয়ে নিয়ে হেফাযত কর। সেখানেই পড়ে থাকবে। হয়ত মালিক এসে তার জিনিস উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এক ব্যক্তি ভুলবশত একটি তোয়ালে মসজিদে ফেলে যান। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদের ফরাশে সেটি পড়ে থাকে। তৃতীয় দিন মালিক এসে তার তোয়ালে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এখানে দিয়ানত, সততা ও পরিষ্কার কারবার ও ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানকার পরিবেশে বদদিয়ানতী, প্রতারক ও মিথ্যাবাদীর অবস্থান বিরল।

দারুল উলুমের পরিবেশে বেনামাযী এবং গাঙ্গুহের পরিবেশ থেকে গাফেল উদাসীন থাকা মুশকিল। কিছু হলেও যিকরুল্লাহের তাওফিক হতো। পরিবেশের প্রভাব আপনা আপনি হবে, যা আত্মার উপর পড়বে। এই ছিল মাওলানা মরহুমের দূরদৃষ্টি। জামাতী ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি পরিবেশ তৈরি করেছেন; নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আল্লাহর ঘরে মানুষ সমবেত হবে। কেউ চিল্লা দিবে। কেউ দু'চিল্লা, কেউ দশ দিন, কেউ বিশ দিন। এক স্থানে সমবেত হবেন। যখন সবাই মিলে একত্রে যিকির করবেন, তখন একজন গাফেল থাকবে কেমন করে? সেও বাধ্য হয়ে যিকির করবে। আমলের পথও করে দিয়েছেন। কেবল শিক্ষা দীক্ষাই নয়; বরং আমলের রাস্তাও সুযোগ করে দিয়েছেন। জামাতবন্দী ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে, যেন মানুষ তা সহজে কবুল করে নেয়। ব্যক্তিগতভাবে তা কমই গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন জামাতী লোকদের

দীন শক্ত ও মজবুত হয়ে যায়। এ হলো আল্লাহর দয়া ও দান যে, জামাতে গমনকারীদের আমল পরিবর্তন হয়ে যায়। আগে বেনামাযী ছিল এখন নামাযী হয়ে গেছেন। এটা কি কম কথা? এ হলো খোদায়ী প্রভাব। যখন এদের সাহচর্যে এবং পরিবেশে আসবে, তখন প্রভাবান্বিত না হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

হাদীস শরীফে নেক ও সৎ লোকের সাহচর্যের উদাহরণ দেয়া হয়েছে আতর বিক্রেতার দোকানের সঙ্গে। আতর বিক্রেতার দোকান থেকে আপনি যদি আতর নাও কিনেন, তবুও অন্তত সুঘ্রাণ তো এসেই যাবে। মস্তিষ্কে প্রফুল্লতা এসে যাবে।

আর মন্দ ও অসৎ সাহচর্যের উদাহরণ দেয়া হয়েছে কামারের দোকানের সঙ্গে। কামারের দোকানে গেলে অংগার এসে কাপড়ে পড়বে। কাপড় পুড়ে যাবে। কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। সৎ ও নেক সাহচর্যের দ্বারা শুভফল লাভ হয় এবং মন্দ ও অসৎ সাহচর্য দ্বারা মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

জামাতে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

হযরত মাওলানা নেক সাহচর্যের নিয়ম কার্যকর করে দিয়েছেন। মানুষ নেক হয়ে যাবে। যদি তার ইচ্ছা নাও থাকে, তবুও নেক হয়ে যাবে এবং যিকির, নামায, রোযা, সততা ও দিয়ানত পয়দা হয়ে যাবে। তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। অবস্থা পাল্টে যাবে। আর কি চান? তারপর ইচ্ছার কুরবানী, অল্পেতুষ্টি– এসবের শিক্ষাও রয়েছে। এ হলো আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন।

যখনই আপনি বাইরে যাবেন তখন বাড়ির সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। তখন যুহদ বা দুনিয়ার প্রতি বিরাগের শান পয়দা হয়ে গেল। তারপর যতদিন জামাতের সঙ্গে থাকবেন, একে অপরের সাহায্য সহায়তা করবেন; তখন ইছার বা নিজের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার ও সেবার মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ কারণেই জামাতে অন্যের সেবাযত্ন, অন্যকে অগ্রাধিকার দান, যেন অন্য কারও খেদমত ও সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। জামাতের বরকতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ আগ্রহ দান করা হয়।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ঈমান হলো দুটি জিনিসের সমষ্টি।

الشفقة على خلق الله আল্লাহর আদেশ নিষেধের শ্রেষ্ঠত্ব ও التعظيم لامر الله এবং গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। আর সৃষ্টিকুলের সেবা ও যত্নের স্পৃহা ও

আগ্রহ পয়দা হয়ে যাবে। জামাতে বের হলে আল্লাহর ফজলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আন্তরিকতার সঙ্গে একে অন্যের খেদমত করে। যারা নিজের টাকা ব্যয় করে পৃথিবীর নানা দেশে যান, তারা তো ইছার-ই করছে। ইছারের প্রথম স্তরই হলো নিজের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর জন্য বেরিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হওয়া। এমন ব্যক্তি অন্যের সেবা কেন করবে না? অটোমেটিকভাবে তার ভেতর অন্যের খেদমত, সেবা ও যত্ন করার মানসিকতা ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

তাবলীগ জামাত কবুলের লক্ষণসমূহ

এই যুগে সাধারণ মানুষের ইসলাম ও আত্মশুদ্ধির অন্য কোন পথ নেই। আল্লাহ তায়ালা মাওলানার অন্তরে এই পদ্ধতি ইলহাম করেছেন। গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে তাবলীগ জামাত অনেক বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর যে কোন দেশে যেখানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, আমি দেখেছি– সেখানে তাবলীগ জামাত রয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, আফ্রিকা সবখানে জামাত রয়েছে। এ হলো আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার লক্ষণ। আল্লাহর নাম উচ্চারণকারীরা সবখানে পৌছে গেছেন এবং আল্লাহর নাম প্রচার করছেন। এ হলো মকবুলিয়তের লক্ষণ।

আমার বলার উদ্দেশ্য, এই জামাতের ভিত্তি স্থাপনকারীরা আল্লাহর মকবুল বান্দা। কিছু মানুষ কিছু সমালোচনাও করেন। আমি বলি, মানব জাতির মধ্যে এমন কোন সমাজ কি রয়েছে, যাদের কোন সমালোচনা হয়নি? আমি সবাইকে একই জবাব দিয়ে থাকি। এক আরিফ বিল্লাহ বুযুর্গের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নিয়ম এসেছে। কাজেই এ কাজ ভাল ও মঙ্গলজনক। যদি কোন রাজনৈতিক নেতার অন্তরে তা উদয় হতো তাহলে মনে করতাম কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কোন আঞ্চলিক ব্যক্তির দেশপ্রেমিকের অন্তরে যদি এ ভাব আসতো তাহলে মনে করতাম দেশের স্বার্থ নিহিত রয়েছে। এ খেয়াল জাগ্রহ হয়েছে এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির অন্তরে। এতে প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলই নিহিত। এ কাজে আল্লাহর বরকতের অনেক লক্ষণ রয়েছে। তাই সকল প্রশ্নের একই উত্তর– এ কাজ ওলীগণ শুরু করেছেন। এতে ইনশাআল্লাহ কল্যাণই রয়েছে। জামাতগুলো বের হওয়া। লোকের সংশোধন হওয়া– এসবই হলো প্রমাণ। এ কাজের বরকত ও কল্যাণ বিস্তার লাভ করছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে প্রসার লাভ করছে।

আমি ফ্রান্স গিয়েছিলাম। সেখানে আমার পরিচিত কোন লোক ছিল না। আমি যখন বিমান বন্দরে পৌছলাম, অভ্যর্থনার জন্য হাজারো মানুষ উপস্থিত। আমি অবাক হলাম। আমার কেউ পরিচিত নেই। প্রথম এসেছি। যাই হোক, তারা মনে করলেন আমাদের একজন খাদেম আসছেন। আমরা সবাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমান বন্দরে যাই। সবাই এসে পড়লেন।

এখন এ খেদমত ও ইছার অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের কথা, নইলে আমি কে? সাধারণ একজন মানুষ। আমার কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। কিন্তু মহব্বতের কারণে সবাই এসেছেন। সবখানে একই অবস্থা দেখেছি।

এবার তারা বললেন, বক্তৃতা কর। একটি সভার আয়োজনও করা হল। অনেকেই আরবের অধিবাসী ছিলেন। আমি বললাম, আরবি ভাষায় বক্তৃতা করার ক্ষমতা আমার নেই। কিতাবে পড়েছিলাম সত্য, কিন্তু বক্তৃতা করা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কিতাব পড়ে হয় না। আমি উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করব। পরে অন্য কেউ আরবি ভাষায় অনুবাদ করে দিবেন। কিন্তু সেখানকার আরবরা বললেন, আমরা আরবি ভাষায় বক্তৃতা শুনব। তা পাঁচ মিনিটই হউক। তখন বাধ্য হয়ে আরবি ভাষায়ই বক্তৃতা করতে হল। পনের বিশ মিনিট বক্তৃতা করলাম। মোটকথা, সবখানে এ অবস্থা দেখেছি। আমেরিকায়ও এ অবস্থা দেখেছি। সবখানে জামাত রয়েছে। আল্লাহর দরবারে মকবুল না হলে এমন হতে পারে না। আত্মার উপর প্রভাব রয়েছে। তারপর ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এ সব জিনিস প্রমাণ করে। এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে মকবুলও হয়েছে।

আমি যখন বার্মা গিয়েছিলাম, তখন আমি দুটি জিনিসের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলাম। প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করো, যেন মাসাঈল জানতে পারে। সবাইকে আলেম হওয়ার প্রয়োজন নেই। আংশিক বিষয়ের আলেম হওয়া ফরযে কেফায়া। হাজারে একজন যদি হয়ে যায় তাহলে পূর্ণ জামাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু দীনদার ধর্মপরায়ণ হওয়া সকলের উপর ফরয। দীনের কাজের প্রাথমিক শিক্ষা এবং তার সঙ্গে তাবলীগের কাজে লেগে যাও। এ দ্বারা তোমাদের আত্মার পরিশুদ্ধি হবে। আমলও সুন্দর সংশোধিত হবে। দীনও বিস্তার লাভ করবে। দীনের প্রচার ও প্রসার হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! জামাতের কাজ ও প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়। বরং ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করছে। এ হলো আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী।

তাবলীগ জামাতের কাজ প্রত্যাখান করা কঠিন

আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম– 'আমি রাসূল প্রেরণ করলাম, দু'জনকে। তারা অস্বীকার করলো। তখন আমি তৃতীয় জন প্রেরণ করলাম। তখন জামাতের আকার ধারণ করল।' জামাতকে প্রত্যাখ্যান করাও কঠিন হবে। মানা, না মানা, আমল করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন; কিন্তু নীতিগতভাবে একে প্রত্যাখ্যান করার সাহস হবে না। কারণ, একটি জামাতের আওয়াজ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা জামাতকে তাওফিক দান করেছেন। জামাতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক হয়েছে, তাদেরকেই তাওফিক দিয়েছেন এবং এ তাওফিকের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে।

তালিম ও তাবলীগের মধ্যে বিরোধ নেই

আমি তো বলে থাকি– এ জামাত বর্তমানে আমাদের জন্য সম্মান রক্ষার মাধ্যম। কেউ যদি আমাকে বলে, আপনি তাবলীগ করেননি কেন? আমি বলবো, আমাদের জামাত তাবলীগ করছে। পার্থক্য এতটুকু, কেউ তালিমী জামাতে ব্যস্ত রয়েছে। কেউ তাবলীগ জামাতে কাজ করছে। এ হল কাজের সুবিধার্থে ভাগ-বন্টন। কাজ বন্টনে কাজ দুটি হয় না। মূল সকলের এক ও অভিন্ন। দারুল উলুমে এক জামাত ব্যবস্থাপক রয়েছেন। তারা পাঠ দান করছেন না। আবার শিক্ষকগণ ব্যবস্থাপনার কাজ করতে পারছেন না। যে দল ব্যবস্থাপনার কাজ করছে তারা শিক্ষকদের সাহায্য করছে এবং শিক্ষকগণ ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করছে। অতএব যারা তাবলীগ করছে, তারা শিক্ষকদেরকে সাহায্য করছে। আমি স্বয়ং হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের বাক্যে শুনেছি। আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা ছিল।

'ভাই এভাবে কাজ আমি শুরু করেছি; কারণ এর ফলে মাদ্রাসাগুলো ছাত্র পাবে। পীর সাহেবান মুরীদ পাবেন। এজন্য কাজ শুরু করেছি, যাতে ইলম প্রসার লাভ করে, স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়।'

মাওলানা মরহুম এ পর্যন্ত ছিলেন যখন এ কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর দিল্লীতে অবস্থান করতেন। কিছু সময় দারুল উলুম দেওবন্দেও কাটাতেন। কিছু সময় মাজহারুল উলুম সাহারনপুরে কাটাতেন এবং পরম

বিনয়ের সঙ্গে বলতেন– ভাই! এ পরিমাণ কাজ আমি করেছি। এখন বলুন, তারপর কি করব? অথচ তিনি নিজেই জানতেন, তার অন্তরেই এ জিনিস উদিত হয়েছে। কিন্তু চরম বিনয়ী ছিলেন। তাই অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। অধিকন্তু আমাদের নবীনদেরকেও বলতেন, ভাই ! এখন সামনে আমি কি করব?

আমি আরজ করলাম, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, আপনি তো নিজেই অন্যদের জন্য রাহনুমা পথ প্রদর্শক! কিন্তু অতি বিনয়ী ছিলেন। তাই সবকিছু করেও মনে করতেন আমি কিছুই করিনি। ছোট ও নবীনদের কাছেও পরামর্শ করতেন। এ ছিল তাঁর শান, তাঁর অবস্থা।

এক আল্লাহওয়ালার এখলাছে পুরো বিশ্ব কর্মতৎপর

একটি নেশা ছিল এবং এমন নেশা ছিল যে, পানাহার, ঘুম, নিদ্রার খেয়ালও তাঁদের ছিল না। ঐ ইনশাআল্লাহর পক্ষ থেকে ঢেলে দেয়া হয়েছিল, ঐ নেশা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা যা আজ পর্যন্ত কর্মতৎপর, কর্মচঞ্চল রয়েছে। একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির এখলাছ ও আন্তরিকতা সবাইকে কর্মতৎপর করে রেখেছে।

সারকথা, জামাতও মোবারক, তাদের কাজও মোবারক! যত বেশি করা যাবে, যত বেশি একাজে অংশগ্রহণ করা যাবে, ইনশাআল্লাহ, তা খায়র ও বরকত কল্যাণ ও মঙ্গলজনক হবে। যতটুকু সময় পারো এ কাজে ব্যয় করো। এক চিল্লা দু'চিল্লা লাগাও। ইনশাআল্লাহ খায়রই হবে। মন্দ ও খারাপ কিছু হবে না। দীন দুরুস্ত হবে। দুনিয়াও ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যাস, এই কয়েকটি কথা আমার আরজ করার ছিল। এখন দোয়া করুন।

اللهُمَّ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ اَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ১২

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

দীনের পথে অগ্রসর হয়ে পুরুষ যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করতে পারে, নারীরাও ঠিক ততটাই করতে পারেন। একজন পুরুষ যদি কামেল ওলী হতে পারেন, তাহলে একজন নারীও কামেল ওলী হতে পারেন। মুসলমানদের মধ্যে পুরুষ ওলীর অভাব নেই, তেমনি মহিলাদের মধ্যেও কামেল ওলীর অভাব নেই। এ বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলোতে এসব মহিলার আলোচনা করা হয়েছে– যারা বেলায়েতের উঁচু স্তরে পৌঁছেছেন এবং কামেল ওলী হয়েছেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানের দুটি আয়াত এখন আমি তেলাওয়াত করলাম। আয়াত দুটিতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফেরেশতাগণ হযরত মরিয়ম (আ.)কে সম্বোধন করে যে ঘটনার কথা বলেছিলেন, এই আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। আজকের এ সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল নারী সমাজকে ওয়াজ শুনানো। তাই আমি এ আয়াত দুটো গ্রহণ করেছি।

ঘটনা হলো– মহিলাদের ঐ সকল অধিকার রয়েছে যা পুরুষদের রয়েছে; বরং কোন কোন বিষয়ে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের হক ও অধিকার বেশি। এজন্য যে সন্তানের লালন পালন, তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম মাদ্রাসা হল মায়ের কোল। মায়ের কাছেই সন্তানের মানসিকতা গড়ে ওঠে। সর্বপ্রথম যা শিখে তা মায়ের কাছ থেকে শিখে। পিতার তরবিয়ত ও শিক্ষা দেয়ার সময় শুরু হয় কিছুটা বুঝ-সুজ ও অনুভূতি আসার পর। কিন্তু কিছুটা হুশ আসার পর এবং হুশ আসার আগেও মা-ই তার তরবিয়ত করেন। তার বয়স বাড়ার প্রাথমিক স্তর মায়ের কোল। যদি মায়ের কোল ইলম, নেকী, তাকওয়া এবং উত্তম যোগ্যতায় পরিপূর্ণ থাকে তাহলে এর প্রভাব সন্তানের উপর প্রতিফলিত হবে। আর আল্লাহ না করুন যদি মায়ের এসব গুণ ও নেয়ামত শূন্য থাকে তাহলে সন্তানও তা লাভে বঞ্চিত থাকবে।

خشت اول چوں نہد معمار کج ☆ تا ثریا می رود دیوار کج

রাজমিস্ত্রী যদি প্রথম ইট বাঁকা বসিয়ে দেয় তাহলে সুরাইয়া সিতারা পর্যন্ত প্রাচীরটি বাঁকাই থেকে যাবে। কোন ফারসি কবি বলেছেন, যখন দালানের প্রথম ইট বাঁকা বসানো হয় তখন শেষ পর্যন্ত দালানটি বাঁকাই থেকে যায়। আর যদি প্রথম ইটটি সোজা করে বসানো হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত দালানটি সোজাই থাকবে। যে জিনিসের সূচনা সোজা এবং সঠিক হয়, তার পরিসমাপ্তিও সোজা ও সঠিক হবে। এ কারণেই নারীর হক ও অধিকার পুরুষের তুলনায় বেশি। আর আমরা এ অধিকারকেই সবচেয়ে বেশি পদদলিত করছি। পুরুষরা তো সবখানেই রয়েছে। নারীদের ওয়াজ শুনানোর কোন ব্যবস্থা নেই। তারা যদি পুরুষদের আদেশক্রমে এসে থাকেন, তাহলে পুরুষদের প্রতি শুকরিয়া ধন্যবাদ। আর যদি নিজেরাই আগ্রহে এসে থাকেন, তাহলে তাদের ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনার মূল্য দেয়া কর্তব্য। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেও আবেগ অনুভূতি

রয়েছে– দীনি কথাবার্তা শিখবে।

সারকথা, সবচে' আনন্দের বিষয় হলো– তাদের মধ্যে দীনের তলব, আগ্রহ উদ্দীপনা রয়েছে। যদি নিজ থেকেই এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তারাই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আর যদি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে আগ্রহ সৃষ্টিকারীরাও ধন্যবাদের যোগ্য। তাই আমি বলেছি মহিলাদের অধিকারই বেশি, যেহেতু জীবনের সূচনা তাদের থেকে শুরু হয়।

নারীর বিবেকশক্তি

আর এ কারণেও যে পরবর্তীতে সন্তানদের বিষয় আসছে, স্বামীরা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যখন নারীরা কোন দাবী আদায় করতে চান, যে কোনভাবে তা তারা স্বামী থেকে আদায় করে নেন। তারা জেদ করবেন, হঠকারিতা করবেন, স্বামীকে ধন্য করবেন। এখানে একদিকে মহিলাদের জন্য বিষয়টি যেমন ভাল ও প্রশংসনীয়, অপরদিকে দুর্বলতারও একটি দিক রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا رَ اَيْتُ مِنْ نَّا قِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْد لكُنَّ.

নারী সমাজ ত্রুটিপূর্ণ। তাদের বিবেক-বুদ্ধি– তবে অনেক সময় মহাবুদ্ধিমান পুরুষদের বিবেক-বুদ্ধিকেও টেক্কা মেরে দেয়। কোন কোন সময় যথেষ্ট বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষকেও তাদের কাছে পাগল সাজতে হয়। যখন তারা ইচ্ছা করেন, এ কাজ এভাবে হোক, তখন পুরুষরা তাদের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন। আমাদের স্থানে এবং এখানে এমনই হবে। যেহেতু মহিলাদের মানসিকতা সবখানে একই রকম। পুরুষদের মানসিকতাও একই রকম, তবে সামাজিকতা, তাহযিব ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে।

বিয়ে-শাদী প্রভৃতিতে যে সব রসুমাত পালন করা হয় এগুলো ধ্বংসাত্মক। এর ফলে ধন-দৌলত দীনধর্ম সবই বরবাদ হয়, ধ্বংস হয়। যখন পুরুষদের জিজ্ঞেস করা হয়– এসব অনর্থক কাজ কেন করছেন? অথচ আপনি বিবেকবান, বুদ্ধিমান মানুষ, নিজ চোখে দেখছেন দীন ও ধন ধ্বংস হচ্ছে; কেন এমন করছেন? উত্তর আসবে, কি করবো? মহিলারা মানছেন না। যেন মহিলাগণ হাকিম, নির্দেশদাতা। তারা নির্দেশ দিচ্ছেন। আর পুরুষরা হলেন আজ্ঞা পালনকারী ভৃত্য। তাদের কর্তব্য হল আনুগত্য করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এরা তো ত্রুটিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের জ্ঞানবুদ্ধিকে তারা হরণ করে নিয়ে যান এবং তাদের অসহায় বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেন। ভাল মানুষকে বাধ্য ও অপারগ বানিয়ে ফেলেন। তারা যদি কোন ভাল কাজের জন্য পুরুষকে বাধ্য করেন, তাহলে পুরুষ বাধ্য হবে না কেন?

যদি স্ত্রী স্বামীকে বলেন– জনাব! এতো সহজ-সরল কথা, আপনার নির্দেশ অবশ্য পালনীয় বটে এবং আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে আমার মুরব্বি। আমার সব কিছু। কিন্তু আপনি নামায পড়েন না। যে পর্যন্ত নামায না পড়বেন আমি আপনার নির্দেশ পালন করব না। স্বামী নত হয়ে যাবে। অবশ্যই নামায পড়বে। আল্লাহর জন্য যদি নামায নাও পড়ে, তবে স্ত্রীর জন্য অবশ্যই পড়বে। মহিলাগণ জেদ ও হঠকারিতা করে স্বামীকে দুনিয়ার কথা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে; তাহলে দীনের কথা মানাতে পারবে না– এমন হতে পারে না। এমন হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। নারীর কারণে অনেক স্বামী সংশোধন হয়েছেন। নারীরা জেদ করেছেন, পুরুষ অপারগ হয়ে সংশোধন হয়েছেন।

আমাদের এখানে কিছু পরিবার এমন রয়েছে, যারা অনেক অনর্থক কাজে লিপ্ত। যেহেতু তাদের হাতে টাকা পয়সা আছে, তাই তাদের জন্য সিনেমা, থিয়েটার, নাচ গান প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকা কঠিন নয়। নামাযের কোন প্রশ্নই তাদের কাছে থাকে না। ভাগ্যক্রমে তাদের ঘরে দীনদার পরহেজগার পরিবারের কোন মেয়ের আগমন ঘটল। কয়েক দিন ধৈর্যধারণ করার পর হয়তো সে বলল, শেষ পর্যন্ত আমার জীবন অতিবাহিত করা মুশকিল। রমজান মাস আগত প্রায়, আমি রোযা রাখব আর আপনারা বসে বসে খেতে থাকবেন। রান্নার জন্য আমাকে বাধ্য করবেন। আমি রান্না করতে বাধ্য থাকব না। যেখানে ইচ্ছা পাক করান। এ ঘরে পাক করতে দেয়া হবে না। ধর্মবিরোধী এ কাজে আমি সহায়তা করতে পারব না। এ হলো জঘন্যতম অপরাধ। আপনাদের ব্যবস্থা আপনারা করে নিন অথবা এসব পাপ কর্ম ত্যাগ করুন। শেষ পর্যন্ত স্বামী বাধ্য হয়ে এসব কাজে ছেড়ে দিল এবং নামায রোযার পাবন্দ হয়ে গেল। আর অনেক নেক ও সৎ গুণাবলী তার মধ্যে পয়দা হয়ে গেল। এজন্য বলি, সর্বপ্রধান মুরব্বি হলেন নারী সমাজ। তারা ঘরেই রয়েছেন। তাদের তরবিয়তে কাজ হবে।

তাই আমার বোনদের বলছি, তারা যখন এতই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম যে, পুরুষরা অপারগ ও বাধ্য হয়ে পড়েন। সুতরাং অলংকার পোশাক পরিচ্ছদ এবং পার্থিব বিষয়াদির জন্য প্রভাব বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিবারকে দীনদার ধর্মপরায়ণ বানানোর জন্য প্রভাব বিস্তার করেন, তাহলে নিশ্চয়ই পরিবার

ধর্মপরায়ণ হয়ে যাবে এবং তারা তাদের স্বামীদের সংশোধনের কারণ হয়ে যাবেন। এজন্য মহিলাদের অন্তরে নেকী, তাকওয়া ও সততার আবেগ, উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া কর্তব্য, যেন স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। একজন মহিলা সন্তানদের উপর, স্বামীর উপর গোত্র ও খান্দানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আমি শুনেছি গোত্র ও পরিবারের মধ্যে যেসব অনৈক্য ও বিভেদ বিচ্ছেদ হয়, তা নারীদের কারণেই হয়ে থাকে। একজনের অন্তরে অন্য জনের প্রতি ঘৃণা ও কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়ে দুই সহোদরের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়। তাছাড়া দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া বেধে যায়। মহিলা যদি সৎ ও নেক স্বভাবের হয়, ধৈর্যশীল হয় তাহলে বড় ঝগড়াও শেষ করে দিতে পারে। দুই বিরোধী গোত্র পরস্পরে মিলে যেতে পারে। কাজেই নিজেদের এ শক্তিকে সৎ ও নেক কাজে ব্যয় করব না কেন? অসৎ ও মন্দ কাজে ব্যয় করব কেন? আল্লাহ তায়ালা যখন শক্তি দান করেছেন, তখন ঐ শক্তিকে সঠিক পথে ব্যয় করা উচিত।

দীনি উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য পুরুষের পথ একটাই

আমি আয়াতটি এ জন্যেই পাঠ করেছিলাম, এ আয়াতে বিশেষভাবে মহিলাদের ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একজন বিশেষ বুযুর্গ মহিলার কথা আলোচনা করেছেন। আর এ জন্যও যে, মহিলাগণ এ অভিযোগ না করেন এই বলে যে, যখনই ওয়াজ করা হয় তখন কেবল পুরুষদের জন্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালাও কুরআন পাকে পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন, মহিলাদের করেননি– এ ভুল ধারণা যেন দুরীভূত হয়। কুরআনে যেভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তেমনি মহিলাদেরকেও করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে নারী-পুরুষকে একত্রিত করে সম্বোধন করা হয়েছে। তা হলে বোঝা গেল, একথা যেন মনে না করা হয় যে, সম্বোধন করা হয় পুরুষের বেলায়, নারীদের বেলায় নয়। দীনি উন্নতি লাভের জন্য পুরুষদের যে ব্যবস্থা মহিলাদেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা। যেমন বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماًO

মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, ইবাদতকারী পুরুষ, ইবাদতকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, সদকা প্রদানকারী পুরুষ, সদকা প্রদানকারী নারী, রোযাদার পুরুষ, রোযাদার নারী, লজ্জাশীল পুরুষ, লজ্জাশীলা নারী, অধিক যিকিরকারী পুরুষ, অধিক যিকিরকারী নারী– আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ওয়াদা করেছেন, মাগফেরাত ও ক্ষমা করে দেয়ার, বিশাল প্রতিদান ও পরকালীন মহামর্যাদা দান করার। [আহযাব : ৩৫]

এ আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল, দীনের পথে অগ্রসর হয়ে পুরুষ যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করতে পারে, নারীরাও ঠিক ততটাই করতে পারেন। একজন পুরুষ যদি কামেল ওলী হতে পারেন, তাহলে একজন নারীও কামেল ওলী হতে পারেন। মুসলমানদের মধ্যে পুরুষ ওলীর অভাব নেই, তেমনি মহিলাদের মধ্যেও কামেল ওলীর অভাব নেই। এ বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলোতে এসব মহিলার আলোচনা করা হয়েছে– যারা বেলায়েতের উঁচু স্তরে পৌঁছেছেন এবং কামেল ওলী হয়েছেন। দু'একজন নয়, শত সহস্র হয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরী, রাবেয়া আদবী। তারপর মহিলা সাহাবী যতজন ছিলেন, তাঁরা সবাই কামেল ওলী ছিলেন। তারপর তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন; তৎপরবর্তী যুগেও মহিলাদের মধ্যে কামেল ওলী ও মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদর্শী হয়েছেন। মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সাহিত্যিক, কবি এবং ঐতিহাসিক হয়েছেন। তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী রয়েছে। হাজারো পুরুষ এগুলো দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। যদি নারী সমাজ দীনি উন্নতি লাভে সক্ষম না হতেন তাহলে এসব মহিলা কোথা থেকে আসতেন?

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর যিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পত্নী ছিলেন– তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ওহীর অর্ধেক ইলম সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হতে হাসিল করো এবং অর্ধেক এককভাবে আয়েশার কাছ থেকে হাসিল করো। হযরত আয়েশা (রা.) এত বড় আলেম যে, নবুওয়তের অর্ধেক ইলম তাঁর কাছে রয়েছে এবং অর্ধেক সকল সাহাবীর কাছে। হযরত আয়েশা একজন মহিলাই

ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মহিলাকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন যে, হাজারো সাহাবী একদিকে আর একজন মহিলা একদিকে। বোঝা গেল, মহিলা যদি উন্নতি করতে চায় তাহলে এত উন্নতি করতে পারে যে, অনেক পুরুষ তার পিছনে থেকে যায়। মহিলাদের উন্নতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। দীনি উন্নতি হোক অথবা জাগতিক উন্নতি, ইলম ও ফযলেও সব সময় উন্নতি করতে পারে। আপনারা ইমাম আবু জাফরের নাম শুনে থাকবেন, যাঁর কিতাব তাহাবী শরীফ একটি হাদীস গ্রন্থ। সকল মাদ্রাসায় পড়ানো হয় অথচ এ হলো একজন মহিলার কর্মফল। ইমাম তাহাবীর কন্যা হাদীস গ্রন্থ রচনা করেছেন। পিতা হাদীস এবং হাদীসের অর্থ বর্ণনা করতেন এবং মেয়ে তা লিখে নিতেন। এভাবে কিতাব গ্রন্থবদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থ দাঁড়াল, যত আলেম ও মুহাদ্দিস গুজরে গিয়েছেন তারা সবাই ইমাম আবু জাফরের মেয়ের শাগরিদ এবং তাঁর দান রয়েছে সবার উপরে। তিনি একজন নারীই ছিলেন। সুতরাং আমাদের স্ত্রী-কন্যাগণ মুহাদ্দিস হতে পারবে না, এর কোন কারণ নেই। ইমাম তাহাবীর কন্যা মুহাদ্দিস হতে পারছেন। আমাদের মেয়েরা তাঁরই স্বজাতি, তাঁরই স্বগোত্র; দীন ও ঈমান সকলের একই। ঐ ইলম ও জ্ঞান আজও বিদ্যমান রয়েছে। শুধু মনোযোগ ও অমনোযোগের ব্যাপার। তারা মনোযোগ ও লক্ষ্য করেছিলেন; তাই নারীরা বড় বড় আলেম হতে পেরেছিলেন। বড় বড় আলেম ও মনীষী তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এখন মনোযোগ নেই। তাই কামালাতের গুণাবলী পয়দা হয় না। কিন্তু এসব হাসিল করার যোগ্যতা পূর্ণভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে।

নারীর উন্নতি লাভের অসাধারণ যোগ্যতা

উলামায়ে ইসলাম, এসব মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা বেলায়েতের শীর্ষস্থান হাসিল করেছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, কিছু কাজ ইসলাম এমনও রেখে দিয়েছে যেগুলো মহিলাদেরকে দেয়া হবে না। কারণ মহিলাদের যে স্থান তা হলো সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান। এমনটা হবে না যে তারা পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ চলাচল করবে। এতে নানা ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হবে। অমঙ্গল ও মন্দ কাজের আশঙ্কা রয়েছে। তাই মহিলাদের এমন সব পদ দেয়া হয়নি যেগুলোর মাধ্যমে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। তবে যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তাদের যোগ্যতা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, উলামায়ে কেরামের একটি জামাত মত পোষণ করেন– মহিলাগণ নবী হতে পারেন; তবে রাসূল হতে পারবেন না। নবী বলা হয় ঐ মহামানবকে যার সঙ্গে ফেরেশতাগণ কথাবার্তা বলেনল আল্লাহর

পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ওহী প্রেরিত হয়। আর রাসূল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি শরীয়ত নিয়ে আসেন, এবং মাখলুকের তরবিয়ত করেন। মহিলাদের তরবিয়তের স্থান ও মর্যাদা দেয়া হয়নি। কিন্তু এই আলেমের মত নবুওয়ত মহিলাদের দেয়া যেতে পারে।

তাছাড়া এক জামাত একথাও বলেন, হযরত মরিয়ম (আ.) নবী ছিলেন। ফেরেশতা তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। হযরত মুসা (আ.)-এর মাতা নবী ছিলেন এবং ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া তিনি প্রথম থেকে মুসলমান ছিলেন এবং নবুওয়তের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মানুষের দুনিয়ায় নবুওয়তের চেয়ে উত্তম কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ তায়ালার কামালাত ও মহব্বতের পর, মহব্বতের যে স্তর রয়েছে, তা হচ্ছে নবুওয়তের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোন মাকাম ও মর্যাদা নেই। নারী যখন এ মাকামও লাভ করতে পারে, তখন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাদের যোগ্যতা কত উন্নত। তারা সকল মাকাম অতিক্রম করতে সক্ষম। তবে রাসূল হতে পারবে না। এ জন্য যে, রাসূলের অর্থ হলো তিনি শরীয়ত নিয়ে আসবেন এবং মানুষের তরবিয়ত করবেন। এজন্য নারীদের এ মাকামে নেয়া হয়নি যে তারা পরপুরুষের তরবিয়ত করবেন। এতে ফেতনার আশংকা রয়েছে। এজন্য এ স্থান দেয়া হয়নি। অথবা যেমন শরীয়তে মাসয়ালা রয়েছে যে, মহিলাদের কাজী, জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে না। তারা আদালতে বসে ফয়সালা করবে এটা হয় না। এ কারণে যে, যখন তারা ফয়সালা করতে বসবেন, তখন বাদী বিবাদী তার সামনে আসবে। তাঁর প্রশ্ন ও আলোচনা করার অধিকার ও প্রয়োজন রয়েছে। সাথীদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখবে। কাজেই সবাইকে তার সামনে থাকতে হবে। এখানে এই ফেতনা-ফাসাদের আশংকা রয়েছে। এজন্যে এখানে মহিলাদেরকে দেয়া হয়নি। মোটকথা, নারীরা যদি মনোযোগের সঙ্গে পরিশ্রম করেন তাহলে ইলম ও জ্ঞান এবং বুযুর্গীর এমন কোন স্তর নেই যা তারা হাসিল করতে পারবেন না। ইমাম তাহাবীর মেয়ে, হযরত রাবেয়া বসরী, হযরত রাবেয়া আছবী, হাজারো লাখো মহিলা সাহাবী, তাবেঈনদের স্ত্রী ও কন্যাগণ বড় বড় আলেম ও ফাজেল ছিলেন।

নারীরা কামেল ওলীদের মুরব্বি হতে পারেন

হযরত রাবেয়ার ঘটনাবলীতে লেখা আছে। একদিন তিনি খুব আবেগ ও উদ্যমের সঙ্গে রওয়ানা হলেন। হাতে এক পাত্রে আগুন অন্য পাত্রে পানি। অত্যন্ত আবেগ উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি চলছিলেন। মানুষ পরস্পর বলাবলি করতে

লাগল এবং জিজ্ঞেস করল, রাবেয়া! এক হাতে আগুন আর অন্য হাতে পানির পাত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে জোশের সঙ্গে তিনি বললেন– আমি যাচ্ছি এ হাতের আগুন দিয়ে জান্নাতকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে এবং অন্য হাতের পানি দিয়ে জাহান্নামকে নিভিয়ে দিতে। কারণ, ইবাদতকারীরা জান্নাতের লোভে কেউ আবার জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করে। নিজেদের মালিক আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে কেউ ইবাদত করছে না। আমি এজন্য যাচ্ছি যে, এ দুটোকে মিটিয়ে করে দেব। তাহলে মানুষের মধ্যে ইখলাস ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা পয়দা হবে। এবার বুঝুন, এই স্তরের মহিলাও গত হয়েছেন, যাদের আবেগ ও উদ্দীপনার অবস্থা ছিল এমন।

মহিলারা অনেক শীর্ষস্থানীয় কামেল ওলীদের তরবিয়ত করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাবেঈ ছিলেন, সুফীদের ইমাম ছিলেন এবং চিশতি সিলসিলার শীর্ষস্থানীয় ওলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে, হযরত রাবেয়া তার ঘরে আসলেন। কোন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা উদ্দেশ্য ছিল অথবা অন্য কোন বিষয় ছিল। হযরত হাসান বাড়িতে ছিলেন না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন নদীর তীরে গেছেন। নদীর তীরে যিকির ও ইবাদত করার অভ্যাস ছিল তাঁর। কোন কোন ওলী দরবেশদের এই নিয়ম ছিল। তাঁরা আল্লাহর যিকির ও ধ্যানের জন্য জঙ্গলবাস গ্রহণ করেছেন। পাহাড় পর্বতে বসে ওজিফা আদায় করেছেন। এতে একাগ্রতা বেশি হয়। আর নদীর তীর সম্পর্কে সুফীরা বলেন, এর দ্বারা অন্তরে বেশি ক্রিয়া হয়। বাহ্যিকভাবে পানির কাছে গেলে অন্তরে প্রফুল্লতা আসে। অন্তরে স্ফুর্তি ও প্রফুল্লতা যত্ বেশি হবে, অন্তর আল্লাহর যিকির ও স্মরণের দিকে তত আকৃষ্ট হবে। আর মৌল ও বাতেনী কারণ হলো, এক হাদীসে বলা হয়েছে– প্রবহমান পানি আল্লাহর যিকির ও তাসবীহে ব্যস্ত থাকে। পানির যিকিরের প্রভাব মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। তখন মানুষের অন্তরও আল্লাহর যিকিরের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। এসব কারণে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বেশিরভাগ সময় নদীর তীরে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করতেন।

রাবেয়া বসরী জানতে পারলেন হাসান বসরী তার অভ্যাস মতো যিকির ও ইবাদত করার জন্য নদীর তীরে গেছেন। তিনিও সেখানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখলেন। হাসান বসরী পানির উপর মুছল্লা বিছিয়ে নামায আদায় করছেন। মুছাল্লা ভিজছেও না, ডুবছেও না। এটা প্রকাশ্য কারামত। রাবেয়া এ বিষয়টি অপছন্দ করলেন, ভাল মনে করলেন না। কারণ, এ হলো আদিয়াত ও দাসত্বের পরিপন্থী। বন্দেগীর অর্থ হলো শীর্ষ স্থানীয় বুযুর্গ

ও সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। কোন বিশেষ অবস্থা করে নেয়ার অর্থ হলো, এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যিকির ও অহংকার বলে সন্দেহ হয়। এমন মনে করা যে, আমি সবার থেকে বড় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমি যা করতে পারি অন্যরা তা পারে না। আমি একজন কারামতওয়ালা। অলৌকিক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি। আসলে বিষয়টি মুখে প্রকাশ না করলেও অবস্থার মাধ্যমে এমন দাবিই প্রকাশ পায়। এতে অহংকারের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বেলায়ত হলো অহংকার ও আমিত্ব ধ্বংস করে মাটির মতো হয়ে যাওয়া। তাই যার মধ্যে অহংকারের চিহ্ন পাওয়া গেল, তিনি কেমন বুযুর্গ! কাজটি রাবেয়া (রহ.)-এর অপছন্দ হল এজন্য যে, হযরত হাসান বসরী ওলীদের ইমাম। তিনি এমন অবস্থা সৃষ্টি করবেন, যাতে প্রতীয়মান হয়, আমি একটা কিছু, আমি বড় কারামতের অধিকারী। হাসান বসরীর জন্য এমনটা উচিত নয়; বরং তা আবদিয়াতের পরিপন্থী। কেননা, গোপনে হয়ত এই দাবী করা হতে পারে যে, আল্লাহর শক্তি আমার মধ্যে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সবাই উপকরণের মুখাপেক্ষী। যেমন- নৌকা ছাড়া কেউ পানির উপর চলাচল করতে পারে না। আমি কিন্তু এসবের মুখাপেক্ষী নই। আমি এভাবে বিনা উপকরণে পানির উপর চলতে পারি। আমার কাছে আল্লাহর শক্তি রয়েছে। যদি এমন দাবি প্রকাশ পায় তাহলে বুযুর্গী থাকল কোথায়? তাই এসব জিনিস ভালো মনে হয় না। যেহেতু তিনিও বুযুর্গ, তাই সংশোধন করে দিলেন। সংশোধন কীভাবে করলেন? মুখে কিছুই বলেননি। সংশোধন করলেন আমল দিয়ে। হাসান বসরী (রহ.) পানির উপর নিজের মুছল্লা বিছিয়ে ছিলেন। এবার রাবেয়া তাঁর মুছল্লা বাতাসের মধ্যে বিছিয়ে দিয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। মুছল্লা বাতাসের উপর আর রাবেয়া তখন নামায পড়ছেন। হাসান বসরী বিষয় অনুধাবন করতে পারলেন– আমাকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। তাই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুছল্লা গুটিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবেয়াও মুছল্লা গুটিয়ে নিচে এসে পড়লেন এবং দুটি বাক্য উচ্চারণ করলেন। এটি খুবই মূল্যবান বাক্য যা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। দীন ও দুনিয়ার সব উপদেশ এ দু'বাক্যে বিদ্যমান ছিল। বললেন– হে হাসান বসরী!

بر آب روی خسے باشی بر ہوا پری لگسے باشی

دل بر ست آر کہ کسی باشی

তুমি যদি পানির উপর চলে যাও, তাহলে এমন আর কি করলে? ময়লা আবর্জনাও পানির উপর দিয়ে ভেসে যায়। এত কোন কামাল ও গুণ নয়। রাবেয়া যদি বাতাসের উপর উড়ে বেড়ায়– সে তো মশা মাছিও বাতাসে উড়ে

বেড়ায়। এ কোন কামাল নয়। নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রন করো, আয়ত্তে নিয়ে আসো, তাহলে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে। প্রকৃত মানুষ হয়ে যাওয়াই হলো কামাল। মশা মাছি হওয়ার মধ্যে কোন কামাল নেই । মানুষ হওয়াই কামাল। ময়লা আবর্জনা খড়কুটো হয়ে যাওয়া কামাল ও কোন গুণ নয়। আমরা যদি বিমানে করে পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাই, তাহলে তা অত্যন্ত কামাল ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা। কিন্তু এ কামাল হলো হাওয়ায় পশুত্বের কামাল, মনুষ্যত্বের কামাল ও মহৎ গুণ নয়। আমরা যদি ডুবো জাহাজে বসে সাগরের তলদেশে পৌঁছে যাই, তাহলে তাও পশুত্বের কামাল ও উন্নতি। যেহেতু মাছও সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। মানুষ হয়ে আমরা যদি মাছ হয়ে যাই, তাহলে কি গুণ হলো? কি উন্নতি হলো? এভাবে বাতাসের উপর চিলও উড়ে বেড়ায়। মানুষ থেকে চিল হয়ে যাওয়া কি কোন কামাল? কোন উন্নতি? এ হলো পশুত্বের উন্নতি। মানবতার উন্নতি নয়। মানবতার উন্নতি হলো এই ঘরে বসে থাকবে এবং আরশের সান্নিধ্যে কথাবার্তা চলবে। নিজ মুছল্লার উপর বসা থাকবেন এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। সম্পর্ক আরশের সঙ্গে হতে হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের বাসিন্দা মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হবে আরশের বাসিন্দা। এ হলো মানবতার সর্বোত্তম উন্নতি, সর্বোত্তম গুণ যা আম্বিয়ায়ে কেরাম শিক্ষা দিয়েছেন।

রাবেয়া বসরী কত মূল্যবান কথা বলেছেন। হাসান বসরী (রহ.) লজ্জিত হলেন এবং তাওবা করলেন। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনো করব না। আমি একাজ করাকে খুবই কামাল মনে করেছিলাম; কিন্তু আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। দেখুন, রাবেয়া একজন মহিলা ছিলেন, আর হাসান বসরী পুরুষদের ইমাম ও নেতা ছিলেন। একজন মহিলা একজন কামেল পুরুষকে হেদায়াত দিচ্ছেন এবং এ হেদায়াতের দ্বারা সৎপথ লাভ হচ্ছে। এজন্য বলি, নারী যদি কামাল হাসিল করতে চায়, তাহলে মহামনীষীদের মুরব্বি হতে পারে।

হযরত আয়েশা (রা.) উম্মতের শিক্ষাগুরু

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। উম্মতের সবচে' বড় মুফাসসিরে কুরআন; অথচ হযরত আয়েশা (রা.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তাঁর থেকে সবচে' বেশি ইলম হাসিল করেছেন। ফতোয়ার প্রয়োজন হলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকে হাসিল করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্পূর্ণ উম্মতের উস্তাদ, আর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁরও উস্তাদ। হযরত

আয়েশা ইলম ও কামালতের মধ্যে সকল উম্মতের উস্তাদ। কোন কোন সাহাবী হযরত আয়েশা (রা.)কে বলতেন–

مَا هٰذِهِ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِىْ بَكْرٍ

হে আবু বকরের পরিবার! প্রথম বরকতময়, তোমাদের তো এত বেশি বরকত রয়েছে যে, তোমাদের এহসান ও দানের সামনে কেউ মাথা তুলতে পারছে না।

হযরত আয়েশা (রা.)কে প্রশ্ন করার কারণে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। অজানা বিষয় প্রকাশ লাভ করেছে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন সব প্রশ্ন করতেন, যেগুলো অন্যরা সাহস করতেন না। উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের দরজা খুলে দিতেন। এ ছিল সম্পূর্ণ উম্মতের উপর তাঁর এহসান। তিনি যদি প্রশ্ন না করতেন তাহলে ইলম আসতো না।

উদাহরণস্বরূপ হাদীসে বলা হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যদি কারো তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণের পর মায়ের দুধ পানের সময় মারা যায়, ছয় মাস, এক বছর পর ইন্তেকাল করে, তাহলে তিনজনই মাতা-পিতার নাজাতের কারণ হবে, সুপারিশ করবে এবং এমনভাবে করবে যেন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে জেদ ও হঠকারিতা করবে। আমার মাতা-পিতাকে অবশ্যই মাফ করে দিন। ক্ষমা করে দিন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মাতা-পিতার জন্য জাহান্নামের আদেশ হয়ে যাবে। এরা শাস্তির যোগ্য। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু সন্তানরা ফেরেশতাদের সামনে রাস্তা রুখে দাঁড়াবে এবং বলবে, আমাদের মাতা-পিতাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তাঁরা উত্তর দিবে, জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছি। তাদের জন্য জাহান্নামের আদেশ করা হয়েছে। সন্তানরা বলবে, এসব আমরা জানি না, আমাদের পিতা-মাতাকে আমরা নিতে দিব না। বাচ্চারা জেদ করবে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন– আল্লাহর নির্দেশ। তারা বলবে, তা হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মাসুম নিষ্পাপ বানিয়েছেন। আমরা তাদেরকে নিয়ে যেতে দেব না। আমাদের থাকতে তারা জাহান্নামে যাবে না। ফেরেশতাগণকে ফিরে আসতে হবে এবং আরজ করবেন– হে আল্লাহ! এই বাচ্চারা পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, যেতে দিচ্ছে না। বাচ্চাদের জেদের কাছে ফেরেশতাগণ হার মানবেন।

যেমন পিতা যদি বাদশাহও হন, আর বাচ্চা জেদ করে বসে তাহলে

বাদশাহকেও বাধ্য হতে হয় বাচ্চাদের কাছে। মেনে নিতে হয় তাদের দাবি। তার রাজ্যের সকল শক্তি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এভাবে ফেরেশতাদের শক্তিও বেকার হয়ে যাবে। তারা বাধ্য হয়ে যাবেন। বাচ্চারা তাদেরকে ঘিরে নিয়ে আসবে। তখন ফেরেশতাগণ আরজ করবে– হে আল্লাহ! আপনার আদেশ ছিলো এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা কিন্তু এসব বাচ্চারা বাধা প্রদান করছে, জেদ করছে, আমাদের যেতে দিচ্ছে না। আল্লাহ তায়ালা বলবেন– হে বোকা বাচ্চার দল! তোমাদের পিতা-মাতা এসব অন্যায় অপরাধ করেছে, গুনাহ ও পাপ করেছে, এরা জাহান্নামের যোগ্য।

তারা বলবে– তারা কি কি করেছেন আমরা এসব জানি না। তারা আমাদের বাবা-মা। যদি তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাতেই হয় তাহলে আমাদেরকেও পাঠিয়ে দিন। আর পরিষ্কার কথা, মাসুমদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে না। আর আপনি যদি আমাদের জান্নাতেই পাঠাতে চান, তাহলে আমরা তাদেরকে নিয়েই যাব। আল্লাহ তায়ালা দলিল-প্রমাণ দিবেন। উত্তরে বাচ্চারা জেদই করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা বলবেন– নিয়ে যাও তোমাদের বাবা-মাকে। ঝগড়াটে ছেলেরা! তোমাদের মা-বাবাকে জান্নাতে নিয়ে যাও! আমাকে নিস্তার দাও। ফলে তারা বাবা-মাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

এ হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)কে শুনালেন। এবার আয়েশা সিদ্দীকা প্রশ্ন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! যদি কারো দুটি সন্তান এভাবে মৃত্যুবরণ করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'জনেরও এই অবস্থা। আবার প্রশ্ন করলেন, যদি একটি সন্তান এমন হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– একজন হলেও এমনই হবে। এ কথাও বললেন, যদি গর্ভপাতও হয়ে যায় এবং বাচ্চার মধ্যে যদি প্রাণ স্পন্দন এসে গিয়ে থাকে, তাহলেও এই হুকুম। সেও জেদ করে মা-বাবাকে মাফ করিয়ে নিয়ে যাবে।

এবার চিন্তা করুন, ছোট সন্তান যখন মারা যায়, তখন মা-বাবার বিশেষত মায়ের কি অবস্থা হয়! তার কলিজার টুকরা ছিল। সে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছে, তার প্রসব ও লালন পালন করেছে। জন্মগ্রহণের পর যখন মারা যায়, তখন পিতা অল্প সময়ে কিছু না কিছু ধৈর্য ধারণ করে নিতে পারে। কিন্তু মা সহজেই ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। এজন্য যে তার অবস্থা হলো এমন– যেন তার দেহ থেকে এক খণ্ড মাংস আলাদা হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন এই হাদীস শুনবে, তার নাজাতের কারণ হবে, তখন সে অনেকাংশে রাজি-খুশি হয়ে যাবে। আমার কোন কষ্ট নেই। কষ্ট হয়ে গেলেও

আমার জন্য নাজাত ও জান্নাতের সামান হয়ে যাবে।

যদি সিদ্দীকা আয়েশা এ প্রশ্ন না করতেন, তাহলে এসব বিষয় গোপনই থেকে যেত। এত সহজ হত না। আমরা তো একথাই বলে বেড়াতাম– যদি তিনজন ছোট সন্তান মারা যায়, তাহলে জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। যদি একজন বা দু'জন হয় তাহলে জান্নাতের ওয়াদা নেই। কিন্তু হযরত আয়েশার প্রশ্ন দ্বারা জানা গেল, একজন দু'জনের বেলায়ও ওয়াদা রয়েছে। বরং গর্ভপাত হয়ে গেলেও এ ওয়াদা রয়েছে, যদি সন্তানের প্রাণ স্পন্দন শুরু হয়ে গিয়ে থাকে। হযরত আয়েশার প্রশ্ন করার কারণে উম্মতের জন্য কত সহজ হয়ে গেল। কত রাস্তা বেরিয়ে আসল। এভাবে এখন এমন অনেক মহিয়সী মহিলাও ছিলেন যারা হাজারো পুরুষের পথ সুগম করে দিয়েছেন। তাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয়ে গেছেন।

নারীদের ধৈর্যশক্তি অসাধারণ

বিবাহ, দুঃখ-শোক, আনন্দ-উৎসাহ এমনই জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়। বেশি দুঃখ কষ্টে পাগলের মতো হয়ে যায়। বেশি আনন্দ-স্ফুর্তিতেও আত্মহারা হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কেউ যদি তাকে সামাল দিতে পারে, তাহলে সে খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং উপকারী হবে। ইসলামে এমন সব মহিলা গত হয়েছেন, যারা সংকটের সময় পুরুষদেরকে সামলেছেন। অথচ পুরুষরা নারীদের তুলনায় শক্ত হৃদয়ের হয়ে থাকেন। নারীদের অন্তর এত কঠোর নয়। তবে তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি, দীন ও দিনায়ত রয়েছে। তাই সংকটের সময় পুরুষদের রক্ষা করেন তারা।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে– হযরত জাবের (রা.)-এর ছয় সাত বছর বয়সের সুন্দর সুশ্রী ছেলে অসুখে পড়ল। সে যুগের রীতি অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হল। কিন্তু ছেলেটি ভাল হল না। এ সময় হযরত জাবের (রা.)কে হঠাৎ সফরে যেতে হল। যাওয়াটা নিতান্ত জরুরী ছিল। স্ত্রীকে বললেন– আমাকে বাধ্য হয়ে সফরে যেতে হচ্ছে। আর এদিকে ছেলের অবস্থা কত নাজুক! তার চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ঠিক মত করো। আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, বেশি দেরি হবে না। একথা বলে হযরত জাবের (রা.) চলে গেলেন। যে দিন তাঁর আসার কথা, সে দিন ছেলের ইন্তেকাল হল। তিনি বাড়ি আসলেন। স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। এমন যদি বর্তমান যুগের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে হতো তাহলে যখন দেখল স্বামী আসছেন, তখনই মাতম বিলাপ শুরু করে দিত। তাহলে বোঝানো যাবে, তিনি

অত্যন্ত দুঃখিনী। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী। যখন হযরত জাবের (রা.)-এর আসার সময় হল তখন নিজেকে সামলে নিলেন এবং এমন ভাব করলেন যেন কোন দুঃখ-চিন্তা নেই। বাচ্চার লাশ ভেতরে রেখে উপরে চাদর দিয়ে দিয়ে ঢেকে দিলেন।

হযরত জাবের আসলেন। আরবের প্রথা মতো স্ত্রী বেরিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, করমর্দন করলেন। স্বামীর হাতে চুমু দিলেন। হযরত এসেই জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কেমন আছে? বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! খুবই আরাম ও শান্তিতে আছে। কথা ভুলও ছিল না। মরণের পর সুখ-শান্তি ও নিরাপদেই ছিল। এমন বাক্য বললেন, যা মিথ্যাও নয়। স্বামীও শান্তি পেলেন।

এবার স্বামীর হাত ধুয়ে দিলেন, আহার করালেন। যদি আসার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সংবাদ শুনিয়ে দিতেন, তাহলে স্বামীর উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত। পানাহারের কোন প্রশ্নই থাকত না। তিনিও শোকাভিভূত হয়ে পড়তেন। খাওয়ার পর স্বামীকে বললেন– আমি আপনার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? বললেন– জিজ্ঞেস করো। বললেন– কেউ যদি আমাদের কাছে কোনো জিনিস আমানত রাখে এবং সময়ও নির্দিষ্ট করে দেয়– এক বছরের জন্য আমানত রাখছি। বছর শেষে নিয়ে যাব, তাহলে এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? বললেন– হুকুম পরিষ্কার। যথা সময় আমানত ফিরিয়ে দেয়া উচিত। স্ত্রী বললেন– যদি আমানত ফিরিয়ে দিতে অন্তরে ব্যথা লাগে, মন না চায় তাহলে? স্বামী বললেন, অন্তর ব্যথিত হওয়ার কী অধিকার রয়েছে? জিনিস অন্যের। নিজের জিনিসের জন্য ব্যথা হতে পারে। যখন অন্যের আমানত, সময়ও নির্ধারিত ছিল, এখন মালিক ফেরত চাচ্ছে। দুঃখ-কষ্টের কোনো অধিকার নেই। বললেন– শরীয়তের এই বিধান? জাবের বললেন– হ্যাঁ, শরীয়তের এই বিধান।

এবার স্ত্রী বললেন– আমাদের ছেলেটি আল্লাহর আমানত ছিল। আল্লাহ সাত বছরের জন্য রেখেছিলেন। গতকাল দূত এসে বলল, আমানত ফিরিয়ে দাও! আমি আমানত ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন দুঃখ-কষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও ব্যথিত হওয়ার কোন অধিকার আমাদের আছে কি?

জাবের বললেন– না; স্ত্রীর হাতে চুমু দিলেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি এমন সান্ত্বনা দান করেছ, দুঃখের পরিবর্তে আমার আনন্দ অনুভব হচ্ছে। আমরা আমানত আদায় করে দিয়েছি। আমাদের বোঝা হালকা হয়েছে।

হ্যাঁ, তিনি নারীই ছিলেন। এমনভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তবে এসব হচ্ছে ঐসব

মহিলার কাজ যাদের মধ্যে দীন এবং দিয়ানত থাকে। নারীরা যদি চিরায়ত প্রথা অনুসরণ করেন তাহলে চোখে পানি না আসলেও অন্য কেউ আসার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার ভান করবেন। আগতরাও কান্নায় অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয় জন আসলে তিনি ঐ একই কাজ করবেন। কিন্তু সাহস ও ধৈর্যের কথা হলো, মাতম ও বিলাপকারীদের সামলে দাও। চিন্তিত জনকে সান্ত্বনা দান কর। তাসাল্লী দাও। এসব কাজ পুরুষরা করে থাকেন। কিন্তু এমন মহিলাও ছিলেন যারা পুরুষের দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করে দিয়েছেন। হালকা করে দিয়েছেন।

উম্মতের উপর হযরত খাদিজা (রা.)-এর এহসান

হযরত খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী। আমি বলি, সমগ্র উম্মতের উপর হযরত খাদিজার এহসান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হল, আলমে গায়েব, অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সর্বপ্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হল, জিবরাঈল (আ.)কে প্রকৃত আকার আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন। নইলে তিনি মানুষের আকৃতিতে আসতেন। সাহাবীদের মধ্যে দাহইয়া কলবি খুবই সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। তার আকৃতি ধারণ করে হযরত জিবরাঈল আসতেন। সাহাবীরা দেখতেন দু'জন দাহইয়া বসে আছেন। একজন একদিকে, অপর জন অন্যদিকে। জানা ছিল, একজন সাহাবী অন্য জন জিবরাঈল (আ.)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসল আকৃতিতে তাঁকে দু'বার দেখেছেন। একবার হেরা গুহায়, যখন সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল। তখন তার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় বার মেরাজের রাতে। এ দেখা এমন ছিল যে, তার ছয়শ' ডানা রয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শূন্যলোক তার শরীরে ভরে গেছে। তার আকার আকৃতি এত বড় যে, মাথা আকাশে আর পা দুটি মাটিতে। কাঁধ দুটি দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে আর বুক পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তেরয়েছে। যেন সম্পূর্ণ শূন্যলোক জিবরাঈলের দেহে ভরে গেছে। মুখমণ্ডল সূর্যের মতো ঝলমল করছে। মাথায় একটি মুকুট রয়েছে যা সূর্যের চেয়েও আলোকোজ্জ্বল। এ থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সবুজ রঙের পোশাক তার দেহকে আবৃত্ত করে রেখেছে। এত সুন্দর, সুশ্রী আকার-আকৃতি। কিন্তু ঐ বিশাল আকৃতি দেখে প্রথম অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্তরে ভয় ও শরীরে কাঁপন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এ ছিল জীবনের প্রথম দেখা। অদৃশ্য জগতের একজনকে এমন বিশাল আকৃতিতে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে ঘরে ফিরলেন এবং হযরত খাদেজা (রা.)কে বললেন–

زَمِّلُوْنِىْ، زَمِّلُوْنِىْ، زَمِّلُوْنِىْ، لَقَدْ خَشِيْتُ عَلى نَفْسِىْ.

আমাকে কম্বলে জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বলে জড়িয়ে দাও! আমার আশংকা হচ্ছে আমি বাঁচব না। আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

হযরত খাদিজা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা বর্ণনা করলেন। এবার হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন–

كَلاَّ وَاللهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُقْرِى الضَّيْفَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِيْنُ عَلى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস ও লজ্জিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব, দান-দক্ষিণা, দরিদ্রদের সাহায্য-সহায়তা, অতিথিদের আতিথেয়তা করে থাকেন, মিসকিনদের আশ্রয় দান করেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন। এমন বান্দাকে আল্লাহ ধ্বংস করেন না। আপনি আতংকিত হবেন না মোটেও; আপনার প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে না।

এই ছিল মৌখিক সান্ত্বনা। তারপর কাজ করলেন, হাত ধরে ওরাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। এই ব্যক্তি আরবদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করতেন। এসব কিতাব তার মুখস্থ ছিল। এসব কিতাবের ইলম ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন তিনি। কুরাইশ গোত্রের এবং আরব মুশরিকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আসমানী কিতাবাদির পণ্ডিত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। এজন্যে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা ঐ ব্যক্তি দিতে পারে, যে আলেম এবং দীন ও ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফ। হযরত খাদিজা (রা.) তার কাছে গেলেন এবং বললেন– একটু শুনুন! আপনার ভাতিজা কি বলছেন?

اِسْمَعْ لِابْنِ اَخِيْكَ

আপনার ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করুন কি হয়েছে তার।

ওরাকা ইবনে নওফল আদর মিশ্রিতকণ্ঠে বললেন–

يَا ابْنَ خِيْ مَعَاذَا تَرٰى

হে আমার ভাতিজা! তুমি কী দেখেছো, কেন এত আতঙ্কিত হয়েছ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন– আমি এভাবে গুহায় বসেছিলাম। এমন সময় এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেল। এমন ছিল তার আকার আকৃতি। সে আমার সঙ্গে কথা বলল।

ওরাকা বিন নওফল বললেন, اَبْشِرْ اَبْشِرْ সুসংবাদ গ্রহণ কর, এই পবিত্রাত্মা যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর দরবারে ওহী নিয়ে আসতেন। অন্য পয়গাম্বরদের কাছেও আসতেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এ উম্মতের নবী বানিয়েছেন, যাঁর সংবাদ আমরা আগে থেকেই শুনছিলাম। মনে হয় সে মহামানব তুমিই। কাজেই তুমি ঘাবড়িও না। এ হলো তোমার জন্য মহাসুসংবাদ। আরো বললেন, 'আফসোস! যখন তুমি দীনের দাওয়াত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে, আমি যদি জীবিত থাকতাম তাহলে আমি তোমার সব ধরনের সাহায্য সহায়তা করতে কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু আমার পাগুলো কবরে ঝুলে রয়েছে। বয়স হয়েছে শতাধিক বছর। বৃদ্ধ হয়ে গেছি।'

আপনারা উপলব্ধি করেছেন, কেমন জটিল অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা তাঁর কোনো শারীরিক ব্যাধি ছিল না। জ্বর কফ ছিল না, এ ছিল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এমন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যা অন্যান্য নবীদের জন্যও পেশ করা হয়েছিল। কোনো সাধারণ ওলী দরবেশও নন; বরং এ ছিল নবীকুল শিরোমণি সাইয়েদুল আম্বিয়ার ঘটনা। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একজন মহিলা তৈরি হলেন। যদি আমাদের যুগের কোন মহিলা হতেন, তাহলে তিনি নিজেও আতংকগ্রস্ত হয়ে বলতেন– আল্লাহই জানেন, এখন কি হবে! তাড়াতাড়ি কম্বল জড়িয়ে দাও এবং হায় হুতাশ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু হযরত খাদিজা নিজে তো আতংকগ্রস্ত হননি; বরং ঐ মহান সত্তাকে সান্ত্বনা দিলেন, যে সত্তা সমগ্র বিশ্বের সরদার– ঐ রাহনুমা হবেন। তাঁর অন্তরাত্মাকে প্রশান্তি দেয়ার চেষ্টা করলেন। কথা দিয়ে, কাজ দিয়ে, পৃথক পৃথক সান্ত্বনা দিলেন। ভাষা দিয়ে এভাবে সান্ত্বনা দিলেন– আপনি এমন ব্যক্তি নন, যাকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিবেন। আপনি তো আপাদমস্তক মহান ও

কল্যাণময়। আল্লাহর বিধান রয়েছে– আল্লাহ এ জাতীয় মহামানবগণকে ধ্বংস করেন না। আর কাজ করলেন এভাবে– ওরাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি একজন নারীই ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার অর্থই হলো সমগ্র উম্মতকে সান্ত্বনা দেয়া, যারা কেয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। একা হযরত খাদিজার এহসান রয়েছে সমগ্র উম্মতের উপর। আমার আরজ করার উদ্দেশ্য, এমন নারীও এ উম্মতের মধ্যে ছিলেন।

সুতরাং মহিলাদের এমন ধারণা পোষণ করা, আমাদের কাজ কেবল ঘরে বসে থাকা, খানাপিনা তৈরি করে দেয়া, ছেলেমেয়ের কাপড় সেলাই করে দেয়া, তাদের লালন পালন করা মাত্র; এর চেয়ে বেশি উন্নতি লাভের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। আর সব হলো পুরুষদের কর্মস্থল। ওলী দরবেশ পুরুষ হবে, ইমাম ও নেতা পুরুষ হবে, মুজতাহিদ, খলিফা, প্রশাসক পুরুষ হবে। আমরা এসব কাজের জন্য নই। আপনারা যদি ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন তাহলে ওলী হতে পারেন। মুজতাহিদ হতে পারেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি ইলহাম হতে পারে। আপনারাও ঐ কাজ করতে পারেন যা একজন শীর্ষস্থানীয় ওলী করতে পারেন। কিন্তু শর্ত হলো নারীদেরকে এসব কাজে আকৃষ্ট হতে হবে। তাতে মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু তারা চেষ্টা করেন না। মনোযোগ দেন না। এসব কথা আমি এজন্য বললাম যে, এ ধারণা দূর হোক যে, 'মহিলাগণ দীনি ও ইলমী উন্নতি লাভের জন্য নন'– এ কাজের জন্যে কেবল পুরুষরাই রয়েছেন।

নারীর ইলম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পুরুষই প্রতিবন্ধক

আপনারা যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমি বলব, এ ব্যাপারে সবচে' উদাসীনতা পুরুষদের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছেন। মুখে হয়তো কেউ বলেনি; তবে নারীদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হয়, তাতে দীন ধর্ম শেখার কোনো পদপেক্ষই গৃহীত হয়নি। আপনারা আপনাদের কাজের মাধ্যমে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন, নারীদের সৃষ্টি এজন্য যে, দীনি ও ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করা তাদের দরকার নেই। এসব যা করার পুরুষরাই করবে। পুরুষ হিন্দুস্থান, আফ্রিকা সবখানে উন্নতি লাভের জন্য বিচরণ করবে। পুরুষ জাতিকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী সমাজকে এসব কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

এর ফলে আপনারা যখন তাদের উন্নতি লাভের সব পথ বন্ধ করে দিলেন, তখন এসব অসহায় নারীদের ত্রুটি কোথায়? এ ত্রুটি তো পুরুষদের। কেয়ামতের দিন

পুরুষদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে– তোমরা নারীদেরে তালিম ও তরবিয়তের প্রতি লক্ষ্য করনি কেন? কেন তাদেরকে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দাওনি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُل عَنْ رَّعِيَّتِه

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর কেয়ামত দিবসে প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে– নিজের অধীনস্তদের কিভাবে পরিচালনা করেছিলে? সুখ-শান্তিতে রেখেছিলে নাকি দুঃখ-কষ্টে রেখেছিলে। সঠিকভাবে তাদের তরবিয়ত করেছিলে কি? দীনের কাজে তাদের লাগিয়ে ছিলে নাকি দীনি কাজ থেকে দূরে রেখেছিলে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রতিটি পুরুষ দায়িত্বশীল বাদশাহ এবং পরিবারে যারা থাকে তারা হলো তার অধীন ও পোষ্য। কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে– পরিবারবর্গের সঙ্গে তোমার আচার-ব্যবহার কেমন ছিল। যদি কেউ দেশের বাদশাহ হয়ে থাকে তাহলে দেশবাসী সবাই তার প্রজা। কেয়ামতের দিন তাকে প্রশ্ন করা হবে; তুমি তোমার প্রজাদেরকে কি অবস্থায় রেখেছিলে? তাদের দুঃখ-কষ্টের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর রেখেছিলে কি? তাদের কষ্ট দিয়েছিলে কি? তাদের মানসম্মান সংরক্ষণ করেছিলে, না তাদেরকে অসম্মানী করেছিলে? প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কাছে এ প্রশ্ন করা হবে। উস্তাদের কাছে তার ছাত্রদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে– তোমার ছাত্ররা তোমার জন্য অধীনস্ত দের মতো ছিলে। তুমি তাদের প্রশাসক ছিলে। তারা তোমার নির্দেশ মেনে চলত। তুমি তাদের উপর কি কি নির্দেশ দিয়েছিলে? পীর সাহেবের কাছে তার মুরিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। মুরীদগণ তোমার আজ্ঞাবহ ছিল, আর তুমি ছিলে নির্দেশদাতা। তোমাকে কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তারা তোমাকে মান্য করেছে। তুমি কি কি জিনিস তাদেরকে পালন করতে আদেশ করেছ? সারকথা, প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন করা হবে, আমার, আপনার কাছেও প্রশ্ন করা হবে, নারীদের সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। যেহেতু তারা পুরুষের অধীন রয়েছে।

নারী সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর অন্তিম অসিয়ত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের প্রতি সবচে' বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। মৃত্যুর আগে আগে সবশেষ যে বাক্য তাঁর জবান মুবারক দিয়ে বের হয়েছিল, তা ছিল এই– اِتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ হে লোক সকল! নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর; এরা হলো আল্লাহর আমানত, যা তোমাদের হাতে

অপর্ণ করা হয়েছে। এমন যেন না হয়, তোমরা আমানতের খেয়ানত করতে এবং কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বাক্য, যা ওফাতের আগে আগে বলেছিলেন। নারীদের ব্যাপারে মনোযোগ দাও, চিন্তা-ভাবনা কর। তারা যেন ধ্বংস হয়ে না যায়। তাদেরকে নষ্ট করা না হয়। তাদের দীক্ষা পদদলিত না হয়। তাদের দীন ও ধর্ম নষ্ট না হয়। তাদের দুনিয়া নিষ্ফল না হয়।

যে পবিত্রাত্মা নারীদের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করেছেন, তাঁর উম্মতেরও দায়িত্ব তারা এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করে এবং নারীদের সব বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اِنَّ اَكْرَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا اَلْطَفُكُمْ اَهْلاً

তোমাদের মধ্যে সবচে' সম্মানের পাত্র ঐ মুসলমান যার চরিত্র নিষ্কলুষ। নারীদের সঙ্গে, স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আচার-আচরণ কোমল স্নেহ প্রীতিপূর্ণ দয়া ও আদরমাখা ছিল। অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নারীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি ও কঠোর ব্যবহার করবে, তাদের হৃদয়কে ব্যথিত করবে, সে সম্মানের পাত্র ও শ্রদ্ধারযোগ্য নয়। এই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। ওফাতের আগে আগে যে অন্তিম অসিয়ত করেছেন, যে উপদেশ দান করেছেন তা নারীদের সম্পর্কে ছিল। আপনারা চিন্তা করুন, উম্মতদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একথা খেয়াল করেছেন, তখন উম্মতরা কি ধারণা করেছেন। তারা তাদের কাজকর্ম দিয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন নারী সমাজ দীনি ও আমলী উন্নতি লাভের অযোগ্য? এ কাজ তাদের নয়, তাদের কাজ হচ্ছে যদি অসহায় দরিদ্র থাকে, তাহলে গৃহাভন্তরে থেকে রান্নাবান্না করবে। আর যদি বিত্তশালী হয় তাহলে, চাকরানী রান্নাবান্না করবে আর তারা ভালো পোশাক পরে উন্নতমানের অলংকারে সজ্জিত হয়ে বসে থাকবে এবং যা ইচ্ছা তা করবে। তাদের দায়িত্ব শেষ এবং তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব এটাই।

রূপের আসক্তি ক্ষণস্থায়ী : মহব্বত থাকে না

এর অর্থ হচ্ছে, তাদের শরীরকে সুশোভিত ও আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আত্মাকে সুন্দর করা হয়েছে কি? শরীরের শোভা সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী

ব্যাপার। কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ মঙ্গল করুন, মাত্র তিনদিনের জ্বরে যৌবন ও রূপ লাবণ্য কমে যায়। মানুষ যদি যৌবন ও রূপ-লাবণ্যের গর্ব করে, মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের উপর গরিমা দেখায়, তাহলে তিন দিনের জ্বর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দেয়। চেহারার রূপ-লাবণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। চামড়া খসখসে হয়ে যায়। জ্বর এসে বলে দেয়, সর্বোত্তম উপদেষ্টা আমি। তুমি সাবধান হয়ে যাও। যে যৌবন ও রূপ-লাবণ্যের জন্য সব কিছু করা হয় তার মূল্য ও মর্যাদার পরিমাণ কমই হয়ে থাকে।

তাই ওলী-দরবেশগণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শারীরিক রূপ-লাবণ্যে পাগল হওয়া উচিত নয়। চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর, স্বভাবকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ কর। উন্নত কর। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– এক বুযুর্গের খানকা'য় আল্লাহ আল্লাহ শেখার জন্য হাজারো মানুষের সমাগম হত। এক ব্যক্তি আসলো। এখনও সে নতুন। তার হৃদয়ে বুযুর্গী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। পীরের হাতে বায়াত করল। পীর সাহেব তাকে আল্লাহু আল্লাহু যিকির করার নিয়ম বলে দিলেন। সেও যিকির শুরু করে দিল। খানকা'র নিয়ম ছিল, সব মুরিদের খাবার পীর সাহেবের ঘর থেকে দেয়া হত। ওলীর একজন কৃতদাসী ছিল, সে খানা ভাগ করে দিত। দাসী ছিল সুন্দরী সুশ্রী। নতুন মুরিদের মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এখন দাসী যখন খাবার নিয়ে উপস্থিত হয় মুরিদ অপলক চোখে দাসীকে দেখতে থাকেন। প্রেম বিনিময় করতে চান। পীর সাহেব তা বুঝতে পারলেন। এই ব্যাটা দাসীর রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এখন পরিষ্কার কথা, দাসীর রূপ-লাবণ্যে যতই আকৃষ্ট হবে, ততই আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ চোখের আড়াল হবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে না কোন রাস্তা। যিকির ও অজিফা যা ছিল সবই বিদায় নিল। অপলক চোখে দাসীকে দেখা এবং চব্বিশ ঘণ্টা বাঁদীর কল্পনায় ব্যস্ত থাকা এই তার কাজ। যখন দাসী আসে অপলক চোখে লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। যিকির আযকার করা, আল্লাহর নাম নেয়া কিছুই হচ্ছে না। এ হলো আল্লাহর বিধান। মানুষ যখনই বাইরের রূপ-লাবণ্য দেখে আসক্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা বিদায় নিবে। এসেছিলেন আল্লাহর যিকির, আল্লাহু আল্লাহু করার জন্য। এখন বাঁদীকে দেখার কাজে লেগে গেলেন। তিনি এবং আল্লাহ হতে গাফেল উদাসীন হয়ে পড়লেন।

পীর সাহেব আঁচ করতে পারলেন, আমার মুরিদ এ বিপদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। 'সুবহানাল্লাহ' তিনি চমৎকার ব্যবস্থা করলেন। তিনি মুরিদকে ডেকে এনে একথা বলেননি, তুমি এমন অপকর্মে লিপ্ত কেন? এমন করো না। বরং একটি কার্যকর

পন্থা গ্রহণ করলেন। এতে তার সংশোধন হয়ে গেল। পন্থাটি হলো– দাসীকে জুলাফের ওষুধ পান করিয়ে দিলেন। শুরু হলো দাস্ত। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দাস্ত হতে থাকল। দাসীকে বলে দিলেন, একটি পাত্রে পায়খানা করার জন্য। দশ মিনিট পর পর দাস্ত হচ্ছিল। বিকাল বেলা বাঁদীর চেহারার রূপ-লাবণ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। চামড়া হাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। তার চেহারা দেখলে ঘৃণা হয়। গোলাপের মতো রূপে ভরা কোমল চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে এবং হলুদ রঙ ধারণ করেছে। পীর সাহেব দাসীকে বললেন– ঐ মুরিদের কাছে খাবার নিয়ে যাও এবং তোমার সঙ্গে আজ কেমন ব্যবহার করে, তা আমাকে জানাও।

এবার দাসী খাবার নিয়ে হাজির। অন্য সময় মুরিদ অপেক্ষায় বসে থাকতেন দাসী কখন আসবে, তাকে দেখে নয়ন শীতল করবেন। কিন্তু আজ যখন আসল, দেখলেন হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে, চেহারায় রূপ-লাবণ্য কিছুই নেই। লাল রঙের পরিবর্তে হলুদ রঙ ধারণ করেছে। দাসীর অবস্থা দেখে তার ঘৃণা সৃষ্টি হলো। বললেন, খাবার রেখে চলে যাও। তাড়াতাড়ি চলে যাও। দাসী খাবার রেখে চলে গেল।

দাসী পীর সাহেবকে ঘটনা জানাল– আমাকে চোখ ভরে দেখার পরিবর্তে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পীর সাহেব বুঝে ফেললেন, চিকিৎসা কাজ দিয়েছে। পীর সাহেব আসলেন এবং ঐ মুরিদকে বললেন– আমার সঙ্গে তাশরিফ নিয়ে আসুন। হাত ধরে নিয়ে আসলেন ঐ পাত্রটির কাছে যার মধ্যে অনেক ময়লা রাখা ছিল। তা দেখিয়ে বললেন, এ হলো আপনার মাশুক প্রিয়া। একে উঠিয়ে নিয়ে যান। কারণ, যে পর্যন্ত তা বাঁদীর মধ্যে ছিল, তার সঙ্গে আপনার প্রেমাশক্তিও সে পর্যন্ত ছিল। এখন এসব বেরিয়ে গেছে, অন্য কিছু বের হয়নি। এখন আপনি ঘৃণা করেছেন। বুঝা গেল, আপনার প্রেম বাঁদীর প্রতি ছিল না, প্রেম ছিল এসব মলমূত্রের সঙ্গে। সতর্কতার সঙ্গে এসব মলমূত্র নিয়ে সংরক্ষণ করুন। এ হলো আপনার মাশুক, আপনার প্রিয়া।

'দেহের প্রতি আসক্তির পরিণাম লজ্জা ও অবমাননা।' আসল কথা হলো, রূপ-লাবণ্য ও দেহের প্রতি আসক্তির অর্থ হলো মলমূত্রের প্রেম। আর স্বভাব-চরিত্রের প্রতি আসক্তি হলো পবিত্র প্রেম। সর্বোত্তম বস্তু হলো উন্নত স্বভাব ও নৈতিকতা। আর এসবই তো কেবল মহব্বত ও ভালোবাসার যোগ্য।

শারীরিক সৌন্দর্য ফেতনা : নৈতিকতার সৌন্দর্য শান্তি

বাস্তবে পৃথিবীতে এমনটাই দেখা গেছে, শরীরের সৌন্দর্য ফেতনা সৃষ্টি করে এবং স্বভাবের সৌন্দর্য শান্তি পয়দা করে। সবচে' সুন্দর ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ অর্ধেক সৌন্দর্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে এবং অর্ধেক হযরত ইউসুফ (আ.)কে দান করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এত সুন্দর ছিলেন অথচ তাঁর উপর যত বিপদ এসেছে তা শারীরিক ও বাইরের রূপ-লাবণ্যের কারণেই। ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিল তাঁকে। মিশরের বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হল। দীর্ঘ নয় বছর কারাবাস করলেন। এসব মসিবত সৌন্দর্যের কারণেই হয়েছিল। কিন্তু যখন মিশরের শাসন ক্ষমতা লাভের সময় আসল, তখন স্বয়ং ইউসুফ (আ.) বললেন–

اجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ.

মিশর রাজ্য আমার হাতে দিয়ে দাও?

কিন্তু এ কারণে বলেননি– اِنِّىْ حَسِيْن جَمِيْل আমি অত্যন্ত সুন্দর রূপ-লাবণ্যের অধিকারী। তাই রাজ্য আমার হাতে ছেড়ে দাও। বরং এ কথা বলেছেন– اِنِّىْ حَفِيْظ عَلِيْم আমার হাতে রাজ্য ছেড়ে দাও। কারণ, আমি আলেম; আমি জানি কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। আমি আমার জ্ঞান ও গুণ দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করে দেখাব। আমি হাফেজ; অর্থাৎ দেশকে রক্ষা করার ও কন্ট্রোল করার ক্ষমতা আমার রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, যখনই বিপদ এসেছে, শোভা সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের কারণেই এসেছে। আর যখন রাজ্য লাভের সময় এলো, তখন জ্ঞান ও গুণ, সীরাত ও নৈতিকতা প্রকাশ করতে হল। প্রয়োজন দেখা দিল এ সবের, দেহের সৌন্দর্য বিপদে ফেলে, ফেতনা সৃষ্টি করে। আর নৈতিক উৎকর্ষ চারিত্রিক মাধুর্য শান্তি ও নিরাপত্তা পয়দা করে। আমি এ প্রসঙ্গে আরজ করেছিলাম– দরিদ্র পরিবারের নারীদের পুরুষদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম ও সবচে' বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তা হলো রান্না করা, ঘরের দেখাশুনা করা, সন্তানের লালন পালন করা। ব্যাস, তাদের দায়-দায়িত্ব শেষ। আর যদি বিত্তশালী পরিবারের কন্যা হয় তাহলে সন্তানের লালন পালন করবে না; সেটা করবে গৃহপরিচারিকা। রান্নাবান্নাও সেই করে দিবে। তাদের কাজ হলো ভাল পোশাক ও উন্নত অলংকার পরবে এবং প্রসাধনী ব্যবহার করবে। আর যদি স্বাধীনতা দেয়া হয় তাহলে পার্কে, বাজারে ঘুরে বেড়াবে। চিত্ত-বিনোদন করবে। এ কাজের ফলে

তাদের মূল্যবান জীবনের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। তারপর মেয়েরা, তোমাদের চরিত্র ও নৈতিকতা কেমন, তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন? স্বভাব চরিত্র কেমন? ইলম ও জ্ঞান আছে কি? পরকাল সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা আছে কি? কবরে হাশরে কি অবস্থা হবে? পরিণাম কি হবে? আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হবে। এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করছো কি? এসবের কোন আলোচনা নেই। ব্যাস, পানাহার করে নিলে, উন্নত পোশাক ও মূল্যবান অলংকার পরে নিলে দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল! আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রশ্ন করা হবে– তোমাকে বাদশাহ নিযুক্ত করা হয়েছিল; তা কি এজন্য করা হয়েছিল, তাদেরকে ভাল খাওয়াবে, ভাল পরাবে এবং আমার থেকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখবে। তোমাকে তো এজন্য বাদশাহ করা হয়েছিল, তুমি মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তাদেরকে পথ নির্দেশ করবে, আমার দিকে তাদেরকে পরিচালিত করবে। সে উদ্দেশ্যে তোমাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তুমি কাজ করনি। তাই এখন তুমি শাস্তির উপযুক্ত। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে দোষ নারীদের নয়, সম্পূর্ণ ত্রুটি পুরুষদের। কারণ তাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাদের তরবিয়তের প্রতি রয়েছে তোমাদের উদাসীনতা। কেবল তাদের মন রক্ষার্থে অনেক কিছু করেছ। তাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছ। পোশাক-পরিচ্ছদ, জেওর-অলংকার দান করেছ এবং এতেই নিজেদের দায়মুক্ত মনে করেছ। তাদের আত্মাকে সুন্দর কারার জন্য কোন চেষ্টাই করোনি। এ কারণে কেয়ামতের দিন তোমরা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না? তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না মনে করেছ; নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা হবে। জবাবদিহির জন্য এখন থেকে তৈরি থাক।

প্রাচুর্যে থেকেও নারীরা মুত্তাকী হতে পারেন

এতে ফল হবে এই, নারীর মহিলার কাছেই যখন কোন ইলম ও কামাল না থাকে বরং তা শূন্য থাকে, তখন সন্তানের মধ্যে ইলম ও জ্ঞান আসবে কোথা থেকে? সন্তানের জ্ঞান লাভ শুরু হয় মায়ের কোল থেকে। সেখানে যদি জাহালত ও মূর্খতা থাকে তাহলে সন্তানও মূর্খ হবে। মাতৃকালে যদি বাইরের সাজসজ্জাই থাকে, তাহলে সন্তানের মধ্যে সাজসজ্জার মোহ সৃষ্টি হবে। তার অন্তরে আত্মাকে সুন্দর করার আগ্রহ থাকবে না।

একটি ঘটনা স্মরণ হল। ঘটনাটি খুবই উপদেশপূর্ণ। তা হল– নারী যদি দীনদার হতে চায়, সন্তানকে দীনদার ধর্মপরায়ণ বানাতে চায় তাহলে আরাম

কেদারায় থেকেও ধর্মপরায়ণ হতে পারে। আর যদি বদদীন ধর্মহীন হতে চায়, তাহলে অভাব অনটনে থেকেও ধর্মহীন হতে পারে। ধার্মিক হওয়ার জন্য দরিদ্র ও ভিখারী হওয়ার কোন শর্ত নেই, আর কোটিপতি হলেই বদদীন হবে, তারও কোন যৌক্তিকতা নেই। এ ধারণা ভুল। ধার্মিক হতে চাইলে কোটিপতিও হতে পারে, আর যদি হতে না চায় তাহলে অনাহারী অর্ধাহারী ভিখারিও ধর্মহীন হতে পারে। এ বিষয়ের উপরই আমি ঘটনা বলছি।

কাবুলের বাদশাহদের মধ্যে আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও দীনদার বাদশাহ ছিলেন। আমীর আমানুল্লাহ খানের পিতা ছিলেন আমীর হাবিবুল্লাহ খান। হাবিবুল্লাহ খানের পিতা ছিলেন আমীর আবদুর রহমান খান এবং তাঁর পিতা ছিলেন আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান। ঐ সময় তাঁর শাসনামল ছিল । তাঁর যুগে অন্য এক বাদশাহ আফগানিস্তান আক্রমণ করল। সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল। আমীর সাহেব এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন। অন্য রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে স্বভাবত রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আক্রমণকারী বাদশাহ রাজ্য তছনছ করবে।

এই চিন্তা নিয়ে অন্দর মহলে আসলেন। বেগম সাহেবা পূর্ব থেকেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বেগমকে দেখে বললেন, আজ সংবাদ এসেছে, অন্য এক রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে। আমি শাহজাদাদের সৈন্য সামন্ত দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। সে শত্রুর মোকাবেলা করবে। বেগম বললেন, ঠিক আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। সারকথা, বাদশাহ শাহজাদাকে সৈন্য বাহিনী দিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য পাঠালেন। শত্রু যেন এ দেশ দখল করতে না পারে। তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। শাহজাদা সৈন্য বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন বাদশাহ অন্দর মহলে আসলেন। তার চেহারা বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বেগমকে বললেন, আজ অত্যন্ত ভয়ানক ও দুঃখজনক সংবাদ এসেছে। শাহজাদা পরাজয় বরণ করেছে, শত্রু দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। আমার ছেলে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসছে। আমার অন্তর খুবই ব্যথিত। দেশ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ছেলে পলায়ন করেছে।

বেগম বললেন, সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি মোটেও এ সংবাদকে বিশ্বাস করবেন না। বাদশাহ বললেন– মিথ্যা নয়। সরকারী সংবাদদাতারা এ সংবাদ দিয়েছে। সিআইডিও একই সংবাদ দিয়েছে। বেগম বললেন, আপনার সংবাদ মাধ্যমগুলো মিথ্যা; আপনার সিআইডিও মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে এবং মিথ্যা সংবাদ কখনো সত্য হতে পারে না।

এবার আমীর সাহেব বললেন, রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো যথারীতি সংবাদ দিয়েছে, আর বেগম রাজপ্রাসাদে বসে বলছে, সংবাদটি মিথ্যা। না না সংবাদটি সত্য, সঠিক সংবাদই এসেছে। বেগম বললেন, আপনার সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ এটা হতে পারে না।

আমীর সাহেব ভাবলেন, এ মহিলার সঙ্গে তর্কে কোন ফল হবে না। তার একই কথা, সংবাদ মিথ্যা অন্য কিছু মানবে না। অথচ কোন দলীল প্রমাণও নেই। আমি প্রমাণসহ বলছি, সরকারী সংবাদ সংস্থা যথারীতি সংবাদ দিয়েছে। তারা বলছে, সব মিথ্যা। তার সঙ্গে তর্ক করবে কে? যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ○

বলা হয়েছে, মহিলাদের বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে; যখন কোন তর্ক বেধে যায়, তখন তারা ঐ মুরগীর এক ঠ্যাং বলতে থাকে। কারণ তারা বাল্যকাল থেকে অলংকারের ঝনঝনানির মধ্যে বড় হয়েছে। বাল্যকাল থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা বেষ্টিত। তখন ইলম ও কামাল, গুণ ও জ্ঞান কোথায় স্থান পাবে? একটি জিনিসই স্থান লাভ করতে পারে। স্বর্ণ বা ইলম। মায়ের দুধ ছাড়ানোর পরই কান ছিদ্র করা হয় অলংকার ঝুলিয়ে রাখার জন্য। আরেকটু বড় হলে নাক ছিদ্র করা হয়, সোনার বালি পরতে। তারপর গলায় সোনার হার দিয়ে দেয়া হবে। হাতে স্বর্ণের হাতকড়া পরানো হবে। পায়ে সোনার বেড়ি লাগিয়ে দেয়া হবে। সারকথা, তারা সোনা-রূপায় আবদ্ধ।

সত্যিই নারীদের যদি বলা হয়, তোমাদের সারা অঙ্গে সোনার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ সে সম্মতি প্রকাশ করবে। তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দাও। তবে পেরেক সোনা-রূপার হতে হবে। সোনা-রূপার ভালোবাসায় তারা গ্রেফতার হয়েছে। শরীরে ছিদ্র করতে প্রস্তুত। কিন্তু সোনা-রূপা হওয়া চাই। কুরআন যে বলেছে, তারা সোনা-রূপার মধ্যে লালিত পালিত; তাই তাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি উদয় হয় না।

যখন স্বামীর সঙ্গে তর্ক হয় তখন প্রমাণ পেশ করবে, ঐ মুরগির এক ঠ্যাং; এমন হবে, এমন হবে না। আমীর সাহেব দেখলেন, আমি প্রমাণ পেশ করছি, সরকারী বার্তা সংস্থা খবর দিচ্ছে। কিন্তু সে বলেই যাচ্ছে– সব ভুল, সব মিথ্যা। এই মহিলার সঙ্গে কে তর্ক করবে? অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি।

দ্বিতীয় বার খুব আনন্দিত হয়ে মহলে প্রবেশ করলেন এবং বললেন– মোবারক হোক, তুমি যা বলেছিলে তাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ এই সংবাদ এসেছে, শাহজাদা বিজয়ী হয়েছে, শত্রুকে পরাজিত করেছে। বিজয়ের পতাকা নিয়ে

ফিরে আসছে।

বেগম বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমার কথা সত্য প্রমাণিত করেছেন। উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– তুমি এ সংবাদ জানলে কেমন করে? তুমি বলেছিলে, আমার সব সংবাদ মিথ্যা। সিআইডি, পুলিশ সবই মিথ্যা; তোমার ইলহাম হয়েছিল নাকি?ৎ

বললেন– ইলহামের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! প্রথমত আমি একজন মহিলা। তারপর রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী। ইলহাম হয় বুযুর্গানে দীনের? ইলহামের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আমি একজন সাধারণ নারী।

আমীর বললেন– তাহলে এত দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি বললে কেমন করে যে, সবই মিথ্যা। আর বাস্তবে হলোও তাই। সবই ভুল প্রমাণিত হল।

বেগম বললেন– একটা রহস্য আছে, যা আমি আজ পর্যন্ত কারো কাছে প্রকাশ করিনি এবং করতে চাইও না।

আমীর বললেন– রহস্যটি কি? এবার আমীর সাহেব পিছে লেগে গেলেন। এমন কি রহস্য থাকতে পারে যা স্বামীর কাছেও গোপন থাকবে।

সে এমন কথা যা আমি কাউকে বলতে চাই না।

اَلْاِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِىْ مَامُنِعَ.

প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, যে জিনিস নিষেধ করা হয়, বাধা দেয়া হয় সে জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। উদগ্রীব হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই কোন গোমর রয়েছে। যখন বাদশাহ অস্থির হয়ে পড়লেন, তখন বেগম বললেন– এ রহস্য আমি আজ পর্যন্ত গোপন রেখেছি। এখন বলছি। রহস্যটি হলো– আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শাহজাদা বিজয়ী অথবা নিহত হবে। পরাজিত হতে পারে না। শত্রুকে পিঠ দেখাতে পারে না। কী কারণে আমার এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল? কারণ হল– ছেলে যখন আমার গর্ভে ছিল, আমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলাম, সন্তান গর্ভে থাকার সময় সন্দেহজনক একটি গ্রাসও খাবো না। হালাল খাদ্যই আমি গ্রহণ করব। এজন্য যে অপবিত্র খাদ্য দ্বারা অপবিত্র রক্ত সৃষ্টি হবে এবং অপবিত্র রক্ত দ্বারা আখলাক ও চরিত্র অপবিত্র হবে। তাই আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, নয় মাস পর্যন্ত সন্দেহজনক খাবার খাবো না। হারাম লোকমা তো দূরের কথা, নির্ভেজাল হালাল খাদ্য গ্রহণ করেছি। এই ছিল আমার অঙ্গীকার। সর্বাবস্থায় এর উপর আমল করেছি।

দ্বিতীয় কাজ আমি এই করেছি– যখন ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো, তখন দুধ পান

করানোর জন্য হাজারো মহিলা ছিল। আমি তাদের দেইনি। নিজে দুধ পান করিয়েছি। দুধ পান করানোর এই নিয়ম ছিল– যখন সে কাঁদত, তখন আমি ওজু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে তারপর দুধ পান করাতাম এবং দোয়াও করতাম। সুতরাং একদিকে পবিত্র খাদ্য অন্যদিকে দোয়া ও আহাজারী। এককথায়, দুধ ছিল পাক-পবিত্র। এ থেকে সৃষ্ট রক্তও পাক-পবিত্র। আর পবিত্র রক্ত থেকে সৃষ্ট স্বভাব চরিত্রও পবিত্র। এজন্যে তার মধ্যে অসৎ চরিত্র আসতে পারবে না। পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও পলায়ন হলো কাপুরুষতা এবং নিকৃষ্ট স্বভাব। সাহস ও বীরত্ব হলো সৎ স্বভাব। তার রক্ত যেহেতু পাক পবিত্র সুতরাং তার মধ্যে কাপুরুষতা আসবে কেমন করে? এটা সম্ভব নয়। তবে এটা হতে পারে, সে নিহত হবে, শহীদ হয়ে যাবে। একথা ঠিক ছিল না যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কাপুরুষের মতো পালিয়ে আসবে। কারণ, যার রক্তে অপবিত্রতা নেই তার কাজে অপবিত্রতা আসবে কেমন করে, কোথা থেকে?

এই ছিল কারণ। ফলে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেছিলাম, একথা অসম্ভব যে সে পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে। যদি আপনি বলতেন সে শহীদ হয়েছে, তাহলে আমি বিশ্বাস করে নিতাম– সত্যিই সে নিহত হয়েছে। আমি এজন্যই দাবি করেছিলাম। আজ আমি আমার গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিলাম।

লক্ষ্য করুন! আমীর দোস্ত মোহাম্মদের স্ত্রী, এক বিশাল দেশের রানী। হাজারো দাস-দাসী সৈন্য-সামন্ত তার চারপাশে। রাজ-সিংহাসনে থেকে যখন এতটা পেরেছে, তখন আমাদের স্ত্রী-কন্যারা সাধারণ পরিবারে থেকে কেন মুত্তাকী হতে পারবে না? আমাদের কাছে এমন কি ধন-সম্পদ রয়েছে, আমরা যদি লাখোপতি, কোটিপতিও হয়ে যাই, তাহলে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশের মালিক তো হয়ে যাইনি। সপ্ত ভূখণ্ড ও সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাইনি। বাদশাহ হয়ে যাইনি। একজন বাদশাহর স্ত্রী যখন এতটা তাকওয়া ও পরহেযগারী দেখাতে সক্ষম হল, তখন আমার বোনেরা কেন দেখাতে পারবে না? আমাদের কন্যারা কেন পারবে না মুত্তাকী হতে। আমাদের কাছে তো এত বেশি ধন-সম্পদ নেই যে ধন-সম্পদের ঝামেলায় অবকাশ পাওয়া যায় না। অবসর যথেষ্ট রয়েছে। তাই আমি বলছিলাম, পুরুষ মহিলা যদি কোটিপতিও হয় তবু পরহেযগার ও মুত্তাকী হতে পারে। আর যদি দীনদার হতে না চায়, তাহলে অনাহার অর্ধাহারে থেকেও হতে পারবে না। ধর্মহীন থেকে যাবেন। এ হলো নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের ব্যাপার। অন্তরে এই আবেগ-উদ্দীপনা তখনই সৃষ্টি হবে, যদি আত্মার সঠিক তরবিয়ত করা হয়। সুশিক্ষা দেয়া হয়। আল্লাহর আযমত ও মহত্ত্বকে অন্তরে স্থান দেয়া হয়। হালাল মাল উপার্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। অবৈধ

নাজায়েয কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা পয়দা করা হয়। তখনই অন্তরে যোগ্যতা পয়দা হবে। তারপর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে নেককার হবে, সে নিজেই তাকওয়া ও পবিত্রতা অন্তরে নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

আসল কথা হলো, মা থেকে ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু মহিলাদের গঠন করার ভিত্তি পুরুষের হাতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ত্রুটি আমাদের আপনাদের, আমার বোনদের নয়।

জন্মের পর থেকেই সন্তান তরবিয়তের মুখাপেক্ষী

আমি আমার বোনদের খুশি করার জন্য এ কথা বলছি না। আজ মহিলাদের সভা। এজন্য এমন কথা বলে দিব, যেন তারা অসন্তুষ্ট না হয়। এমন কথা নয়; বরং বাস্তব ও প্রকৃত কথা হলো আমরা সঠিকভাবে তাদের তরবিয়ত করব। এ হলো আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য। চার পাঁচ বছরের মেয়ে কি জানে! আপনি যে পথে পরিচালিত করবেন, সে পথেই পরিচালিত হবে?

ইমাম গাযালী বলেন, সন্তান জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তরবিয়তের মুহতাজ, তরবিয়তের যোগ্য হয়ে যায়। আমরা মনে করি, যখন বয়স চার পাঁচ বছর হবে, তখন তার তালিম, তরবিয়তের দ্বারা শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দেব। বাস্তবে কিন্তু এমন নয়; বরং ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরবিয়তের সময় এসে যায়। এ কারণে যে, নয় মাসের বাচ্চার বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন জ্ঞান ও অনুভূতি থাকে না; কিন্তু তার সামনে কোন মন্দ কথা বলো না। তার সামনে কোন মন্দ রূপ ধারণ করো না– এই মনে করে যে তার কোন হুশ ও অনুভূতি নেই। কিন্তু তার হৃদয় সাদা কাগজের মতো। সাদা চোখ দিয়ে যে দৃশ্যই তার হৃদয়ে প্রবেশ করবে, তা তার হৃদয়ে আঁকা হয়ে যাবে। আপনি মন্দ কথা বলবেন, গালি দিবেন তা কান দিয়ে প্রবেশ করে অন্তরে আঁকা হয়ে যাবে। যখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি হবে তখন ঐসব মন্দ কথা বলবে, বকতে থাকবে। এক কথায়, তরবিয়ত জন্মগ্রহণ থেকে শুরু হয়ে যায়। আমরা কিন্তু এ খেয়াল করে বসে থাকি, এখন শিশু; তার কোন অনুভূতি নেই, যা ইচ্ছা সামনে করে ফেলি। মন্দ রূপ ধারণ করি। এ কথা ঠিক নয় যে, তার জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু এসব জিনিস তার চোখ ও কান দিয়ে প্রবেশ করে অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই ইমাম গাযালী লিখেছেন– দুধের শিশুর সামনে কথা সামলে বল, ভদ্রতা ও তাহযিবের সঙ্গে বল, মন্দ কথা বলো না। ঐ মন্দ কথা তার অন্তরে আঁকা হয়ে যাবে। যখন কোন ভাব-বুদ্ধি ধারণ করে, তখন মন্দ রূপ ধারণ করো না। ভাল

রূপ ধারণ করো। চোখের পথ দিয়ে ভাবমূর্তি তার অন্তরে প্রবেশ করবে। সুদৃঢ় ছাপ হয়ে থাকবে। এজন্য বলেছেন, তরবিয়ত পাঁচ বছর বয়সে নয়; বরং জন্ম থেকেই শুরু হয়ে যায়।

শিশুরা মা-বাবার অনুকরণকারী

অবস্থা এমন হবে, পিতামাতার মধ্যে যদি তাকওয়া তাহারত এবং পাক-পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তারা সর্বদা সতর্ক থাকেন। যত সতর্ক থাকবেন, যত পবিত্রতা গ্রহণ করে চলবেন, সন্তানের অন্তরে ততই পবিত্রতা সৃষ্টি হবে। এ কারণেই গ্রাম্য ছেলেরা গালি দিতে বেশি পটু থাকে। শহরের ছেলে সুসভ্য থাকে। গালিগালাজ জানে না। কারণ হলো, গ্রামের বাবা-মা গালাগালি দিয়ে থাকেন। তাই সন্তানের মধ্যেও এটা ক্রিয়া করে। শহরে কথাবার্তা ভদ্রতার সঙ্গে বলা হয়। এগুলোই সন্তান শুনে। তার অন্তরে বিদ্ধ হয়ে থাকে। এর প্রভাবে সেও ভাল কথা বলে।

তাই ইসলামী শারীয়ত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুটি ও দুধের ব্যবস্থা করেনি; বরং প্রথম ব্যবস্থা করেছে এই– তাকে গোসল করিয়ে পাক পবিত্র করে ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দাও। আযান দেয়া হয় এমন– যেন প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হল। প্রাচীরের কোন খবরও নেই কি বলা হল। এসব বাক্য নবজাতককে শুনানো হয়। সে যদিও বুঝে না, কিন্তু কানের পথ দিয়ে اشهد ان لا اله الا الله এবং الله اكبر তার অন্তরে পৌঁছে। অন্তরে তা আঁকা হয়ে যায়। যখন اشهد ان محمد رسول الله বলবেন, তখন তার অন্তরে রিসালাতের প্রতি ঈমান আঁকা হয়ে যাবে। যখন حى على الصلوة বলা হবে, তখন এ বাক্যও অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। নবজাতককে আযমত ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে ভরে দিলেন। আর বাম কানকে তাকবীর দিয়ে ভরে দিলেন। এতে করে আল্লাহ রাসুল এবং দীনের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তার অন্তরে বসে গেল।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এই আযান ও তাকবীরের নামায কোথায়? পরবর্তীতে জানাযার নামায যা আপনারা পড়বেন। এ হলো ঐ নামাযের আজান ও একামত যা দুনিয়াতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হল এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় নামায পড়া হবে। এটাই ছিল জানাযার আযান ও একামত। তা হলে মুমিন বাচ্চার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামের উপর হলো। আল্লাহু আকবর দ্বারা জীবনের শুরু হলো এবং আল্লাহু আকবর-এর উপর জীবন শেষও হলো।

জীবনের শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম সঙ্গে থাকল। খাতেমা বিল খায়ের হল। এর কারণ হল এই– সর্বপ্রথম যে বাক্য সন্তানের অন্তরে প্রবেশ করবে, তা হবে আল্লাহর নাম, গালিগালাজ ও মন্দ কথা নয়। এখন যদি আপনি ভাল তরবিয়ত করেন, গঠন করেন, তাহলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনি হৃদয়ে বীজ বপন করে রাখলেন। এখন যদি নামাযের জন্য বলেন তাহলে বীজ তো রয়েছে। এতে গাছে ফলমূল আসতে শুরু করবে। নেক আমল শুরু হয়ে যাবে। খোদা না করুন, যদি তরবিয়ত না করেন, তাহলে যে বীজ বপন করেছিলেন, তা ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

জমিতে আপনি বীজ বপন করেন। কিন্তু এতে যদি সেচ না দেন, আগের তাপ থেকে হেফাজত না করেন, তাহলে বীজ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই বীজ থেকে গাছের জন্মের আশাটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্য নবজাতকের জন্মের শুরুতেই তাওহিদ ও রিসালতের বীজ বপন করা হয়। তারপর পিতা-মাতার জন্য নির্দেশ রয়েছে– مروا صبيانكم اذا بلغوا سبعا বাচ্চাদেরকে নামাযের আদেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়ে যায়। واضربوهم اذا بلغوا عشرا আর যখন দশ বছর হয়ে যায় তখন প্রয়োজনে প্রহার করে হলেও নামায পড়াও। এ যেন চারা গাছে সেচ দেয়া। বীজ বপন করা হয়েছিল, এখন সেচ দেয়া শুরু হয়েছে। রোদ থেকে রক্ষা কর। যেন চারাটি বড় হয়ে ফলদায়ক গাছে পরিণত হতে পারে। এ হলো তরবিয়ত। ছেলে মেয়ে উভয়েই এ তরবিয়তের সমান অধিকারী। তাহলে ত্রুটি হল পিতা-মাতার, সন্তানের কোন ত্রুটি নেই। সন্তানের ত্রুটি তখন হবে যখন সে সাবালক হয়ে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান হবে। তখন শরীয়তের নির্দেশ তার প্রতিও এসে যাবে। সে ত্রুটি করবে তাকে ধরপাকড় করা হবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান না করার কারণে মাতা-পিতাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন তোমরা সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করোনি, কেন ভুল পথে পরিচালিত করেছিলে?

মহিলাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এজন্য প্রয়োজন নারীদের সঠিক শিক্ষা দীক্ষার সুবন্দোবস্ত করে দেয়া। যেমন আমাদের আগের যুগে এ প্রথা ছিল; বরং এখনও ছোট ছোট শহরগুলোতে রয়েছে। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় না; বরং শহরে সে সকল শিক্ষিত ও বয়স্ক মহিলা রয়েছেন তারা মহল্লার মেয়েদেরকে একটি ঘরে একত্রিত করে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক কাজকামও করেন।

কুরআনের তরজমাও পড়ছেন, মাসআলা মাসাইলও শিখছেন। বেহেশতি জেওর তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে। এসব ছিল পারিবারিক শিক্ষা। এসব ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন মেয়েরা স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। মোটকথা, কিছু না কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। যেমন- কোনো কোনো গাছ এমন থাকে, যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই যেতে পারে।

সারকথা, তাদের পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষা দেয়া উচিত। যেসব মহিলা কুরআন পড়েছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলা, উর্দু শিখেছেন অথবা মাসাইল জানেন কিংবা কোন কিতাব পড়েছেন– জীবনের শুরুতেই তাদের মাসাইল শেখা হয়ে যায়। এজন্য শরীয়তে ইসলামী ইলম অর্জনের দু'টি স্তর রেখেছে। এর স্তর প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই ওয়াজিব। এতে নর-নারীর কোনো ভেদাভেদ নেই। আরেক স্তর হলো ফরযে কেফায়া, যাতে একজন যদি অর্জন করে নেয় তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

যে অংশ প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব তা হলো, দীনের মূল ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি। এর দ্বারা তাদের আকিদা ও আখলাক বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন করা যাবে। মাতা-পিতা ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের কি হক ও অধিকার রয়েছে তা জানা যাবে। ইবাদত আখলাক সামাজিক রীতিনীতি আকাঈদ ও বিশ্বাস সব জরুরত পরিমাণ শিখতে হয়, শিক্ষা করা ওয়াজিব। পুরুষ হোক, মহিলা হোক সবার জন্যে এ আদেশ রয়েছে। আরেক হলো পূর্ণাঙ্গ আলেম হওয়া। এ কাজ প্রত্যেকের উপর ফরয নয়। এতে দুইশ'র মধ্যেও যদি দু'একজন আলেম হয়ে যায়, তাহলে সবার জন্য যথেষ্ট। আর একজনও যদি আলেম না হন, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

সারকথা, ফরযে কেফায়ার অবস্থা হলো, সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায় যদি এ দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, ত্যাগ করে, সমগ্র জাতিই গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি একজনও আলেম বানিয়ে দেয়া হয় তাহলে জাতির উপর হতে পাপ মোচন হয়ে যাবে। সুতরাং এক পর্যায় হল ফরযে আইন, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি গুনাহগার হবে, যে তা পালন না করবে। এই পরিমাণ ইলম হাসিল করা নর-নারী সবার উপর কর্তব্য বা ফরয, যে ইলম দ্বারা জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে ইসলাম কি এবং কাকে বলে, আমরা মুসলমান কেন? আমাদের উপর কি কি জিনিস ফরয। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? নারী-পুরুষ সবার জন্য এসব শিক্ষা ফরয। পুরুষ নিজে নিজের সন্তানদের শিখাবে অথবা পুরুষ একজন মহিলাকে শিক্ষা দিবে এবং ঐ মহিলা অন্যান্য মহিলাদের শিখাবে। ঘরে ঘরে গিয়ে অথবা কোন

এক স্থানে একত্রিত হয়ে বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের শিক্ষা দিবে। এর বেশি কিছুই করতে হবে না। সামান্য মনোযোগ দিলে সহজেই কাজ হয়ে যেতে পারে।

এখন পারিভাষিক অর্থে আলেম হওয়া তা সকলের জন্য দরকার নয়। মহিলাদের জন্যও না, পুরুষদের জন্যও না। সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনও যদি হয়ে যায়, বাইরে কোথাও গিয়ে ইলম শিক্ষা করে আসেন, হিন্দুস্থান গিয়ে পড়াশুনা করে আসেন, তাহলে সমগ্র জাতি গুনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। এখন ঐ আলেমের কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে স্বজাতির সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা। দীনি কাজকর্ম করা ও প্রয়োজনে তাদের সহায়তা ও পথ প্রদর্শন করা। তাদেরকে মাসআলা মাসাইল শিক্ষা দেয়া, ফতোয়া ফরায়েজ করে দেয়া, দীনি ব্যাপারে তাদের রাহনুমায়ী করা, তাদের অন্তরে যেসব খুঁটিনাটি প্রশ্ন দেখা দিবে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা। এসব হলো আলেমের দায়িত্ব।

উদ্দেশ্য, মহিলারাও ইলম ও আখলাক অর্জনে সে পরিমাণ অধিকারী যে পরিমাণ অধিকারী একজন পুরুষ। আমাদের জন্য যা দরকার তাদের জন্যও তা করা দরকার। তাদের দেখাশুনা করা, খোঁজখবর নেয়া আপনাদের দায়িত্ব। যদি আপনারা সে দায়িত্ব আদায় না করেন, তাহলে আপনাদের ধরপাকড় করা হবে, জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব স্মরণ বাড়িয়ে দেয়া ও দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলা। এ লক্ষ্যেই আমি এ কয়েকটি কথা আরজ করলাম। আর এ আয়াতও তেলাওয়াত করেছিলাম–

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِينَ ○

ফেরেশতারা যখন আসলেন এবং হযরত মরিয়ম (আ.)কে সম্বোধন করলেন। তিনি হলেন হযরত ঈসা (আ.)-এর শ্রদ্ধেয় মাতা, অতি পাক পবিত্র ও পরহেযগার মহিলা। [ইমরান : ৪২]

কোন কোন আলেম তাঁকে নবী বলেছেন। তাঁকে সম্বোধন করে ফেরেশতারা বললেন–

'হে মরিয়ম! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। তোমাকে পাক-পবিত্র ও নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র দান করেছেন। সমকালীন সকল নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ যখন তোমাকে এ নেয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তখন তোমার কাজ কি? يٰمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ

হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত গুজার আনুগত্যকারিণী দাসী হয়ে যাও। وَاسْجُدِى এবং সেজদা করো وَارْكَعِى مَعَ الرّٰكِعِيْنَ এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর। রুকুর অর্থ হলো নামায। যেখানেই রুকু শব্দ এসেছে সেখানেই নামাযের আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে শুধু রুকু অর্থ নয়; বরং নামাযই অর্থ হয়। অর্থাৎ নামায কায়েম কর, আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বকে নিজের অভ্যাসে পরিণত কর। এজন্য আমি এই আয়াত পাঠ করেছিলাম যে, হযরত মরিয়ম (আ.) কত নিষ্কলুষ পাক পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কতটুকু মর্যাদা দান করেছিলেন যে ফেরেশতারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। এ মর্যাদা ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে? এটা অতি সৌভাগ্যের কথা। এ সম্মান ও মর্যাদা একজন মহিলা হযরত মরিয়ম (আ.) লাভ করলেন। আমাদের মেয়ে ও বোনেরা কেন এ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না? যদি তারা ঐ সকল কাজ করেন, যা হযরত মরিয়ম (আ.) করেছিলেন।

কথা হল, তাঁর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলো তাঁরই জন্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেসব কামাল ও গুণাবলী তাঁকে দান করেছিলেন, এ সবের দরোজা কারো জন্য বন্ধ করেননি। মরিয়ম (আ.) যদি কামেল ওলী হতে পারেন, তাহলে আমাদের নারীরা কেন তা হতে পারেন না। নবুওয়তের দরজা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কেউ নবী হতে পারবেন না। একই নবুওয়ত কেয়ামত পর্যায়ের জন্য যথেষ্ট। এ নবুওয়তের তুফায়েলে শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিস, ইমাম, মুজতাহিদ, আওলিয়া এবং মুজাদ্দিদ সৃষ্টি হতে থাকবেন। ঐ নবুওয়তের ফয়েজ ও বরকত কেয়ামত পর্যন্ত কাজ করতে থাকবে।

এত পূর্ণাঙ্গ নবুওয়ত যে এ নবুওয়তকে শেষ করে দিয়ে অন্য কোন নবুওয়তের প্রয়োজন হবে না। নবুওয়তের যত স্তর ও মর্যাদা ছিল সবই এই নবুওয়তের উপর নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন নবুওয়তের কোন স্তর অবশিষ্ট নেই। তাই কোন নবী প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিবে না এবং তাঁর উপর নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

একই মহান সত্তার উপর সকল স্তর ও মর্যাদার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ ঐ মহান সত্তা যার আলো ও জ্যোতি কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে আলোদান করতে থাকবে। আলোকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হাজারো লাখো আয়না সৃষ্টি করবেন। আয়না সূর্যের মুখোমুখি থাকবে এবং আয়নার প্রতিচ্ছবি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঢেলে দেয়া হবে। অন্ধকার প্রকোষ্ঠও আলোকময় হয়ে যাবে।

নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সত্য কিন্তু বেলায়তের দরজা বন্ধ হয়নি। কাজেই ঐ নবুওয়তের অধীন থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা যা একজন পুরুষ লাভ করতে পারে, একজন নারীও তা করতে পারেন। নারীরা নিরাশ হবেন না। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ইলম ও জ্ঞান কেবল পুরুষদের জন্য। আমরা কেবল ঘরে বসে থাকব। ঘরে বসেই সব কিছু হাসিল করা যায়। যদি পরিশ্রম করা হয়, প্রচেষ্টা চালানো হয়। এজন্যই আমি এই আয়াত পাঠ করেছিলাম এবং কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করলাম।

আল্লাহ করুন, আমাদের অন্তর যেন তা কবুল করে নেয়। আমাদের অন্তর এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রত্যেকের হক ও অধিকারকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হই। আমাদেরকে যদি দায়িত্বশীল বানানো হয়ে থাকে তাহলে যেন অধীনস্থদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন, আমিন, আমিন!

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْلَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ غَيْرَ جَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا ○ لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَىَ الرِّجَالِ
فَلاَ التَّانِيْثُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عَيْب ○ وَلاَ التَّذْكِيْرُ فَخْر لِلْهِلاَلِ

বয়ান : ১৩

ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিক রূপায়ণ

মানুষের চিন্তাশক্তিই মানুষের প্রকৃত কর্মশক্তি এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ সকল শক্তির নেতৃত্বের অধিকারী এ শক্তি। এ শক্তির কারণেই মানুষ বিশ্বে কর্মতৎপর। সকল জীবের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করা হয়। তারপর মানুষ এ নয় যে, সে এ শক্তির পাত্র বরং বিশেষ পাত্র। যে পাত্রে বিবেক-বিবেচনা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মতো শক্তিগুলোর মত চিন্তাও একটি শক্তি।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ ঈ. । ড. ফকির হোসাইন ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ জামেয়া মিল্লিয়া (ইসলামী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) দিল্লির এক অসধারাণ ও বিশাল সভায় অংশ গ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিল । সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল– 'আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন' । সভায় দেশের সকল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং প্রায় সকল মতের জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন । সভায় রাষ্ট্রপ্রতি ফখরুদ্দীন আলী আহমদের অংশ গ্রহণে গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল । আমি অধমকে সভার সভাপতি নির্বাচন করা হয় । রাষ্ট্রপতি মাত্র এক ঘণ্টার সময় দিয়েছিলেন । তাই প্রথম অধিবেশনের সকল কার্যক্রম এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা জরুরী ছিল । প্রথমে ইউনির্ভাসিটির

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মাসউদ হুসাইন আগত সুধীদের খোশ আহমেদ জানালেন। তারপর শ্রদ্ধেয় জিয়াউল হাসান ফারুকী, প্রিন্সিপাল জামেয়া কলেজ ও ডাইরেক্টর জাকের হোসাইন ইনিস্টিটিইট– সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করলেন।

সভাপতি ও রাষ্ট্রপতির জন্য পনের মিনিট করে সময় দেয়া হয়েছিল। অধম প্রথমে নিজের বক্তৃতার মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করলাম। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচ্য বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোকপাত করা সম্ভব ছিল না। এজন্য কক্তৃতায় কয়েকটি মৌলিক নীতির উপরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হল। তবে সভার সমাপ্তি অধিবেশনে উদ্যোক্তাদের সামনে যখন এ আলোচনা আসল, তখন জামেয়া কর্তৃপক্ষ মৌলিক নীতিগুলো সবিস্তারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সেখানে অবশিষ্ট অংশও লেখা থাকবে। সেজন্য এ প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে ঐ সকল মৌলিক বিষয়ও লেখা হয়েছে যেগুলো সভায় মৌলিকভাবে আরজ করা হয়েছিল। আর যেগুলো বয়ান করা হয়নি, তাও লেখা হয়েছে। হতে পারে তারতিব ও বিন্যাসে আগ পাছ হয়ে থাকবে, কিন্তু বিষয় সবই এসে গেছে।

ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকায়নের বিষয়টি অসাধারণ গুরুত্বের দাবি রাখে। এজন্য মুনাসেব মনে হয় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক নীতি পেশ করা। আধুনিক চিন্তাবিগণ যেন এ নীতিগুলোর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী এ কাজ খুবই জরুরী।

মানব জীবনে চিন্তা-গবেষণার গুরুত্ব

সবার আগে ভূমিকাস্বরূপ একথা আরজ করে দেয়া প্রয়োজন যে, মানব জীবনে চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ এক মূলনীতি আছে। মানুষের অন্যান্য সব তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক শক্তিগুলো এ নীতির অধীনে এসে যায় এবং সব কিছুই এ মূল শক্তির অধীন। চিন্তাশক্তি ছাড়া কেউ এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। পঞ্চইন্দ্রিয় হোক অথবা বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি হোক অথবা দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা হোক অথবা কিয়াস; এ সকল শক্তির পরিচালক হল চিন্তাশক্তি। আবার চিন্তা কেবল একটি শক্তিই নয়; বরং এটা মানবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। এর মাধ্যমে মানুষ তার মানবতার পরিচয় লাভ করে। কেননা এ শক্তি অন্যান্য জীবের মধ্যে দেয়া হয়নি। এজন্য মানুষের চিন্তা শক্তিকে যদি মানব প্রকৃতির মূল পরিচালক বলা হয় তবে তা অত্যুক্তি হবে না।

মানুষের প্রধান পরিচয় হল সে হায়ওয়ান নাতিক বা হায়ওয়ানে আকীল বা বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু যদি চিন্তা করা হয় তবে বুঝা যায়, এ দ্বারা মানুষের সঠিক এবং পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এ কারণে এটাকে মানুষের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা অথবা ব্যাপক সংজ্ঞা মনে করা যেতে পারে না। কারণ, বুদ্ধির কিছু না কিছু অংশ মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। একটি কুকুরের জন্য যদি কোন এক স্থানে এক টুকরা মাংস নিক্ষেপ করা হয় তবে দ্বিতীয় দিনও কুকুরটি এই স্থানে এসে উপস্থিত হবে। সে যেন কিয়াস করে নিল, আজ যখন এখানে মাংসের টুকরা পেয়েছি অতএব আগামীকালও পাওয়া যেতে পারে। তাই ঐ স্থানে এসে হাজির হয়। সকল সমস্যার সমাধান কল্পে সুগরা ও কুবরাকে দুটি জিনিস মিলিয়ে ফল বের করা কিয়াসে আকলী বলা হয়। এর জন্য কোন শব্দ ও বর্ণনা নাই। কিন্তু কথাটি বাস্তব। আমাদের পরিভাষায় কোন কোন জীব-জন্তুকে চালাক বলা হয়। যেমন- শিয়াল। আর মহিষ ও গাধাকে সাধারণভাবে বোকা বলা হয়। শেষ সাদী সিরাজী বলেছেন–

مسکین خر اگرچہ بہے غیر زالت ☆ وں پار ہمی برد عزز است

অসহায় গর্দভ যদিও বোকা, বুদ্ধিহীন কিন্তু যেহেতু বোঝা বহন করে, তাই সে প্রিয়ও বটে।

অন্য একজন কবি মহিষ সম্পর্কে বলেছেন–

جاموس بے وقوف وبے ہوس ☆ چوں شیر دہر تو چشم از وپوش

মহিষ যদিও বুদ্ধিহীন বোকা কিন্তু যেহেতু দুধ দান করে, তাই তার দোষ-ত্রুটি হতে চোখ বন্ধ করে রাখ।

এসব প্রাণীর মধ্যে যদিও বুদ্ধি নেই– যদি থাকত, তবে তাদের মধ্যে প্রকারভেদ করা উচিত হত না। যা সাধারণ পরিভাষায় বহুল প্রচলিত। এমতাবস্থায় বুদ্ধিকে মানুষের একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য বলে মানুষের পূর্ণ পরিচয় দান ও পূর্ণ সংজ্ঞা বলা কোন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হয় না। অবশ্য মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে মৌলিক বস্তুকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য করা, নতুন নতুন অজানা বিষয় আবিষ্কার করার মাধ্যমে আংশিক বিষয়াদি জেনে নেয়া, অথবা আংশিক বিষয়াদি দ্বারা মৌলিক বিষয়ের অনুসন্ধান লাভ করা। মৌলিক বস্তু হতে আনুসঙ্গিক বিষয়াদি জেনে নেয়া, এসবের পরিণতি ও ফলাফল নির্ণয় করা, ইহকাল ও পরকালকে সামনে রেখে জীবনসমূহের শ্রেণীভেদ করে সকলের কর্মসীমা নির্ধারণ করা, সুশৃংখল সমাজ

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে মানব বৈশিষ্ট্য। আর এসব হল মানুষের চিন্তা ও গবেষণার ফলাফল। এজন্য মানব প্রকৃতির ব্যাপকতার সংজ্ঞা যদি দিতে হয় তবে মানুষকে হাওয়ানে নাতিক না বলে হায়ওয়ানে মুতাফাক্কির বলতে হবে। কেননা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা এবং সব বিষয়ে সকলে চিন্তা-গবেষণা করা মানব জাতিরই বিশেষত্ব। অন্যান্য প্রাণীর তা নেই। এজন্য চিন্তাশীল প্রাণীই মানব প্রকৃতির সঠিক সংজ্ঞা হতে পারে। এ সংজ্ঞাই বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

মানুষের চিন্তাশক্তিই মানুষের প্রকৃত কর্মশক্তি এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ সকল শক্তির নেতৃত্বের অধিকারী এ শক্তি। এ শক্তির কারণেই মানুষ বিশ্বে কর্মতৎপর। সকল জীবের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করা হয়। তারপর মানুষ এ নয় যে, সে এ শক্তির পাত্র বরং বিশেষ পাত্র। যে পাত্রে বিবেক-বিবেচনা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মতো শক্তিগুলোর মত চিন্তাও একটি শক্তি। অন্যান্য শক্তির মতো এ শক্তিও তার পরিধির মধ্যে কর্মতৎপরতা চালায়। বরং চিন্তাশক্তি ঐ সকল অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নেতৃত্ব করে, যেন ঐসব শক্তির প্রাণ এর মধ্যেই নিহিত। এ শক্তির ইশারা ইঙ্গিতেই সকল শক্তি কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। কোথায়ও যদি নাচ গান বাজনা, আমোদ-ফূর্তি প্রদর্শন হতে থাকে, আর পথিক অন্যমনস্ক থাকে, অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকে তবে এসব কিছুই তার নজরে পড়ে না। তার চোখ দেখবে না, কান শুনবে না। তার অজ্ঞানতার উপর মানুষ যখন বিস্ময় প্রকাশ করবে, তখন সে বলবে, 'আমি অমুক বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম। তাই এসব দৃশ্য, এসব স্তর ও আওয়াজ কিছুই অনুভব করতে পারিনি।' এ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, চোখের কাজ নিজেরা দেখতেও পায় না; বরং ধারণা ও চিন্তাশক্তি দেখায়। চোখের দেখা ও কানের শোনা হল চিন্তা শক্তির যন্ত্র বা উপকরণ বিশেষ। এর বেশি কিছু নয়।

বৃদ্ধি ও দূরদৃষ্টিরও একই অবস্থা। মানুষ যতই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হোক, যখন কোন বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তখন অন্য কোন দর্শনীয় জিনিস তার সামনে পেশ করা হোক, সে তা লক্ষ করবে না, অনুভবও করতে পারবে না। যেহেতু তার চিন্তাশক্তি অন্য ধ্যানে মগ্ন রয়েছে, ব্যস্ত রয়েছে। চিন্তাশক্তির এ সুযোগ নেই, অবসর নেই যে অন্য দর্শনীয় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করবে। এভাবে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কৈফিয়তসমূহও চিন্তাশক্তি ছাড়া বাস্তবরূপ লাভে সক্ষম হবে না। যদি অদৃশ্য জগতের দিকে চিন্তাশক্তি আকৃষ্ট না হয় অথবা অন্য কোন অবস্থায় মগ্ন থকে, তবে অন্যান্য হালত ও কৈফিয়ত আত্মার মধ্যে প্রকাশ লাভ করতে পারবে না। মুরাকাবা ও ধ্যানের মধ্যে চিন্তা শক্তিকেই

ব্যবহার করতে হয়। এহসান ও তাসাওউফের অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালাকে এভাবে হাজির নাজির সবখানে বিরাজমান ধারণা করবে। ইবাদত আদায়ে ব্যস্ত হবে যেন বান্দা আল্লাহকে দেখছে। এ চিন্তাশক্তির ব্যবহার নয় তো কি হতে পারে?

মানবীয় চিন্তাশক্তির কর্মদক্ষতা

মোটকথা, এ হলো এক বাস্তব হাকিকত। মানুষের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের মধ্যে একমাত্র চিন্তাশক্তিই কার্যকর রয়েছে। এ শক্তি যদি কার্যকরী না থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্বাদ গ্রহণ শক্তি, স্পর্শশক্তি, কর্মশক্তি সবই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। চিন্তাশক্তি যখন বস্তুর দিকে নিপতিত হয় তখন পঞ্চইন্দ্রিয় নিজ নিজ কাজের দিকে তার নির্দেশানুযায়ী তৎপর হয়ে উঠে। যখন চিন্তাশক্তি বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত কাজের দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন বুদ্ধি একজন সেবকের মতো তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। এই চিন্তাশক্তি যখন অদৃশ্য জগতের দিকে ধাবিত হয় তখন অনুভূতিশক্তি তার ইশারা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে।

তাই চিন্তাশক্তি কেবল মানব জাতির বৈশিষ্ট্যই নয়। এটা মৌল প্রকৃতির শিরোনাম; বরং তার সকল অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রাণ ও তাদের জন্য নেতা ও কর্মবার্তাও বটে। পবিত্র কুরআন এ বাস্তব কথাকে তার অলৌকিক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। যেসব জাতি চোখের দৃষ্টিশক্তি, কানের শ্রবণশক্তি ইত্যাদি দ্বারা নবীগণ (আ.) যে সকল ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির মুজেযা অবলোকন করতেন, তাদের পবিত্র কথাবার্তা শুনতেন, তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির নামও উচ্চারণ করতেন না। তাই পবিত্র কুরআন এর অন্তরের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিকে দায়ী করেছে, যা আসলে এ চিন্তাশক্তির ত্রুটি। ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

কথা হলো, তাদের চোখ অন্ধ নয়; বরং তাদের বুকে আত্মাই অন্ধ। সে আত্মা চিন্তা ও গবেষণাশূন্য। এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রধান কর্মকর্তা হলো আত্মার চিন্তা ও গবেষণা। চামরার চোখ নয়। চিন্তার দৃষ্টি যদি না থাকে তাহলে সকল ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়। যদিও স্বাভাবিকভাবে বাহ্যিক দেখাশুনার কাজ চলতে থাকে। এজন্য পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারীদের বাহ্যিক শ্রবণ ও দর্শনকারীদেরকে মেনে নিয়ে তার প্রকৃত কাজকর্মকে অস্বীকার করেছে। তাই এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তব রূপ লাভ করছে না, যার সম্পর্ক ছিল চিন্তাশক্তির উপর। এ কারণে যে, এই চিন্তা ও প্রেরণাই বাইরের বস্তুসমূহের

মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ ○ وَمِنهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ○

আর আপনি তাদের ঈমান গ্রহণের আশা ছেড়ে দিন। কেননা তাদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন যারা বাহ্যত আপনার কথার দিকে কান লাগিয়ে রাখেন। কিন্তু আপনি কি বধিরদেরকে শুনাতে পারবেন? তারা মেনে নিবে বলে অপেক্ষা করছেন? অথচ যারা বাহ্যত আপনাকে দেখেছে। তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাতে চান, যাদের দৃষ্টিশক্তি নেই? [ইউনুস : ৪২-৪৩]

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, শুনেও না শুনা, দেখেও না দেখার ভান করা চিন্তাশক্তি অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। কুরআন আকল ও ইসবার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। শ্রবণকারী ও দর্শকের মধ্যে এসব মৌলিক অনুভূতি না থাকলে তার চিন্তাশক্তির সম্পর্ক চিন্তা-ভাবনার সাথে থাকে না। তবে প্রকৃতপক্ষে তার জন্য শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তু অদৃশ্য ও অশ্রুতই থাকে। পবিত্র কুরআন সত্যের অস্বীকারকারীদের অবস্থা অন্যখানে এভাবে বর্ণনা করেছে– তারা নবীদের কথাবার্তা কাজকর্ম শুনতো ও দেখতো। বাহ্যিকভাবে তাদের শ্রবণ ও দর্শনশক্তি ছিল। কিন্তু তাদের অন্তরে চিন্তা ছিল না অথবা এই শক্তি দুটি কাজে লাগাতে পারত না। তাই তাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে পশুদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকেও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। তাদের চিন্তা ও অনুভূতি ঐ পর্যায়ে ছিল না, যা দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে দেখতে ও শুনতে পারত। একেই কুরআন 'ফেকাহ কলবী'– আত্মার বুদ্ধি বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـٰئِكَ كَالأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْغَـٰفِلُونَ○

তাদের অন্তর এমন যে, তারা কিছুই বুঝে না। তাদের চোখ এমন যে তারা দেখতে পায় না। তাদের কান এমন যে, কিছুই শুনতে পায় না– এমন মানুষ চারপায়া জন্তুর মত; বরং

এদের চেয়েও অধম। এরাই হল চরম উদাসীন। [আরাফ : ১৭৯]

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, আত্মার স্বাভাবিক অনুভূতিই মৌল জিনিস নয়। এ তো জীবজন্তুর মধ্যেও রয়েছে; বরং জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধিই হল মূল বস্তু, যার অপর নাম চিন্তাশক্তি। এ শক্তি যদি না থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়াদি কোন কাজই করবে না। যদি করে তবে তা গ্রহণীয় হবে না। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, আত্মার আলো ও জ্যোতিই মূল বস্তু যার অপর নাম চিন্তাশক্তি। প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অনুভূতি তো চারপায়া জন্তুদের মধ্যেও রয়েছে।

বিবেকের কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সঠিক মাপকাঠি

এভাবে বিবেক-বৃদ্ধি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে, বিবেক-বুদ্ধির কার্যকারিতা গ্রহণীয় হওয়ার মাপমাঠি চিন্তা শক্তিই। এ ব্যাপারে শুধু বুদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ স্বভাবজাত বিবেক-বুদ্ধির চিন্তা-ভাবনা যদি আত্মার চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি না হয় তাহলে বিবেকের অনুভূতিও গুরুত্বহীন ও অগ্রহণীয় হয়ে পড়ে। তাই এমন চিন্তা-ভাবনাহীন রয়েছে। কুরআন একে আকেল না বলে গাফেল বলেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنْ ءايَـٰتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ○

আর আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এ-ও রয়েছে, তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখাই, যার দ্বারা ভয় ও আশা উভয়ই হয়। তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং ঐ পানি দিয়ে মৃত ভূমি সজীব করে দেন। এসবের মধ্যে কুদরতের নিদর্শন রয়েছে ঐ সকল মানুষের জন্য যাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে। [রূম : ২৪]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো, বিদ্যুৎ, তাপ, বাষ্প, বৃষ্টি দ্বারা মৃত মাটিকে সজীব করা হয় এবং এসব চামরার চোখে দেখা যায়, সবাই দেখে, পশুপাখিও দেখে। এসবের সঙ্গে পার্থিব জীবনে ভয়-ভীতি ও আশার সম্পর্ক থাকে। কিন্তু বলা হলো, এসব ঘটনা প্রবাহে কুদরতের নিদর্শন লুকিয়ে আছে। আর এসবের পরিচয় দান করাই উদ্দেশ্য– যা কেবল বিবেক পরিচালনাকারীদের জন্য

প্রযোজ্য। চামরার চোখে যারা দেখেন তাদের জন্য নয়। আর বুদ্ধিকে পরিচালনা করার অর্থই হলো চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করা। এ শক্তিই বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে রাখে। চিন্তা ও ভাবনাহীন বুদ্ধির কার্যক্রমে কোন শুভ ফল লাভ হয় না। সারকথা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি হোক অথবা বিবেক-বুদ্ধি হোক, চিন্তা-ভাবনাহীন অবস্থায় সবাই অন্ধ। এ বর্ণনা দ্বারা চিন্তা ও গবেষণা শক্তির উচ্চ মর্যাদা সহজেই বোধগম্য হয়।

কুরআনে মানব-জাতিকে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান

এ কারণে পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানব সমাজকে চিন্তা ও গবেষণার জন্য আহ্বান করেছে। কোথাও এ চিন্তা ও গবেষণার জন্য মানুষের অভ্যন্তরীণ নিদর্শনসমূহ কোথাও এ ইলমী ও শরয়ী নিদর্শনাবলী পেশ করেছে। কোথায়ও আবার অনুভূতি ও ঐশীশক্তির প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার জন্য দাবি তুলেছে। অভ্যন্তরীণ নিদর্শনসমূহের দিকে রাহনুমায়ী করার জন্য বলা হয়েছে

وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

স্বয়ং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পরিচিতি লাভের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? কুরআনও জাগতিক প্রমাণাদি পেশ করেছে। যেমন–

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السَّمَـٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ.

> তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে না? [আরাফ : ১৮৪]

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে প্রমাণাদি একত্র করে বলা হয়েছে–

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ○

> আমি খুব শিগগিরই তাদেরকে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন দিগন্তে দেখাব এবং তাদের নিজ সত্তায়ও দেখাব। তাহলে তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে যে, কুরআনই সত্য ও হক। [হা-মীম সিজদা : ৫৩]

কোথায়ও শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনকে পেশ করে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য বলা হয়েছে–

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـٰفاً كَثِيراًO

তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে না? যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো, তাহলে এতে সীমাহীন পরস্পরবিরোধী বিষয়াদি বিদ্যমান থাকত। [নিসা : ৮২]

কোথায়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন, তাঁর জীবনের নিষ্কলুষ কাজকর্ম এবং তাঁর সীরাত উন্নত চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। যেন তাঁর পবিত্র সীরাত, উন্নত নৈতিকতা ও মহানুভবতা দেখে তার দাওয়াতের সত্যতা সকলের অন্তরে এসে যায় এবং মানবজাতি তার অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়। বলা হয়েছে–

قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَـٰحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍO

হে নবী! আপনি বলে দিন আমি তোমাদেরকে মাত্র একটি কথারই উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা দু'জন অথবা একজন একজন করে প্রস্তুত হও। এরপর চিন্তা ও গবেষণা কর যে, প্রকৃতই তোমাদের এ সহচরের মধ্যে পাগলামী রয়েছে কিনা। তিনি তো এ ছাড়া অন্য কিছু নন, যে তোমাদেরকে পরকালের কঠিন আযাব হতে সতর্ক করছেন। [সাবা : ৪৬]

–যে আযাব তোমাদের উপর আসবে। অনুভূত বিষয়টি সম্পর্কে একই নীতি। অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি যা প্রকাশ পায়, তাতেও আমার চিন্তা-গবেষণা কাজ করে থাকে। যে চিন্তাকে 'লুব' নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং ঐ চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত ইলম ও মারেফতকে হেকমত বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ

الألباب ○

যাকে হেকমত দান করা হয়েছে তাকে বেশি কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং ঐ সকল মানুষই সৎ উপদেশ গ্রহণ করেন যারা গভীর বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। [বাকারা : ২৬৯]

সারকথা, বিবেক-বুদ্ধি হল স্বভাবজাত একটি শক্তি। দেখার শক্তি, শোনার শক্তি– এসব হলো বুদ্ধির বাইরের (ইন্দ্রিয়জাত) শক্তি এবং অনুভূতির মূল। এর দ্বারা সর্বাধিক মৌলিক বিষয়গুলো অনুধাবন করা যায়। কিন্তু 'লুব' হল বিবেক-বুদ্ধির মূল প্রকৃতি। যার দ্বারা শরীয়তের এবং সৃষ্টিজগতের মূল হাকিকত প্রকাশ পায়। এরই নাম যিকির। এটা এক হেকমত যাকে 'খায়রে কাছির' বলা হয়েছে। এটা স্বভাবজাত বাহ্যিক বুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় না। বরং আকলে ইরকানী দ্বারা লাভ হয়। আর এটাকেই লুব বলা হয়েছে। সারকথা, পবিত্র কুরআন চিন্তাশক্তিকে মানুষের মূলশক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছে। এ শক্তির কার্যোপকরণ স্বয়ং মানুষ ও সৃষ্টিজগত। শরীয়ত প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত ও কালামতের এবং আল্লাহর মারেফতের বিষয়সমূহ সাব্যস্ত করে দিয়েছে; আর বিভিন্ন আয়াতে এ কাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সাফ কথা, চিন্তা ও গবেষণা চোখ ও কানের কাজ নয়; বরং এ হলো চিন্তাশীল আত্মার কাজ। চিন্তাশক্তি এসব ইন্দ্রিয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তখন তার নির্দেশানুসারে ইন্দ্রিয়গুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং চিন্তাশক্তি মূল শক্তিগুলো আয়ত্ব করে এসবের মাধ্যমে আল্লাহর মারেফত হাসিল করতে সক্ষম হয়।

মোটকথা, চিন্তাশক্তিই মানব জাতির বিশেষত্ব। চিন্তা মানব সমাজকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। চিন্তার মাধ্যমেই ইলম ও মারেফতের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এটাই মানুষের বাহ্যিক ও গোপন শক্তিসমূহের নেতা ও রাহবর। যদি চিন্তা ও গবেষণা ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য না হত, তাহলে ইজতেহাদের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত এবং শরীয়তের আংশিক বিধানগুলো উম্মতের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যেত। তবে এ কথা ভিন্ন যে, ইজতেহাদের কোন দরজা খোলা রয়েছে এবং কোন দরজা বন্ধ রয়েছে। তবে ইজতেহাদ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এ দরজা উম্মতের জন্য সবসময় খোলা থাকবে। কাজেই জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া যদি জ্ঞানীদেরকে এ মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বিশ্বের পরিবর্তনশীল অবস্থায় ইসলামী জীবন বিধানের সংস্কার ও নবায়নের জন্য আহ্বান করে, আর জ্ঞানীদেরকে আল্লাহর ও মানবীয় মৌলিক বস্তুগুলোকে

পরিমার্জন করার জন্য দাওয়াত দিয়ে থাকে, তাহলে সে কেবল একটি বড় সমস্যার সমাধানের গুরুদায়িত্ব নিজো কাঁধে উঠায়নি; বরং জামেয়ার অতীত ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেহেতু এ জামেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব। উদ্দেশ্য ছিল, নতুন পুরাতন শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে বিভিন্নমুখী প্রতিভা একত্রিত করে উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একই রাস্তায় চিন্তা-গবেষণা করে জাতির এ দ্বিমুখী নীতিকে নিঃশেষ করে দেয়া এবং আকাঈদ ও বিশ্বাস, চিন্তা ও ভাবনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবক্ষেত্রে এ বহুরূপ ধারণে সহায়তা করা। অতএব নিঃসন্দেহে জামেয়ার ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, এ চিন্তার ভিত্তি কোন ধরনের ইলম ও জ্ঞানের উপর রাখা হবে? যার মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয় এসে যাবে, যেগুলোর জন্য পবিত্র কুরআন দাওয়াত দিয়েছে। সবই ঐ বিষয় কেন্দ্রবিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে যা কাজ ব্যাপকতর না হয়ে বরং ঐ কেন্দ্রবিন্দুতে সংকুচিত হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে বলা যায়, চিন্তা-গবেষণাই মানুষের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চিন্তা-গবেষণা দ্বারাই ইলম ও মারেফতের দ্বার উন্মুক্ত হয়। চিন্তাশক্তিই মানুষের জাহেরি ও বাতেনি শক্তিসমূহের নেতা ও কর্ণধার। যদি চিন্তাশক্তির প্রতি গুরুত্ব ইসলাম ধর্মে আরোপিত না হত তাহলে ইজতেহাদের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত এবং শরীয়তের আংশিক ও আনুসঙ্গিক বিষয়গুলো উম্মতের সামনে প্রকাশ পেতো না। কি ধরনের ইজতেহাদের দরজা খোলা রয়েছে এবং কি ধরনের ইজতেহাদের দরজা শেষ হয়ে গেছে সে আলোচনা ভিন্ন। তবে ইজতেহাদের দরজা উম্মতের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং সব সময় থাকবে। তাই জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া এ মূলনীতির প্রতি ভারতের বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী বিধান নবায়ণের আহ্বান করেছেন এবং উলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে আল্লাহর ও মানবীয় হকের রূপরেখা নবায়ন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এ কেবল একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহ্বানই নয়; বরং জামেয়ার অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও বটে। কেননা জামেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (রহ.); যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো, পুরনো ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে বিভিন্নমুখী প্রতিভাগুলোকে এক কেন্দ্রে সমবেত করা। তাহলে সম্মিলিত চিন্তাধারার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায় তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও জাতিকে একই আকিদা বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত করে শক্তিশালী ও

ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা সম্ভব হবে। কাজেই জামেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু ইসলামী বিধি-বিধানের নবরূপায়নে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ ধ্যান-ধারণা ও নবায়নের ইলমী কেন্দ্র কি হবে, যেখানে সকল চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ঐক্যবদ্ধ হবেন, যে জন্য পবিত্র কুরআন বার বার আহ্বান করছে? এ কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত হতে পারলে কাজও বিস্তৃত না হয়ে বরং সংক্ষেপ হয়ে আসবে। আর এক কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে।

ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল রাসূলের পথ

ইসলামী দর্শনের আধুনিকীকরণে প্রথম পদক্ষেপ এটা হওয়া উচিত, যেন আমরা সবার আগে আমাদের চিন্তা ও গবেষণার জন্য একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করে নিই। যে লক্ষ্যের জন্য আমরা শ্রম ব্যয় করব– আমরা আমাদের চিন্তা ও গবেষণা শক্তিকে এবং শাখা-প্রশাখা জাতীয় মাসাইল ও বিষয় ঐ প্রধান লক্ষ্যের সাথে জুড়ে দেই। যার ফলে শুধু পথই পরিষ্কার হবে না; বরং আমাদের অনৈক্য দলাদলি অনেকাংশে কমে যাবে। আমাদের পদক্ষেপ নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হবে এবং ক্রমোন্নতি লাভ করবে।

তাই আমাদের কাছে ঐ মূল কেন্দ্রবিন্দু হল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পথ– যাকে মিনহাজে নবুওয়ত বলা হয়। সকল চিন্তা ও গবেষণাকে একস্থানে কেন্দ্রিভূত করে দেয়া প্রয়োজন। এ পথের মশাল হাতে নিয়েই মুসলিম জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ দ্বারা দূরীভূত হয়েছিল অন্ধকার এবং আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠছিল সারা বিশ্ব নবীর আলো ও জ্যোতিতে। তাই আজও যদি ঐ আলোকোজ্জ্বল পথের অনুসরণ করা হয়, তাহলে জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে সামনে পথ প্রদর্শক মেনে নেয়ার কারণে আমাদের মন-মানসিকতায় ঐ জাতীয় পরিবর্তন সূচিত হবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মধ্যে পয়দা করে দিয়েছিলেন। আর এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামী দর্শনের আধুনিকায়ন কিভাবে শুরু হয়েছে এবং এ প্রচেষ্টার শুরুর সাথে শেষের সম্পর্ক কি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফলে থাকবে না কোন প্রকার বিভ্রান্তি যে, মুসলমান জাতির মন-মানসিকতা কিভাবে গঠিত হচ্ছে আর তাকে কোন পথে পরিচালনা করা হচ্ছে।

উম্মতের মন-মানসিকতায় নবী-আদর্শের প্রভাব

যদি ভেবে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আমাদেরকে দীন শিক্ষা দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ন্যায়নীতি ও মধ্যপন্থা দেখিয়ে গেছে। আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদ শিক্ষা দেয়নি বা এ পথে পরিচালিত করেনি যে, আমরা ইবাদতের নামে সম্পূর্ণ বিবাগী হয়ে যাব। পাহাড়ে পর্বতে চলে যাব এবং সমাজ ও সামাজিকতা ত্যাগ করব; নিজের সব আবেগ-উদ্দীপনা ঝেড়ে মুছে ফেলে পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করব। না থাকবে ঘর দরজা, না থাকবে কোন সমাজ ও সামাজিকতা। থাকবে না কোনো সমাজ, নামায, অর্থ সমৃদ্ধি। মানব সমাজের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। জাতীয়তা বোধ থাকবে না। পরস্পরের মিল ও মহব্বত থাকবে না। না, ইসলামে এসবের কোন স্থান নেই। ইসলাম তার অনুসারীদের থেকে এসব কামনা করেনি। এসব হল মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। ইসলাম এসবকে রাহবানিয়াত বলে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে। لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান ও সুযোগ নেই। আমাদেরকে ইসলাম পশুত্ব ও হিংস্রতার পথে পরিচালিত করেনি। আমরা ইবাদতের নাম ধরে আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলাকে সুন্দর করে অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারি না। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকতে পারি না। আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব করা নয়; বরং অন্য কিছু। এটা হয় না যে, আমাদের সঠিক আকিদা ও ইবাদত থাকবে না। ফরয ও ওয়াজিব বিষয়ের প্রতি থাকবে না কোন মমত্ববোধ। কোন তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ পরস্পরে দয়া-মায়া কল্যাণকামিতা থাকবে না। সন্তান ও আত্মীয়দের প্রতি কোন মায়া-মমতা সহানুভূতি সমবেদনা থাকবে না। দিন-রাত কেবল প্রকৃতির দাসত্ব, খেল তামাশা, সুখ ভোগ, আরাম আয়েশ, গর্ব গরিমা অহংকার ইত্যাদি জীবনের চিরসাথী হয়ে যাবে। এসবকে ইসলাম অর্থহীন স্থূল জীবন বলে আখ্যা দিয়েছে এবং গাফলত ও উদাসীনতার উপকরণ বলেছে। বরং এসব কিছু পশুত্ব বলে বর্ণনা করে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং উম্মতের মন-মস্তিষ্ক থেকে এসবকে চিরতরে খতম করে দিয়েছে। বলা হয়েছে–

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ○ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ○ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ○

আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এরা কেবল পার্থিব জীবনের বাইরের দিকটা দেখে থাকে, তারা পরকালের ব্যাপারে উদাসীন, আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। তারা আহার আনন্দ উপভোগ করে নিক, তাদের কল্পনা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক। খুব শিগগিরই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে। [ইমরান : ১৮৪, রূম : ৭, হাজর : ৩]

আসল কথা, ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, এসব বাড়াবাড়ি না করে, দুনিয়া বিসর্জন না দিয়ে, এর প্রেম ও মোহ ত্যাগ করে এবং দীনকে সঠিক জেনে জীবনপথে চলতে হবে। ইসলাম অযথা বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত রেখেছে। অর্থাৎ এমন পূর্ণাঙ্গ বিধান ও ব্যবস্থা দান করেছে, যেখানে পার্থিব বস্তুসমূহকে আয়ত্বে রেখে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই ইহজীবনকে পরকালের ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছে এবং পরকালকে এর ফসল বর্ণনা করেছে–

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

ইহ-জীবন পরজীবনের ক্ষেত্র বিশেষ।

ফল ও ফসল যদি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তাহলে সে অনুপাতে উৎপাদনও দরকার। এ কারণে যেখানে ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ যেমন পরকালীন আজাব ও সওয়াবের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ইহকালীন উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মিসওয়াক ব্যবহারে যেমন পরকালীন সওয়াব রয়েছে, তেমনি মুখের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য করা হয়েছে। পবিত্র হালাল আহারে যেমন নেক আমলের শক্তি রাখা হয়েছে, সেখানে স্বাদও পরিত্যাগ করা হয়নি। পোশাক পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণ ও সওয়াব লাভ মুখ্য হলেও পার্থিব সৌন্দর্য সম্ভ্রমকে ত্যাগ করা হয়নি। যদিও পায়ের গোড়ালির নিচে বস্ত্র পরিধান করাকে গর্ব অহংকারের লক্ষণ বলে সেভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করা হয়েছে; সাথে সাথে পোশাককে অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, আর এ হলো পার্থিব উপকার। রাজ সিংহাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য যদিও আদল ও ইনসাফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখে দেশ রক্ষা, জনসেবা ও জনগণের তরবিয়ত, পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়; সেখানে নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়েছে। সারকথা, পরকালের সঠিক অন্বেষণের সাথে ইহকালীন

আয় উপার্জনকে অবশ্য করণীয় করা হয়েছে। কবি ছাইব কত চমৎকারভাবে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন–

فکر دنیا کن اندیشہ عقبیٰ بگزار ☆ تا بعقبیٰ نہ رسد دامن دنیا مگزار

ইহকালের চিন্তা কর, পরকালের ভয় করো না, পরকালে না পৌছা পর্যন্ত ইহকালকে বর্জন করো না।

সারকথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বৈরাগ্যবাদ ও পন্তত্ব হতে আলাদা করে মধ্যবর্তী পথে এ উম্মতকে পরিচালিত করেছেন, যে পথে স্বভাবজাত আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্দীপনাকে পদদলিত করা হয়নি। বরং সঠিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মানব চিন্তা বুদ্ধিতে কোন রকমের আমূল পরিবর্তন করা হয়নি। বরং এসবকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনের আদলে স্বভাব চরিত্র গঠন, সুশৃঙ্খল পরিবার, সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও ন্যায়ানুগ শাসন পদ্ধতি, সম্মানজনক পররাষ্ট্রনীতি, আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়া ও মহত্ববোধ, সমতাপূর্ণ সমাজ সুশৃঙ্খল জামাত, উন্নত নৈতিকতা, সেবাযত্নের মনোভাব গঠন, ইবাদত-বন্দেগী সদুপদেশ প্রদান, মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা, সর্বোপরি পরকালের হিসাব নিকাশের চিন্তা সব সময় মানসপটে জাগরুক রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। যে জাতি এ মন্ত্রে দীক্ষিত ও সক্রিয় থাকে, সে জাতি ইহকালকে ও পরকালকে একত্রিত করে অন্য জাতিসমূহের অন্ধ অনুসারী না হয়ে নিজেই বিশ্ব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, ন্যায় ও সত্যের আহ্বায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ করে ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায়।

جسطرح احمد مختار ہر نبیوں میں امام ☆ ان کی امت بھی ہے دنیا میں اقوام

যেভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীকূলের ইমাম ও নেতা, তেমনি তাঁর উম্মতও বিশ্বের বিভিন্ন উম্মত ও সমাজের নেতা।

যুগের চাহিদা ও আধুনিকতা

এসময় যে জিনিসের সবচে' বেশি প্রয়োজন তা হল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও আদর্শকে সঠিক মূল্যায়ন করে সে মোতাবেক ইসলামী বিধি-বিধানকে আধুনিকীকরণ এবং বর্তমান যুগে জিজ্ঞাসার জবাব, যুগের পরিভাষায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে পেশ করা। তাহলেই প্রকৃত অর্থে

ইসলামী দর্শনের নবায়ন ও আধুনিকীরণ করা হবে। যদি উম্মতকে এ মন-মানসিকতা ও আদর্শ হতে সামান্যতমও বিচ্যুত করা হয় তাহলে তা নবায়ন ও আধুনিকীরণ হবে না; বরং ইসলামে বিকৃতি করা হবে। তা হবে আমাদের উদ্দেশ্যের চরম পরিপন্থী। তাই নবায়ন ও আধুনিকীকরণের বিষয়টি সংক্ষেপে এমন হবে– 'মাসাইল হবে পুরাতন আর প্রমাণাদি হবে আধুনিক যুগের'– তা হলে এ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আমরা খেলাফতে ইলাহী প্রতিষ্ঠায় এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি হওয়ার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো। ইসলামী জীবন-দর্শনের আধুনিকীকরণের এ হলো প্রথম পদক্ষেপ বা লক্ষ্য। এখান থেকে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে ঐ কেন্দ্রবিন্দুতে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা চালাতে হবে।

ইসলামী জীবন-দর্শন আধুনিকরণে মূলনীতির গুরুত্ব

আধুনিকীকরণে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে, ঐসব মৌলনীতি ও বিধানের অনুসরণ যেগুলোর অধীনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল আদর্শ তথা সকল আকাঈদ, আহকাম, আখলাক, ইবাদত, মুয়ামালাত, সামাজিক বিধি-বিধান, রীতিনীতি প্রভৃতি সব এসে যাবে। তাহলে আমাদের আধুনিকীকরণের মূল উৎস ঐসব মৌলনীতিই হবে, যেগুলোর মাধ্যমে পুরাতন মাসাইল বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। এভাবে কাজ করা হলে পুরাতন ও নতুনের কোন সংঘাত দেখা দিবে না। যদি এরূপ না করে মূলনীতি বর্জন বা পরিবর্তন করা হয় তাহলে তা আর যাই হোক, ইসলামী দর্শনের নবায়ন বা আধুনিকায়ন হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি বৈজ্ঞানিক দর্শনকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিধি-বিধান দ্বারা আধুনিকায়ন করতে চায় যেগুলোর প্রচলিত বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই অথবা যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন শাস্ত্রের আধুনিকায়নের জন্য আরবি ব্যাকরণের ছরফ (শব্দ গঠন) বা নহু (বাক্য গঠন)-এর নীতি প্রয়োগ করতে চায়, তাহলে সে কখনও সফলকাম হবে না। এজন্য ইসলামী দর্শনের আধুনিকীকরণ, তরতিব ও সংকলনে ইসলামী দর্শনের মূলনীতিগুলোকে সামনে রাখতে হবে, যেন আমাদের আধুনিকীকরণ ঐ মন-মানসিকতা হতে দূরে সরে না যায়, যা ঐসব মূলনীতিতে রয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকেই সকল বিধি-বিধান অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে ঐসব মূলনীতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এর প্রভাব রয়েছে শরীয়তের প্রতিটি

আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের উপর। আধুনিকীকরণে যদি এসব মূলনীতির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা না হয়, তাহলে তা ইসলামী জীবন-দর্শনের আধুনিকীকরণ হবে না; বরং মস্তিষ্কপ্রসূত কতিপয় বিধানের আধুনিকরণ করা হবে মাত্র।

মূলনীতির সঙ্গে আংশিক বিষয় নিরূপণ সমস্যা

তবে সেসব মূলনীতির সাথে যেসব বিধান আকাঈদ ও ইবাদত সম্পর্কিত, সেগুলোর আমল সম্পর্কিত খুটিনাটি ও আংশিক বিষয়াদি স্বয়ং শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাজেই এগুলোতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা নবায়ন ও আধুনিকীকরণের কোন প্রশ্ন উঠে না। তবে কারবার দরবার, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় সমস্যা বলতে মূলনীতি বর্ণনা করেছে এবং আংশিক ও খুটিনাটি বিষয়াদি যুগের চাহিদার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকে অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে এবং থাকবেও। তবে এসব বিষয়কে মূলনীতির অধীন করে দেয়া হয়েছে। কাজেই এগুলোকে বিষয়ভিত্তিক নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু উলামায়ে কেরামই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, যা আগের যুগে করা হত। একজন মুজতাহিদকে ইজতেহাদ করার অনুমতি দেয়া হবে, তিনি অনুকরণের মধ্যে থেকেই তা করতে পারতেন। এ পরিধির বাইরে পা ফেলতে পারতেন না। তবে এ অনুকরণ আংশিক বিষয়ে হোক অথবা মূলনীতিতে হোক; যদি ইজতেহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে আংশিক বিষয়ের মাসআলাতেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব মূলনীতির অনুসরণ করা হয়। এজন্য আধুনিকীকরণ এসব মূল ও আংশিক নীতিসমূহের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য যদি জাতির পুনর্গঠন হয়ে থাকে তাহলে সমাজকে ঐ আদর্শের আলোতে গঠন করতে হবে। সাফ কথা, শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতি দ্বারা চিকিৎসা করা যায় না; বরং রোগীর ব্যক্তিগত অবস্থা ও মন-মানসিকতা জেনে তারপর ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। জাতীয় সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যদি ইসলামের নীতি ও বিধান সংস্কারের প্রয়োজন হয় তাহলে আংশিক ও ছোট খাটো আমল দ্বারাই তা সম্ভব হবে। এ কারণেই দেখা যায় যে, সংস্কারের নামে কিছু নীতির অবতারণা করা হয়, বাস্তব কাজকর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই; যা কেবল মস্তিষ্কের বাহাদুরী বাড়িয়ে দেয়, বাস্তব ও কার্যকর কোন প্রোগ্রাম তাতে থাকে না। এটা টিকে থাকতে পারে না। শরীয়ত পছন্দ করে না। এ ধরনের বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা নিষ্ফল। যেমন চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে মানুষ প্রশ্ন করেছে। তখন কুরআন জ্ঞানপূর্ণ উত্তর প্রদান করেছে। চাঁদ থেকে উপকৃত হতে থাক।

তার হ্রাস বৃদ্ধির পেছনে কি রহস্য– তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা গবেষণা করো না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

يَسْـــئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

আপনার চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুসন্ধানসুলভ প্রশ্ন করা হয়, আপনি বলে দিন– চাঁদ হচ্ছে সময় নির্ধারণের জন্য এবং হজের জন্য। [বাকারা : ১৮৯]

রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হলো, তোমাদের এত বেশি ইলম ও জ্ঞান নেই যে, এসব রহস্য অনুধাবন করতে পার। শক্তি-বহির্ভূত কাজের পেছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? আমল ও সাধনার মাধ্যমে এসব রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে অথবা কেয়ামতের দিন এ বিষয়ে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। পরকালীন নাজাত ও মুক্তি এ কথার উপর নির্ভশীল নয়।

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً.

আপনি বলে দিন, রূহ আমার প্রভূর নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে। আর তোমাদেরকে অতি অল্প ও নগণ্য ইলম দান করা হয়েছে। [বনি ইসরাঈল : ৮৫]

এভাবে কেয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হলো, এর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমাদের উন্নতি সমৃদ্ধি কিছুই কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কেবল কেয়ামত আসার ব্যাপারে একীন ও বিশ্বাস রাখতে হবে। আংশিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আকিদার অংশ নয়–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَـــٰهَا ○ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ○ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَـــٰهَآ ○

জনসাধারণ কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে কিন্তু এর সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর নির্দিষ্ট সময়ের ইলম একমাত্র আপনার প্রভুর রয়েছে। [নাযেয়াত : ৪২-৪৪]

সারকথা, কুরআনের আলোকে এই ইলমই উদ্দেশ্য ও উপার্জনের যোগ্য, যে ইলম দ্বারা আমলের জিন্দেগি গঠিত হয়, সুন্দর হয়। ইহ-পরকালীন কল্যাণ লাভ হয়। আর আমলী জিন্দেগি কেবল নীতিমালায় গঠিত হয় না; বরং আমলের মাধ্যমেই গঠিত হয়। প্রয়োজনে এর সঠিক অনুশীলন করানো দরকার। এজন্য

এমন কোন মুরব্বির প্রয়োজন হয় যার স্বভাব প্রকৃতি রব্বানী আলোকে গঠিত হয়েছে। রব্বানী শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেছেন–

اَلَّذِيْ يُرَبِّىْ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ ثُمَّ بِكِبَارِهَا.

'রাব্বানী' ঐ মহামানবকে বলা হয় যিনি প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট ব্যাপারে এবং পরবর্তীতে বড় বড় ব্যাপারে মানুষকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এজন্য পবিত্র কুরআন ওয়াজ নসিহত ও আমর বিল মারুফের ব্যবস্থাকে সামাজিকভাবে সুদৃঢ় করেছে এবং একে রাজ্য লাভের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছে।

সারকথা, যে আদর্শের আলোকে ও অনুকরণে আমরা আমাদের শক্তি ও চেষ্টা ব্যয় করব, সে আদর্শ নীতিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমল ও কর্মকাণ্ডপূর্ণ হতে হবে। ইলম ও আমল এক সঙ্গে থাকবে। এছাড়া আমাদের আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টা সফল হবে না। মোটকথা, ইসলামী জীবন-দর্শনের নবায়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ইসলামী মূলনীতিসমূহকে সামনে রাখতে হবে। যেমন প্রয়োজন তেমনি ইলমে ফেকাহ এবং ফেকাহর আংশিক ও জুযী বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে। তাহলে বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে আংশিক মাসাইলে অগ্রাধিকার প্রদান বা নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে তা করতে পারবেন কেবল যোগ্য উলামায়ে কেরাম। এ কথাও স্পষ্ট যে, মূলনীতির পরিচয় লাভ ও হৃদয়ঙ্গম করা, এর অন্তর্নিহিত রহস্য অনুধারণ ও বিশ্লেষণ করা আংশিক মাসাইল ছাড়া সম্ভব নয়। মূলনীতি যতই হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষণ হোক না কেন, যে পর্যন্ত আমলের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ না করবে, সে পর্যন্ত মূলনীতির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যাবে না, সম্ভব নয়। এ আংশিক আমল ও কাজকর্মের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক রূপ-রেখা আকৃতি-প্রকৃতি সামনে আসতে পারে। কাজেই ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকীকরণের সময় সম্পূর্ণ দীনের ভিত্তি ও মূলনীতির প্রতি এবং প্রতিটি অধ্যায়ের নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য করা অবশ্য প্রয়োজন। তাই প্রতি অধ্যায়ের মাঝে আংশিক ও জুযী বিষয়াদিকে সামনে রাখা কর্তব্য। তা না হলে মূলনীতিসমূহের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে না।

মুতাকাদ্দমীন ফকিহ সংকলিত আংশিক মাসাইলের উপকারিতা

এর দ্বারা সেসব ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় যেগুলোর কারণে ঐসব মাসাইল সংকলিত হয়েছে। ফকিহগণ শরীয়তের মূলনীতিসমূহকে সামনে

রেখে সম্ভাব্য দূরের বিষয়ের হুকুমও বের করে রেখেছেন। সাফ কথা, সকল যুগের ঘটনাবলীতে জাতিগত একতা বিদ্যমান থাকে। যদিও ঘটনার প্রকৃতিতে যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকে। সুতরাং ঐসব জুযী বা আংশিক বিষয় বর্তমান যুগে বেকার হবে-না। যদি কিছুই না হয়, তাহলে বর্তমান যুগের আংশিক বিষয়গুলোকে ঐসব আংশিক বিষয়ের সাথে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। বরং যথাসম্ভব ঐসব আংশিক বিষয়ে এমন অনেক মাসআলা পাওয়া যাবে, যেগুলো বর্তমান যুগে ও আগের যুগের মতো কার্যকর ও উপকারী বলে প্রমাণিত হবে এবং সমস্যার সমাধান করা যাবে। প্রয়োজন কেবল প্রতিটি অধ্যায়ে আলাদা আলাদা অনুসন্ধান করা। তাছাড়া ঐসব আংশিক মাসাইল ফকিহগণের মাধ্যমে সংকলিত হতে হবে। আমাদের সংকলিত মাসাইল থেকে সাবেক ফকিহগণ সংকলিত মাসাইলগুলো নবুওয়তের বেশি নিকটবর্তী হবে। সুতরাং নতুনভাবে সংকলন না করে বরং ফকিহগণের সংকলিত মাসাইল তালাশ করা বেশি সহজ হবে। আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টাকে আংশিক মাসাইলের তালাশ ও শ্রেণী বিন্যাসে ব্যয় করা বেশি ফলদায়ক হবে। এরপরও যদি মুফতি সাহেবকে নতুনভাবে সংকলন করতে হয় তাহলে ঐসব পুরনো মাসাইল তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে। বরং সম্পূর্ণ সম্ভব যে, মূলনীতির আলোকে সংকলিত আংশিক বিষয় নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিবে না। কারণ, আগেই জানা হয়েছে, ফকিহগণ ফেকাহ'র নীতিমালা ও শরীয়তের বিধি-বিধানের আলোকে সম্ভাব্য সব বিষয়ের হুকুম লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যার সমষ্টিকে ইলমে ফিকাহ নাম দেয়া হয়েছে। যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে সবিস্তার লেখা রয়েছে। সুতরাং আধুনিকায়নে শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাথে ঐসব জুযী বা আংশিক বিষয়াদিকে সামনে রাখা প্রয়োজন। এ কারণে আমাদের পূর্বসূরিরা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আংশিক বিষয়কে কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অথবা অন্যান্য জাতির সমালোচনার ভয়ে ত্যাগ করেননি। অনুরূপ ঘটনার বিবরণ ঐতিহাসিকগণের মতে– সেসময় পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদায়েন। ১৬ হিজরী মোতাবেক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাজধানী মাদায়েন জয় করেন। হযরত সালমান ফারসি একবার বাগদাদে (ইরাক) আহার করছিলেন। একজন ফারসি কৃতদাস খাদ্য পরিবেশন করছিল। তখন তার হাতের একটি লোকমা মাটিতে পড়ে যায়। হযরত সালমান তৎক্ষণাৎ তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলেন। তখন গোলাম বলল– 'এ দেশ বিত্তশালীদের দেশ, সম্ভ্রান্ত মানুষের দেশ। এ কাজকে তারা অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখবে, নীচতা মনে করবে। জবাবে তিনি বললেন–

أَ اَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِهؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ؟

আমি আমার বন্ধুর সুন্নতকে এসব নির্বোধের কারণে ছেড়ে দিব কি?

ভাবুন, এক দিকে দীনের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র বিষয়ে উপর আমল, অন্যদিকে দেশের পর দেশ জয়। খেলাফতের বিস্তৃতি, দেশের পর দেশ জয়ের সাথে অহংকারীদের সমালোচনা ও ঠাট্টা বিদ্রুপ। অথচ নবুওয়তের ফয়েজ ও বরকতে তাদের পবিত্র আত্মায় যে নেশা পয়দা হয়েছিল, তা এসব কারণে এদিক সেদিক হতে পারেনি। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বেশি শরীয়তের ছোট বিষয়ের অনুসরণ আর কে করতে পারবে? আর তাদের চেয়ে বেশি দেশ বিজয়ী আর কে ছিল? এতে প্রমাণ হল, সাময়িক ঘটনা ও প্রয়োজনের খাতিরে শরীয়তে সুযোগ সৃষ্টি করা উদারতার পরিচায়ক নয় যে, এতে অন্য জাতি ও সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হবে। বর্তমান যুগের পরিভাষায় উদারতা দেখানোর জন্য ইসলামের আংশিক বিষয়েও পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামে উদারতার অর্থ হলো, ইসলাম মূলনীতিসমূহে এত ব্যাপক ও নমনীয়তা রেখেছে যে, কোন ঘটনা ও বিষয় এর বাইরে যাবে না। যার অর্থ দাঁড়ালো, দীন তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূলনীতি ও পলিসির অধীনে কখনো এত সংকীর্ণ হয়নি যে, সৃষ্ট ঘটনাবলীর সমাধান দিতে পারবে না। দীনের মধ্যে এমন শূন্যতা কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, দীন সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এ জাতীয় হাজারো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, ইসলাম কোন রুক্ষ ও অনমনীয় আইনের সমষ্টি নয়। বরং ইসলাম হল একটি দীন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যে দীনের মূল ভিত্তি ও প্রকৃতি হল এশক ও মহব্বত, প্রেম ও ভালোবাসা। যে প্রেম ও ভালবাসা হবে আল্লাহর সাথে, রাসূলের সাথে, সাহাবায়ে কেরামের সাথে। এজন্য সত্যিকারের আশিক তার প্রিয়জনের কোন ভঙ্গি ক্ষণিকের জন্যও পরিত্যাগ করবে না। যেমন সালমান ফারসি (রা.) 'আমার বন্ধু' বলে মহব্বত ও ভালবাসার প্রতি ইংগিত করেছেন। এর অর্থ, কোন আংশিক বিষয় ত্যাগ আইনানুগ বৈধ যদি থাকেও তবুও প্রেম ও ভালবাসার আইনে সে সুযোগ নেই। সে প্রশ্নই উঠে না। ইসলামী মানসিকতায় যে প্রেমের সংমিশ্রণ রয়েছে পূর্ণ মাত্রায়, সে প্রেম একজন পাক্কা মুসলমানকে প্রতিটি আংশিক বিষয়ে অনুকরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। চুল পরিমাণ এদিক সেদিক হতে দেয় না। সুতরাং আধুনিকীকরণের কারণে ইসলামের এ বিশেষত্বকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে না।

ইসলামে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

তবে এতসব শর্ত ও পাবন্দির সাথে সাথে ইসলাম মুসলমানকে পূর্ণ বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। একজন সাধারণ মানুষও আইনসম্মত এ অধিকারের বলে রাষ্ট্রের প্রধানকেও প্রশ্ন করতে পারে। রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণের দাবি-দাওয়া শুনতে বাধ্য। এর জন্য প্রধান দৃষ্টান্ত হলো নামাযের জামাত, যাকে বলা হয় 'ইমামতে সুগরা' বা ছোট নেতৃত্ব। আর তা 'ইমামতে কুবরা'র সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। রাষ্ট্রের যেমন ইমাম রয়েছে, নামাযেরও ইমাম রয়েছেন। জেহাদের ময়দানে যেমন তাকবির ও শ্লোগান দেয়া হয়, নামাযেও তাকবির বলা হয়, রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য যেমন ফরয, এখানে নামাযেও তেমন ইমামের আনুগত্য ফরয। যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদরা যেমন কাতারবন্দী হয়ে আছেন, থাকা প্রয়োজন নামাযেও তেমনি প্রয়োজন। এজন্যে ইমামতে সুগরায় যে রীতিনীতি রাখা হয়েছে, ইমামতে কুবরা ও রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তেমনি রাখা হয়েছে। এ অবস্থার আলোকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে নামাযী যদি এর সামান্যতম রীতিনীতি হতে এদিক সেদিক হয় তাহলে নামাযই শুদ্ধ হবে না।

সুতরাং মসজিদের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে মুকতাদিদের উচিত, ইমাম যখন নিয়ত বাঁধবে তখন তারাও সাথে সাথে নিয়ত বাঁধবে। ইমাম দাঁড়ানো থাকলে তারাও দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম রুকু করলে তারাও রুকু করবে। সেজদা করলে তারাও সেজদা করবে। وَلَا الضَّالِّينَ বললে তারা আমিন বলবে। যদি ইমামের কোন ভুল হয়ে যায় এবং সেজদায়ে সাহু করে তবে মুকতাদিরাও ইমামের সঙ্গে সেজদা সাহু করবে। তবে স্বাধীনতা এতটুকু দেয়া হয়েছে, ইমাম যদি কেরাত অথবা নামাযের জন্য কোন ব্যাপারে ভুল করে তাহলে প্রত্যেক মুকতাদি বাধা দিতে পারে। তারও এ অধিকার দেয়া হয়েছে। মুকতাদি ইমামকে এগুতে দিবে না, যে পর্যন্ত ইমাম সংশোধন না করে। ইমামের ভুল হলে প্রত্যেক মুসল্লী পেছন থেকে তাকবির ও তাসবীহ'র মাধ্যমে ইমামকে সতর্ক করবে। সতর্ক করার অধিকার তার রয়েছে। ইমাম সংশোধন করে নিতে বাধ্য হবে।

একই অবস্থা 'ইমামতে কুবরা' বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও। আমিরের আনুগত্য সব বিষয়ে সকলের উপর ওয়াজিব। নইলে শাস্তিরযোগ্য হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমির যদি কোন ভুল করেন তাহলে একজন সাধারণ মানুষও প্রকাশ্যে আমিরকে প্রশ্ন করতে ও সমালোচনা করতে পারবে। এ অধিকার তার রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমির তার নীতি ও কাজকে সংশোধন না করবে তাঁর কোন

বিশেষ উজর ও কারণ ব্যাখ্যা না করবে, সবাই তাঁকে বাধা দিতে পারবে।

হযরত ফারুকে আযম (রা.)কে একজন সাধারণ মানুষ যখন বাধা দিল, যখন তিনি আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঘোষণা করছিলেন– হে লোকসকল! আমিরের কথা শোন, মান্য কর, আনুগত্য কর! এক গ্রাম্য ব্যক্তি বলল– আমরা আপনার কথা মানব না, আনুগত্য করব না। জিজ্ঞেস করলেন– কেন? বলল– গনিমতের মালে আপনার অংশে সাধারণ মানুষের মতো কেবল একটি চাদর ছিল অথচ আপনার শরীরে একখন দুটি চাদর রয়েছে। বললেন– 'এর উত্তর ছেলে আবদুল্লাহ দিবে।'

ছেলে বললেন– 'আমিরুল মুমিনীনের শরীরের উচ্চতা বেশি; তাই একটি চাদর তার জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্যে আমি আমার চাদর তাঁকে দান করে দিয়েছি। ঐ চাদরই তিনি আজ পরিধান করেছেন।'

এবার গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, 'আপনার কথা মানব, আনুগত্য করব।'

সারকথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শানুসারে আমলের ক্ষেত্রে এত কঠোর যে সামান্যতম অলসতা বা ত্রুটি সহ্য করা হয়নি। একজন সাধারণ মানুষকেও অধিকার দেয়া হয়েছে, আমীরুল মুমিনীনের সামান্যতম বাহ্যিক ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন করার। নীতির অধীনে চরম বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এই হলো প্রকৃত জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্র। কিন্তু আমি মনে করি, নীতি ও বিধানের এ আনুগত্য এমন কোন ব্যাপার নয়, যা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে দিবে। বিশেষত এসব নীতি ও বিধানের অনুকরণ করেই ইসলাম ও মুসলমান জাতি বিশ্বজয়ী হয়েছিল।

ইসলামী নীতিমালা বিশ্বজনীন হওয়ার বাস্তব সাক্ষ্য

আমরা ইসলামকে বিশ্বজনীন ও কল্যাণকর ধর্ম বলি। তাহলে বিশ্বজনীনের অর্থ হলো, ঐ নীতি ও বিধানগুলো বিশ্বজনীন। যদি এ নীতিগুলো সংকীর্ণ হতো, প্রগতিশীল না হতো, তাহলে ইসলাম বিশ্বজনীন হওয়া তো দূরের কথা 'আরবজনীন'ও হতো না। কিন্তু এসব নীতি ও বিধানে অনেক শতাব্দী ধরে বিশ্বজনীন কল্যাণকর রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। সেসব নীতির দীক্ষা গ্রহণ করে এমন সব মহামনীষী সৃষ্টি হয়েছেন, যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আলো দেখিয়েছেন, পথের দিশা দিয়েছেন। অন্ধকারে আচ্ছন্ন জাতি, কওম ও সম্প্রদায়গুলোকে তাদের মানবেতর অবস্থা থেকে উদ্ধার করে মানবতার গৌরবে পৌঁছে দিয়েছেন। সংকীর্ণ নীতিমালা দিয়ে এসব সম্ভব ছিলো কি? স্বাভাবিক ও

প্রাকৃতিক নীতিসমূহকে সংকীর্ণ মনে করা নিজের মন-মস্তিষ্কের সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। একে প্রকৃত সংকীর্ণতা বলা যায় না। বিশেষত, এসব নীতি ও বিধানে এত নমনীয়তা রাখা হয়েছে, এত সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে, এগুলো থেকে সব যুগের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ আলেমগণ যুগপোযোগী মাসাইল বের করেছেন, যুগের চাহিদা ও সমস্যার সমাধান করেছেন। আজও করতে পারেন। এ নীতিগুলোতে সকল যুগের সৃষ্ট সমস্যাবলীর জন্য দিকনির্দেশ রয়েছে। হেদায়াতের ব্যবস্থাও রয়েছে।

তাই সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্ধারিত আংশিক আমল ও কার্যক্রম স্বভাবসুলভ এ নীতিগুলোর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়নি; বরং এসব আংশিক বিষয়াদিকে যুগের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। প্রত্যেক যুগে যেসব নিত্য নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়, এগুলো সম্পর্কে আলেমগণ মূলনীতির আলোকে সমাধান দেন। যেমন- চিন্তাশীল মুফতিগণের কার্যক্রম আমাদের সামনে রয়েছে। বিশেষত মাসাইলের প্রমাণ-পদ্ধতিতে সব যুগের নতুনত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এক সময় পুঁথিগত দর্শনের প্রভাব ছিল। এখন দীন সম্পর্কে কেবল রেওয়ায়েতের উপর মানুষ সন্তুষ্ট হন না, যে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষায় দীনের ব্যাখ্যা করা না হয়। এবার ইমাম রাজী ও ইমাম গাযালী বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষায় দীনের ব্যাখ্যা করলেন এবং মানুষের সামনে দীন ও ইসলামের হক্কানিয়াতের সত্যতা প্রমাণ করলেন। আর মানুষের সামনে দীন ও ইসলামের এমন এক যুগ ছিল– যখন তাসাওউফ প্রাধান্য লাভ করল, তখন ইবনে আরাবী প্রমুখ মনীষী তাসাওউফ ও মারেফতের দৃষ্টিভঙ্গিতে দীনকে উজ্জ্বল করে পেশ করলেন। আরেক যুগ ছিল, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যুগ। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এবং হাকীমুল উম্মত আর্থ-সামাজিক দর্শনের আলোকে দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লষণ করে দিলেন এবং যুগ সমস্যার সমাধান ও যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দান করলেন। এরপর আসলো পদার্থ বিজ্ঞানের যুগ। তখন দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর মত বিজ্ঞ আরিফ-বিল্লাহ আলেম ইসলামী আকাঈদ ও মূলনীতিসমূহকে বাস্তব ভিত্তিক প্রমাণাদি পেশ করে সুদৃঢ় করেছিলেন। এতে একদিকে ইসলামের ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা প্রমাণ হলো। অন্যদিকে তার ব্যাপকতা বিকশিত হলো এবং ইসলামের নমনীয়তা প্রকাশ পেল। এর মধ্যে সকল প্রকার পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পরও তার মূল প্রকৃতি অবিকৃত থেকে যায়। যার অর্থ হলো– এর মধ্যে সব কিছু বিদ্যমান রয়েছে। সব ধরনের পোশাক এতে ফিট হবে। মানানসই হবে এবং কাল ও যুগ একে স্পষ্ট করে দিবে মাত্র।

যুগের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের প্রভাব

বর্তমান যুগ হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগ। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় দল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্টি জন্মলাভ করছে। রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ধর্মীয় মাসআলাকে রাজনৈতিক লেবেল লাগিয়ে যদি পেশ করা না হয়, তাহলে মানুষ তা গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে না। ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব সমস্যার সমাধানের জন্যে ইসলাম-বহির্ভূত কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে না; বরং ইসলামের অভ্যন্তরেই এর সমাধান রয়েছে। এর মাধ্যমেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকবে। আর এর প্রকৃতি ও স্বভাব আর্থিক ও রাজনৈতিক নীতি ও বিধান যদি এমন না হতো তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হতো না। রাষ্ট্রনায়কগণ দীন ও দুনিয়ার সাথে সাথে দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব আদায় করেছেন। আজও মুসলিম শাসকদের কাজকর্ম ইতিহাসের পতায় তাদের সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল কুরআন সুন্নাহ ও ইলমে ফিকহের আলোকে। তবে আজকের জয়ী ও বিজিত মুসলমানদের সবচে' বড় ভুল হচ্ছে, তারা বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিগুলো গ্রহণ করেছেন। সত্য অথচ নিজেদের কাজ ও কর্ম পদ্ধতি হতে কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। যদি মুসলমান জাতি নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা, রীতিনীতি ও বিধি-বিধানকে ঠিক রেখে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে আজও তারা আদর্শ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতো, যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বকে তারা দেখিয়েছেন। তাহলে বিশ্ববাসী তাদের অনুসরণে বাধ্য হত। এর বাইরে অন্য কিছু সংঘটিত হত না।

দীনি প্রকৃতি অনুযায়ী আধুনিক করার পথ

আসলে এ যুগেও একথা অত্যন্ত দরকারী যে, ইসলামী নীতিগুলোর মূল প্রকৃতি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অবিকল ও অবিকৃত রেখেও দিয়ানত, সততার রাজনীতি, ইবাদত ও সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যুগের সৃষ্ট সমস্যাবলী নতুনভাবে সাজিয়ে সমাধান করা যাবে। আর এটাই হবে যুগের সর্বোত্তম কাজ। যুগ-জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান । বিশেষ করে এ কাজে

দক্ষ ফকিহগণ ইসলামী নীতি ও বিধানের আলোকে কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। তাঁদের সমাধানে ইসলামী স্বভাব প্রকৃতির প্রতিফলন, পূর্বসূরিদের আদর্শ, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য পূরণের মনোবাঞ্ছা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, সমাজের সংস্কার ও কল্যাণ সাধন, পরকালীন নাজাত ও মুক্তি লাভের আশা এবং এর সীমা রক্ষা করা হবে। আর তখনই 'ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকীকরণ' দীনি রঙে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে এর সঙ্গে এসব মনীষীর মাঝে দীনি চিন্তা-গবেষণা ও দীনি মেজায যেমন প্রয়োজন, তেমনি একথাও দরকার যে, তারা বর্তমান যুগ ও যুগ-জিজ্ঞাসা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন। বর্তমান যুগের সকল চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। বর্তমান যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। জগতের গতি প্রকৃতি, মন-মানসিকতার সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও সুদৃঢ় মতের অধিকারী হবেন। কারণ, 'যুগ চাহিদাই' ফতোয়ার কারণ। মনোনীত ও নির্বাচিত মনীষীগণ তো অবশ্যই দীন ভক্ত; কিন্তু যুগ ও যুগের চাহিদা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কিংবা এর বিপরীত যদি হয় তাহলে ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে না। এ স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করতে পারবে না।

এ বিয়য়ে এমন মনীষীদের সমবেত করাই প্রধান ও কঠিনতম সমস্যা হবে। ইসলাম কোন পার্থিব ও সামাজিক আইন নয়। এ হলো দীন ও জীবন বিধান। এতে দুনিয়ার সাথে আখেরাতও সম্পৃক্ত রয়েছে এবং প্রতিটি কাজে তা পরিস্ফূট। সে কাজ চিন্তা-গবেষণা সম্পর্কিত হোক অথবা আমল ও কাজ সম্পর্কিত হোক। যেখানে মানুষের ইহকালকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সংকোচ ও সংকীর্ণতা হতে মুক্ত করে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন জবাবদিহিতার দায়-দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। সুতরাং শুধু পার্থিব ও আর্থিক প্রয়োজন সামনে রেখে সৃষ্ট সমস্যাবলীর সমাধান দেয়া হয়নি। সেহেতু حال (অবস্থা) সব সময় পরিবর্তনশীল রয়েছে এবং থাকবেও। হাল (অবস্থা) হচ্ছে ما حال فقد زال অর্থাৎ যে অবস্থা এল তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে– অবস্থাকে পরিবর্তিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে; তবে প্রকৃতির মৌল বিধানগুলো পরিবর্তনশীল নয়। সেগুলো অবিকল থাকবে, অনড় থাকবে। তবে শরীয়তের এসব বিধানে এত বেশি সুযোগ-সুবিধা ও নমনীয়তা রাখা হয়েছে যে, পরিবর্তনশীল যুগ ও সমাজের রাহনুমায়ী করতে সক্ষম। কাজেই গবেষকের কাজ হবে এতটুকু, যতটা পরিবর্তিত অবস্থা ও নিত্য নতুন সমস্যাবলী সামনে রেখে ঐ সকল আংশিক ও জুযী মাসাইলকে দেখবে। যেগুলোকে 'নবীর আদর্শ' সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে

ঐসব (পরিবর্তন করা নয়) সংযোজিত করে দিবে। মুফতি ও চিন্তাশীলদের কাজ ঘটনা ও মাসাইল পরিবর্তন করা নয়; বরং উভয়কে একত্রিত করে দেয়া। অবস্থা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারবে না। মাসাইল থেকেও অন্যমনষ্ক হতে পারবে না। এজন্য শরীয়ত সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে মৌল বিধান পরিবর্তন করেছে; নিত্য-নতুন সৃষ্টি আংশিক বিষয়াদি সম্পর্কে কোন ধরা-বাধা নিয়ম দেয়নি। বরং এসব যুগে যুগে নানা রঙে প্রকাশ পেতে থাকবে। সে মোতাবেক সমাধান করা হবে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ সংকলনের গুরুত্ব

ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে বর্তমান যুগে যে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, এর উৎস হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাছাড়া এ সময়ের রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহ দীন ও মাযহাবের রঙ নিয়ে, এ পোশাকের আবরণে মানব মস্তিষ্কে জায়গা করে নিয়েছে। আজ নানা ইজম ও মতবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দল গঠিত হচ্ছে। বিধি-বিধান, আইন-কানুন তৈরি হচ্ছে। রাজনৈতিক পরিভাষাও সৃষ্টি হচ্ছে (যা রাজনৈতিক); এমন সব রাজনৈতিক পরিভাষা সৃষ্টি হচ্ছে, যেসব পরিভাষা দীন ও ধর্ম সম্পর্কে ব্যবহার করা হত। লোকে বলতো– 'আমি অমুক মতাদর্শে বিশ্বাসী, আমার ঈমান অমুক মতাদর্শের উপর।' এক যুগে এসব শব্দ ধর্ম সম্পর্কে ব্যবহৃত হত। তাই বর্তমানে রাজনৈতিক নীতি ও পরিভাষার সংকলন খুবই প্রয়োজন। সে সংকলনে রাজনৈতিক মতাদর্শের চিন্তা ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে ইসলামের সামাজিক বিষয়কে দলিল ও প্রমাণের আলোকে পেশ করা হবে। সে কাজের জন্য কয়েকজন চিন্তাবিদ, আলেম ও চিন্তাশীল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা কাজ নেয়া যেতে পারে। কারণ, অতীতের দর্শন সে যুগের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সংকলিত হয়েছিল। তখন অন্তরে রাজনীতির পট্টি লাগানো ছিল না। এখন বর্তমান যুগের রাজনৈতিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সামনে রেখে এবং ইসলামী রাজনীতি ও সমাজনীতিকে দলিল-প্রমাণসহ সামনে রাখতে হবে এবং রাখা প্রয়োজন।

আনন্দের বিষয়, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া আজ এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। হতে পারে সেমিনারের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন দর্শনের নতুন ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যাবে। হাদীস ও ফিকাহ'র কিতাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসাইল বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে। বিভিন্ন শিরোনামে যেসব মাসাইল রয়েছে, সেগুলো তাদের ব্যাপকতা ও নমনীয়তার

কারণে এ সম্পর্কিত জুযী ও আংশিক মাসাইলের উপর সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এগুলোতে ফকিহগণের চিন্তা-গবেষণার নির্যাস রয়েছে। সুতরাং এসব শিরোনামকে অবিকৃত রেখে যদি কাজ করা হয় এবং বর্তমান যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করা হয়, তাহলে এ যুগের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। উন্নত রাজনৈতিক দর্শন প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং তা হবে জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার এক স্মরণীয় পদক্ষেপ। এর সঙ্গে আমরা এ আশাও পোষণ করতে পারি যে, এ চিন্তা ও গবেষণা গুটিকয়েক সর্বজন আলোচিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন- ব্যাংক ব্যবস্থা, ইনসিওরেন্স, স্টক এক্সচেঞ্জ, সুদ ভিত্তিক লেনদেন ইত্যাদি শুধুমাত্র আর্থিক সমস্যাবলীতে যেন সীমাবদ্ধ না রাখা হয়। কারণ, ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে যখন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, তখন পরিপূর্ণভাবে নেয়া উচিত। যাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এমনটা হয়ে গেলে আশা করি এই সন্দেহ দূর হবে যে, ইসলামী নীতিমালায় শুধু স্থবিরতাই রয়েছে না আমাদের মন-মস্তিষ্কে আরো কিছু রয়েছে আর ইসলামের উপর দোষ চাপানো হয়েছে। অথচ ইসলাম নিজেই এ স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। যেমন- বিগত চৌদ্দশ' বছরে বিভিন্ন জাতির স্থবিরতাকে ভেঙ্গেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের তার স্বভাবজাত মূলনীতি মেনে চলতে বাধ্য করে। একেই স্থবিরতা মনে করা হচ্ছে। আসলে স্বভাবজাত নীতিকে সীমাবদ্ধ থাকা স্থবিরতা নয়; বরং স্থবিরতাকে ভেঙ্গে ফেলা।

নবীর আদর্শ ও ইসলামী মানসিকতার মূলনীতি

নেতিবাচক দিকসমূহ :

১. لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ ইসলাম জামাত ছাড়া হয় না; অর্থাৎ ইসলামের মেজায হলো সামাজিক। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ইসলাম পছন্দ করে না।

২. لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। অর্থাৎ দীন ও ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের মেজায আবিষ্কার পছন্দ ও নতুনত্ব পদ্ধতি নয়; বরং অনুসরণ পছন্দ। নির্জনবাস ও সম্পর্কচ্ছেদও ইসলাম পছন্দ করে না; বরং সাধারণের সাথে মিলেমিশে কাজ করাকে পছন্দ করে।

৩. لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ দীনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামের দীনি মেজাযে জোর জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ নেই; বরং নরমী-কোমলতা, দয়া-

মহব্বত ও ভালবাসার মাধ্যমে দলিল ও প্রমাণ দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া হয়। গ্রহণ ও বর্জন সম্পূর্ণ শ্রোতার ইচ্ছাধীন। কাজ করতেও পারে, নাও করতে পারে।

৪. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِىْ الْاِسْلَامِ ইসলামে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কোন স্থান নেই। অর্থাৎ ইসলামের মেজায ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক নয়; বরং গঠনমূলক ও কল্যাণকর।

৫. لَا عَدْوٰى وَلَا طَيْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ সংক্রামক ও অকল্যাণকর বাস্তবে ইসলাম বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ ইসলামের মেজায কল্পিত নয়। ঝাড়, মন্ত্র, টুটকা, রোগ-ব্যাধির সংক্রমণের অথবা কল্পনা ও ভয়ভীতিতে ইসলাম বিশ্বাস করে না। বরং ইসলামের মেজায বাস্তব ভিত্তিক। বাস্তব বিষয়াদিই কেবল গ্রহণযোগ্য। তা পার্থিব উপকরণের মাধ্যমে প্রকাশ পাক কিংবা অদৃশ্য উপকরণের মাধ্যমে। কল্পনাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা এসবের উৎস ও উপকরণ হতে পারে না। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই।

৬. لَا نُوْلِىْ اَمْرَنَا هٰذَا مَنْ طَلَبَهٗ প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কোন দায়িত্ব দেয়া হবে না। ইসলামের মেজায পদের প্রার্থীকে পদ না দেয়ার। পদের প্রার্থী হওয়া সাধারণত স্বার্থপরতারই প্রমাণ বহন করে। স্বার্থপর মানুষ নিজের স্বার্থ উদ্ধার ও সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকে। তাই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয় ন।

৭. لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا নিজের শক্তি ও সামর্থের বাইরে নির্দেশ দেয়া হয় না। অর্থাৎ ইসলাম কারো উপর শক্তি ও বল প্রয়োগ করে না। মানুষ হোক অথবা জীবজন্তু, শক্তি ও সামর্থের বাইরে কাজের নির্দেশ (জুলুম) ইসলাম করে না।

৮. لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا আমাদের সঙ্গে যে প্রতারণা করে সে আমাদের মধ্যে নয়। বাইরে উপকার দেখিয়ে প্রতারণা করা ইসলামের স্বভাব নয়; বরং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশই ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি।

৯. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ 'আমি লৌকিকতা পোষণকারী নই'– অর্থাৎ ইসলামে বাহ্যিকতা, লৌকিকতা ও আচারানুষ্ঠান নেই; বরং সততা সরলতা এবং জাহের ও বাতেনের সমতা রয়েছে।

১০. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه 'আমরা রাসূলগণের মধ্যে ভেদাভেদ করি না।' অর্থাৎ ইসলামে মহামনীষীদের নামে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি ও সংকীর্ণতা নেই।

বরং মহামনীষীদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিকভাবে সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে এক প্লাটফরমে সমবেত করা এবং মানব জাতিকে সংগঠিত করাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১১. لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃতিতে কাপুরুষতা, ভয়ভীতি ও সাহসহীনতার কোন স্থান নেই; বরং দৃঢ়তা, সাহস শক্তি ও অটল বিশ্বাসের সঙ্গে বীরত্ব উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে। [ইমরান : ১৩৯]

১২. لا تيئسوا من روح الله 'নিরাশ হয়ো না, আল্লাহর করুণা হতে।' ইসলামের স্বভাব প্রকৃতিতে বিপদ যত ভয়াবহই হোক, নিরাশ হতে নেই; বরং আল্লাহর উপর ভরসা ও পূর্ণ আস্থা রেখে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে অগ্রসর হবে। নিরাশ হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরের শাখা বিশেষ।

১৩. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ধর্মে কোন সংকীর্ণতা রাখা হয়নি। দীন সম্পর্কে ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি কোন রকম সংকোচ ও সংকীর্ণতা নেই; বরং আছে প্রশস্ততা। মা'জুর বা অপারগকে বাধ্য করা হয় না; বরং তার অবস্থা অনুযায়ী পথ বের করে দেয়া হয়। [হজ্জ : ৭৮]

১৪. لن يشاد الدين الاغلبه প্রতিযোগিতার ধর্মই বিজয়ী হবে। ইসলাম ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি নেই এবং সামর্থের বাইরে কোন আমল ও নির্দেশ নেই। তা হলে দীন তাকে পরাভূত করে ফেলবে। ইসলাম মধ্যপন্থায় সামর্থ অনুযায়ী আমল করতে বলেছে। মধ্যম পথ ও পন্থা গ্রহণই ইসলামের মৌলনীতি।

১৫. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ মানুষ তার চেষ্টা অনুযায়ী ফল পাবে। অর্থাৎ ইসলাম আমল ও কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়। প্রতিটি প্রচেষ্টা তাকে উপকৃত করবে। অন্যের চেষ্টায় কোন উপকার হবে না। তা হলে মানুষ অন্যের উপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। সাহস করে সামনে অগ্রসর হও। [নজম : ৩৯]

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ.

ইতিবাচক দিকসমূহ :

এই নীতি ইসলামের ইতিবাচক মৌলনীতিসমূহ যার মাধ্যমে ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি প্রকাশ পায়।

১. لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃতি হলো দলিল ও প্রমাণ ভিত্তিক এবং বাস্তব অবস্থায় অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ, আবেগপ্রবণতা, সন্দেহ-সংশয় বা অবস্থা বিবেচনায় কাউকে সাজা শাস্তি প্রদান বা পুরস্কৃত করে না। [আনফাল : ৪২]

২. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ অর্থাৎ ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। লড়াই-ঝগড়া, ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খায় বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া ইসলামের প্রকৃতিতে দান-দক্ষিণা দয়া ও ইহসান রয়েছে; সংকীর্ণতা কার্পণ্য ও কঠোরতা নেই। [নিসা : ১২৮]

৩. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ অর্থাৎ ইসলাম প্রতিশোধ প্রিয় নয়; বরং ভদ্রতা, ক্ষমতা এবং দুঃখ-কষ্টে সহ্য ও ধৈর্যধারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়াকে ইসলাম সৎসাহস ও মহৎ গুণ বলে আখ্যায়িত করেছে। [লুকমান : ১৭]

৪. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ইসলামের নীতি প্রকৃতি ভ্রাতৃত্বসুলভ। ভ্রাতৃত্ব ভালবাসাই পছন্দনীয়, সম্পর্কহীনতা নয়। [হুজরাত : ১০]

৫. انَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ اخْوَة অর্থাৎ ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। গোটা মানব জাতি ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করবে। সে যে কোন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক হোক। দাস প্রথা বা শাসন শোষণের মাধ্যমে ভাই হতে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করা নয়।

৬. مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً

অর্থাৎ ইসলাম বিশ্ব মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম মানবকে সম্মান প্রদর্শন করে। তার অধিকার সংরক্ষণ করে। মানবতার অবমাননা, এর প্রতি তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শনে মানবতাবোধ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ইসলাম এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। [মায়েদা : ৩২]

৭.

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً أُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْكَـٰفِرُونَ.

অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃতিতে সত্য মিথ্যা, হক ও বাতেলকে সংমিশ্রণ করা নয়। কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার

মানসে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা একত্র করে মধ্যপন্থা বের করা নয়; বরং সত্য ও মিথ্যাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পৃথক করে দিতে হবে। [নিসা : ১৫০]

৮. اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ কর। ইসলাম মানুষকে একাগ্রতার সাথে আন্তরিক শান্তি নিরাপত্তা ও আরাম দিতে চায়। অসম্পূর্ণ কাজ দ্বারা অন্তরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চায় না। [বাকারা : ২০৮]

৯. اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ইসলাম আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা চায়। অন্যের প্রাপ্য আমানতদারীর সাথে পৌঁছে দিতে চায়। বিশ্বাসভঙ্গ, বদ দিয়ানত, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা চায় না, পছন্দ করে না।

১০. وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ইসলাম জাতীয় সামাজিক কার্যাবলী সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে চায় এবং নেতার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অনুসরণ ও সহযোগিতা চায়। যদি একজন হাবশি কৃতদাসকেও নেতা নিয়োগ বা নির্বাচন করা হয় তাহলে তাকেও মানতে হবে। বিচ্ছিন্নতা আনুগত্যহীনতা এবং নেতৃত্বহীন গণতন্ত্র ইসলামের মেজাযে নেই। এসব হলো বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলতা। ইসলাম তা চায় না। [নিসা : ৪৬]

১১. كُلُّ امْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের আয়ের উপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করে, যাতে অন্যের গলগ্রহ হয়ে না পড়ে। অন্যের উপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না পড়ে। [তুর : ২১]

১২. مَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا يُجْزَ بِهٖ ইসলাম চায় কেউ যেন নিজের বংশ মর্যাদার উপর গর্ব অহংকার না করে। যে যা করবে তা ভবিষ্যতে অবশ্যই সে পেয়ে যাবে। নিসা : ১২৩]

১৩. ثَلٰثَةٌ لَعَنَهُمُ اللهُ مُتَّبِعٌ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ইসলামের প্রকৃতিতে মূর্খ যুগের প্রচলন ও রসুম– যা ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি বা নবায়ন গ্রহণযোগ্য হবে না। এর দ্বারা ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করা হয়।

১৪. مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ইসলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য চায়। কানুনে হক বা সত্য আইন আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নেই। [হাশর : ৭]

১৫. اَنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ ইসলাম প্রতিটি কাজকে তা ইবাদত

হোক অথবা আদত হোক– পরকালমুখী করতে চায়। ইহকালের উপর সব কাজের পরিসমাপ্তি কাম্য নয়। পার্থিব উপকারই মুখ্য নয়, কিন্তু দুনিয়াকে বর্জন করতে চায় না; বরং ইহজীবনকে গ্রহণের মাধ্যমে পরকাল বের করতে চায়। এজন্য পৃথিবীকে জমি বলা হয়েছে। তাই ফল যদি কাম্য হয় তাহলে চাষাবাদও কাম্য হবে। নইলে ফল লাভ হবে না। ইসলামে দুনিয়া ত্যাগ ও বর্জন কাম্য নয়; বরং মোহকে ত্যাগ করা চাই। এ কারণে যে, বিশ্বজগত মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং একে নিষ্ক্রিয় ও বর্জন করা যায় না। আর মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরকালের জন্য। সুতরাং মানব জাতিকে শুধু ইহকালের জন্য ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না।

নীতিসমূহের সার-সংক্ষেপ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কয়েকটি মূলনীতি এ রকম। সমাজ, ব্যক্তি, ব্যক্তিগত দলিল, নেতার অনুসরণ ও আনুগত্য, অর্পণ, পদের শ্রেণী বিন্যাস, সাধারণের প্রশিক্ষণ, নৈতিক উৎকর্ষ সাধন, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, সামাজিক রীতিনীতি, দীনের বিস্তৃতি, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার উর্ধ্বে অবস্থান, বেদআত থেকে আত্মরক্ষা, রাসূলের অনুসরণ, ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও হামদরদী, ন্যায় ও ইনসাফ, জনসেবা, সৃষ্টির সেবা, ইহকাল ও পরকালের সমন্বয় সাধন এবং পরকালকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা প্রভৃতি এমন সব বিষয় যার মাধ্যমে নবী আদর্শের স্বাদ ও ইসলামী স্বভাব প্রকৃতি প্রকাশ পায়, ইসলামী আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়ে সামনে আসে। এর কয়েকটি উদাহরণ যা তাৎক্ষণিকভাবে স্মরণে আসল। নইলে কুরআন সুন্নাহ'য় এমন হাজারো মূলনীতি রয়েছে। আমাদের আধুনিক হতে সব সময় এসব নীতিকে অনুসরণ করতে হবে, সামনে রাখতে হবে।

আধুনিকীকরণের প্রধান কাজ লোক নির্বাচন

এসব পদক্ষেপ গ্রহণে ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লোক নির্বাচন করা, যাদের ধর্মীয় বিষয়ে পারদর্শিতা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ফকিহগণের তুল্য– সামগ্রিকভাবে দীনের মৌল ও আংশিক নীতিসমূহের জ্ঞান থাকবে। ইসলামের সত্যিকার রূহ ও প্রাণ তাদের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। কাজে নিয়োজিত মনীষীগণ যদি ইসলামের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ হন অথবা অপারদর্শী হন, তাদের চিন্তা-গবেষণা ফকিহদের মতো না হয়, ইসলামের

কর্মনীতি সম্পর্কে ও ইসলামী রূহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হন; তাহলে ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে না। তাই সবচে' বড় সমস্যা হলো– লোক নির্বাচন কর। আল্লাহ তায়ালা যখন পূর্ণাঙ্গ এ দীন ও জীবন-বিধানকে পৃথিবীতে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন সবার আগে লোকও নির্বাচন করলেন। আর ঐ মহান সত্তা ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব। এর কারণ, দীন শুধু শিক্ষা ও চিন্তা-গবেষণার জন্য নয় এবং আমলী তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের জন্য এসেছে। প্রশিক্ষণ শুধু পুস্তক পাঠ ও পুঁথিগত শিক্ষা দ্বারা হয় না। যে পর্যন্ত মহান ব্যক্তিরা আমল ও কাজের মাধ্যমে (প্রকাশ না করেন) অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে না দেন, বাস্তব আমল ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ না করেন।

সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন কাল অতিবাহিত হয়নি, যখন উম্মতের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য শুধু কিতাব বা নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। কারণ, সেসব ব্যক্তিই দীন ও দীনি মাসাইলকে নিখুঁত করে, ইসলামের নিয়ম-পদ্ধতির আলোকে পেশ করেছিলেন– যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা দীন প্রেরণ করেছেন, সে উদ্দেশ্যে নির্বাচিত মনীষীগণ জাতি ও সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাদের জাতীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। যে জাতিকে আল্লাহ হেদায়াতের জন্য মনোনীত করেছিলেন, তাদের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। কারণ, প্রত্যেক যুগে শরীয়ত এমনভাবে এসেছে, যেমন মন-মানসিকতা জাতির ছিল। যুগের মানুষের যে জাতীয় মন-মানসিকতা ছিল, সেই মন-মানসিকতার দিকে খেয়াল রেখে সে জাতীয় মুজেযার মাধ্যমে নবুওয়ত প্রদান করা হয়েছে।

এখন নবুওয়তের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন নবীগণের এ কাজ ও দায়িত্ব উম্মতের চিন্তাশীল উলামা, মুজাদ্দেদ, ফকিহগণের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা শরীয়তের ঐ রঙে রঙিন করে পেশ করেবেন, যে রঙ বর্তমান যুগের মন–মানসিকতাকে আলোড়িত করছে। এ বাস্তব ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.)– যিনি স্থানীয় তাবেয়ী এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যার একক ইমাম ছিলেন– এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْن فَانْظُرُوَا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

এই ইলম এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাই তোমাদের প্রকৃত দীন। সুতরাং বিশেষভাবে দেখে নাও, কোন ব্যক্তি ও মনীষী হতে দীন ও দর্শন গ্রহণ করছ।

এই বাক্যের মাধ্যমে দীন ও দীনি জীবন দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়। [মেশকাত]

তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের প্রধান কেন্দ্র ও উৎস হলো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীগণ। লিখিত লিপি প্রশিক্ষক হতে পারে না। এটা বাস্তব কথা যে, সংস্কারক, প্রশিক্ষক এবং চিন্তাবিদগণ যদি সঠিক মত ও পথের অনুসারী হন, তাহলে তারাই মানবাত্মার সঠিক রাহনুমায়ী ও পথ প্রদর্শনে সক্ষম হবেন। তারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসারী না হন অথবা তাদের অন্তরে কোনো রকম ভুল ও বক্রতা বিদ্যমান থাকে তাহলে কুরআন হাদীস থেকে সে ভ্রান্তি আবিষ্কার করে অন্যদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিবেন। নিজের সাথে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে দিবেন।

আজ মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কত দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে– যারা প্রত্যেকে পবিত্র কুরআনকে নিজের পথ প্রদর্শক বলে স্বীকার করে, কুরআন নামে নিজ নিজ মতবাদ বিশ্বে প্রচার করেছে অথচ পরস্পরবিরোধী দলসমূহের মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হতে পারে। সাফ কথা, পরস্পর মৌলিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সব সত্য সঠিক হতে পারে না। মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহকে সামনে রেখে ইমাম ও পথ প্রদর্শক বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন দল যদি বাতেল ও ভ্রান্ত হয় তার অর্থ এ নয় যে, তাদের হাতে কুরআনও ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরিষ্কার প্রমাণ হলো, এ পথে সত্য সঠিক চিন্তা-গবেষণা ও গবেষকের ব্যক্তিত্বই প্রধান। তখন কোন দলের বাতেল ও ভুল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাদের হাতে কুরআন ও সুন্নত এবং ধর্মীয় লিটারেচার বা সাহিত্য নেই। বরং তা হচ্ছে– তাদের মধ্যে সঠিক চিন্তাশীল ও পূর্বসূরিদের নীতির আলোকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব নেই। বরং কোন ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যদি ব্যক্তিত্ব সত্য সঠিক হয় তাহলে বাতেল হতেও সত্যকে উদঘাটন করে নিবে। আর যদি ব্যক্তিত্ব ভ্রান্ত গবেষক ও চিন্তাবিদ হয় তাহলে কুরআন ও হাদীস হতে বাতেলকে প্রস্ফুটিত করে মানবাত্মাকে ফাসেদ ও পথভ্রষ্ট করে দিবে। তা না হলে কুরআনকে ইমাম ও পথপ্রদর্শক বলে স্বীকারকারী কোন বাতেল দল আদৌ বাতেল হয় না। এজন্য যখন আমরা ইসলামী জীবন দর্শনকে আধুনিক করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছি, তখন সবার আগে সত্য সঠিক গবেষক ও চিন্তাবিদগণকে নির্বাচন করতে হবে। এর দ্বারা সঠিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত মন-মানসিকতা ভেসে উঠবে এবং সত্য সঠিক ঐ আদর্শের উপর আমাদের চিন্তা ও গবেষণা দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী জীবন দর্শনের আধুনিকীকরণ মোবারক কাজ। এই

বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে এ কাজের জন্য মালা পাওয়ার উপযুক্ত। আর এ কাজে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা; আর তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। দ্বিতীয় কাজ হবে, এই আদর্শ অনুযায়ী চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য নীতি ও বিধান নির্ধারণ করা। সেখানে মৌলনীতিসমূহ ও আংশিক ফিকহ নীতিসমূহও থাকবে। তৃতীয় কাজ হবে, ইসলামের মেজায, মন-মানসিকতার সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক পরিচয় লাভ– যা ইসলামকে দেয়া হয়েছে। আর এর উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী উম্মতের তরবিয়ত, প্রশিক্ষণ ও মানসিকতা গঠিত হয়ে আসছে। চতুর্থ পদক্ষেপ হবে, 'ব্যক্তি নির্বাচন' গবেষণা গবেষক দ্বারাই হতে পারে; শুধু কাগজ কলম দিয়ে হবে না। পঞ্চম পদক্ষেপ হবে, সেসব জাহেরী ও বাতেনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মূল উপাদান বা প্রাপক এবং আদর্শের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য।

স্বীকার করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধিবেশনে সময় স্বল্পতার কারণে কুরআনী নীতিমালার সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করতে হয়েছে। এগুলোতে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এখানে প্রবন্ধের আকারে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও পেশ করেছি। সময়ের অভাবে তাও সুশৃঙ্খলভাবে পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্বলিত নয়; বরং ব্যস্ততার সাথে সাথে বিশৃঙ্খলভাবে কিছু কথাকে তাড়াতাড়ি করে লিখে একত্র করে দিলাম, যেগুলোতে বিশেষভাবে কোন নিয়ম-নীতি ও শ্রেণী-বিন্যাস করা যায়নি। এজন্য এ প্রবন্ধকে جهد المعقل دموعة (অশ্রু বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচায়ক) মনে করতে হবে। এতে ফরয আদায় হয়েছে বটে; তবে ফরয তার আনুসঙ্গিক বিষয়াদি দ্বারা সুসজ্জিত নয়। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা এ অভিযানকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দিন এবং মুসলিম সমাজের জন্য শুভ পদক্ষেপ বানিয়ে দিন। আমিন, আমিন, আমিন।

[মাসিক দারুল উলুম : ১৯৭৯ ইং, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ]

বয়ান : ১৪

ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

দীন ও দুনিয়া এ দু'য়ের মধ্যে আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে। দীনকেও সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষাগারকে হেফাজত করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যও সংরক্ষণ করে টিকিয়ে রাখতে হবে। ব্যবসায়ীগণ যদি তা না করেন তাহলে মাদ্রাসাও চলতে পারবে না। উলামারা কিতাব ছাপাতে পারবেন না। কোন কাজই হবে না। দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ:

বুযুর্গানে মুহতারাম!

ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে দুটি পথ তুলে ধরেছে; যেনো ইসলাম দুটি পথের সমষ্টি– ১. নৈকট্য লাভের পথ ও ২. উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পথ।

'ইকতে রাবাত' বা 'নৈকট্য লাভের পথ' মানে হলো, ঐ সরল পথ যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ এ নয় যে, আমি আপনার এতটা কাছে আসব যে মাঝখানের ব্যবধান এক গজের পরিবর্তে আধা গজ হবে। অথবা আধা গজের বদলে কয়েক আঙ্গুল থেকে যাবে। যদি এমন হয় তাহলে একে নৈকট্য বলা হবে; কিন্তু এ নৈকট্য হলো দৈহিক। আর

আল্লাহ তায়ালা শরীর ও দেহ হতে পবিত্র। তাহলে তাঁর নৈকট্য লাভের অর্থ এমন হবে কেন? আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ হলো– আমরা তাঁর সাথে নিবিড় ও সুদৃঢ় ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করব। তার চরিত্রে নিজেকে সুসজ্জিত ও চরিত্রবান করে নিব। তাঁর গুণাবলী দ্বারা নিজেরা গুণবান হয়ে যাব। তাঁর পূর্ণতা হতে নিজেরা পূর্ণতা লাভ করব। যেন আমরা প্রতিনিধিত্বের সুমহান মর্যাদা লাভ করতে পারি। ইসলামী পরিভাষায় একে 'ইকতে রাবাত' অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলা হয়। এর জন্য ইবাদত যেমন- নামায, রোযা, হজ, যাকাত প্রভৃতি রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় পথ হলো 'ইরতে ফাকাত'। এর অর্থ হলো, পরস্পরে মিল-মহব্বত, দয়া ও মমতা, তামাদ্দুন, পরস্পরে সাহায্য-সহায়তা, সামাজিকতা, রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন সামনে থাকবে। কিভাবে আমরা পার্থিব জীবন যাপন করব। দুনিয়াতে যেমন মসজিদ বানানো প্রয়োজন, তেমনি বসবাসের ঘরও বানানো দরকার। আবার হাট-বাজারেরও প্রয়োজন রয়েছে। এসব হলো উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের উপকরণ। পরস্পরের সম্পর্ক, স্নেহ মমতা, সাহায্য সহায়তা এবং সামাজিকতা কিভাবে সম্পাদন করব– এজন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ইসলাম এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। সারকথা, ইসলামের বিষয় দু'টিকে 'ইকতে রাবাত' ও 'ইরতে ফাকাত' বলা হয়। এমনিভাবে ঈমানেরও দুটি শাখা রয়েছে। এক الشفقة على خلق الله দুই. التعظيم لامر الله এক. আল্লাহ প্রেরিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। দুই. সৃষ্টির প্রতি দয়া স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা। এ হলো ঈমানের দুটি শাখা। এজন্য ইলমও দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

ইলমের দুটি বিভাগ

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন–

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ، عِلْمُ الْاَبْدَانِ وَ عِلْمُ الْاَدْيَانِ

ইলম দুই প্রকার। এক. দৈহিক জীবনের ইলম, দুই. আধ্যাত্মিক জীবনের ইলম। দৈহিক জীবনের ইলমের অধীনে এসব শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন- আহার, পান করা, গৃহনির্মাণ, বাজার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়াদি।

অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনের অধীনে শাখা রয়েছে– সেজদা কিভাবে করা হবে, কিভাবে আল্লাহর নিকট মাথা নত করা হবে, কিভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

করা হবে। তাই আমাদের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, কিভাবে আমাদের দীন ও ধর্ম ঠিক হবে, সুন্দর হবে; তেমনি এটারও প্রয়োজন রয়েছে, কিভাবে আমরা আমাদের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক করব।

প্রত্যেক ধর্মের মৌলিকত্ব ও মেজায ভিন্ন

তবে প্রত্যেক জাতি ও তার আইনের মেজায ও মানসিকতা আলাদা। ইহুদীবাদ একটি জাতি, তার একটি গঠন প্রকৃতি রয়েছে। খৃষ্টবাদ একটি জাতি। তারও বিশেষ মেজায ও গঠন প্রকৃতি রয়েছে। ইসলামের একটি সম্প্রদায় হলো 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাাত' যাকে হক বা সঠিক জামাত বলা হয়েছে। অন্য যেসব ফেরকা ও সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে শিয়াদের এক মেজায, সুন্নীদের অন্য মেজায। সারকথা, প্রতিটি সম্প্রদায়ের মেজায যেমন আলাদা আলাদা, পুরো মিল্লাতের মেজাযও তেমিন আলাদা। সাফ কথা, আমরা আমাদের স্বকীয়তা ও স্বভাব প্রকৃতি বজায় রেখেই নিজেদের মূলনীতির উপর চলতে পারি। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর ঘর বানাতে পারি। আমরা যদি অন্যের ভিত্তির উপর প্রাসাদ নির্মাণ করি, তাহলে তার অধিকার থাকবে, সে আগামীকাল বলে দিবে– 'ভূমি আমার। তুমি তোমার প্রাসাদ সরাও, অট্টালিকা ভেঙ্গে দাও।' তখন আপনি অসহায় হয়ে পড়বেন। নিজের অর্থে তৈরি ঘর-সম্পদ ধ্বংস করতে হবে। তবে যদি নিজস্ব জমির উপর ঘর বানিয়ে থাকেন, তাহলে কেউ বলতে পারবে না– আস্তানা হটাও, গাট্টি বাঁধো, জমি আমার! আপনি বলতে পারবেন– ভূমি, ভিত্তি এবং প্রাসাদ সবই আমার। সারকথা, সব মিল্লাতের আলাদা আলাদা প্রকৃতি ও মানসিকতা রয়েছে। তার নির্মাণের বুনিয়াদ বা ভিত্তি আলাদা।

জাহেলিয়াতের সভ্যতার ভিত্তি প্রবৃত্তির দাসত্বের উপর আর ইসলামী তমদ্দুনের ভিত্তি হকের উপর

বর্তমানে ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুনকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের আগমন হয়েছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন, সে যুগে দুনিয়াতে দুটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি ছিল পারস্য সভ্যতা। তখন পারস্যের বাদশাহ ছিলেন খসরু পারভেজ। আরেকটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক রোমান (বাইজান্টাইন) সম্রাট হেরাক্লিয়াস। রোমান সাম্রাজ্যে ছিল

খৃষ্টানদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং পারস্যে ছিল পারসিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি। এ দুটি দেশ ও তার শাসক গোষ্ঠী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। ইতিহাস পাঠ করে যা জানা যায় তাতে মনে হয় আমরা এখনও ঐ সভ্যতার এক দশমাংশেও পৌছতে পারিনি। তারা সভ্যতার এতটাই শীর্ষে পৌছে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, উচ্চ শ্রেণীর লোক ও আমিরকে ঐ পর্যন্ত আমির ও উচ্চ শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করা হত না, যে পর্যন্ত এক লাখ টাকা মূল্যের পোশাক ও অলংকার তার শরীরের শোভা না পেত। তার কটিবন্ধটি হতো দশ হাজার টাকা মূল্যের– এভাবে দামী হতো পোশাক পরিচ্ছদ। আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে কোন উচ্চ শ্রেণীর লোকও এ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি, যার শরীরে এক লাখ টাকা মূল্যের পোশাক থাকবে। এমন কেউ নেই। আর ওখানে আমিরজাদাদের শরীরে দেড় লাখ টাকা মূল্যের পোশাক থাকতো। তবেই তাকে আমির বলে গণ্য করা হতো। সোসাইটিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত। এ অবস্থা রোমানদেরও ছিল, পারসিকদেরও ছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য যদি শুধু কৃষ্টি ও সভ্যতা হত, তাহলে এর চেয়ে বড় কৃষ্টি ও সভ্যতা আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি– যা আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিজের স্থানে আজকের বৈশিষ্ট্য আলাদা রয়েছে। এখন হলো যান্ত্রিক সভ্যতা। এসব অবশ্যই তাদের ছিল না। তবে যান্ত্রিক সভ্যতা ছেড়ে যদি দালান-কোঠা, অর্থ-সম্পদ বিবেচনা করা হয় সে ক্ষেত্রে এত স্বচ্ছল ছিল যে, তারা উন্নতির শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছিল। এ সভ্যতাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইসলাম এর সমর্থন করে ঘোষণা করে দিত যে, রোমান ও পারসিকদের কৃষ্টি ও সভ্যতা ঠিক। বাস্তব উদ্দেশ্য পুরা হয়ে যেত; সাহাবীদের কোন প্রয়োজন দেখা দিত না যে, যুদ্ধ করে ঐ তাহযিব ও তমদ্দুনকে নির্মূল করে ইসলামী তাহযিব ও তমদ্দুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঐ দুটি সভ্যতার ভিত্তি ছিল প্রবৃত্তির দাসত্ব ও চাহিদার উপর। আর ইসলামী তমদ্দুনের ভিত্তি হলো আল্লাহর দাসত্ব ও তার সন্তুষ্টি লাভের উপর। কাজেই প্রকৃতি ও মানসিকতার দিক দিয়ে উভয়ে আলাদা হয়ে গেল। ইসলামী তমদ্দুন সাহাবীগণ বিশ্বে প্রচার করলেন। বরণ করলেন এর জন্য শ্রেষ্ঠতম দুঃখ-কষ্ট, চেষ্টা ও সাধনা। বর্তমান যুগে সর্বোত্তম পথ হলো সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে, যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা সামনে রেখে, যুগের চাহিদা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে, বরং সামনে রেখে দীনি বিধান অনুসারে তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং একে বিজয়ী ও শক্তিশালী করবেন। যাতে দুনিয়ার সকল জাতি আমাদের কাছে মাথা

নত করে এবং আমাদের তাহযিব গ্রহণে বাধ্য হয়। বর্তমান যুগের তমদ্দুন যেখানে ইসলামের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ হয়, সেখানে ইসলামী তাহযিব ও তমদ্দুনকে প্রাধান্য দিবে।

তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, আর তা হলো যুগের পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে যুগের মুখপাত্র আকবর এলাহাবাদী চমৎকার বলেছেন–

کیا ہوا ج جو بدبدلا ہے زمانہ نے تجھے ☆ مردوہ ہے جو زمانہ کو بدل دے ہیں

যুগের কী হল, তোমাকে পাল্টে দিয়েছে। তারাই বীর পুরুষ যারা যুগকে পাল্টে দেয়।

বীরত্ব ও বাহাদুরী, এ কথা নয় যে, আমরা মাথা নত করে নিজের দুর্বলতা ও অপারগতা ঘোষণা করব। বরং নিজেদের কাজকর্ম উন্নত নৈতিকতা দুনিয়ার সামনে পেশ করব– যাতে আমাদের উন্নত নৈতিকতা ও এর ফল দেখে দুনিয়াবাসী আমাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। আমরা এ মিশনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব। যে মিশনের সম্প্রসারণ ও প্রচারের জন্য আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি। তবে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য কষ্টকর হলো, আমরা আমাদের অপকর্মের কারণে এমন স্থানে এসে পৌঁছেছি, দুনিয়ার মানুষকে আমাদের সামনে নত করতে পারছি না। তবে অন্তত এই আবেগ উদ্দীপনা তো থাকা উচিত যে, অপরাপর তাহযিব তমদ্দুনের ভাল জিনিসগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি। এতে কোন বাধা নেই। দুনিয়াতে যখন কোনো নতুন তমদ্দুন আসে তখন তার একটি বিশেষ হাওয়া প্রবহমান থাকে। এ হাওয়া যখন চলতে থাকে তখন নিজের স্থানেও প্রবেশ করে। মানুষ তখন নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। দূরে থাকতে পারে না। এ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তবে আমাদের অন্তত এতটুকু করা দরকার, ঐসব বিষয় চিহ্নিত করব, যেসব বিষয়ে ইসলামী তমদ্দুনের সঙ্গে সংঘাত রয়েছে। আর সেসব বিষয়ে আমরা আমাদের কাজকর্ম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেব।

যুগের ঘটনাবলীর প্রতি ইসলামের চোখ বন্ধ নয়

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আপনি ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সামনে আসছে। এসব প্রতিবন্ধকতা আপনারা বেশি বুঝেন। শুনে শুনে আমরাও কিছু জানি। নিশ্চয়ই খুব দুঃসময়।

তবে যেখানে এমন জটিল বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন, সেখানে প্রতিবন্ধকতার আসল কারণ কি তাও জানতে হবে। সেখানে এমন কিছু বিষয়ও থাকে যেগুলো এসবের উত্তম পরিবর্তন হতে পারে। এসব গ্রহণ করে আপনার চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, তা কতটুকু ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন! এরপর সামঞ্জস্যহীন ও বিরোধী বিষয়গুলো সম্পর্কেও আপনাকে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। ইসলাম কতটুকু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে আর কতটুকু দেয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেমন পরিস্থিতি বা সময়ই আসুক না কেন, যেসব ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়; ইসলাম সেসব ঘটনাবলীতে আগে কখনও চোখ বন্ধ করেনি, আজও করবে না। ভবিষ্যতেও পারবে না। এগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও লক্ষ্য দেয়া হয়। এগুলোকে সামনে রেখে ইসলাম এমন সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাতে জাতির স্বার্থ নষ্ট না হয়; বরং তা রক্ষা পায়। সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে দেয়া হয়, সামান্য সংশোধন করে দেয়া হয়। কোন কোন জিনিসকে অবিকল গ্রহণ করা হয়। কোনটিকে সামান্য সংশোধন করা হয়। এসব করে কাজ চালিয়ে দেয়া হয়। আমাদেরকে কোন অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে আলাদা করা হয় না, করতে দেয়া হয় না। কোন কোন জিনিসে সামান্যতম পরিবর্তন করা হয়। কোন কোন জিনিসের নিয়ম ও পদ্ধতি বদলে দেয়া হয়। ঐ জিনিসের মুনাফা ও উপকারিতা আগের মতো থাকে। মূল জিনিসও নষ্ট হয় না এবং বৈধতার মধ্যে রাখা হয়। এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত হবে না, যে অবস্থায় কাউকে নিষিদ্ধ ও গুনাহর কাজে লিপ্ত হতে হয়– যখন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল যে, উপকারও হাত ছাড়া হবে না; আবার নাজায়েয ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে হবে না।

আমাদের এখানে মিরাট শহরে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন হাজী আবদুল গনি সাহেব। অত্যন্ত নেক ও সালেহ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দোকানে টুপি বিক্রি করা হত। তাকে দারুল উলুমের একজন ফাজিল দুটি টুপি তৈরি করে দেয়ার জন্য অর্ডার দিলেন। টুপি জরির কাপড় দিয়ে তৈরি হবে এবং জরির কাজ এত ঘন হবে যে, কাপড় দেখা যাবে না, শুধু জরির কাজই নজরে পড়বে।

পরদিন গেলেন তিনি। হাজী সাহেব বললেন, টুপির দাম ত্রিশ টাকা। এমনিতে এক টুপি পনের টাকা। ক্রেতা দেখলেন টুপিগুলো উন্নতমানের এবং তার পছন্দসই বানানো হয়েছে। তিনি বললেন– দাম আগামীকাল পাঠিয়ে দেব।

হাজী সাহেব বললেন, টুপিগুলোতে কাপড় মোটেও দেখা যাচ্ছে না। একে মুয়াররাক বা রূপা মিশ্রিত বলা হয়। যদি মুয়াররক কাজ করা হয়, তাহলে তা রূপা বলে গণ্য হয়। আর বাকিতে রূপা বেচাকেনা জায়েয নয়।

এবার ক্রেতা নিরুত্তর। তিনি বললেন– আমি দেওবন্দের ফাজিল হয়েও এ মাসআলাটি জানি না। আর আপনি দোকানে বসে এত সূক্ষ্ম মাসআলাটি জানেন! যাক, আমি পরশু মূল্য নিয়ে আসব।

হাজী সাহেব বললেন– আমি এমন উপায় বলে দিচ্ছি যাতে বাকিও হয়ে যাবে।

তিনি বললেন– কী উপায় সেটা?

: আপনি ত্রিশ টাকা আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে নগদ মূল্যে টুপি কিনে নিন। পরে ঋণের টাকা শোধ করে দিবেন। এখন ফাজিল সাহেব লজ্জিত হলেন। কথা তিনি বুঝতে পারলেন এবং অনেক অনেক শুকরিয়া আদায় করলেন; আর বললেন– আমি একথা আগে বুঝতে পারিনি।

কথা একই হলো, বেচাকেনাও হলো এবং জায়েয হয়ে গেল। মোটকথা, অনেক মাসাইল যেমন ব্যাংক, লটারী জীবনবীমা এসবে অনেক নাজায়েয বিষয় আছে। তবে এমন সুযোগও রয়েছে– যদি সামান্য পরিবর্তন করা হয় তাহলে উপকারও থেকে যাবে এবং জায়েযও হয়ে যাবে। বর্তমান যুগের সমস্যাবলীতে মুফতি ও সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার সমন্বয়ে পথ বেরিয়ে আসতে পারে। তবে এ কাজে অনেক চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষকেও চিন্তা করতে হবে। ফতোয়া দানকারী মুফতিকেও চিন্তা করতে হবে। এটা কোনো যা-তা বিষয় নয়। আপনি যদি কোনো বিষয়ে মোটামুটিভাবে জানতে চান তাহলে ফতোয়া এক রকম হবে, আর যদি বিস্তারিতভাবে ঘটনাবলী বর্ণনা করে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন তাহলে মাসআলা অন্য রকম হবে।

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– আমি ব্যবসা করি। এতে সুদী লেনদেন রয়েছে। এর হুকুম কি? আমি বলব– 'নাজায়েয হারাম।' সুদকে ইসলাম হারাম করেছে। কুরআনে পরিষ্কার আয়াত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের এই হলো উত্তর।

কিন্তু যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন– 'ব্যাংকিং সিস্টেম রয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা। তাই বাধ্য হয়ে করতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্য কোন পথ ও উপায় নেই। এ বিষয়ে ফতোয়া দিন– আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাই; আর ছোট ছোট কুড়েঘর বানিয়ে বসে পড়ি। বিশ্বের অন্যান্য জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে, আর আমরা বসে থাকব। তারা উন্নতি করবে আর আগামীকাল তারা আমাদের উপর চড়াও হবে। তখন আমরা বৈধতা ধারণ করে আঘাতের উপর আঘাত সহ্য করে যাব। আপনি যদি এ ফতোয়া দেন, তাহলে আমরা এসবের জন্য তৈরি হয়ে যাব। আর যদি আপনি এই ফতোয়া দেন যে, তোমরা অন্যান্য জাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাক। সম্মানজনক জীবন যাপন কর।

প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ উপার্জন করতে পার। তাহলে এ মারাত্মক ব্যাধির ওষুধ কি?

এসব সিস্টেমে কিছু বিষয় অবৈধতা রয়েছে। আপনি চিন্তা-ভাবনা করুন! দেখা যাবে, ব্যাপক অবস্থার উপর বিবেচনা করে আপনি যখন কোন বিশেষ বিষয় বর্ণনা করবেন আর মুফতি সাহেব চিন্তা-গবেষণা করবেন তখন অন্য হুকুম হবে। তখন কোন না কোন পথ বেরিয়ে আসবে। তবে এমন জিনিসও বের হবে, যেখানে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। শরীয়তের বিধি-বিধান সাধারণ মানুষের অধীন হতে পারে না– আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। যদি আইন ইচ্ছানুযায়ী ঘুরতে থাকে তাহলে কি তা আইন হলো? এ তো হলো মোমের তৈরি নাফ। যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দাও। মানুষকেই আইনের অধীন হতে হয়।

ইসলাম সব সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক আইন। তাই আন্তর্জাতিক অবস্থা থেকে সম্পর্কহীন হতে পারে না। যখন কোনো আইন আন্তর্জাতিক হবে, সে আইন নিজেই বলবে– আমি সব কালের সব জাতির জন্য সমান আইন। আমার পয়গাম বিশ্বের সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ের জন্য। তাহলে ঐ কানুন সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কোন জাতির স্বভাব প্রকৃতি ও মন-মানসিকতা কি রকম, তাদের রীতিনীতি কি, তাদের সমাজ নীতি কি– এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ও পূর্ণাঙ্গ দীন। ফলে এমন হওয়া সম্ভব নয় যে, তার মধ্যে সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে না। আমি তো বলি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ইসলামই সৃষ্টি করেছে। প্রাক-ইসলাম যুগে বিশ্বে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরও ছিল না। ব্যবসা বড় বড় ছিল; তবে একই দেশে, একই শহরে হত। এক দেশ থেকে অন্য দেশে সারা বিশ্বে মাল সরবরাহ করা এবং সকল স্থান থেকে দাম এসে যাওয়া– এমন ব্যবস্থা ছিল না। তার উপায়ও ছিল না। কিন্তু ইসলাম তা করে দেখিয়েছে। ইসলাম এর ভিত্তি স্থাপন করেছে।

পবিত্র কুরআন এক দুই নয়, ছয় সাত ধরনের সফর ও ভ্রমণের কথা বর্ণনা করেছে। শিক্ষা সফর, তাবলীগী সফর, চরিত্র গঠনের সফর, বাণিজ্যিক সফর, রাজনৈতিক সফর প্রভৃতি। এসব সফরের ফজিলত বর্ণনা করেছে। শ্রেণী বিভাগ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ধর্ম আন্তর্জাতিক পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক ধর্ম সমগ্র বিশ্বে চলমান এবং তা পাঠাচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা– যিনি অতীত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত– তিনি জানেন এ যুগে আন্তর্জাতিক দীনের প্রয়োজন। কাজেই আন্তর্জাতিক উপায় উপকরণও থাকতে হবে। যাতায়াতের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও যানবাহন থাকতে হবে। এক দেশ থেকে

অন্য দেশে যাওয়া সহজ হবে। এক দেশের সংবাদ অন্য দেশে পৌছানো সহজ হবে। যেহেতু সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক হবে। বিশ্ববাসীর সামনে আন্তর্জাতিক দীনও হবে। এমন আন্তর্জাতিক দীন যাতে বিশ্ব মানবতার মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যায়। যখন একটি জেনারেশন শেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় জেনারেশন স্থান পূরণ করে, তখন বিশ্বে অনেক পরিবর্তন হয়। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। যখন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আপোস করার সময় এমে যায়, তখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তাহজিব তমদ্দুন বদলে যায়। তাই ইসলাম এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে। প্রতি শত বছর পর আমি মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠাবো, যিনি দীনের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন। এজন্য পরবর্তীদের অবস্থার অনুকূল রাখা হবে। তাদের মানসিকতার অনুকূলে তাদের ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে তারা দীন বুঝতে সক্ষম হয়।

জাতির মধ্যে যখন তাসাওউফ প্রাধান্য লাভ করেছে তখন ইসলাম নিজেকে তাসাওউফের পোশাক ও আবরণে উপস্থাপন করেছে, যাতে সুফী মেজায মানুষ বুঝতে পারে। সুফিয়ানা দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের তাফসির লেখা হয়েছে। যেমন- মহিউদ্দিন ইবনে আরবী, ইমাম গাযালী তাফসির লিখেছেন। একটা যুগ ছিল বুদ্ধিবৃত্তির। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে ছাড়া কোন কিছু বুঝতে ও মানতে প্রস্তুত ছিল না। তখন এমন সংস্কারক মনীষীগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন, যারা কুরআন হাদীসকে বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তিতর্কের রঙে পেশ করেছেন। ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ এ কাজ করেছেন। বিবেক-বুদ্ধির নিরিখে তাফসির প্রণয়ন করেছেন। পবিত্র কুরআনের মাসাইলকে নির্ভেজাল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আরেক যুগ আসলো, যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাধান্য ছিল। তখন ঐ রঙে কুরআন হাদীস পেশ করা হল। পবিত্র কুরআনের এ পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে। তার এত সুন্দর হেচারায় যে কোন পোশাক পরিয়ে দাও, সৌন্দর্য অবিকল থেকে যাবে। সুন্দরই দেখাবে তার চেহারাকে। যে রঙের জাতিগত সম্প্রদায়ের সামনে আসবে, ইসলাম সেই রঙে নিজেকে পেশ করবে। ইসলামে যে ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে, এটা কি করে সম্ভব হবে যে, বিশ্বের জাতিগুলোর মন-মেজায ও মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর ইসলাম সকলের জন্য একই পয়গাম পেশ করবে, তাদের মানসিকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না! ইসলামে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা রয়েছে। এদের প্রতি নিশ্চয়ই সে লক্ষ্য করবে।

আর এমন সব জিনিস যেগুলো তাদের সত্তাগত কারণে নিষিদ্ধ, বিশেষ সময়ে তা বৈধ হয়ে যায়। তবে প্রয়োজন হল প্রশ্নকারী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেন না করেন। যে যে

বিষয়ে তিনি লিপ্ত ঐসব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বাস্তব ঘটনার মতো করে পেশ করবেন। এমনভাবে প্রশ্ন করবেন না যে, অমুক জিনিস জায়েয অথবা নাজায়েয। বীমা বা ইনস্যুরেন্স জায়েয কি না? এর সোজা উত্তর, নাজায়েয। অমুক অমুক জিনিস নাজায়েয। তবে যখন এসব বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করবেন, তখন সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে। তখন পথ বের হবে। নিঃসন্দেহে ইসলাম শরাবকে হারাম করেছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ইসলাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। সময়ে এ হুকুম পরিবর্তন হতে পারে। ইসলাম একথাও বলেছে– কোন রোগী যদি এমন হয় যে চিকিৎসক বলে দিয়েছে, শরাব পান ছাড়া সে বাঁচবে না, তার জীবন রক্ষা পাবে না, সে ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে– সে শরাব পান করে তার জীবন রক্ষা করবে। এভাবে শূকর ইসলামে নাপাক, অপবিত্র বলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু তার রক্ত মাংসই নয়; বরং সবকিছু অপবিত্র বলা হয়েছে। নাজায়েয ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে, আহারের অন্য কিছু না থাকে, সে ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। একে শূকরের মাংস খেতে দাও, মৃত জন্তুর মাংস খেতে দাও। এভাবে শিরকি কালেমা উচ্চারণ করা, কেউ যদি তরবারী নিয়ে মুসলমানের মাথার উপর দাঁড়িয়ে যায়– কুফরি কথা বল, নইলে এখনই তোমার শিরোচ্ছেদ করা হবে; তখন ইসলাম তাকে অনুমতি দিয়েছে। অন্তরে দৃঢ়ভাবে ঈমানকে পোষণ করে মুখে কুফরি কথা বলে ফেলবে। এখন কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন– কুফরি কথা বলা জায়েয না নাজায়েয? আমি বলব– সম্পূর্ণ হারাম, নাজায়েজ। এ দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এমনভাবে জিজ্ঞেস করে– আমি নীতিগত প্রশ্ন করছি না। আমি এ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই– এক ব্যক্তি আমার মাথার উপর তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুফরি কথা বল, নইলে তোর শিরোচ্ছেদ করা হবে। তখন হুকুম হবে যে, তোমার জন্য কুফরি কালেমা বলে ফেলা জায়েয।

সুতরাং আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, একটি জিনিস সত্তাগত নিষিদ্ধ থাকে কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় সুযোগ থাকে। ইসলাম চরম উদারতা ও চরম রক্ষণশীলতার ধর্ম নয়। এ হলো মধ্যপন্থী ধর্ম। যেখানে উভয় বাহুর প্রতি লক্ষ্য রয়েছে।

তাই আমি আরজ করছিলাম, বিষয় মাত্র দুটি। এক হলো, দিয়ানত যা ইবাদতের মধ্যে রয়েছে। আরেক হলো মুয়াশারাত। সামাজিকতা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে, তালাক, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া প্রদান, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, ফৌজদারী দেওয়ানী– সবই এর অধীন। এসবের

নীতি বর্ণনা করা হয়েছে– যা সম্পূর্ণ মধ্যম ও ন্যায়ানুগ, ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন। এতে প্রত্যেক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে। তবে জাতি এদিকে মনোনিবেশ করবে, শিখবে, বুঝবে অথবা শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করবে, আমল করবে। তবে শর্ত হলো, প্রশ্ন করবে বিস্তারিতভাবে। যেভাবে ইস্তেফতাকারী ও প্রশ্নকারীর জন্য কর্তব্য, চিন্তা করে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করবে তেমনি ফতোয়া প্রদানকারী মুফতিদেরও কর্তব্য ঘটনার সব দিক বিবেচনা করে মাসআলা প্রদান করবেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবেন না। এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সঠিক হবে আশা করি। এতে এমন সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, যা জাতির স্বার্থের অনুকূল হবে এবং নাজায়েয হারাম কাজে লিপ্ত হতে হবে না।

মুফতির কাছে বিস্তারিত বর্ণনার দ্বারা নতুন সুযোগ বের হতে পারে। তাই প্রয়োজন মতো প্রশ্ন আপনারা সাজাবেন। উত্তর প্রদানের জন্য আমরা আলেমদের কমিটি গঠন করে দেব। তারা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন এবং আপনাকে শরীয়তের হুকুম ও বিধান কি সে সম্পর্কে ফতোয়া দিবেন। হয়তো বলবেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করুন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড় পর্বতে চলে যান। তবে আপনি (মুফতী) সত্যিকার দেশপ্রেমিক হলে দেশ ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সুযোগ সুবিধা করে ফতোয়া প্রদান করুন। যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা ইসলাম দিয়েছে, তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিন।

মুফতি সাহেব সর্বোচ্চ এ কথা বলবেন, তুমি দোষী, তুমি নাজায়েয কারবার করছো। আমি বলি, দোষী ব্যক্তিদের জন্যও সুযোগ দেয়া হয়। সন্দেহ দ্বারা দোষী ব্যক্তি উপকৃত হয়। যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে দোষী ব্যক্তির সাজা মওকুফ করা হয়। আমরা দোষী তা স্বীকার করি। কিন্তু এর সাথে কিছু সন্দেহ রয়েছে। এসব সন্দেহের সুযোগ আমরা পাব। সুযোগ আমাদেরকে দিতে হবে। ঘটনা উপস্থাপনকারীকে বিস্তারিত ঘটনা বলতে হবে। বর্তমান যুগে সংক্ষিপ্ত ও অগভীর বর্ণনায় কাজ চলবে না। এটা বাস্তব কথা। কিন্তু আমরা তা জানি না। আমরা এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নই। আমরা কিভাবে জানব, বীমা কি? ইনস্যুরেন্স কি? যেহেতু আমরা বীমার ব্যবসা করছি না। আপনারা জানেন, আপনারা বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

শরীয়তের বিধান ও নির্দেশ বলে দেয়া আমাদের মুফতিগণের কাজ। আপনি যদি ঘটনা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন, তাহলে আমাদের কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। আমরা এ কথাই বলব, আপনি যা করেছেন তা হারাম। কিন্তু যদি ঘটনা বিস্তারিত সামনে আসে, তখন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ফতোয়া দেয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত এই মজলিসে এতটুকু আরজ করতে পারি। বক্তাগণ যা বলেছেন, তা পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা বুঝতে পারিনি। কিন্তু মোটামুটি এতটুকু অনুমান করতে পেরেছি, দীন ও দুনিয়া এ দু'য়ের মধ্যে আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে। দীনকেও সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষাগারকে হেফাজত করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যও সংরক্ষণ করে টিকিয়ে রাখতে হবে। ব্যবসায়ীগণ যদি তা না করেন তাহলে মাদ্রাসাও চলতে পারবে না। উলামারা কিতাব ছাপাতে পারবেন না। কোন কাজই হবে না। দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। বিস্তারিত কথা শরীয়তের সামনে পেশ করেই সমাধান করা যেতে পারে। ফতোয়া নেয়া যেতে পারে। তাহলে মানুষ শান্তিতে থাকবেন। নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমরা কোন নাজায়েয কাজ করছি না। দুনিয়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতের সব কাজের জন্য আমরা প্রস্তুত। আমরা আলেমদের একটি জামাত এ কাজে লাগিয়ে দেব। তারা চিন্তা ও গবেষণা করে এ সম্পর্কিত আহকাম বলে দিবেন। আপনার কাজ হবে বিস্তারিত ঘটনা আমাদের সামনে পেশ করবেন, যেন এর উপর হুকুম দেয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

কয়েকটি কথা আমার আরজ করার ছিল। সবশেষ আমি আমার বুযুর্গ ভাইদের এবং মুসলমান আফ্রিকাবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, তারা আমার কদর করেছেন। সম্মান করেছেন। বাস্তবিকই আমি এর যোগ্য ছিলাম না। এ কেবল আপনাদের দয়া ও মহানুভবতা, আমি শুকরিয়া আদায় করছি। অন্তরে এর ছবি নিয়ে দেশে ফিরব। এ কেবল মৌখিক শুকর নয়। অন্তরও তা স্বীকার করছে। যেখানেই যাব অন্তরে তা থাকবে, তা স্বীকার করব।

আর সবচে' খুশির বিষয় হলো, বৈরী পরিবেশে অবস্থান করেও আপনাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি রয়েছে। আপনারা চাচ্ছেন, আমাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে দীন ও ঈমান অবশিষ্ট থাক। আপনারা এ-ও বলছেন যে, প্রত্যেক জাতির স্বভাব-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন থাকে। আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্র ত্যাগ করতে রাজি নই– যদি এ আবেগ উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকে তাহলে কাজ খুব সহজ। ঘটনা বলবেন, ফতোয়া সে অনুযায়ী হবে। তারপর ইনশাআল্লাহ! মারাত্মক কোন অসুবিধা থাকবে না। যা সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। আমরা কোন কোন বিষয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে গেছি। সঠিক জায়গায় ফিরে আসতে হবে।

ইসলাম এতটা বেশি অগ্রসর হতে বলেনি। একেবারে পেছনমুখীও করেনি। আবার সবার আগে যেতেও বলেনি। মধ্যবিন্দুতে কায়েম থাকতে হবে।

সারকথা, এসব হলো সম্মানযোগ্য ও মূল্যবান কথা। আমি দোয়া করি, ভবিষ্যতেও করবো, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের অসুবিধাকে দূর করে দিন। সহজ-সরল পথ বের করে দিন, আপনাদের দীন-ধর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করুন। এখন নামাযের সময় হয়েছে। এ কয়েকটি কথা আরজ করার ছিল, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করছি।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বয়ান : ১৫

দরসে বুখারীর সমাপনী অনুষ্ঠান

ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়; বরং তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ একটি দীন। একটি জীবন বিধান। যে ব্যক্তি এ দীন সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হবে; সে ইলম ও কামালাত, জ্ঞান ও পূর্ণতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ইহজগত ও পরজগতের সকল রহস্য তার জন্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ইলমের কেন্দ্র।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، أَدْعُو إِلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

বুযুর্গানে মুহতারাম, প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

বুখারী শরীফ খতম করার পর্ব শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সবশেষ হাদীস শরীফ পাঠ করা হয়ে গেছে। দোয়াও করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাব বুখারী শরীফ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

جَعَلْتُه بَيْنِىْ وَ بَيْنَ اللهِ حُجَّةً

আমি এই কিতাবকে আমার এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে প্রমাণস্বরূপ রেখেছি। এই কিতাবের একটি শুভ ফল হলো, বুখারী খতম করে যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উম্মতের সব যুগের আমল এমন রয়েছে। এজন্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, যখন বুখারী শরীফ খতম করা হয় তখন মাহফিলও করা হয়। সকলের দোয়া ও মুনাজাতের মধ্যমে খতম করা হয়। বর্তমানে এ প্রথা আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাইরে থেকে লোকজনকে দাওয়াত করে আনা হয়। তবে আমরা ছাত্র জীবনে দেখেছি, হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.), মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) যখন বুখারী শরীফ খতম করাতেন তখন বাইরে থেকে কাউকে দাওয়াত করা হতো না। শুধু দারুল উলুমের শিক্ষক, ছাত্র-কর্মচারী ও পরিচালকগণ একত্রিত হতেন, সমবেত হতেন। খতমে বুখারী শরীফে শরীক হতেন। এ সিলসিলা এখনও চালু রয়েছে। যখনই বুখারী শরীফ খতম করা হয় তখন দারুল উলুমের সকলে এবং শহরের অধিবাসীরাও সংবাদ পেলে এসে যান; আর দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

সারকথা, বুখারী শরীফ খতম উপলক্ষে দোয়া করার প্রথা উম্মতের মাঝে প্রথম থেকেই চালু আছে। পাঠ দানের মাধ্যমে যখন খতম করা হয়, তখন তো বাস্তবিক খতম করা হয়, দোয়াও করা হয়। এখনও গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ ও সমস্যা দেখা দিলে, মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসলে অথবা কারো কোনো মাকসাদ (উদ্দেশ্য)-এর জন্য বা একাধিক মাকসাদের জন্য বুখারী শরীফ খতম করানোর প্রথা বিভিন্ন মাদ্রাসা এবং দারুল উলুমে চালু রয়েছে। বিভিন্ন দরখাস্ত ও আবেদন একত্র হয়ে গেলে ছাত্র-শিক্ষক সমবেত হয়ে খতম করেন, দোয়া করেন। এ খতমে তাৎক্ষণিক ফলাফলও দেখা গেছে। আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল ও মঞ্জুর করেন।

বুখারী শরীফের পবিত্রতা

ইমাম বুখারী (রহ.) এই পবিত্র কিতাবকে তাঁর নিজের ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যে হুজ্জত বা প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন। হুজ্জত হওয়াই উচিত। কারণ, যে আগ্রহ উদ্দীপনা এবং পবিত্রতার সঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ) এই কিতাব সংকলন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত অন্য কোন মুহাদ্দিসের মধ্যে পাওয়া যায় না। হারাম শরীফে গিয়ে এ কিতাব প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছেন। তিনি বলেন-

প্রত্যেকটি হাদীস যখন আমি লিখছিলাম, তখন লেখার আগে গোসল করেছি। দু'রাকাত নফল নামায পড়েছি এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মুনাজাত করেছি– 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হাদীসটি ইনশেরাহ (সঠিক ও সন্দেহমুক্ত) করে দাও।'

যখন আমার অন্তর হাদীস ও তার অর্থ সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে যেত, তখনই কেবল হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতাম।

তার মানে, বুখারী শরীফে প্রায় কম বেশি সাত হাজার হাদীস রয়েছে। সুতরাং চৌদ্দ হাজার রাকাত নফল নামায পড়ে ইমাম বুখারী কিতাবটি প্রণয়ন করেছেন। প্রত্যেক হাদীসে আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করেছেন।

হাদীস নিজেই পবিত্র বিষয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম, তাঁর বাণী। তারপর সংকলনকারী ইমাম বুখারী (রহ.) যিনি ইলমে হাদীসে মুমিনদের নেতা। তাঁদের নয়নমণি। এর সংকলন হারাম শরীফে। প্রত্যেক হাদীসে দু'রাকাত করে নফল নামায। পবিত্রতার উপর পবিত্রতা। এ কিতাব হুজ্জত হবে না কেন? হুজ্জত হয়েছে।

উম্মতের মধ্যে এই আমল অবিরামভাবে সব সময় রয়েছে। বুখারী শরীফ খতম করে দোয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করবেন। এজন্য আমি আরজ করেছি, বুখারী শরীফের হক আদায় হয়েছে। হাদীস পড়া হয়েছে। দোয়া মুনাজাতও করা হয়েছে। এখন প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উস্তাদগণ করে থাকেন। এ সম্পর্কে আমি কি আরজ করব! আমার ইলম তাঁদের চেয়েও অনেক কম। কাজেই এ হকও আদায় হয়ে গেছে অথবা হয়ে যাবে। যে উস্তাদ বুখারী শরীফ শিক্ষা দান করেছেন, তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। আর আমার দ্বারা যে পরিমাণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব তা তিন বছর আগে এখানে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম। যখন বুখারী শরীফ খতম হচ্ছিল, তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম। হাদীসের উপর তাকরির হয়েছিল। ভবিষ্যতের জন্য তাই যথেষ্ট। এখন এ পবিত্রতম মাহফিলে নিজের আনন্দ প্রকাশ এবং মোবারকবাদ দেয়াই উদ্দেশ্য।

সূচনা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

মানুষের আমলের মধ্যে দুটি জিনিসকে আনন্দ-উৎসব ও মোবারকবাদের যোগ্য মনে করা হয়। এক. কোন জিনিসের শুরু এবং দুই. সমাপ্তি। শুরুর সময় মানুষ আনন্দ-উৎসব করে। আবার শেষ হওয়ার সময়ও। সন্তান জন্মগ্রহণ করলে

আনন্দ-উৎসব করা হয়। মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আর আজ সন্তানের মহৎ মানবজীবনের সূচনা হচ্ছে। তাই সূচনাতে এই আনন্দ-উৎসব। কোন ব্যক্তি প্রথমে গাছ রোপণ করে। বন্ধু-বান্ধব দাওয়াত করে মিষ্টি বণ্টন করে। বাগানের সূচনা হচ্ছে। কোন ব্যক্তি দোকান খুলে তার মুরব্বি ও বুযুর্গদেরকে দাওয়াত করে। তাদের দিয়ে দোকান উদ্বোধন করে, মিষ্টি বিতরণ করে, আনন্দ প্রকাশ করে। মোটকথা, মানব জীবনের সূচনা হোক অথবা তার কোন কাজকর্মের সূচনা হোক, উভয়ই আনন্দের বিষয়। এ কারণে বিষয়ের শুরুটাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

কেউ যখন কোনো একটা কাজের সূচনা করে, পরবর্তীতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে যায়। অমুক কাজ অমুক কথার সূচনা অমুক ব্যক্তি করেছিল। সূচনা একটি মর্যাদা, একটি সম্মান।

ইলমের নূর বা জ্যোতি

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজিলত, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, সেসব হাদীসের সূচনারও একটা বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূর (হাকিকত) সৃষ্টি করেছেন।

মূল কথা, নূর দ্বারা বাহ্যিক নূর উদ্দেশ্য নয়। যেমন চন্দ্র-সূর্যের নূর বা আলো থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নূর'-এর তুলনায় এদের নূর নেহায়েত কম, সাধারণ ও তুচ্ছ। ঐ নূর ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকিকত ও মহিমার। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকিকত সৃষ্টি করেছেন। আর এটাই হলো নূর। অর্থাৎ আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। এ নূর বাহ্যিক নয়; বরং তা মানভী বা তাৎপর্যমণ্ডিত নূর। আর মানভী নূরসমূহের মধ্যে ইলমের নূরই সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাহ্যিক নূর বা আলোতে আপনি পথ দেখেন। ভাল-মন্দ জিনিস দেখেন। কোন পথে চলবেন, কোন পথে চলা উচিত হবে না, তা বুঝেন। সূর্যের আলোতে আপনি পথ চলেন। বাধা-বিঘ্ন পার্থক্য করেন। ইলমের নূর ও আলো এরচে' বহুগুণ বেশি গুণসম্পন্ন। এ নূর দ্বারা যে কোন জিনিসের ভাল-মন্দ বোঝা যায়। ইলমের আলোতে হালাল হারাম জায়েয নাজায়েযের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কোনটি আল্লাহর পছন্দনীয় কোনটি অপছন্দনীয়, কোনটিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট কোনটিতে অসন্তুষ্ট তা জানা যায়। সাফ কথা, এসব

জিনিসের পার্থক্য সূর্যের আলো দ্বারা হবে না, হতে পারে না। সূর্যের আলো আকার-আকৃতি দেখাতে পারবে। আর ইলমের নূর জিনিসের হাকিকত বা তাৎপর্য দেখাবে। হাকিকতসমূহের মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ সৃষ্টি করবে। আমার আকৃতি দেখানো কোন বড় কাজ নয়, মহৎ কাজ নয়। এজন্য সূর্যের আলো বিশেষ কোন গুরুত্ব দাবি করতে পারে না। হারিকেন, কুপি বাতি ও বিদ্যুতের আলো রয়েছে। এগুলোতে আকার আকৃতি রঙ রূপ দেখা ও পরিচয় করা যায়। কিন্তু ইলমের নূর দ্বারা মৌল প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। শরীয়তসমূহের মূল তত্ত্ব বোঝা যায়। শরীয়তের আদেশ নিষেধের শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। আদেশ-নিষেধের কারণ কি তা জানা যায়। ঐ 'কারণের' মাধ্যমে অন্য আহকাম বের করা যায়। রহস্যাবলী ও মূল তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। সুতরাং ইলমের নূর সূর্যের নূরের তুলনায় অনেক অনেক গুণ উপরে।

হাকিকতে মুহাম্মদিয়া

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকিকত হলো ইলমের নূর। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌল প্রকৃতিতে ইলামের নূর সংমিশ্রণ করে দেয়া হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

পূর্বাপর সকল ইলম ও জ্ঞান আমাকে দেয়া হয়েছে।

তিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। মানব-দানব, জিন-ফেরেশতা অন্য কাউকে এ ইলম দেয়া হয়নি, যে ইলম হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আলেম। তা কেন? এজন্য যে, তার মূল প্রকৃতি ইলমের খামির দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য তাঁর দীন ও শরীয়ত ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন হুকুম এমন নেই যার মধ্যে হেকমত (জ্ঞান ও রহস্য) না আছে। কোন হুকুম এমন নেই যার মধ্যে যুক্তি ও বিবেকের সমর্থন না আছে। হুকুম ও আদেশের এমন আকৃতি নেই যার মধ্যে তাৎপর্য না আছে। এক একটি অক্ষরের মধ্যে রহস্য ও তাৎপর্যের সাগর লুকিয়ে আছে। কুরআন শরীফকে তাঁর মু'জেযা রূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। জ্ঞানে ভর্তি মু'জেযা হচ্ছে কুরআন– যার গর্ভেও জ্ঞান পরিপূর্ণ রয়েছে। নবীর সত্তা ইলম দ্বারা তৈরি। এমন শরীয়ত তাঁকে প্রদান করা হয়েছে, যা ইলমে পরিপূর্ণ। শরীয়তের এমন আদেশ-নিষেধ নেই যার গভীরে 'কারণ' বিদ্যমান

নেই। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে ঘোষণা করেছেন–

أَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

আমি এবং আমার অনুসারীগণ দীন সম্পর্কে বসীরত (অন্তর্দৃষ্টি)-এর উপর রয়েছি। আল্লাহরই পবিত্রতা এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [ইউসুফ : ১০৮]

অর্থাৎ ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়; বরং তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ একটি দীন। একটি জীবন বিধান। যে ব্যক্তি এ দীন সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হবে; সে ইলম ও কামালাত, জ্ঞান ও পূর্ণতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ইহজগত ও পরজগতের সকল রহস্য তার জন্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ইলমের কেন্দ্র।

নবুওয়তের কামালাত ও তার শেষ সীমা

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন নাবীঈন বা সর্বশেষ নবী বানানো হয়েছে। খতমে নবুওয়তের অর্থ নবুওয়তকে শেষ করে দেয়া নয় যে, দুনিয়া থেকে নবুওয়তকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। খতমে নবুওয়তের অর্থ নবুওয়তকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে দেয়া। নবুওয়তের কত স্তর, মর্যাদা ও গুণাবলী রয়েছে তার সব হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তায় কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে। এখন নবুওয়তের এমন কোন দরজা ও মর্যাদা নেই, যার জন্য অন্য কোনো নবী প্রেরণ করা হবে। নবীর মাধ্যমে ঐ মর্যাদা এ গুণ প্রকাশ করা হবে। নবুওয়তের সকল কামালাত ও গুণাবলী তা জ্ঞান সম্পর্কিত হোক, চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কে হোক– সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সত্তার উপর পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এসবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের সকল গুণাবলীর পরিসমাপ্তি। আখলাক ও নৈতিকতার প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি কেবল ধৈর্যশীলই নন; বরং ধৈর্যশীলদের নেতা। শাকীর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীই নন; বরং শাকীরদের শীর্ষ স্থানে রয়েছেন। লজ্জাশীলই নন; বরং লজ্জাশীলদের সরদার। লজ্জার সকল স্তর তাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে। গয়রত ও হানিয়ত বা মর্যাদাবোধ ও ঘৃণামাখা ক্রোধ, বীরত্ব দানশীলতা প্রভৃতি যত সৎ ও উন্নত স্বভাব

চরিত্র রয়েছে, তিনি সবার শেষ সীমায় অবস্থান করেছেন। নৈতিকতার সকল স্তর এখানে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

আখলাক ও চরিত্রের শ্রেণীবিন্যাস

আখলাক ও চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এতে তিনটি স্তর বা শ্রেণী বের করা যায়। খুলুকে হাসান বা সৎস্বভাব, খুলুকে করিম বা সচ্চরিত্র ও খুলুকে আজিম বা মহান স্বভাব চরিত্র। খুলুকে হাসান সম্পর্কে হযরত ইবরাহিম (আ.)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেছিলেন– خَلِيلِي حَسِنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ 'হে আমার বন্ধু! সদ্ব্যবহার কর, তোমার সামনে কাফেরই হোক না কেন।'

দ্বিতীয়, খুলুকে করিম। মানুষকে করিম স্বভাবের হওয়া। তা হলো দ্বিতীয় স্থান। আর তৃতীয় স্থান হলো খুলুকে আযিমের। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ আমি প্রেরিত হয়েছি মহান চরিত্র পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য।

আখলাকের সংজ্ঞা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে আখলাকে করিম, আখলাকে হাসান এবং আখলাকে আযিমের পরিপূর্ণ সমাবেশ হয়েছে। এ তিনটির প্রভেদ বা পার্থক্য কি? খুলুকে হাসান-এর অর্থ ন্যায় ইনসাফ ক্ষমতা একদিক থেকে যা হবে, অন্যদিকেও তাই হবে। আপনার সঙ্গে যদি কেউ এক পয়সার ব্যবহার করে, তবে আপনার কর্তব্য হবে এক পয়সা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তখন বলা হবে, আপনি খুলুকে হাসান দেখিয়েছেন। সমান সমান ব্যবহার করেছেন।

আপনাকে যদি কেউ চড় মারে তাহলে আপনারও অধিকার রয়েছে চপেটাঘাত করার। যদি চড়ের বদলে ঘুষি মারেন, তাহলে বলা হবে, আপনি মন্দ ব্যবহার ও অসৎ ব্যবহার করলেন। আসলে সমান করার অধিকার ছিল। আপনাকে চপেটাঘাত করা হয়েছে। আপনারও সমপরিমাণ চপেটাঘাত করার অধিকার ছিল। যেহেতু আপনি চপেটাঘাত না করে ঘুষি মেরেছেন, তাই তা অন্যায় ও মন্দ স্বভাব বলে গণ্য হবে। সে এ পরিমাণ করেনি যা আপনি করলেন। এখন

আপনি শাস্তির যোগ্য। অতএব খুলুকে হাসানের অর্থ ন্যায়, ইনসাফ ও সমতা। ভাল-মন্দে সমতা রক্ষা করা হলো খুলুকে হাসান।

খুলুকে করিম খুলুকে হাসানের উপরের স্তর। আপনার সঙ্গে কেউ যদি মন্দ ব্যবহার করে তবে আপনি প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ক্ষমা করে দিবেন। মাফ করে দিবেন। এ হলো খুলুকে করিম। আর যদি প্রতিশোধ নেন তাহলে খুলুকে হসান; কিন্তু শর্ত হলো সমান সমান হতে হবে। আর যদি মাফ করে দেন, এক টাকার পরিবর্তে দু'টাকা দিয়েছেন– অথচ এক টাকার পরিবর্তে এক টাকা দিতে পারতেন– এক্ষেত্রে বলা হবে আপনার ব্যবহার খুলুকে করিম। আপনি করিমুন নফস ব্যক্তি। সারকথা, ন্যায় ও ইনসাফের উর্ধ্বে যা করা হয়, তাকে খুলুকে করিম বলা হয়।

আর তৃতীয় স্তর হলো, খুলুকে আযিম। আর তা হলো এই– কেউ যদি আপনার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, অন্যায় অত্যাচার করে, তাহলে আপনি কেবল প্রতিশোধ গ্রহণ ত্যাগ করেননি। আপনি কেবল ক্ষমাই করেননি; বরং মন্দ ও অন্যায়কারীর উপর দান-দক্ষিণাও করলেন, সাহায্য সহায়তাও করলেন। এটাই খুলুকে আযিম বা মহান চরিত্র।

রাসূল (সা.)-এর চরিত্র

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

মাফ করে দিন, মুর্খদের উপদেশ দিন, ক্ষমা করে দিন।

তারপর বলা হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ

আল্লাহ আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহমত ভরে দিয়েছেন। এ কারণে আপনি কোমল হৃদয় বিশিষ্ট, কারো সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট দেখে আপনি অস্থির হয়ে পড়েন। অন্তর ব্যথায় গলে যেতে চায়–

لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.

আপনি যদি কঠোর হৃদয় হতেন, তা হলে আপনার চারপাশে যারা সমবেত

রয়েছে, তারা পালিয়ে যেত। আপনার চরিত্র-মাধুর্য এদের আকর্ষণ করে রেখেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কী ছিল? প্রথমে বলা হলো, এদেরকে ক্ষমা করে দিন। একথা বলা হয়নি, ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ করুন; বরং যদি কেউ মন্দ ব্যবহার করে, মাফ করে দিন। ত্যাগ ও কুরবানী করুন। প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করবেন না। আপনার মহান সত্তা প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক উপরে। যদিও ন্যায়ানুগ প্রতিশোধ গ্রহণ খুলুকে হাসানের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আপনার চরিত্র মহানুভবতার অনেক উপরে। আপনার মহত্ত্বের স্তর হলো, মন্দ ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দিন।

তারপর হলো اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ঐ মন্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের জন্য মাগফেরাত ও ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। এটা আরো এক ধাপ উপরে। কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, আর আপনি দোয়া করছেন। وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ . তাদের থেকে পরামার্শ গ্রহণ করুন। এ মর্যাদা আরো এক ধাপ উঁচু। এসবের নাম হলো খুলুকে আযিম। খুলুকে আযিমের মধ্যে খুলুকে করিম ও খুলুকে হাসানও রয়েছে।

তরতিব ও বিন্যাসের স্তর

আম্বিয়াগণ (আ.) মহৎ চরিত্র ও গুণাবলীর কেন্দ্র। এর সবই তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু তাদের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়তে হাসান ছিল; সে অনুযায়ী তিনি তাঁর উম্মতের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তোমার সাথে কেউ যদি মন্দ বা খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তোমার কর্তব্য হবে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। মুসা (আ.)-এর শরীয়তে ক্ষমা করা জায়েয ছিল না। মুসা (আ.)-এর শরীয়তে ক্ষমা করা জায়েয ছিল না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ.

আমি তাঁদের উপর এই বিধান আবশ্যক করে দিয়েছিলাম। যদি তোমার সাথে কেউ মন্দ আচরণ করে তাহলে ক্ষমা করা জায়েয হবে না। প্রতিশোধ নিতে হবে। যদি কেউ দাঁত ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তোমার কর্তব্য তুমিও তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দাও। কেউ যদি চোখ নষ্ট করে দেয় তাহলে তোমারও কর্তব্য তার চোখ নষ্ট করে দেয়া। কেউ যদি চপেটাঘাত করে তুমিও চপেটাঘাত কর। প্রতিশোধ গ্রহণ ওয়াজিব ছিল। ক্ষমা করা জায়েয ছিল না। এ ছিল ঈসা (আ.)-এর

শরীয়ত। এ শরীয়তের উপর তাঁর উম্মতকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। খুলুকে হাসানের উপর ছিল তাদের তরবিয়ত।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ আসলো। তিনি খুলুকে করিমের তরবিয়ত গঠন করলেন নিজ উম্মতকে। যদি কেউ মন্দ ও গর্হিত ব্যবহার করে তবে প্রতিশোধ গ্রহণ জায়েয নয়। ক্ষমা করা ওয়াজিব ছিল। মুসা (আ.)-এর শরীয়তে চরম কঠোরতা ছিল। আর ঈসা (আ.)-এর শরীয়তে নম্রতা। এই নির্দেশ যে, যদি কেউ তোমার বাম গালে চড় মারে তাহলে তুমি ডান গাল পেতে দাও– 'ভাই! আরো একটি আঘাত করে যাও। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।' প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি ছিল না। তা জায়েযও ছিল না। ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব ছিল। মাথা নত করে বিনয়ের সঙ্গে থাকা ওয়াজিব ছিল। তাহলে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি বিনয়ী হয়ে থাকবে। এতেই ছিল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। এ প্রশিক্ষণ ছিল খুলুকে করিমে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে খুলুকে আযিম বা মহান চরিত্রের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কেউ যদি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তুমি তার সাথে ভাল আচরণ কর। ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অন্যের মন্দের পরিবর্তে ভাল কর, সে গালি দেয়, তুমি তার জন্য দোয়া করো।

হযরত জুনায়েদ (রহ.) জাহাজের আরোহী ছিলেন। হজ করতে যাচ্ছিলেন। মানুষ তাকে চিনতে পারেনি। কেউ মন্দ বলল, কেউ বকাবকি করল। কেউ অন্য কিছু বলেছিল। তারা গালি দিচ্ছে। আর হযরত জুনায়েদ দোয়া দিচ্ছিলেন– হে আল্লাহ! এদেরকে হেদায়েত করুন। তাদেরকে ঐ মর্যাদা দান করুন, যা আমাকে দান করেছেন। তারা মন্দের চেষ্টা করছে আর তিনি ভালোর জন্য চেষ্টা ও দোয়া করছেন। এভাবে এই উম্মতের প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে খুলুকে আযিম মহৎ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রান্তিকতার মর্যাদা

এসব বলার উদ্দেশ্য, আখলাকের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বোত্তম স্তর হল খুলুকে আযিম। এর উপরে আর কোন স্তর নেই; এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। তিনি সকল আখলাক ও কামালাতসমূহের সমন্বয়ে এ গুণে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। আগের ও পরের সব ইলমও তাঁকে দান করা হয়েছিল। তিনি ইলমের সমষ্টি ছিলেন। আগের যুগের সব অবস্থা তাঁর

মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি জামেউল আহওয়াল ছিলেন। এজন্য তাঁকে খাতামুন নাবিঈন বানানো হয়েছে। তিনি ইলম, আমল, আখলাকের সকল পূর্ণতার শেষ সীমায় অবস্থান করছিলেন। এ কথাই তিনি বলেছেন– اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ সর্বপ্রথম আমার প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ প্রকৃতি ইলম ও গুণাবলী দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু যদি এসব পরে সৃষ্টি করা হত, অন্য কিছু আগে সৃষ্টি করা হত, তবুও কামালতের কেন্দ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হতেন। কিন্ত প্রথম হওয়ার মর্যাদা দান করা হয়েছে। তিনি সবার শেষে এসেছেন। একদিকে প্রথম, অন্যদিকে সবার শেষ। সকল কামালাত ও গুণাবলীতে তিনি সবার প্রথম এবং শেষ। তাঁর দিকে রুজু করতে হবে। তাই সবার প্রথম হওয়া একটি মহামর্যাদা।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ مِنْهُ الْقَبْرِ কবর থেকে আমিই উঠব, তারপর সবাইকে উঠাব। আবু বকর ও উমরকে উঠাব। তারপর জান্নাতুল বাকীতে যাব। যারা ওখানে মাদফুন (সমাধিস্থ) রয়েছেন, তাদের উঠাব। তারপর মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লার মানুষকে উঠাব এবং সবাই আমার সঙ্গে থাকবেন। কবর থেকে সবার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠবেন। এ মর্যাদাও তাঁর রয়েছে– اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ আমিই সবার আগে জান্নাতের দরজা খুলব। আমার নেতৃত্বে বিশ্বের সকল উম্মত চলবে। আমিই প্রথম শাফাআত করব। সকল উম্মত আমার পতাকার তলে থাকবে। দুনিয়া ও আখেরাতের যত প্রথম ও সূচনা রয়েছে সবই তাঁর জন্য রাখা হয়েছে। এতে বোঝা গেল, শুরু করা একটি মহামর্যাদা। এ কারণেই সকল মহান কাজের শুরুতে আনন্দ-উৎসব করা হয়।

আনন্দ উৎসবের পূর্ণাঙ্গতা

এভাবে দ্বিতীয় স্তর হলো কাজেরও পূর্ণতা লাভ করা। এতেও আনন্দ-উৎসব করা হয়। যখন কোন জিনিস পরিপূর্ণ হয়ে যায়, পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে, তখন আনন্দ-উৎসব করা হয়। আজ কাজটি পূর্ণ হয়েছে। বাচ্চা যদি শিক্ষা সমাপ্ত করে, সার্টিফিকেট লাভ করে, আপনি তখন দাওয়াত করেন। এজন্য যে, ছেলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে; সে জ্ঞান লাভের দরজায় পৌঁছে গেছে। পাঠ গ্রহণের যে ধারাবাহিকতা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ শেষ হবারও আনন্দ-উৎসব রয়েছে।

আপনি হয়তো বলবেন, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আনন্দ-উৎসব ঠিক আছে। কিন্তু আপনার কথা মতো মৃত্যুর দিনেও আনন্দ-উৎসব করা উচিত। অথচ সেদিন মাতম করা হয়। কান্নাকাটি করা হয়। কেউই আনন্দ-উল্লাস করে না। ঐ নীতি অনুসারে যখন জন্মের সময় আনন্দ করা হয়, তাহলে শেষ সময়ও আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

আমি বলি, শেষ সময়ও আপনারা আনন্দ-উৎসব করেন। মৃত্যুর উপর কেউ কোনোদিন দুঃখিত হয় না; বরং মৃত্যু যখন ভালো হয়, ঈমানের সঙ্গে হয় তখন আপনারা বলে থাকেন, বড় চমৎকার মরণ হয়েছে। বড় ভাল মানুষ ছিল। আল্লাহ এমন মৃত্যু সবাইকে নসীব করুন। মৃত্যু তো আছেই, মরতে হবেই; কিন্তু কাম্যমৃত্যু নসীব হয়েছে। আনন্দের কথা, শান্তি ও খুশির কথা। কেউ যদি শাহাদাত বরণ করে, তখন আপনি বলবেন, মৃত্যু তো যথাসময়ে আসবেই; কিন্তু শাহাদাত লাভ তা ভাগ্যের কথা, কত আনন্দের বিষয়।

মৃত্যুতে আনন্দ-উল্লাস

মৃত্যু মানে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ। আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ কি দুঃখ-কষ্টের কথা? মানুষ দুঃখ করে বলবে– হায়! অমুক ব্যক্তি কেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল? হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اللهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلٰى مَنْ يَعْلَمُ اَنِّىْ رَسُوْلُكَ

হে আল্লাহ! ঐ ব্যক্তিদের অন্তরে মৃত্যুকে প্রিয় করে দাও,
যারা আমাকে রাসূল বলে স্বীকার করে, বিশ্বাস করে।

কেন মহব্বত করবে, কেন মরণকে প্রিয় করে দেয়া হবে? এর কারণ বলা হয়েছে–

اِنَّ الْمَوْتَ جِسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ

মরণ একটি সেতু, যাকে অতিক্রম করে মানুষ প্রকৃত বন্ধুর সাক্ষাৎ ও মিলন লাভ করে। নিজে প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু আল্লাহর সঙ্গে বান্দার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার মাধ্যম। এটা তো হতে পরে না যে, বান্দা আল্লাহর দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভ করবে আর আপনি বসে বসে বিলাপ করবেন, মাতম করবেন।

আসলে মরণ আনন্দেরই বিষয়। তারপরও আমরা দুঃখ করি, শোক প্রকাশ

করি। এ দুঃখ ও শোক মৃত্যুর জন্য নয়; বরং তা হলো বিচ্ছেদের শোক। আমার প্রিয়জন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এজন্য দুঃখ নয় যে, কেন মরে গেল। আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ কেন করল; বরং আমাদের একটি নেয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখ। এ দুঃখ মৃত্যুর জন্য নয়। এ দুঃখ বিচ্ছেদের। অমুক ব্যক্তি আমাদের থেকে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো।

প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হলো বিচ্ছেদের, মৃত্যুর জন্য নয়। বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তার জন্য দুঃখ নয়। মৃত্যু আনন্দের ব্যাপার। আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক আনন্দের আর কিছু নয়।

ইবনে কারিজ (রহ.) বলেন–

خرم آن روز گزیں منزل ویراں بروئیم ☆ تا در میکدہ شاداں وغزل خواں بروئیم

কখন সে মোবারক দিন আসবে। এ ধ্বংসশীল বিশ্বকে ত্যাগ করব এবং নিজের প্রকৃত মাহবুব আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবো।

প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ

হযরত বেলাল (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হচ্ছিল। মুখমণ্ডলে আনন্দের এমন ছাপ ছিল যা জীবনভর আর কখনো দেখা যায়নি। মানুষ জিজ্ঞেস করল– মৃত্যু যাতনা হচ্ছে আর আপনি চরম উৎফুল্ল ও আনন্দিত? বললেন–

غَدًا نَلْقَى مُحَمَّدً ص اَوَّاَصْحَابَه

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে কাল সাক্ষাৎ হবে। এজন্য আমি আনন্দিত, শান্তি রয়েছে আমার অন্তরে।

মৃত্যুর আনন্দ সম্পর্কে সেসব মনীষীকে জিজ্ঞেস করুন যারা অপবিত্র বিশ্বকে ত্যাগ করে পবিত্র আলমে গিয়েছেন। এখানকার বন্ধু-বান্ধব– যাদের বন্ধুত্ব সন্দেহজনক ছিল, তাদের ত্যাগ করে সে বন্ধুদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যাদের বন্ধুত্বে কোন সন্দেহ সংশয় নেই।

মনসুর (রহ.) বেশিরভাগ সময় কবরস্থানে যেতেন। মানুষ জিজ্ঞেস করত– জনবসতি ত্যাগ করে কবরস্থানে যান কেন?

উত্তরে বলতেন– ঐ সমাজের সাথে থাকি, যারা গীবত বা পরনিন্দা করে না, অকল্যাণ কামনা করে না, চোগলখোরী করে না। মৃত্যুর পর মানুষের মন্দ সব কিছু শেষ হয়ে যায় এবং নেকীগুলো প্রকাশিত হয়। এসব পেয়ে মানুষ আনন্দিত হয়। আর নবী ও ওলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ তো পরম আনন্দের কথা। আমার বলার উদ্দেশ্য, আপনারাও আনন্দিত হন। মৃত্যু আনন্দিত হওয়ারই বিষয়। কিন্তু বিচ্ছেদের দুঃখ-কষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। তাই আনন্দ-উৎসব চাপা পড়ে যায়। যদি বিচ্ছেদের দুঃখ-কষ্ট না হতো, তাহলে মানুষ হয়তো মৃত্যুর সময় বাদ্যযন্ত্র বাজাত। বলত, 'বড় ভাল হয়েছে, আল্লাহর দিদার ও সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে।' কিন্তু এ আনন্দের উপর বিচ্ছেদ-ব্যথা প্রাধান্য লাভ করে। তাই মানুষ অশ্রু বিসর্জন করে। সুতরাং অর্থ হলো, আনন্দের দু'টি জিনিস রয়েছে। সূচনা ও সমাপ্তি।

প্রকৃত আনন্দ

শুরুতে আশার উপর আনন্দ-উৎসব করা হয়। প্রাথমিকভাবে মানুষ আশা পোষণ করে– 'আমি আজ পড়তে বসলাম, আশা করি আট বছরে আলেম হয়ে যাব।' আশার উপর আনন্দ-উৎসব করে। আজই আনন্দের কোন কিছু হয়নি। যদি বাগান করেন, তবে শুরুতে আনন্দ-উৎসব করেন। এ আশায় যে, কিছু দিন পর বাগানে ফল ফুল আসবে। আমরা উপকৃত হব। সারকথা, শুরুর সময় আনন্দ কেবল আশার উপর হয়ে থাকে। বাস্তবতার উপর হয় না। কিন্তু সমাপ্তির সময় আনন্দ-উৎসব বাস্তব ভিত্তিক হয়ে থাকে। জিনিস পূর্ণতা লাভ করে।

আপনারা যেদিন বুখারী শরীফ শুরু করেছিলেন সেদিন যে খুশি ছিল তা ছিল আশা ভিত্তিক। এখন আশা পূর্ণ হয়েছে। আপনারা সারা বছরে বুখারী পড়ে শেষ করেছেন। আশার উপর আনন্দ ছিল। আর এখন পড়া শেষ করেছেন। এখন একটি কাজের সমাপ্তির উপর উৎসব করছেন। আজকের দিন আমাদের জন্য নেহায়েত আনন্দের দিন। বুখারী শরীফের দরস সমাপ্ত হয়েছে।

শেষ হওয়ার অর্থ, অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সকল হাদীস পাঠ করে, আজ এ স্তরে পৌঁছে গিয়েছি যে, আমরা সাত হাজার হাদীসের আলেম। যোগ্যতা অনুসারে আমরা ইলম হাসিল করেছি। এ ইলম আমাদের অন্তরে রয়েছে। সমাপ্তিকালে যে আনন্দ-উৎসব করা হয় তা হলো জিনিসের পূর্ণতা লাভের উপর ভিত্তি করে। কেবল আশার উপর নয়। সুতরাং আজ অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির দিন। বুখারী শরীফ সমাপ্ত হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক

চিন্তার বিষয়, শেষ হওয়ার পর কেন আমরা আনন্দ-উৎসব করি। আপনি বুখারী শরীফ পাঠ করে দু'টি জিনিস লাভ করেছেন। হাদীসের মতন। তার অর্থ ও উদ্দেশ্য– যা আপনাদের উস্তাদগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিতাবুল ঈমান (ঈমান অধ্যায়) ও এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর অর্থ। ইলম অধ্যায়ের হাদীসসমূহের অর্থ। তাহারাত (পবিত্রতা) সালাত, যাকাত, হজ, মুয়ামালাত (লেনদেন), জিহাদ, গাযওয়া– এসবের অর্থ হাদীসের মতন সব আপনাদের কাছে পৌঁছেছে। আপনারা এর অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন। আর দ্বিতীয় হলো সনদ লাভ করেছেন।

আপনি বলবেন, আমার কাছে এ হাদীস আমার উস্তাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাঁকে তাঁর উস্তাদ হতে– এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলা পৌঁছে গেছে এবং আপনার আত্মার সম্পর্ক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মার সঙ্গে স্থাপিত হয়ে গেছে। একটি নূরানী সিলসিলার মাধ্যমে হাদীসের শব্দ ও অর্থ আপনার অন্তরে এসে গেছে। হাদীসের মতনের সাথে সাথে আপনি সনদও লাভ করেছেন এবং আপনি স্বীকৃত আলেম হয়ে গেলেন।

সনদের প্রয়োজন

শুধু আলেম হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রমাণযোগ্য আলেম হওয়া দরকার। যে আলেমের নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সেই প্রকৃত আলেম। যদি আপনি দেখেন কারো সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অথবা কোন সম্পর্কই স্থাপন করা হয়নি। কোন উস্তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেনি, সনদ হাসিল করেনি, তরবিয়ত হাসিল করেনি। এরপর সে যা বলবে, তা হবে তার পাঠ ও চিন্তা-গবেষণার ফল। নিজের প্রবৃত্তিকে ইমাম বানিয়ে বলছে। আমি যা বুঝেছি তাই প্রকাশ করছি। পরিষ্কার কথা, তা আল্লাহর দেয়া অর্থ ও উদ্দেশ্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত উদ্দেশ্য হবে না; বরং তার প্রবৃত্তি নির্ধারিত অর্থ উদ্দেশ্য হবে।

এ কারণে যে, তিনি 'শব্দ' আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে গ্রহণ করেছেন, আর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়েছেন নিজের থেকে। শব্দ হলো উদ্ধৃত, আর অর্থ হলো নিজস্ব। এ অর্থ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে অর্থ সনদসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসালসালাত

মুহাদ্দিসগণ সনদের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা শুধু শব্দ ও অর্থের হেফাযত ও সংরক্ষণই করেননি; বরং অবস্থা ও অঙ্গভঙ্গিও বর্ণনা করেছেন। যে ভঙ্গি ও অবস্থা হাদীস বর্ণনা ও শোনার সময় ছিল। তারা উস্তাদের কাইফিয়ত, অবস্থা ও অঙ্গভঙ্গিও সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন, বর্ণনা করেছেন। এজন্যে মুসালসালাত সম্পর্কে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ الدر الثمين স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে শুধু শব্দ ও অর্থই রেওয়ায়েত করেননি; বরং বিভিন্ন অবস্থা ও অঙ্গভঙ্গিও বর্ণনা করেছেন। ঐসব কাজকর্মের সনদ রয়েছে যেসব কাজকর্ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দেখিয়ে ছিলেন। যেমন- হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি ঐ বলেন–

صَافَحْتُ بِكَفِّيْ هٰذِهِ كَفَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি আমার এ হাত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাতে মুসাফাহা করেছি। আমার হাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে রেখেছি।

এরপর বলেন–

فَمَا مَسَسْتُ خَزًّا وَّلَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত থেকে বেশি নরম মুলায়েম কোন রেশমও দেখিনি। এমন নরম ও মুলায়েম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ছিল। আমি আমার এই হাত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুসাফাহা করেছি।

তাবেঈ বলেন– 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার হাত আপনার হাতের উপর রাখব। তাহলে এই সিলসিলা পরোক্ষভাবে আমার হাতও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে রাখা হবে।' এভাবে এই হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

উচ্চ সনদ

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) আমাকে বললেন– 'বর্তমানে আমার সনদ আমাদের জামাতের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আমার মাধ্যম কম। আমার মন চায়, তোমাকে হাদীসের ইজাযত ও সনদ দিয়ে দিব। তবে শর্ত হলো, সাহারানপুর এসে হাদীসের সনদ নিতে হবে।' আমি আরজ করলাম, হযরত! আমি হাজির হব। যৌবনকালের কথা ছিল স্মরণ থাকেনি, ভুলে গিয়েছিলাম। এক বছর পার হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে এক সফরে একত্রিত হলাম। হযরত বললেন, 'তুমি আসনি কেন? আমি তোমাকে হাদীসের ইজাযত প্রদান করতাম।' তারপরও এক বছর পার হয়ে গেল। যৌবনকালের কথা। তারপর জানতে পারলাম, হযরত হিজরত করে মদীনায় চলে যাচ্ছেন। এবার চিন্তা হলো, এ দৌলত আর পাওয়া যাবে না। হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। তখন আমি সাহারানপুরে সফর করলাম। হযরতের খেদমতে হাজির হলাম। আরজ করলাম– 'হযরত! আমি হাজির হয়েছি।' তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে বললেন– 'মাদ্রাসার কুতুবখানা থেকে হাদীসের যেসব বড় কিতাবাদি রয়েছে সব নিয়ে আস।' তিনি সিহাহ সিত্তাসহ মুসনাদ, মু'জাম– সব কিতাব নিয়ে আসলেন। প্রত্যেক কিতাবের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করে হযরত আমাকে ইজাযত প্রদান করলেন। আমাকে কিছু পড়ালেন। কোন কোন কিতাব রেওয়ায়েত করারও অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর বললেন– 'মুসালসাল হাদীসেরও ইজাযত প্রদান করব। মুসালসাল মুসাফাহা সম্পর্কিত হযরত আনাসের যে হাদীস রয়েছে, এ হাদীসের ইজাযত মুসাফাহা করে তাঁর হাতের উপর আমার হাত রেখে প্রদান করলেন এবং হাদীস বর্ণনা করলেন। মুসাফাহা ধারাবাহিকভাবে সনদ সহকারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। এভাবে তোমার হাত যেন এসব হাতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের উপর রাখা হল।'

এভাবে দ্বিতীয় হাদীস, যা খেজুর ও পানি দিয়ে মুসালসাল রয়েছে। তাও ইজাযত দিলেন। খেজুর খাওয়ালেন, পানি পান করালেন। এ হলো হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর আনলেন; নিজে খেলেন এবং আলীকে তা খেতে দিলেন। পানিও পান করলেন। অবশিষ্ট পানি আলীকে পান করতে দিলেন। যেন খেজুর ও পানির

দাওয়াত করা হয়েছে। তারপর ঐ হাদীস শুনালেন। খেজুর ও পানি দিয়ে দাওয়াত করলে কি ফজিলত পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রা.) এভাবে তাঁর শাগরিদকে ইজাযত দিয়েছেন। নিজে খেজুর খেয়ে অবশিষ্ট খেজুর শাগরিদকে দিয়েছেন। পানি পান করেছেন এবং অবশিষ্ট পানি তাঁকে দান করেছেন। তারপর হাদীস পড়েছেন। এ আমলটি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। হযরত মাওলানা খলিল আহমদ (রহ.) খেজুর ও পানি (জমজমের পানি) আনলেন। খেজুর খেয়ে পানি পান করে অবশিষ্টটুকু আমাকে দিলেন। এরপর হাদীস নকল করলেন এবং ইজাযত প্রদান করলেন। আমল করে এ দুই হাদীসের ইজাযত প্রদান করলেন। তার সকল মুসালসাল হাদীসের ইজাযত দিলেন। তিনি বললেন, আমি ইজাযত দিলাম। তুমি হাদীস রেওয়ায়েত করতে পার।

আমার আরজ করার উদ্দেশ্য, মুহাদ্দিসীন কেবল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি; বরং ভাবভঙ্গি সব কিছু সনদ সহকারে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

মুহাদ্দিসীনের সতর্কতা

সাধারণ একটি কথা, আমি মিশকাত শরীফ আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে পড়েছিলাম। যখন মাতম ও বিলাপ সম্পর্কিত হাদীস আসলো, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে এ প্রথা চলে আসছিল। যখন কোন মহামানবের মৃত্যু হতো, তখন সে ওসিয়ত করে যেতো, ছয় মাস পর্যন্ত অথবা এক বছর, দু'বছর পর্যন্ত আমার জন্য মাতম ও বিলাপ করবে। স্পষ্ট কথা, এত অশ্রু কোথায় পাওয়া যাবে? সেটা সম্ভব ছিল না। আর যদি অশ্রুপাত না করা হয় তাহলে মানুষ বলবে– মৃত ব্যক্তি আসলে বড় লোক ছিল না। সাধারণ মানুষ ছিল। সুতরাং ছয় মাস মাতম কর, যেন বুঝা যায় মৃত ব্যক্তি বড়লোক ছিল। এখন ছয় মাস পর্যন্ত কে কাঁদবে? তখন মাতম ও বিলাপকারিনী নারীদের ভাড়া করা হতো। তারা ছয় মাস বসে বসে মাতম করত। মহিলাদের রাখা হত। চোখের পানি ফেলা তাদের জন্য সহজ। ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। কাজেই মাতম ও বিলাপের জন্য নারীদের থেকে উত্তম কেউ ছিল না। তাঁদেরকে ভাড়া করা হতো। টাকা দেয়া হত। আহার ও পোশাক পরিচ্ছেদ দেয়া হত।

তাদের নিয়ম কি ছিল? ঘরে বসা আছে, পানাহার করছে, আমোদ-স্ফুর্তি করছে। যখন দেখবে কোন মানুষ শোক প্রকাশের জন্য আসছে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠাক হয়ে

বসে পড়বে এবং কাঁদতে শুরু করবে– তুমি পাহাড় ছিলে, তুমি সূর্য ছিলে, চন্দ্র ছিলে– এমন ছিলে, তেমন ছিলে! পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আব্বা আমাকে রাঁ রাঁ করে কেঁদে দেখালেন। আমি অবাক হলাম। এর কী দরকার ছিল? তারপর নিজেই বললেন, 'তোমার মনে প্রশ্ন হতে পারে, আমি রাঁ রাঁ কেন করলাম?' বললেন– 'আমি যখন হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর কাছে হাদীস পড়ি তখন তিনিও রাঁ রাঁ করে দেখান এবং বলেন, তিনি যখন শাহ আবদুল গনি (রহ.)-এর নিকট হাদীস পড়েন তখন তিনিও এ হাদীসে রাঁ রাঁ করে দেখিয়ে ছিলেন। শাহ আবদুল গনি বলেন– তাঁকে শাহ ইসহাক সাহেবও তা করে দেখিয়েছেন। শাহ ইসহাক বলেন– তাঁকেও শাহ আবদুল আজিজ সাহেব এসব করে দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন– আমি যখন শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর নিকট হাদীস পড়ি তখন তিনি এরূপ করেছিলেন। শাহ ওলিউল্লাহ বলেন, আমি যখন শাযখ আবু তাহির মদনী (রহ.)-এর নিকট হাদীস পড়ি তখন তিনিও রাঁ রাঁ করে দেখিয়েছেন। এভাবে সাহাবী পর্যন্ত রাঁ রাঁ-এর সনদ পৌঁছে দিয়েছেন।

মুহাদ্দিসগণ এত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, তারা কেবল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দই বর্ণনা করেননি, বরং আকার, ভঙ্গিও বর্ণনা করেছেন। অবস্থা ও সে ভঙ্গি সনদসহ পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে একথা বুঝা যায় যে, পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে হাদীস শুনেছেন। বর্ণনা করেছেন।

সনদহীন আলেম

যার কাছে সনদ নেই, শুধু অনুবাদ দেখে হাদীস বর্ণনা করে, সে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যার সনদ নেই, তাকে আলেম বলা হবে না। বড়জোর নাকিল বা উদ্ধৃতিদাতা বলা যাবে। উদ্ধৃতি যদি সঠিক হয় তাহলে বলা হবে সঠিক উদ্ধৃতিদাতা। আর যদি ভুল হয় তাহলে বলা হবে ভুল উদ্ধৃতিদাতা; তবে আলেম বলা হবে না। কারণ, আলেমের জন্য সনদ শর্ত। সনদ বিহীন ইলম, ইলম নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সনদের প্রয়োজন নেই। জ্ঞানজনিত বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি আমাদেরও রয়েছে, তাদেরও ছিল। হতে পারে তারা ভুল করেছেন। আমরা বলে, দিব ভুল করেছেন। আমাদের বুদ্ধি এমন বলে– প্রত্যেককে বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে। একজনের বুদ্ধি অন্য জনের জন্য প্রমাণ হতে পারে না। কারণ, সে ভুল করতে পারে। তবে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। উস্তাদ হাদীস বর্ণনা করে বলবেন, আমার উস্তাদ এমন বলেছেন। তিনি বলবেন, আমার উস্তাদ এমন বলেছেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত সনদ পৌঁছে যাবে– তিনি এমন বলেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা ওহী। মানে হচ্ছে, আল্লাহ আমাকে এমন বলেছেন। আমাদের সনদ আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যদি মধ্যে একটি কড়া ভেঙ্গে যায়, তাহলে ইলম বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না। আলেমও বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না।

সনদবিহীন আলেমের উদাহরণ

এর উদাহরণ এমন– পার্থিব উত্তরাধিকারী আইনে যে পর্যন্ত পিতা থেকে বংশ ও নসব প্রমাণিত না হবে, আপনি উত্তরাধিকারী হবেন কেমন করে? প্রথমে প্রমাণ করতে হবে, এই ব্যক্তি অমুকের ছেলে। তারপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সে অংশ পাবে। আর যদি প্রমাণ করতে না পারে এবং মানুষও বলে, সে অমুকের ছেলে নয়, সে মিথ্যা বলছে, তার পিতা অন্য কেউ, তাহলে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। উত্তরাধিকারী হতে হলে বংশ প্রমাণিত হতে হবে। পিতার সঙ্গে বংশ প্রমাণিত হলে তখনই কেবল তার উত্তরাধিকারী স্বীকার করা হবে। ঠিক তেমনি নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো ইলম। এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঐ ব্যক্তিই হতে পারে, যার সম্পর্ক আধ্যাত্মিকভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত রয়েছে। পার্থিব উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য দৈহিক বংশ পরিচয় প্রয়োজন আর এখানে আধ্যাত্মিক বংশের প্রয়োজন। ওখানে পার্থিব ও দৈহিক বংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হয় না। এখানেও আধ্যাত্মিক বংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হবে না।

সুতরাং আমরা ঐ ইলমকে ইলম বলি যে ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পৌঁছেছে। আর যে ইলমকে মানব মস্তিষ্ক আবিষ্কার করেছে, জনশ্রুতি, কথাবার্তা অথবা কেউ অনুবাদ দেখে বলে দিয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। এমন ব্যক্তিকে আলেম বলা হবে না। আলেমের জন্য সনদ প্রথম শর্ত। কোন উস্তাদের কাছে ইলম হাসিল করতে হবে। তার ইলমী বংশ-যোগাযোগ কোথায় পৌঁছেছে; যদি শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে তাহলে আমরা বলব– পিতাবিহীন পুত্র। পিতাবিহীন পুত্র উত্তরাধিকারী হয় না। সারকথা, সনদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বরকত হাসিলের মাধ্যম

সে কারণেই মুহাদ্দিসীন বলে থাকেন–

لَوْ لَا الْاِ سْنَادُ لَبَطَلَ الدِّيْنُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ.

দীনের ব্যাপারে যদি সনদ না থাকে, তাহলে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। যার যা ইচ্ছা তাই বলে দিবে।

বলবে, এ হলো দীন-ধর্মের কথা। প্রত্যেকের এ অধিকার থাকবে। তবে আমরা যখন জিজ্ঞেস করব, এর সনদ কি? তুমি কার শাগরিদ? তিনি কার শাগরিদ? তারপর এবং তারপর? যে পর্যন্ত সনদ পেশ না করবে, তার ইলমকে ইলম বলব না, গ্রহণও করবো না। সনদ হল অত্যাবশক।

আপনার জন্য সর্বোত্তম ও মোবারকবাদের যোগ্য জিনিস হলো সনদ। বুখারী শরীফ সমাপ্ত হয়েছে; আপনারা সনদ হাসিল করেছেন। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বংশ-যোগাযোগ হয়েছে। আপনি তাই বলছেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। সেসব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বুঝিয়ে ছিলেন এবং সাহাবীগণ তাবেঈকে, তাবেঈ তাবে-তাবেঈকে বুঝিয়ে ছিলেন। আপনারা মতন হাসিল করেছেন। যার মাধ্যমে ইলমের দরজা খুলেছে, সনদ হাসিল করছেন। এতে আপনাদের ইলম বিশ্বস্ত ও অন্যদের জন্য প্রমাণিত হয়েছে। সনদ ছাড়া ইলম হুজ্জত হয় না। এ জন্যে মুহাদ্দিসীন সনদকে খুবই প্রয়োজনীয় বলেছেন।

রেওয়ায়াতের গুরুত্ব

এর মধ্যে দরজা ও মর্যাদা রাখা হয়েছে। সেই ব্যক্তির রেওয়ায়েত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য যে তার শায়খের সাহচর্যে বেশি সময় কাটিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনাকারী এমন, যিনি উস্তাদের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং একটি হাদীস শুনেছেন। আরেক হলো ঐ ব্যক্তি, যিনি এক বছর দু'বছর নিজের শায়খের খেদমতে কাটিয়ে হাদীস শিক্ষা করেছেন। সারকথা, যিনি দু'এক বছর শায়খের খেদমতে থাকবে, সে শুধু কথা ও কাজই শিখবে না; বরং তার অন্তরে ঐ রঙ এসে যাবে, যে রঙ উস্তাদের অন্তর থেকে প্রভাব ফেলেছিল। তাই যে শাগরিদ অনেক সময় সাহচর্য লাভ করেছেন তার রেওয়ায়েতের যে মূল্য ও মর্যাদা হবে তা ঐ রাবী বা বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েতের হবে না, যার সাক্ষাৎ হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র। হাদীস শুনে চলে গেছেন, সনদ ঠিক। কিন্তু সনদের সাথে ঐ সকল অবস্থা মুনতাকিল প্রভাবিত হবে না, যা উস্তাদের অন্তরে ছিল। আর এ-ই হলো প্রকৃত জিনিস।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

আল্লাহ রঙে সব রঙের উপর প্রাধান্য রয়েছে; আল্লাহ তায়ালা ঐ রঙ তাঁর নবীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। নবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের অন্তরে ঢেলেছেন। সাহাবীগণ তাঁদের সহচরের মাধ্যমে তাবেঈনদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। তাঁরা তাবে-তাবেঈনদের অন্তরে পৌঁছিয়েছেন। সেসব কাইফিয়ত অনুভূতি ও যওকের রঙও প্রভাব ফেলে এসেছে। আমরা ঐ ইলম সঠিক বলে গ্রহণ করব যা উপর থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ নিজের অনুভূতি ও মানসিকতার চিকিৎসা নিজের উস্তাদ দিয়ে করিয়ে নেব, যাতে আমাদের অনুভূতিও সঠিক হয়ে যায়। নিজের অনুভূতিকে উস্তাদের সামনে পেশ করব। আমাদের অনুভূতি শুদ্ধ না ভুল। আমাদের অনুভূতিও সেরূপ হওয়া উচিত, যেমন আল্লাহর রসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল। যওকও তা-ই হবে যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল।

সঠিক অনুভূতি

সঠিক অনুভূতির হলো এই– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর চারটি প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে– يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ প্রথম কাজ হলো, তিনি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবেন। আল্লাহ প্রদত্ত শব্দগুলো পূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিবেন। তারপর يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ কিতাবের শিক্ষা দিবেন। তালিম হলো– অর্থ বুঝিয়ে দেয়া, আল্লাহর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দেয়া। তারপর বলা হয়েছে– وَالْحِكْمَةَ হেকমত শিক্ষা দিবেন। হেকমত দু'প্রকার ১. দর্শনশাস্ত্র ও ২. কর্মশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্র আলেমের মধ্যে এসে গেছে। থাকলো হেকমত আমলী। সুতরাং বালাগত বা অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এক শব্দের যখন দুই অর্থ হয় এবং একটি প্রথম শব্দ এসে যায়, তখন দ্বিতীয় অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং হেকমত দ্বারা হেকমতে আমলী উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলের নমুনা দেখাবেন। কোন আমল কিভাবে করতে হবে। অতএব শব্দ দিয়ে ভাব বর্ণনা করলেন, অর্থ দিয়ে উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন আর হেকমত দ্বারা আমল করে দেখালেন– এ জাতীয় আমল পেশ কর। চতুর্থ দায়িত্ব হলো وَيُزَكِّيْهِمْ আত্মাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করবেন। এ হলো ঐ যওক ও অনুভূতিকে ঠিক করা যাতে আত্মায় কোন রকম বক্রতা না থাকে। আত্মা সরল-

সোজা হয়ে যায়। বিবেক-বুদ্ধি ভেজালমুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ ও রাসূলের যে কথা বর্ণনা করা হয়, তা নির্দ্বিধায় অন্তরে প্রবেশ লাভ করে। বক্রতা অবশিষ্ট না থাকে। সারকথা, সুস্থ আত্মা ও সঠিক অনুভূতি তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাসিল হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের তরবিয়ত করেছেন। তাদের অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। কোনো রকম বক্রতা থাকেনি।

দিলে যদি বক্রতা থাকে তাহলে যে আয়াতই নজরে আসবে মনে মনে সে অর্থই বুঝবে যা প্রকৃত অর্থের বিপরীত। কারো অন্তরে যদি খৃষ্টবাদের প্রভাব থাকে এবং খৃষ্টবাদের অনুভূতি নিয়ে কুরআন পাঠ করে তাহলে প্রত্যেক আয়াতে খৃষ্টবাদ দেখতে পাবে। মনে যদি কাদিয়ানিয়ত নিয়ে কুরআন পাঠ করে তাহলে সম্পূর্ণ কুরআন কাদিয়ানিয়াত দেখতে পাবে। কারণ, কুরআনের শব্দ ও বাক্য অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। আয়াত ও শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। একথা উস্তাদগণ বুঝাবেন যে, উদ্দেশ্য হলো এই, উদ্দেশ্য সেটা নয়। যদি প্রশিক্ষণ না হয় তাহলে একাধিক অর্থ থেকে মানুষ ঐ অর্থ গ্রহণ করবে যা তার প্রবৃত্তি ও মানসিকতার অনুকূল। সে আলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে। তা রাসূলের উদ্দেশ্য হবে না; বরং তার নফসের উদ্দেশ্য হবে। এজন্য যওক ও অনুভূতিকে ঠিক করতে হবে।

সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পেশ করেছেন; আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। নিজের কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ইলম আমল ও যওকের মাধ্যমে সাহাবীগণ তা বুঝেছেন। যদি যওক ও অনুভূতি ঠিক না হয়, আমলের নমুনা না থাকে, তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুধাবন করার কোন উপায় নেই।

কুরআন ও সুন্নাতের উদ্দেশ্য

আর এ কারণেই হযরত আলী (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে যখন খারেজিদের সঙ্গে মুনাযারা করার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন অসিয়ত করলেন– দেখো! খারেজিদের সামনে কুরআন থেকে কোনো প্রমাণ পেশ করবে না; বরং প্রমাণ পেশ করবে সুন্নত থেকে।

ইবনে আব্বাস আরজ করলেন– 'হযরত! কুরআন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বিশেষ দোয়া করে দিয়েছেন। اللهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ হে আল্লাহ! ইবনে আব্বাসকে কুরআন পাকের ইলম ও হেকমত

দান কর। আল্লাহ আমাকে কুরআনের ইলম দান করেছেন। কুরআনই আমার বিশেষ আলোচ্য। আর এ থেকে আপনি নিষেধ করেছেন? কুরআন থেকে প্রমাণ দেবো না, সুন্নত থেকে প্রমাণ পেশ করব? এর কারণ কি?

হযরত আলী (রা.) বললেন– 'কুরআনের বাক্যগুলো অত্যন্ত গভীর অর্থ ও রহস্যপূর্ণ। এক একটি বাক্য একাধিক অর্থ বিশিষ্ট হতে পারে। তুমি কোন আয়াত পড়ে একটি অর্থ বলবে, শত্রুরা ঐ আয়াতকেই অন্য অর্থে উপস্থাপন করবে। সাধারণ মানুষ মনে করবে, সেও কুরআন থেকে প্রমাণ পেশ করছে। তখন হক ও সত্য প্রকাশ পাবে না। কিন্তু যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে পেশ করো, তাহলে তাতে একাধিক অর্থ হতে পারে না। এতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির হয়ে যাবে। তাই প্রয়োজন সুন্নত দিয়ে প্রমাণ পেশ করা।

সুতরাং যারা কুরআন থেকে নিজের মর্জি মতো অর্থ বের করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, তারা হাদীসকে অমান্য ও অস্বীকার করে। তারা বলে– (আল্লাহ না করুন) এ বিপদ কোথা থেকে আসলো? এর কারণে সেই অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিল, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও বর্ণিত হয়ে আসছে এবং আমাদের সকল অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারা হাদীসকে অস্বীকার করে সরিয়ে দিতে চায়। যেন তারা পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাদের বিবেকপ্রসূত ও প্রবৃত্তির কাম্য ঐ অর্থ গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের উর্বর মতিষ্ক আবিষ্কার করেছে। সেসব লোক মনগড়া অর্থ কুরআনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা কুরআনের অর্থ হবে না; বরং এতে তাদের নফস ও প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি, স্বরভঙ্গি ও উচ্চারণ ভেদ

তাই পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে লব ও লেহজা, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গি ও স্বরভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। পবিত্র কালামের আলোচনায় এর বিশেষত্ব, পরিবেশ, সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ প্রভাব ফেলে। যখন সব বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তখন উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে কেমন করে? আমি একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমাদের উর্দু ভাষার একটি বাক্য کیا بات ہے কি কথা আছে? এর কয়েকটি অর্থ হয়। স্বরভঙ্গি ও উচ্চারণভঙ্গি দ্বারা অর্থের পরিবর্তন হতে থাকে। আমি যদি বলি کیا بات ہے কি কথা! আপনি বুঝবেন আমি প্রশ্ন করছি। বিষয়টি কি? কি ঘটনা ঘটল? আমি যদি উচ্চারণভঙ্গি সামান্য পরিবর্তন করে বলি کیا بات

ہے এখানে প্রশ্ন নেই। আপনি বুঝাতে পেরেছেন, আমি কোন জিনিসের গুরুত্ব বর্ণনা করছি। অমুক জিনিস। তা তো বেশ বড়। এখন যদি সামান্য উচ্চারণভঙ্গি পাল্টে বলি کیا بات ہے তখন আপনি কি বুঝাবেন? প্রশ্নও না। কোন জিনিসের গুরুত্বও না; বরং তাচ্ছিল্যের ভাব বুঝাবেন। আমি কোন জিনিসের উপর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করছি। তার স্বর পরিবর্তন করে আমি যদি বলি کیا بات ہے আপনি মনে করেন, আমি বিস্ময় প্রকাশ করছি। প্রশ্ন ও তাচ্ছিল্য– গুরুত্ব কিছুই না। একটি ছোট বাক্য کیا بات ہے এর কয়েকটি অর্থ হয়। আর সব অর্থই স্বরভঙ্গির দ্বারা বোঝা যায়।

মনে করুন, আপনি এই বাক্যটি পত্রে লিখে পাঠালেন। পত্রে উচ্চারণ স্বরভঙ্গি কিছুই থাকে না। তখন এই বাক্য দ্বারা ঐ অর্থই বুঝবে যে, অর্থ তার মন ও নফসকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে। আপনি যদি সামনে বসিয়ে উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গির সঙ্গে অথবা কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করে অর্থ বুঝিয়ে দেন, তাহলে নে ব্যক্তি সঠিক অর্থ বুঝতে পারবে। অর্থাৎ যে অর্থ আপনার উদ্দেশ্য। আর যদি পত্র লিখে পাঠিয়ে দেন, তাহলে ঐ অর্থই বুঝবে, যা তার নফসের উপর আগে থেকেই আসন পেতে বসে আছে। সে এই বাক্যের যে অর্থ বুঝবে ঐ বিষয়ে শব্দ আপনার হবে। উদ্দেশ্য হবে তার স্থির করা। লেখকের উদ্দেশ্য হবে না। ঠিক এভাবে কুরআন হাদীসও বুঝে নিন। উচ্চারণভঙ্গি, স্বরভঙ্গি ও অর্থের কারণে অনেক অর্থ হয়। যদি এসব জিনিসকে ত্যাগ করে শুধু শব্দকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অর্থ বুঝবে যা তার নফস ও মন-মানসিকতায় আগে থেকে প্রভাব বিস্তার করে আছে। যদি এমন করা হয় তাহলে মারাত্মক ক্ষতি ও বিপর্যের সৃষ্টি হবে। এমন অনেক হতভাগ্য রয়েছে যারা প্রতারণার মাধ্যমে দুনিয়াকে পথভ্রষ্ট করে দিয়ে বলবে– 'এ অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য।' অথচ প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য নয়। শব্দ গ্রহণ করলেন আল্লাহর কালামের, আর অর্থ স্থির করলেন নিজের পক্ষ থেকে। তবে যদি সনদ থাকে তাহলে রাসূলের বর্ণনা এসে যাবে এবং ঐ অর্থও এসে যাবে, যা পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া এবং অবস্থাসহ বর্ণনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে বিষয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে না। যদি কেউ স্বাধীন অর্থ করার প্রয়াস পায় তাহলে হাদীস ও পূর্বসূরিদের বর্ণনা দিয়ে তা বাতিল প্রমাণিত হবে। ঐ অর্থ গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য নয়, তা প্রমাণ হয়ে

যাবে। আর দুনিয়াবাসীর সামনে প্রমাণ হয়ে যাবে, কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তীদের কথাই শুধু প্রমাণযোগ্য হতে পারে।

আমরা বলি, দীন হলো ঐ বস্তু যা ধারাবাহিকভাবে সুশৃংখল রয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত আছে। শব্দের অর্থ, অবস্থা বা কাইফিয়ত সাময়িক অবস্থাসমূহ, ঘটনাবলী সব কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিল রয়েছে।

নবুওয়তের প্রয়োজন

আজ সেসব ছাত্র যারা বুখারী শরীফের পাঠ শেষ করেছেন, তাঁরা ধন্যবাদের যোগ্য। মোবারকবাদের প্রথম কথা হলো– প্রায় সাত হাজার হাদীসের মতন তারা হাসিল করেছেন, যেগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামের ঐ মর্যাদা ঐ গুরুত্ব যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রয়েছে। বরং বলা উচিত, বান্দা নিজে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত রাসূল মাধ্যম না হবেন। যেহেতু আল্লাহ হলেন নূর বা জ্যোতি আর বান্দা হলো জুলমত তথা অন্ধকার। নূর ও জুলমত একত্রিত হয় না। তাই মধ্যবর্তী একজন সৃষ্টি করলেন। সে হলো বশর বা মানুষ। তবে এত পূর্ণাঙ্গ বশর যে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত রয়েছেন। এ ধরনের বশর হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর পবিত্র জামাত। বান্দাগণের আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। নবী যদি না থাকতেন তাহলে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। পৌঁছা সম্ভব হত না। এভাবে আল্লাহর কালামও এত মর্যাদাশীল ও মহান যে, মানুষের জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তাই রাসূলের কালামকে মাধ্যম বানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কালামে পৌঁছতে পারব।

কেউ যদি মাঝখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামকে বের করে দেয় এবং লাফ দিয়ে আল্লাহর কালামে পৌঁছে যেতে চায় তাহলে সে নিচে পড়ে যাবে। আল্লাহর কালামে পৌঁছতে পারবে না। তাই সে কালাম খুবই উচ্চাঙ্গের, নেহায়েত উচ্চস্থানের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া যেমন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, তেমনি আল্লাহর কালামের গভীরে পৌঁছা ও রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত তাঁর কালামকে মাধ্যম বানানো না হবে। তা না হলে নবী প্রেরণের কোন প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা থাকে না। হযরত জিবরাঈল (আ.) কুরআন লিখে বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে রেখে দিতেন এবং

উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে দিতেন– হে লোক সকল! তোমরা সবাই আধ্যাত্মিক রোগী, আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত। আর এ হলো স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থাপত্র। তা নিয়ে যাও এবং নিজ নিজ চিকিৎসা করে নাও। তখন নবীর কোনো প্রয়োজন ছিল না, অথচ নবী প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন- চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বই পড়ে নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করা যায় না। কারণ, বই-পুস্তকে নীতি বর্ণনা করা হবে। নাড়ী ধরে রোগ নির্ণয় করা, তার শরীরের মেজায বুঝা– এসবের জন্য বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিতাবের পৃষ্ঠা প্রশিক্ষণ দিতে পারে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে মানুষ। যদি কারো চোখ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শুধুমাত্র কিতাবের পৃষ্ঠা থেকে যায়, প্রশিক্ষণ না থাকে, বাস্তব অবস্থা সামনে না থাকে তাহলে শুধু কালো অক্ষরগুলো থেকে যাবে। তাই আল্লাহর কালাম পর্যন্ত পৌঁছতে হলে রাসূলের কালামের প্রয়োজন। এছাড়া আমরা পৌঁছতে পারব না।

আজ আনন্দের দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম আপনাদের কাছে পৌঁছেছে। আর তা সনদসহ পৌঁছেছে। শুধু মুতালায়া ও পাঠের মাধ্যমে অথবা প্রবৃত্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে তা পৌঁছেনি। এতে নফসের অনেক প্রতারণা প্রবঞ্চনা থাকে। শয়তানও সাথে থাকে। খুশির কথা, মুত্তাসিল সনদের সাথে তা পৌঁছেছে এবং আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

সেসব ছাত্র ভাগ্যবান আজ যাদের সম্পর্ক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে। তাদের আত্মার সম্পর্ক নবীর আত্মার সঙ্গে তার কালামের মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে।

উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও সম্মান

এই উম্মতের প্রধান ও সর্বোত্তম মর্যাদা হলো আল্লাহর কালাম– যা তাদের কাছে সনদসহ পৌঁছেছে এবং আজও বিদ্যমান রয়েছে। আজ যদি কেউ কুরআন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করে। আল্লাহর কালাম, তার প্রমাণ ও সনদ কি? তখন উলামায়ে কেরাম উত্তর দিবেন। আমি বলব, 'আমার সনদ আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যুক্ত। আমি এ কুরআন আমার উস্তাদ কারী আবদুল ওয়াহিদ খান সাহেবের কাছে হেফজ করেছি। তাঁকে হেফয করিয়েছেন কারী আবদুর রহমান সাহেব এবং কেরাতও শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁকে কারী আবদুল্লাহ মক্কী সাহেব হেফয করিয়েছেন, কেরাত শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁকে কারী ইবরাহিম সাহেব– এভাবে সিলসিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন হযরত জিবরাঈল

(আ.)। জিবরাঈল (আ.)কে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং একজন হাফেযের সনদ আল্লাহ তায়ালা পযন্ত পৌঁছে গেছে।

পৃথিবীতে কোন গ্রন্থ এমন রয়েছে যে গ্রন্থ মুসলমান সনদসহ আল্লাহ পয়ন্ত পৌঁছেছে। যার সম্পর্কে এ দাবি করা হচ্ছে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ। তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর কোনটিরই এই সনদ নেই। সনদ রয়েছে শুধু পবিত্র কুরআনেরই।

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ.

বাপ-দাদাকে এমন বলতে শুনেছি। হতে পারে বাপ-দাদা ভুল বলেছেন। যে পর্যন্ত সনদ সামনে নেই, ভুলত্রুটি অসম্ভব নয়। তবে যদি সনদ সামনে থাকে, তাহলে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকবে না। [যুখরুফ : ২২]

রিজালশাস্ত্র বা হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা

মুসলমানরা শুধু এ পর্যন্ত এসে শেষ করেননি যে, তারা কেবল হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। তারা আরো এগিয়ে বরং হাদীসের রাবীদের (বর্ণনাকারী) স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা একটি জীবনীশাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই শাস্ত্রে পঞ্চাশ হাজার এমন মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত সংকলন করা হয়েছে, যারা হাদীসের বর্ণনাকারী। তাঁদের নাম, বংশ, স্বভাব-চরিত্র, নৈতিকতা, কর্মজীবন, স্মরণশক্তি, মেধাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা কেমন ছিল, তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন ছিল– এমন পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। এই হলো সেই কষ্টিপাথর, যার দ্বারা জানা যাবে বর্ণনাকারী কেমন ছিলেন, যাদের মাধ্যমে কিতাব (কুরআন-হাদীস) আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

সারকথা, মুসলমানরা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর রাসূলের বাণী নিয়ে বসে আছেন। তা একথার উপর নয় যে, বাপ-দাদার কাছে এভাবে শুনে আসছি–

أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ.

বাপ-দাদারাও ভুল করতে পারেন। বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগাে পারেন। তবু তোমরা বলবে, বাপ-দাদার থেকে এমন শুনে আসছি। এ কোন গ্রহণযোগ্যও বিশ্বস্ত কথা নয়; বরং এসব হলো জনশ্রুতি। আর জনশ্রুতি কোন বিশ্বাসযোগ্য জিনিস হতে পারে না। সনদ হলো এই– আমি অমুকের কাছে

শুনেছি বা শিখেছি। তিনি অমুকের কাছে শিখেছেন। এভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হবে।

দীনের প্রতিটি আংশিক বিষয়েরও সনদ রয়েছে

মুসলমানদের কাছে প্রতিটি হাদীসের সনদ রয়েছে। যদি ছোট একটি বাক্যও পাঠ করেন তবুও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তার সনদ পৌঁছে দিবেন। এর ফলে মুসলমানদের সমাজে সনদের প্রথা চালু হয়ে গেছে। তারা শুধু কুরআন ও হাদীসই বর্ণনা করেননি; বরং দীন সম্পর্কিত যে কোন বিষয় হোক না কেন, প্রত্যেকটির সনদ রয়েছে। আপনি হেদায়া পড়েন; এরও সনদ আছে। গ্রন্থ প্রণেতা থেকে আমাদের উস্তাদগণ এভাবে পড়ে আসছেন। তাছাড়া তাসাওউফেও সুফী সাধকগণের সনদ রয়েছে। শায়খ আবু ইসহাক-এর লেখা 'রিসালা কুশারিয়া' রয়েছে। এতে লেখক হযরত জুনায়েদ ও হযরত শিবলী (রহ.)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তাসাওউফের নীতি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন– তাসাওউফের এ ঘটনা হযরত জুনায়েদ অথবা হযরত শিবলী থেকে অমুক সনদে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

এরপর সেসব বিষয়ের উৎস কুরআন-হাদীস থেকে পেশ করেছেন। তাঁরা ঐ নীতি কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রণয়ন করেছেন। তাসাওউফেরও সনদ রয়েছে। ফিকাহ ও হাদীসের আলাদা আলাদা সনদ রয়েছে। সব যুগে বিশ্বের সব স্থানে সকলে একমত বর্ণনা করেছেন। তাতে মিথ্যার সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং এমন কোনো দীনি বিষয় ও দীনি মাসআলা নেই, যা মুসলমানগণ একথা বলে বর্ণনা করবেন– বাপ-দাদা থেকে আমরা এমনই শুনে আসছি; বরং তাঁরা বলবেন– আমি অমুক উস্তাদের কাছে পড়েছি। তিনি তাঁর উস্তাদের কথা বলবেন। তিনি তাঁর উস্তাদের কথা বর্ণনা করবেন। এ হলো মাপকাঠি। যার হাতে সনদ থাকবে না, তাকে আপনি বলতে পারবেন তার ইলম গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত নয়। ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা হবে, যার সনদ মুত্তাসিল।

সুতরাং আজ এই ছাত্রদেরকে মোবারকবাদ দেয়ার সময়– যারা হাদীসের মতন পড়েছেন তাদের সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই আমি ছাত্রদের মোবারকবাদ দিচ্ছি। তাদের সাথে তাদের উস্তাদগণকে, মাদরাসার কর্মচারী ও সাহায্যকারী সবাইকে মোবারকবাদ পেশ করছি। ধন্যবাদ

দিচ্ছি। তাদের পরিশ্রমের ফসল আজ চোখের সামনে। সনদসহ কয়েকজন আলেম তৈরি হয়েছেন।

আলেমগণের শ্রেণীবিন্যাস

সা কথা, সব আলেম এক স্তরের নন। কারো মেধা উচ্চাঙ্গের। কারো মধ্যম। কেউ সাধারণ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيْمٌ সকল জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী (আল্লাহ তায়ালা) রয়েছেন। এক স্তরে সবাই নন। কেউ তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন। কেউ স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন কেউ আবার স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন বা বুদ্ধিহীন। কিন্তু সবাই ধার্মিক হয়ে যান। তাদের অন্তত আমল শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যায়। সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। মোটকথা, সকলে এক স্তরের নন। তবে সবার সম্পর্কে সুধারণা রাখতে হবে। যখন তাদের বর্ণনা সনদসহ হয়, তাদের ইলম সনদসহ হাসিল হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হবে তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। এই শ্রদ্ধা তাদের রক্ত মাংস ও দেহের নয়। এ শ্রদ্ধা হবে তাদের ইলমের। তাদের মধ্যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ইলম এসেছে। এজন্য ইলম ও ইলমের নিসবত ও সম্পর্কের সম্মান করতে হবে যা তাদের মধ্যেও রয়েছে। এমন আলেম ও ছাত্র যারা আছেন তারা আমাদের জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তাদের নিসবত হাসিল হয়েছে। আমরা তাদেরকে সম্মান করব। কোনো আলেমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ জায়েয নয়। কারণ এতে ইলমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আর ইলম হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দান; এর প্রতি অবজ্ঞা জায়েয হবে কেমন করে? সনদসহ আলেম অবশ্যই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাদেরকে সম্মান করা হবে। তাদেরকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ দেয়া হবে। আমিও মোবারকবাদ পেশ করছি।

হাদীসের ইজাযত বা অনুমতি প্রদান

যেহেতু বুখারী শরীফের সমাপ্তির সময় দয়া ও মেহেরবানী করে আমাকে দাওয়াত করেছেন, এ সা'আদত ও শুভ কাজে আমাকে শরীক করেছেন– আমিই শেষ করব। এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমি আমার সনদ শেষ করব এবং ঐ সনদের ইজাযত তাদেরকে প্রদান করব। আমার এক সনদ নিম্নরূপ– হযরত আল্লামা কাশ্মিরী, তিনি হযরত শাখুল হিন্দ হতে। তিনি হযরত মাওলানা কাসেম

নানুতবী থেকে। আর তিনি শাহ আবদুল গনি হতে, শাহ আবদুল গনি শাহ ইসহাক হতে। তিনি শাহ আবদুল আজিজ হতে। তিনি শাহ ওলীউল্লাহ হতে, শাহ ওলীউল্লাহ শায়খ আবু তাহির দনী (রহ.) হতে। এর পরের সনদ তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় সনদ আমাকে মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী ইজাযত প্রদান করেছেন। তাঁকে ইজাযত প্রদান করেছেন মাওলানা আবদুল কাইয়ুম বড্ডানবী, তাঁকে শাহ ইসহাক (রহ.) ইজাযত দিয়েছেন।

উভয় সনদে আমি এই ছাত্রগণকে ইজাযত প্রদান করছি।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَاخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

পরিশিষ্ট

পয়গামে হেদায়েত : ১

[একটি পত্র যা শাদী উপলক্ষে প্রেরণ করা হয়েছিল]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّـــابَعْدُ:

বুযুর্গানে মুহতারাম!

বিয়ে শাদী হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর সুন্নত। ইসলাম বিয়ে-শাদীকে কেবল একটি আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং ইবাদত ও সওয়াবের কাজ বলে গণ্য করেছে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلنِّكَاحُ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِىْ النِّصْفِ الْبَاقِىْ

বিয়ে-শাদী হল দীনের অর্ধেক; মানুষের উচিত, অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করা।

বিয়ে-শাদীর মাধ্যমেই কেবল সততা, নিষ্কলুষতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে। মানুষ হারাম কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে হালাল কাজের গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বিয়ে-শাদীর মাধ্যমেই পরস্পরে একতা এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সাম্য-মৈত্রীর ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরিচিতজন আপনজন হয়ে যায়। আগে থেকে সম্পর্কহীন ব্যক্তি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যায়। পরস্পরের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা যেমন পিতার বংশকে নেয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে শ্বশুর ও শ্বশুরালয়ের সঙ্গে আত্মীয়তাকেও নেয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন।

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً.

আল্লাহ তায়ালা পানি (বীর্য) হতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার জন্য পিতার বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।

সুতরাং বংশকে নেয়ামত বলে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির উপর নিজের ইহসান বর্ণনা করেছেন। এ নেয়ামত আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। এভাবে শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তা ও সম্পর্ককেও নেয়ামত বলে প্রকাশ করেছেন। পর ও অপরিচিত হৃদয়গুলোকে এভাবে পরস্পরে মিল মহব্বতে আপনজন করে দেয়া একমাত্র আল্লাহরই কাজ। কোন সৃষ্টির সামর্থে এ কাজ নয়।

বিয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা একে তাঁর কুদরতের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। এ কি কুদরতের আশ্চর্য ফল নয় যে, বিয়ের এক মিনিট আগেও পুরুষ মহিলা একে অন্যের পর ছিলেন। একে অন্যের দুঃখ-বেদনাকে নিজের দুঃখ-বেদনা বলে ভাবতেন না। যদি কোন পর মহিলা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সাধারণ মানবিক ব্যথা ছাড়া মানুষের মনে অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট স্থান পায় না এবং নিজের অন্তরে দুঃখ-ব্যথাকে এভাবে অনুভব করে না যে, অস্থির হয়ে যাবে; আর নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার এক মিনিট পরই যদি নববধূর দুঃখ-কষ্টের কথা সে শুনতে পারে, তাহলে সে ব্যথিত হবে; চিন্তিত হয়ে পড়বে। অস্থির ও পেরেশান হয়ে যাবে। নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে স্ত্রীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। নিজের আরাম হারাম করে দিবে। ঠিক একই অবস্থা মেয়েটিরও হবে। অন্তরের এ সম্পর্ক মায়া-মমতা ও একাত্মতা কি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন নয়? অন্তরকে কিভাবে পাল্টে দিয়েছেন। আত্মা ও অন্তরের সঙ্গে জগতে বিপ্লব ও আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এজন্য একে কুদরতের নিদর্শন বলা হয়েছে। এটা বাস্তব ঘটনা। কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। এই দু'জনের একাত্মতা ও গভীর সম্পর্কের কারণে উভয়ের আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ও স্নেহ-মমতা পয়দা হয়। এটা কিভাবে সম্ভব যে, পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে এবং পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষকে ভালবাসবেন না। একে অন্যের দুঃখ-কষ্টে শরীক হবেন না। পরস্পরে সহানুভূতি প্রকাশ করবেন না। এজন্য বিয়ে যেমন আল্লাহর কুদরতের এক বড় নিদর্শন, তেমনি উভয় গোত্রের মেলামেশাও সৌহার্দ্রপূর্ণ সম্পর্ক ও কুদরতের মহানিদর্শন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক শাদী করে বিভিন্ন গোত্রকে নিজের আপনজন করে নিয়েছেন। পরস্পরে একাত্ম হয়ে গেছেন। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের সম্পর্ককে অটুট রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তালাক বা বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করা জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কাজ বলা হয়েছে।

اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَاللهِ الطَّلَاقُ

বৈধ জিনিসের মধ্যে সবচে' অপছন্দ আল্লাহর কাছে তালাক দেয়া। কারণ, তালাক বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করে অথচ এ বন্ধন ছিল একাত্মতা ও প্রেমপ্রীতির মাধ্যম। আর তালাক হল একাত্মতা বিনষ্টকারী। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে তাওহিদের সঙ্গে পরস্পরের ভালোবাসা ও একাত্মতাও রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলোকে একত্র করে দেয়া হোক, জুড়ে দেয়া হোক। বিক্ষিপ্ত মন-মানসিকতাপূর্ণ লোকদের জুড়ে দেয়া হোক। আল্লাহ থেকে দূরে অবস্থিত আত্মাগুলোকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হোক। এজন্যই

আল্লাহ তায়ালা বিয়ের বন্ধনে সামান্যতম বিচ্ছেদকেও পছন্দ করেননি। তাহলে বিয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য এবং ইত্তেহাদ ও একাত্মতার মাধ্যম বানানোর জন্য শরীয়ত যে পথনির্দেশ করেছে, তা হল মৌলিকভাবে দুটি জিনিস; শপকত ও ইতায়াত বা দয়া ও আনুগত্য। এ দুটোর উপর সামাজিক ব্যবস্থা নির্ভর করছে। স্বামীদের আদেশ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। তার মন রক্ষা করবে এবং কোমল ব্যবহার ও চরিত্র দ্বারা তার হৃদয়কে জয় করে নেয়ার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اَكْرَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا اَلْطَفُكُمْ اَهْلاً

তোমাদের মধ্যে সবচে' সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ঐ মুসলমান যার চরিত্র নিষ্কলুষ, পাক পবিত্র এবং স্ত্রীর সাথে তার ব্যবহার কোমল ও মাধুর্যপূর্ণ।

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আহারের সময় নিজ হাতে এক লোকমা খাবার স্ত্রীর মুখে দিয়ে দেয়াও সদকা বলে গণ্য হবে। সওয়াব দেয়া হবে এ কাজের উপর। কারণ এ কাজ ইবাদত বলে পরিগণিত হয়। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন। তাঁদের মন রক্ষা করতেন। এজন্য স্ত্রীগণের সঙ্গে কোমল ও মধুর ব্যবহার করা, তাদের মন জয় করার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এ দ্বারা যেমন বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তেমনি অন্তরে সুখ-শান্তি, মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনের মধ্যে এ-ও রয়েছে– তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া পয়দা করেছেন। যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পার। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দয়া ও মেহেরবানী পয়দা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য তার কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। সম্পর্কহীন হৃদয়ের সঙ্গে কিভাবে হঠাৎ করে বিশেষ প্রীতিপূর্ণ মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল তা ভাববার বিষয় বটে। এসব এজন্য হয় যে, স্ত্রী তার পিতা-মাতা বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের ত্যাগ করে স্বামীর বাড়িতে এসে যায় এবং মনে করে স্বামীর আপনজন হয়েই আমাকে থাকতে হবে। এখন যদি স্বামী দয়া মায়া, স্নেহ মমতা প্রদর্শন না করে, তার সঙ্গে প্রীতিশূন্য রুক্ষ আচরণ করে, নানাভাবে কষ্ট দেয় তাহলে এ অসহায় নারী

কোথায় যাবে? এখানেও হলো না ওখানেও হলো না। স্বামীর কারণে আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করল। স্বামীও আপন হল না। তাহলে এই অসহায় নারীর স্থান হবে কোথায়? চিন্তা ও দুঃখে ধুঁকে ধুঁকে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দেয়া ছাড়া তার আর কোন পথ থাকে না।

এদিকে স্ত্রীদেরকে আদেশ করা হয়েছে– তারা স্বামীর আনুগত্য করবে, তার আদেশ পালনে সদা তৎপর থাকবে। এমন কোন কাজ করবে না যার দ্বারা স্বামীর মন ভেঙ্গে যায়, স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। যে কারণে এ মধুর সম্পর্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নষ্ট হয়। যেমন- উগ্রতা, বদমেজাজী, দুষ্টুমি, অবাধ্যতা, স্বামীর মাল আত্মসাৎ ও খেয়ানত করা, স্বামীর প্রয়োজনে ব্যয় না করে অন্যত্র তার বিনা অনুমতিতে ব্যয় করা; নিজ পিত্রালয়ের জন্য ব্যয় করা– যা নিঃসন্দেহে খেয়ানত করা হবে এবং স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণও হবে। এ কারণে তাদের সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে। আর শেষ পর্যন্ত মূল সম্পর্কে ফাটল দেখা দিবে। যার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ পরিবারে দেখা দিবে। দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে চরম ঘোষণা দিয়েছেন– আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম তাহলে নিজ নিজ স্বামীকে সেজদা করার জন্য বলতাম। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা শিরক ও হারাম, এজন্য এ আদশে করিনি। কিন্তু এ কথা দ্বারা স্বামীর চরম আনুগত্যের কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নাজায়েয ও হারাম কাজকর্ম ও কথাবার্তা ছাড়া এমন কোন আনুগত্য নেই যার জন্য স্ত্রীকে আদেশ করা হয়নি। এজন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– রাতে যদি স্বামীর সঙ্গে দুষ্টুমি করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সারারাত ধরে তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন। দিনের বেলায়ও সেই একই অবস্থা।

সারকথা, এ দুটি কথা– স্বামীর আনুগত্য ও স্ত্রীর সঙ্গে দয়া ও ভালোবাসা এমন যে, এ দুটি ছাড়া জীবন অগ্রসর হবে না। উন্নতি হবে না। এ দুয়ের সম্পর্ক কোন বাহ্যিক টিপটপ সৌন্দর্য ও প্রদর্শনীর সঙ্গে নয়; বরং এমন এক বাস্তব জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে যা চিরস্থায়ী। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, স্বামীর প্রেমপ্রীতি যদি স্ত্রীর বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে এসব জিনিস ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়াতেই স্থায়ী নয়, পরকালে উপকারী হওয়া তো দূরের কথা। অতএব যখন এসব কমে যাবে অথবা শেষ হয়ে যাবে, তখন ক্ষণিকের দয়া ভালোবাসাও শেষ হয়ে যাবে এবং মধুর সম্পর্কে ভাটা পড়ে যাবে; বরং শেষ পর্যন্ত ছিন্ন করারও সময় এসে যেতে পারে। আর যদি এ সম্পর্কের ভিত্তি স্ত্রীর দীনদারীর উপর রাখা হয়, তাহলে দীন সর্বদা চিরস্থায়ী থাকবে। দুনিয়ার এবং পরকালেও সঙ্গে থাকবে। এজন্য দীনের উপর

প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক সর্বদা মধুর ও সুদৃঢ় থাকবে। সে সম্পর্কে ক্ষণস্থায়ী কোন জিনিস ফাটল সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই হাদীস শরীফে এসব বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে–

تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِاَرْبَعَ لِمَا لِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ.

নারীদের চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করা হয়– এর মধ্যে প্রথম বিত্তবান হওয়া, দ্বিতীয় সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য, তৃতীয় হলো তার সামাজিক মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি, আর চতুর্থ হলো তার দীনদারী ও ধর্মপরায়ণতা। সুতরাং সকল জিনিসের মধ্যে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।

সাফ কথা, মাল-সম্পদ, রূপ-লাবণ্য, সামাজিক সম্মান এসব ক্ষণস্থায়ী জিনিস। স্ত্রীর উপর দয়া প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা যদি এসব কারণে হয় তাহলে প্রথমত এসব দয়া ও ভালোবাসা নয়; বরং নিজের স্বার্থপরতা এবং যে পর্যন্ত এসব রয়েছে ততক্ষণ পারিবারিক জীবনে নেমে আসবে বিরোধ, অনৈক্য ও মনোমালিন্য। এতে পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু যদি বিয়ের প্রধান কারণ স্ত্রীর দীনদারী ও ধর্মপরায়ণতা হয়ে থাকে, আর এ লক্ষণ হলো স্বামীও ধার্মিক হওয়া এবং দয়া-ভালোবাসা ও প্রেমপ্রীতি এ কারণে হয়, তাহলে এর ভিত্তি রয়েছে আল্লাহভীতির উপর। তখন মানুষ অনুভব করবে, আল্লাহ তায়ালা যখন এর দায়-দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীর সঙ্গে দয়া ও ভালবাসার আচরণ করব। সে রূপ-লাবণ্যময়ী, সুন্দরী, সুশ্রী হোক বা নাই হোক, বিত্তশালী হোক বা নাই হোক, সম্মানী ও মর্যাদাশীল হোক বা নাই হোক। পরিষ্কার কথা, এ আবেগ ও উদ্দীপনার কারণে যে ভালোবাসা ও মধুর ব্যবহার হবে তা দীনি কাজ বলে গণ্য হবে এবং আজীবন এ সম্পর্ক অটুট থাকবে। তাহলে যদি আল্লাহ তায়ালা দীনদারীর সঙ্গে সঙ্গে রূপ-লাবণ্য ও শোভা সৌন্দর্যও দান করেন, ধন-সম্পদ মান-সম্মানও দান করেন তাহলে সোনায় সোহাগা। কিন্তু এসব জিনিসকে সম্পর্কের ভিত্তি সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। করার যোগ্যও নয়। কেননা এসব প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। সারকথা, বিয়ের সম্পর্ক দৃঢ়তা স্থায়িত্ব এ দুটি জিনিস দ্বারাই হয়। স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য ও স্বামীর জন্য স্ত্রীর মন রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, স্ত্রী দাসী নয়; বরং জীবনসাথী অর্ধাঙ্গিনী। তাই স্ত্রীর সঙ্গে উঁচু নিচু ব্যবহার কোনভাবে জায়েয হবে না। তাকে সম্মানের পাত্রী ও যোগ্য বানানো হয়েছে। তাকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধার পাত্রী বানানো হয়নি। আরব দেশে

কোন মহিলা যদি আসে তাহলে হারামা সম্মানের পাত্র বলে সম্মান করা হয়। তার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়া হয়। যদি মহিলাদের মান-সম্মান রক্ষা না হয়, তাহলে পরিবারের সবাই এমনকি সন্তানরাও তার সম্মান করবে না। এজন্য শরীয়ত যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার দিয়েছে, তেমনি স্বামীর উপর স্ত্রীকেও হক ও অধিকার দান করেছে, যেন তারা সমাজে সম্মানিত থাকেন। অতএব কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ এবং মহিলাদের হক ও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর; এভাবে পুরুষদের অধিকার রয়েছে নারীদের উপর। উদাহরণস্বরূপ পুরুষকে যদি তালাকের অধিকার দেয়া হয়ে থাকে, তেমনি স্ত্রীকেও খুলা'র অধিকার দান করা হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দেয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ আলেম ও প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে। উভয়কে সমঅধিকার দান করা হয়েছে। এ হলো স্পষ্ট প্রমাণ যে, নারীদেরকে লাওয়ারিশ বানিয়ে পুরুষের হাতে অর্পণ করা হয়নি; বরং সম্মানজনকভাবে সমঅধিকার দেয়া হয়েছে। স্ত্রীকে যেমন আনুগত্যের অধিকার দেয়া হয়েছে, তেমনি স্বামীকেও স্ত্রীর মন রক্ষা করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হল উভয়ের পদমর্যাদা ও সমঅধিকার। এতে কোন ধরনের উঁচু নিচু করা হয়নি।

সারকথা, সামাজিক সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা সাহায্য সহায়তা এবং স্ত্রীর আনুগত্যই পরিবারকে সুখী সমৃদ্ধশালী করতে পারে। এ দুই সিলপাটের উপর দিয়ে জীবনের গাড়ী সচল থাকতে পারে। সুখী হওয়ার যে রাস্তা ইসলাম বলে দিয়েছে তা হল দীনি আবেগ ও উদ্দীপনার স্থায়িত্ব এবং শরীয়তসম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠার রাস্তা। এজন্য স্বামী-স্ত্রীর পাঠের জন্য এমন সব কিতাব থাকা কর্তব্য যা দ্বারা দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের অধিকার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় এবং পরস্পরের সম্পর্ক সুমধুর হয়। এ জাতীয় অনেক বই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যেমন হযরত থানভী (রহ.)-এর বেহেশতি জেওর, হুকুকুল জাওজাহিন, হুকুকুল মুয়াশারা ইত্যাদি। আশা করি বিয়ের মজলিশে অধমের উপস্থিতি হতে এ পয়গামে হেদায়াত বেশি উপকারী হবে। মজলিশে উপস্থিতি হলো সাময়িক জিনিস। আর এখানে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো হলো চিরস্থায়ী কর্মপদ্ধতি।

والله الموفق وهو المستعان .

পয়গামে হেদায়ত : ২

[একটি পত্রের জওয়াব]

[মাসিক দারুল উলুম : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং]

সম্মানিত (পত্র প্রেরক), আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

আপনার সবিস্তার পত্র পেয়েছি। আমি সফরে ছিলাম, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হল। পত্রে আপনি আপনার ভাল মন্দ সব অবস্থা লিখে দিয়েছেন এবং নিজের সংশোধন হওয়া সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথম কথা হল– ইসলামের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য হল কুফর। নিরাশ কখনো হবেন না। কোন ব্যাধি এমন নেই যার ওষুধ ও চিকিৎসা আল্লাহ তায়ালা দান করেননি। আল্লাহ তায়ালা তার সীমাহীন জ্ঞান ও হেকমতের কারণে রোগব্যাধি সৃষ্টি করেছেন এবং চিকিৎসাও সৃষ্টি করেছেন। এজন্য যে, মানুষের মধ্যে কর্মপ্রেরণা অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ, সাহস এবং প্রতিরোধ শক্তি প্রকাশিত হয়। আপনার ধারণা মতে, রোগব্যাধি যদি সৃষ্টিই না করা হত, আধ্যাত্মিক ব্যাধির মধ্যে কুফর ও নেফাকের কোন নাম নিশানা বা চিহ্নই যদি না থাকত এবং বাতেনি রোগব্যাধির উপকরণ, শয়তান, কাফের, ফাসেকের পরিবেশ যদি সৃষ্টি করা না হত, তা হলে চিকিৎসা ও চিকিৎসার উপকরণ অর্থাৎ নেক আমল ও নেক মানুষ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন হত না। আর যখন ভাল মন্দ কিছুই থাকত না, তখন ভাল ও মন্দ মানুষও থাকত না। এ অবস্থায় দুনিয়া কিসের নাম হত? কাকে সৃষ্টি করা হত? অন্য অর্থে দুনিয়া সৃষ্টি করারই প্রয়োজন হত না। প্রকৃত অর্থে দুনিয়াকে সৃষ্টি করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সৌন্দর্যের সঙ্গে ধ্বংস, পাপের সঙ্গে পুণ্য, তাকওয়ার সঙ্গে পাপাচার, ইসলামের সঙ্গে কুফর সৃষ্টি করাও দরকার এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। হেকমত ছিল, সে কারণে কুফরের মোকাবেলায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফিসক ও পাপাচারের মোকাবেলায় অবনতি, সত্যের মোকাবেলায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফিসক ও পাপাচারের মোকাবেলায় তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতা, পাপের মোকাবেলায় পুণ্য, উন্নতির মোকাবেলায় অবনতি, সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা, মান-সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান অপমান

প্রকাশ পাবে। আপনার ধারণা অনুযায়ী শয়তানকে কেন মানুষের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে? শয়তান সৃষ্টি না হওয়াই উচিত ছিল। তা হলে আপনাকে কেউ পাপকর্মে উৎসাহিত করতো না। তা হলে আপনাকে পয়দা করারই বা কি প্রয়োজন ছিল? আর আপনার মধ্যে মন্দ ও পাপাচারকে প্রতিহত করার শক্তি রেখে দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? ভাল-মন্দের পার্থক্য করার শক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল, যৌক্তিকতা কি ছিল? কর্মশক্তি ও কর্ম প্রেরণার দরকার কি ছিল? আপনি হক ও বাতেল, সত্য ও অসত্যকে পার্থক্য করে হক ও সত্যের দিকে ধাবিত হবেন। এসবই যদি নিষ্প্রয়োজন হয় তাহলে মানুষ সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? এ মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে যার ইচ্ছা শক্তি, কর্মতৎপরতা, কর্মপ্রেরণা কিছুই থাকবে না। থাকবে না বিবেক-বুদ্ধি, ভাল মন্দে প্রভেদ করার শক্তি, সাহস উদ্যম ও প্রতিরোধ শক্তি। তা হলে মানুষ হবে না, হবে ইট পাথরের একটি স্তুপ। আর বিশ্ব ভূখণ্ড সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য, মানুষের খেদমত ও উপকার করার জন্য। মানুষের বসবাসের জন্য এ জগৎ যদি মাটির স্তুপে পরিণত হতো, তখন সৃষ্টি জগতই বেকার হতো। কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝার এবং উপভোগ করার কেউ থাকতো না। সুতরাং আপনার মত অনুসারে এবং তা-ও আপনার কাপুরুষতার কারণে বিশ্ব অস্তিত্বহীন করা উচিত ছিল। অথবা (উচিত) মাটিরস্তুপ রূপে বিদ্যমান থাকা। এসব বিভ্রান্তিকর কল্পনা ছাড়া কিছুই না। আপনি নেক ও বদ, ভাল ও মন্দ যা কিছুই করেছেন, নিজ ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী করেছেন। আল্লাহ বাধ্য করেননি। এমন সময় আপনার কখন এসেছিল যখন আপনি ইট পাথরের মতো ক্ষমতাহীন ও সামর্থহীন ছিলেন? আপনি নেক কাজ করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু আপনাকে জবরদস্তিমূলক পাপকর্মে বাধ্য করা হয়েছে? আপনার ইচ্ছা ও শক্তিকে হরণ করা হয়েছে? এভাবে আপনার কৃতকর্মকে তাকদিরের উপর ঢেলে দেয়ার অপচেষ্টা করবেন না। এ হলো অত্যন্ত দুঃসাহস এবং গোস্তাখীও বটে। মানুষ নিজ পাপকর্ম করবে এবং নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে নিজ প্রভুর উপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে– এ হতে পারে না।

এসব ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনার চিকিৎসা এটাই যে সবার আগে নিজ জীবনের একটি উদ্দেশ্য স্থির করে নিন। উদ্দেশ্য দুনিয়া হবে না পরকাল হবে– যদি উদ্দেশ্য দুনিয়া হয়, তাহলে দুনিয়া অর্জনে লেগে যান। হালাল হারামের কোন প্রশ্ন নেই। যা মন চায় অথবা তথাকথিত জ্ঞান-বুদ্ধি যা বলে সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকুন। লোকের কথা মত ভাল-মন্দ বিবেচনা করুন। তাদের খাতিরে এসব ত্যাগ বা গ্রহণ করুন এবং যেসব বস্তুকে ভাল মনে করেন, সবই করুন।

পরকার ও পরিণতির চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিন। আর যদি জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরকাল হয়, তাহলে পরকাল উপার্জন করার প্রচেষ্টায় লেগে যান। তখন পরকাল সম্পর্কিত বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। ঐ আইনে কোন জিনিস হালাল কোন জিনিস হারাম বুঝে নিয়ে নিজের ইচ্ছা ও শ্রমকে ব্যয় করতে হবে এবং এসব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করতে হবে। তাকদিরের উপর (বিশ্বাস করে) অপর্ণ করে নিজেকে নির্দোষ করে নিতে হলে আজ থেকে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেতের কাজ– সব ত্যাগ করুন। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তা পেয়ে যাবেন অবশ্যই। কিন্তু রিযিকের উপকরণ গ্রহণ করা সামর্থানুযায়ী চেষ্টা চালানো আপনিও জরুরী মনে করেন। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নিজ শক্তি ও শ্রমের বিশ্লেষণ করে দেখুন। এগুলো আপনার অভীষ্ট হাসিলে কি কি প্রতিকুলতা সৃষ্টি করছে বা করবে?

পরকালীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য নীতিমালা হলো শরীয়ত, যার মৌলিক স্তম্ভ হলো পাঁচটি– ইবাদত, আখলাক (চরিত্র), ইতেকাদ (বিশ্বাস), মুয়ামালাত (কারবার), উকুবাত (দণ্ডবিধি)। আর এসবই মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নাম নিয়ে এসব কাজ শুরু করে দিন। ফরযগুলো যথারীতি পালন করুন। চরিত্র গঠনের জন্যে কোন চরিত্রবান ব্যক্তির শরণাপন্ন হোন। আকিদা বিশ্বাস সংশোধন করুন। কুচিন্তা ও ভাবনাকে দূর করে দিন। কাজেকর্মে ইলমে ফেকার অনুসরণ করুন। নিজের ইলম না থাকলে জিজ্ঞেস করে করে আমল করুন।

শাস্তি সম্পর্কে পার্থিব ও দৈহিক সাজা দেয়া যাবে না। সে সুযোগ নেই। একে আল্লাহর রহমতস্বরূপ গ্রহণ করুন। এর পরিবর্তে তাওবা ইস্তেগফার করুন– যার অর্থ হলো অতীত পাপের ব্যাপারে লজ্জিত এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। যাই হোক, গুনাহ করব না, তারপরও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কাম-ক্রোধের তাড়নায় কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় তাওবা করে নিন। নিজের উপর আর্থিক সাজা নির্ধারণ করুন এবং ঐ অর্থ সদকা করে দিন। পরিবেশকে পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। যদি পরিবেশ গুনাহর হয়ে থাকে এবং আত্মার দুর্বলতার কারণে পরিবেশের প্রভাব হতে মুক্ত থাকা দুষ্কর হয়, তাহলে পরিবেশ পরিবর্তনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন নিজের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বর্জন করতে তৈরি হয়ে যাবে, তখন অসম্ভব হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিবেন। আল্লাহর পক্ষ হতে অবশ্যই সাহায্য আসবে। এসব কুচিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উত্তম উপায় হলো বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকা।

জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ রাখা। সকাল বিকালের জন্য কোন যিকিরকে নির্ধারণ করে নিন। যেমন সকাল বিকাল حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ একশ' বার করে। তারপর لا اله الا الله এর যিকির করুন। অর্থাৎ হাছবুনার যিকির একশ' বার, কালেমার যিকির একশ' বার। বিকেলেও তেমনি। তারপরও যদি কুচিন্তা আসে তাহলে لا حول ولا قوت الا بالله العلى العظيم পড়ুন। যখন পরকালকে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তখন পরকাল বিরোধী চিন্তা-ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য লা হাওলা ছাড়া আর এত বেশি কার্যকর ব্যবস্থা কি হতে পারে? যিকিরের আধিক্য আত্মাকে পাক পবিত্র করে দিবে। কুচিন্তা দূর করবে। আত্মা ও হৃদয়কে কোমল করবে। মন্দ পরিবেশের প্রতি ঘৃণা ও ভাল পরিবেশের জন্য আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। সব কিছু বর্জন করে এ নীতিকে গ্রহণ করুন, কুচিন্তায় লা হাওলা পড়ুন। এছাড়া সংশোধনের জন্য আর কোন পথ নেই। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজনকে নিজের আমলের সাথী করে নিন। সে আপনাকে সৎ পরামর্শ দিবে এবং এমন একজনকে ঠিক করে নিন, যিনি এসব মন্দ ও কুচিন্তা থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন। সারকথা, রোগ দেখা দিলে চিকিৎসক নিয়োগ করুন। তার কাছে সকল অবস্থা প্রকাশ করুন। তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তার বাতলানো ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করুন। ভরসা আল্লাহর উপর রাখুন। নেক আমলকে আল্লাহর দয়ার লক্ষণ মনে করবেন। যদি আমল নেক না হয়, মনে করবেন আল্লাহর দয়া ও মঙ্গল নেই।

এসময় এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার প্রয়োজন নেই। এ পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেদায়াত করুন। ধৈর্য সাহস ও দৃঢ়তা দান করুন এবং খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমিন আমিন আমিন।

মুহাম্মদ তৈয়ব
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
৯-১১-৭৭ হি.

আফ্রিকার সফর সমাপনী মাহফিলে

বিদায়ী ভাষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّـــابَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

মহব্বত ও কৃতজ্ঞতা শব্দের মাধ্যমে আদায় করা যায় না

বুযুর্গানে মুহতারাম, শ্রদ্ধেয় সভাপতি, জমিয়তের নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ!

গত পঁচিশ দিনে এখানে অবস্থানকালে অনেক সভা সমিতি হয়েছে। সেসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আজও বিশাল সমাবেশ। কিন্তু অন্যান্য মজলিসের তুলনায় আজকের সভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কারণ, আজকের সভার আগে যেসব সভা হয়েছে সেগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুনার উদ্দেশ্যে। আর আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিছু বলার জন্য, বক্তব্য পেশ করার জন্য। এর আগে আপনারা বক্তার কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এবং বক্তা থাকতেন একজন। আর আজ আমি শ্রোতা, আপনারা সবাই বলবেন। সবাই বলতে পারেন; তবে যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা সবার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তারা এখনই বক্তব্য পেশ করছেন। আমাদের মাওলানা উমর দীন সাহেব, পরম শ্রদ্ধেয় আহমদুল্লাহ সাহেব, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সাহেব। এ সকল বুযুর্গ কিছু বলার জন্য সমবেত হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন। অধমের পঁচিশ দিনের অবস্থানকাল সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে আপনারা একে মূল্যায়ন করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে প্রকাশ করেছেন।

আপনাদের বক্তব্য এবং পঁচিশ দিনের মহব্বত ভালবাসা আর আপনাদের কাজকর্ম দেখে আমার অন্তরেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। আর তা এমনই বাস্তব ব্যাপার যে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এটা অন্তরের অবস্থা। অন্তরের এ অবস্থা প্রকাশে ভাষা অক্ষম। যেভাবেই বলা হোক না কেন, মনের অবস্থার প্রতিফলন ও প্রকাশ ততটুকু হয় না। মহব্বতের কোন ভাষা নেই। তা প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশিত হতে পারে না। ভাষার পরিধি খুবই সংকীর্ণ। আর মহব্বতজনিত উৎসাহ উদ্দীপনার আয়তন বিশাল ও সীমাহীন। তাই ভাষার প্রভাব তাতে দেখা যায় না। মানুষ যতই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করুক না কেন, ভালবাসা ও মহব্বতের হক আদায় হবে না। কোন এক কবি বলেছেন– پرسیدیکے کہ عاشقی چیست কোন এক প্রেমিককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো– প্রেম কি জিনিস? প্রেম ও ভালবাসার কিছুটা বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করো? گفتم چو ماتوی بدانی বললাম, প্রেমের ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। অভ্যন্তরীণ অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে, তা ভাষায় আসে না, ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। এ অবস্থা দৈহিক হোক কিংবা আধ্যাত্মিক। সে অবস্থা থেকে ভাষা অনেক উর্ধ্বে। কোন ছেলে যদি আপনাকে প্রশ্ন করে– 'যৌবনকালের অবস্থা কেমন, আমাকে বলে দিন।' আপনি কী বলবেন? বলবেন– বাবা, দশ বছর অপেক্ষা করো। যখন যুবক হবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে যৌবনের অবস্থা কি ও কেমন। কোন যুবক যদি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে– দাদা, আমাকে বার্ধক্যের অবস্থা বলে দিন? বৃদ্ধ বলবে– 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন। বৃদ্ধ হয়ে যাও, তখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে বার্ধক্য কি ও কেমন। আমি ভাষায় কি করে বুঝাব?

তেমনি কোন বৃদ্ধও মৃত্যুকালীন কষ্ট বুঝতে পারবে না, যে লোক সাকরাতে মাওতে রয়েছে, যার প্রাণ বায়ু ওষ্ঠাগত, তার কি অবস্থা। কেউ ব্যাখ্যা করতে, বলতে ও বুঝাতে পারবে না। যার মৃত্যু নিকটে ইসলামের পরিভাষায় একে মুহতাজার বলা হয়। এখন যদি কোন বুড়ো ঐ মুহতাজারকে জিজ্ঞেস করে– তোমার কি অবস্থা– ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দাও। সে বলবে– এ অবস্থা থেকে কেউ বাদ পড়বে না। কিছু দিনের মধ্যে তোমারও এই অবস্থা হবে। তখন বুঝে আসবে। অথবা যদি কোন মুহতাজার কোন মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে– কবরে তোমার কি কি অবস্থা হয়েছে, তা আমাকে বলে দাও। সে বলবে– 'ভাই! কবরে আগে আসো! আসতে তো হবেই– তখন কবরেই তা তোমার বুঝে এসে যাবে। আমি কি বর্ণনা করব? কাইফিয়ত বা অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভাষায়

স্থান সংকুলানও হয় না। যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে– আপেলের স্বাদ কেমন? আমি কী বলব? যতই বলব, বলা কিন্তু হবে না। একথা বলা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না যে, কিছু পয়সা খরচ কর। আপেল কিনে খেয়ে নাও। তখন আপেলের স্বাদ বুঝে আসবে। স্বাদের বর্ণনা ভাষায় হয় না। আপেলের স্বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন একটি বিষয়; তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রেম ও ভালবাসা ভাষায় প্রকাশিত হবে কেমন করে? ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হবে কীভাবে?

আপনাদের মহব্বত, ভালবাসা ও কাজকর্ম দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। আপনাদের প্রতি মহব্বত হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, যা আখেরাতেও সঙ্গে থাকবে।

একদিকে পঁচিশ দিনের কাজকর্মের তৎপরতা, অন্যদিকে শুধু কথা আর কথা। আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হয়নি। আপনারা আমল করেছেন। মহব্বত, আতিথেয়তা, সৌজন্য, ভদ্রতা, মেহমানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা– এসবই আমল, যা আপনারা করে দেখিয়েছেন। একদিন দু'দিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ দিন। শরীয়তের বিধান মতে মানুষ তিন দিন মেহমান থাকে; আর এই তিন দিন নৈতিকভাবে আতিথেয়তা করা মুস্তাহাব। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটা ওয়াজিব ছিল। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সে যুগের মানুষের জন্য বিধান ছিল– যদি কেউ তিন দিনের আতিথেয়তা না করে, এক দিন পর জবাব দিয়ে দেয়, তাহলে মেহমানের অধিকার ছিল, মেজবানের ঘর থেকে সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চলে যাবে যা দিয়ে তিন দিনের আতিথেয়তা হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক যুগের এ রীতি বন্ধ করা হয়েছে। সাময়িক কারণে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল। যেহেতু দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। ইসলাম গ্রহণের জন্য লোকজন আসতো; তাদের যদি আপ্যায়ন না করা হয় তাহলে তারা দীন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। তাই তিন দিনের আতিথেয়তা ওয়াজিব ছিল। এরপর এই নির্দেশ রহিত করা হয়। এখন তা মুস্তাহাব– উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তবে কেউ যদি এর চেয়ে কম সময় অবস্থান করে, তাহলে তার প্রতি সম্মান দেখানো ওয়াজিব; বরং ঈমানের অংশ বলা হয়েছে।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার কর্তব্য হবে অতিথির সেবাযত্ন ও সম্মান করা।

তাই বলে মেহমানের আদর আপ্যায়নের অর্থ এমন নয় যে, প্রতিদিন মোরগ-পোলাও বা বিরানি খাওয়াবে। বরং মানে হচ্ছে, যাই পেশ করো মহব্বত ও

ভালবাসার সঙ্গে পেশ করো। যদি ডাল-ভাতও হয়। যদি গোশত-পোলাও হয় আর তার সঙ্গে মহব্বতও থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সারকথা, পঁচিশ দিন ধরে এমন আপ্যায়ন, সেবাযত্ন করা মুস্তাহাবেরও অনেক বেশি, ওয়াজিবের পর্যায়ে ছিল। এ শুধু মহব্বতের আবেগে করা হয়েছে। আমার অন্তরে পঁচিশ দিনের সেবাযত্ন, আদর-আপ্যায়নে কৃতজ্ঞতার যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তা দশ পনের মিনিট ভাষার মাধ্যমে কী করে প্রকাশ করি? এ আবেগ সঙ্গে যাবে। এ যে অন্তরের অংশ হয়ে গেছে। আর মহব্বতের এই আবেগ ইনশাআল্লাহ পরকাল পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে। এ জগতে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

আপনারা যে আদর আপ্যায়ন করেছেন, তা দুনিয়ার জন্য নয়; তা করেছেন পরকালের জন্য। পার্থিব কোন আত্মীয়তার কারণে করেননি। আমার সঙ্গে আপনাদের কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারও উদ্দেশ্য নয়। শুধু নিজের দীনের মহব্বতের কারণে। এই আশার উপর যে, এই ব্যক্তি আমাদের দীনি কোন হেদায়েত ও উপকার করতে পারবে। এসব পরকালীন আবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও এখানে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আখেরাতেও সঙ্গে থাকবে। যে জিনিস ইহকাল থেকে পরকালে সঙ্গে যাবে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে কেমন করে? এমন কোনো ভাষা কি আছে যাতে ইহ-পরকালীন কথা সংকুলান হবে? সুতরাং এ আমার শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দীপনাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আপনাদের মহব্বত ও ভালবাসায় আমার অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শুধু এটুকু পারি যে, আপনাদের জন্য দোয়া করব। আমি ওয়াদা করছি, ভবিষ্যতেও দোয়া করব। দোয়া করা ছাড়া আমার অন্য কিছু করার ক্ষমতাও নেই।

আর তা এজন্য বলছি যে, দোয়ার জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। অযোগ্য ব্যক্তিও দোয়া করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তার কথাও শুনেন। গুনাহগার ব্যক্তিও যদি দোয়া করে, আল্লাহ তার ডাকও শুনেন। দোয়ার জন্য যোগ্যতার শর্ত নেই। আপনাদের কাছেও দোয়ার আবেদন রইল। দোয়া করা ছাড়া অন্য এমন কিছু আমার কাছে নেই, যা আমি পেশ করব। মাওলানা ওমর দীন সাহেব দুঃখ-আনন্দ মেশানো আবেগ নিয়ে বক্তৃতা করেছেন। আনন্দ এজন্য যে, তার ধারণা অনুযায়ী পঁচিশ দিনের অবস্থানে কিছু কাজ হয়েছে। দুঃখ এজন্য যে, আজ বিদায়ের দিন। কিন্তু আমার মধ্যে দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু নেই। কোন আনন্দ নেই। আমি নিরানন্দ।

বিদায়ের দুঃখ, কোন কাজ না হওয়ার দুঃখ। আমি কোনো খেদমত করতে

পারিনি। এটা তো আপনাদের মহব্বত ও গুণগ্রাহিতা যে, আপনারা বলেছেন, আমার সম্পূর্ণ সময় আমি ব্যয় করেছি। আসলে কিছুই করিনি। শুধু ক'টি মুহূর্ত এখন পার হয়েছে। কিছু কথা আরজ করেছি। যা করা আমার জন্য উচিত ছিল তা করতে পারিনি। তাই আমার জন্য দুঃখ আর দুঃখ। এখন শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারি? যে সব ত্রুটি হয়েছে, তা আপনারা ক্ষমা করবেন। খেদমতে যা ত্রুটি হয়েছে মাফ করবেন। ভদ্রলোকদের ভদ্রতা হচ্ছে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া।

সত্যিকার শুকরিয়া আমলী জিন্দেগির পরিবর্তন

আসলে বিগত দিনগুলোতে মহব্বত ও আন্তরিকতাপূর্ণ যে ব্যবহার আপনারা করেছেন তার প্রতিক্রিয়া হৃদয়ের গভীরে গেঁথে গেছে। তবে আমি মনে করি, প্রকৃত শুকরিয়া হবে এই, যেসব আবেদন নিবেদন করা হয়েছে সে অনুযায়ী আমলী জিন্দেগিতে বিপ্লবাত্মক কিছু প্রকাশ লাভ করা। এ হবে প্রকৃত শুকরিয়া। শরীয়তের ভাষায় একেই শুকরিয়া বলা হয়। যদি কোন কথা বলার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে কথা বলাই হলো প্রকৃত শুকরিয়া। কোন আমলের কথা বলা হয়ে থাকলে সে আমল করাই শুকরিয়া। এ অর্থে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায়ের অপেক্ষা করতে থাকব। এটা আমার আকাঙ্ক্ষা। এ-ও একটি দুঃসাহস যে, আমি আপনাদের বলব– আপনারা আমার শুকরিয়া আদায় করুন। কিন্তু আমি সাহস করে বলছি, আপনারা আমার শুকরিয়া আদায় করুন। তবে শুকরিয়া হবে আমলী। আমালের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করুন। যদি এই পঁচিশ দিনের মধ্যে কোন আমলের কথা হয়ে থাকে, আপনারা শুনে থাকেন তাহলে সে অনুযায়ী আমল করুন।

প্রকৃতপক্ষে এটা আমার শুকরিয়া হবে না; বরং আল্লাহ তায়ালার শুকর আদায় করা হবে। দীন ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুকরিয়া আদায় করা হবে। যাঁর জুতার বরকতে আমরা কিছু বলতে ও শুনতে পারি। সুতরাং প্রকৃত শুকরিয়া যা আমি চাই, আকাঙ্ক্ষা করি– তা হলো আমলীভাবে কাজকর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবনে বাস্তব কোন পরিবর্তন সাধিত হোক।

আপনারা প্রায় শত বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। আপনাদের পিতামহ এখানে এসেছিলেন। আমি মনে করি, আজ আপনাদের হাতে যে ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশের সামগ্রী রয়েছে এসব বাপ-দাদাদের বরকত। তাদের দোয়া ও আন্তরিকতার ফল। তাঁরা এখানে এসেছিলেন এবং দীন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

তারা দীন ও দুনিয়া উভয়টা অর্জন করেছেন। দীনের উপর দৃঢ়তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাদের ধর্মপরায়ণতার স্মৃতি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান পরিবেশে দীনি আবেগ-উদ্দীপনা যা আপনাদের মধ্যে রয়েছে। বাস্তব কথা, এসব সে পবিত্রাত্মা মনীষীদের বরকত, তাদের স্মৃতি যা বংশানুক্রমে আপনাদের মধ্যে এসেছে। এখন আপনারা বুঝে নিন। আপনারা যদি এসব স্মৃতিকে সংরক্ষণ করেন, তাহলে আপনাদের উত্তরসূরি সন্তানদের মধ্যেও এসব আবেগ-উদ্দীপনা সম্প্রসারিত হবে– যেভাবে পূর্বসুরিদের থেকে আপনারা পেয়েছেন। আপনাদের সন্তানরাও তা পাবেন। আর যদি 'আল্লাহ্ না করুন' আপনারা এসবের সংরক্ষণে ব্যর্থ হন, বর্জন করেন, তাহলে সন্তানদের প্রতিও তা আশা করবেন না। তাই আমি মনে করি, এখানে আগমনকারী মনীষীরা তাদের দীনের উপর শক্ত ছিলেন, আবার দুনিয়াও উপার্জন করেছেন। তাদের সমাজে দীন ও সরলতা ছিল, নমনীয়তা ছিল না।

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন কোন জাতি আমার অনুকরণ করে, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তার উপর রহমত করব। আর এ রহমতের প্রতিক্রিয়া তার সাত পুরুষ পর্যন্ত থাকবে। আর যখন কোন জাতি আমার নাফরমানি করে অবাধ্য হয়ে যায়, আমি তার উপর অভিশাপ করি। আমার অভিশাপের প্রতিক্রিয়াও সাত পুরুষ পর্যন্ত থাকবে। আপনাদের মধ্যে দীন ও দীনের প্রতি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে তা হলো সেসব বুযুর্গের স্মৃতি, আপনাদের পূর্বপুরুষদের বরকত। তাঁরা তাঁদের অন্তরকে দীন দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। এ হলো উপদেশ গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বনের স্থান। আমরাও যদি তাদের মতো নিজেদের অন্তরকে দীনি আবেগ-উদ্দীপনার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে রাখি, তাহলে আশা করতে পারি, এ দীন ও ধর্মের প্রভাব আমাদের সন্তানদের উপরও পড়বে। তারা ধর্মপরায়ণ হবে। তাই আমি মনে করি, প্রকৃত শুকরিয়া হলো, দীনি কথাবার্তা অনুযায়ী আমল করা এবং আমলের মাধ্যমে দীনকে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করা, প্রচার করা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নামটিই হলো আমলের। ইসলাম কেবল কথাবার্তা ও কল্পনার ধর্ম নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধর্ম নয়।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে اَلْاِيْمَانُ سِرٌ وَالْاِسْلَامُ عَلَانِيَة ঈমান হলো গোপন জিনিস যা অন্তরে থাকে– অর্থাৎ আকাইদ ও বিশ্বাস। আর ইসলাম হলো প্রকাশ্য জিনিস যা আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নামায, রোযা, হজ, যাকাত, সত্যবাদিতা, উম্মত, সমাজ প্রভৃতি হলো ইসলাম এবং আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা– এসব হলো ঈমান। ঈমান হলো শিকরের মতো যা অন্তরে গোপন থাকে। আর

ইসলাম হলো শাখা-প্রশাখার মতো যা বাইরে দেখা যায়। তাই ইসলাম আমলকেই বলা হয়। কোন ধারণা ও কল্পনার নাম ইসলাম নয়। সুতরাং ইসলাম প্রকাশিত হবে আমলের মাধ্যমে, কথাবার্তায় হবে না। আর যেসব বিষয় পেশ করা হয়েছে, তার সবই ইসলাম বিষয়ক।

ঈমান তো আলহামদুলিল্লাহ সবার অন্তরেই আছে। আমরা যারা আছি, আল্লাহর একত্ব, পরকাল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করি। সব জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করি। তাই এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তা তো আপনাদের মধ্যে আছেই। আমাদের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে তা হলো আমলের ত্রুটি। আকাঈদে ত্রুটি নেই। এজন্য আমল সম্পর্কিত কথাবার্তা বেশি বলা হয়েছে। তাই এসবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বেশি। এসব কাজ যদি হয় তাহলে প্রকৃত শুকরিয়া আদায় করা হবে।

মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিঃসন্দেহে মুল্যবান বিষয়। এ কারণে যে, শুকর যেমন মুখ ও অন্তর দিয়ে হয়, তেমনি আমল দিয়েও হয়। আত্মা ও অন্তরের শুকরের অর্থ উপকার স্বীকার করা। মুখের শুকরের অর্থ প্রকাশ করা। আর আমলী শুকরের অর্থ হলো আমল ও কাজ করা। এখন অপেক্ষা কেবল আমলের। মুখ ও অন্তর দিয়ে শুকর আদায় করা হয়েছে। আমলগুলো বাস্তব রূপ লাভ করুক। তাহলে পূর্ণাঙ্গ শুকরিয়া আদায় হবে।

পার্থিব বিপদাপদ দূর করতে আধ্যাত্মিক তদবির

সারা বিশ্বে যে অবস্থা বর্তমানে বিরাজ করছে এবং আফ্রিকায়ও রয়েছে তা সত্যিকার অর্থে দীনের কারণেই সম্ভভ হয়েছে। পার্থিব সমস্যাও রয়েছে; তবে এসব মারাত্মক ক্ষতিকারক নয়। যেহেতু এ সবই ক্ষণস্থায়ী বিষয়। আসবে চলে যাবে। যদি দীনি কষ্ট হয় তাহলে তা বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে। আত্মার জন্য কষ্টদায়ক হবে।

হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এক লোক দুঃখ কষ্টের কথা বলল। তিনি চমৎকার সামাধান দিলেন। অন্তরকে মুক্ত করার কথা বললেন। বললেন– যখন কোন বিপদ আসে প্রথমে একথা চিন্তা করো, এ বিপদ তোমার দীনের উপর এসেছে অথবা দুনিয়ার উপর এসেছে। যদি দুনিয়ার উপর আসে, তাহলে শুকর আদায় করা প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ! দীন নিরাপদ রয়েছে। যে বিপদ এসেছে তা দুনিয়ার উপর এসেছে। আর দুনিয়ার বিপদাপদ ক্ষণস্থায়ী। তবে দীনের বিপদ স্থায়ী হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন চলতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া হয় সবচে' বেশি। তাই

দীন যদি বিপদ মুক্ত থাকে তাহলে আমাদের শুকর আদয় করা উচিত।

পার্থিব বিপদাপদ নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক। তবে এর সামাধানও রয়েছে। পার্থিব ব্যবস্থা আছে, শরীয়তও ব্যবস্থা দিয়েছে। পার্থিব বিপদ সব শেষ হয়ে যাবে। স্বয়ং পৃথিবী অস্থায়ী, তার বিপদাপদও অস্থায়ী।

হযরত আলী (রা.) বলেন, মানুষের উপর যে বিপদই আসে, সে তার একটি সময়সীমা নিয়ে আসে। এর প্রতিরোধের জন্য মোটামুটি ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তবে আল্লাহর উপর বেশি নির্ভর কর। যখন নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন বিপদও শেষ হবে। যদি হাত পা বেশি পরিমাণে মারতে থাক। তাহলে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। যেমন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলো। ডাক্তার ডাকা হলো এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও হলো। আসলে রোগ তার নির্ধারিত সময়ে চলে যাবে। তবে যদি এত বেশি গুরুত্ব দাও যে, সকালে এক ডাক্তার, বিকালে আরেক ডাক্তার, রাতে আরেকজন। চিকিৎসার ঝড় বইয়ে দাও, তাহলে চিকিৎসাই আরেকটা রোগে পরিণত হবে। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যাবে।

কোন চড়ুই পাখি যদি জালে আটকা পড়ে, তাহলে তার পথ ও ব্যবস্থা হলো চুপ করে বসে বসে চিন্তা করবে– কোথাও কোনো ছিদ্র আছে কি না, যে ছিদ্র দিয়ে সে বের হতে পারবে। যদি বেশি হাত-পা মারতে শুরু করে, তাহলে জাল আরও শক্ত হয়ে আটকাবে। তখন বের হওয়ার কোন পথই থাকবে না। তাই বিপদ যখন আসে বেশি হা-হুতাশ ও হাত-পা মারার কারণেই আসে। ধৈর্য ও সবরের সাথে উদ্ধার লাভের তদবির করবে। কোন পথ ও ব্যবস্থায় উদ্ধার পাওয়া যাবে, তা চিন্তা-ভাবনা করবে। শান্তিতে ধৈর্যের সঙ্গে তদবির করবে। কিছু সহ্য করাও দরকার। কিছু তদবির করাও দরকার। মানুষ যদি কামনা করে বিপদ মোটেই না আসুক, চিরতরে দূরে সরে যাক, তা অসম্ভব। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কামনা। তাই কিছু সহ্য করুন। কিছু তদবির করো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। বিপদকে হাত-পা মেরে প্রতিহত করতে চাইলে মানুষ বিপদের বেড়াজালে আটকা পড়বে। আর সম্পূর্ণ নীরব নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও বিপদ বাড়বে। মধ্যপন্থাই উপকারী। সারকথা, পার্থিব বিপদাপদ আসে এবং যায়। বেশি গুরুত্ব দেয়ার বিষয় হলো দীনি বিপদ যেন না আসে, যার মাধ্যমে আমাদের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই আমি যা কিছু আরজ করেছি সব দীন সম্পর্কিত। পার্থিব, রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক বিষয়ে কিছু বলিনি। সোজা কথা, আমি অন্য দেশের নাগরিক। আমি কী বলতে ও করতে পারব? আর বলার প্রয়োজন তখনই হয়, যখন দেশের মধ্যে চিন্তাশীল, কর্মী মানুষ না থাকেন। আপনারা চিন্তাশীল।

কাজও করে যাচ্ছেন। আমার কাজ হলো দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিন। বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। আশা করি, সকল বিপদাপদ ও সকল সমস্যার সমাধান হবে। মুশকিলাত দূর হবে। সৎ নিয়ত, উত্তম ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে কাজ চলুক। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক পরিষ্কার রাখুন। মুশকিলাত দূর হবে। বিপদ মানুষের উপরই আসে। দুনিয়া নামই হলো বিপদ-আপদের। যদি বিপদ না থাকে তাহলে জান্নাত পাওয়া যাবে কেন? আর জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা কেন? আকাঙ্ক্ষা এজন্যই যে, দুনিয়াতে বিপদাপদ ও মুশকিলাত রয়েছে। দুনিয়া মানেই হলো মুশকিলাত।

সারকথা, দোয়া করছি এবং ইনশাআল্লাহ করব– আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সকল দীনি দুনিয়াবী মুশকিলাত দূর করুন। সমস্যার সমাধান করুন। (আমিন) বিপদ মসিবত থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখুন। শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। ইহ-পরকালীন প্রশান্তি দান করুন। আমিন!

সুতরাং আমি যেসব কথা আরজ করছি, তা আসলে আমার আবেগ ও উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ। আমি কত প্রভাবান্বিত হয়েছি। আপনারা তো আপনাদের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতির কারণে প্রভাবিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি আমল ও কাজ দেখে প্রভাবিত হচ্ছি। পঁচিশ দিন পর্যন্ত সব রকম মহব্বত, ভালবাসা, আদর-আপ্যায়ন এবং সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। প্রথম প্রথম আমার মনে কিছুটা সংকোচ ছিল, না জানি কেমন পরিবেশ হবে? মানুষ আমার বক্তব্য কী শুনবে? তাদের আবেগ-উদ্দীপনা কেমন হবে। দূরে থাকার সময় আজনবিয়ত বা সম্পর্কহীনতা থাকে। তখন মানুষ কত কিছু কল্পনা করতে থাকে। কিন্তু আসার প্রথম দিনই মনে হলো, আমি আমার আপনজনদের মধ্যে এসেছি। কোন সম্পর্কহীনতা নেই। কোনো দূরত্ব নেই। যেন নিজের ঘর, নিজের বাড়ি। আর পঁচিশ দিন পর মানুষ এমনই হয়ে যায়। কিন্তু আমি তো প্রথম দিনই পরিবারের মানুষ হয়ে গেছি।

এ ব্যাপারে যত কৃতজ্ঞতা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি না কেন, তা অবশ্য কমই হবে। তবে আপনাদের জন্য আমি দোয়া করব। দোয়া করার ওয়াদা করছি। আপনাদের খেদমতে এর বেশি আর কি করতে পারি? তবে আপনাদের কাছে আরজ থাকবে– এটা ফেতনার যুগ। যেভাবে অন্য সব তদবির ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জ্ঞানী গুণী জনের বর্ণিত নিয়মের উপর আমল করা হয়, তা সবই নিজ নিজ স্থানে ঠিক আছে। তবে আধ্যাত্মিকভাবে এমন কিছু দোয়া ও তদবির রয়েছে যেগুলো বিপদাপদ ও সমস্যা সমাধানে

উপকারী ও সহায়ক। একজন মুসলমানের জন্য এসবের চেয়ে উত্তম কোন তদবির হতে পারে না যে, মানুষ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে চলতে শুরু করবে এবং কি হবে না হবে তার প্রতি কোন রকম লক্ষ করবে না। তখন সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। অথচ আমরা এমন পরিবেশে বাস করছি যে, সে পর্যায়ের ঈমান আমাদের নেই। যেমন পার্থিব সব কিছু থেকে নিজেকে ছিন্ন করে আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দেবো। কিন্তু আমি বলি, পার্থিব সামাজিক তদবির অবশ্যই করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে দীনি ও আধ্যাত্মিক তদবির থেকে উদাসীন থাকবেন না।

সাহাবায়ে কেরামের উপরও আপদ বিপদ এসেছে। কোন কোন যুদ্ধে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা হয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছেন– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।' এর ফলাফলও বলে দিয়েছেন– فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ সাহাবায়ে কেরাম যখনই এই দোয়া পড়তে শুরু করেছেন তখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিপদের বদলে নেয়ামত এসে গেছে এবং আল্লাহর ফজলে সকল অসুবিধা দূর হয়ে গেছে।

তাই কেউ ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ফজরের নামায শেষে একশ' বার পড়ে নেয় এবং এ নিয়ত করে– আমার এবং আমার অন্য ভাইদের আপদ বিপদ দূর হোক, সমস্যার সমাধান হোক; এ হলো এমন এক তদবির যার সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। মানুষের ওয়াদা অপূরণ থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা পুরা হবেই, লঙ্ঘন হতে পারে না। এ হলো খাঁটি কথা। এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান হবে। সুতরাং এ আয়াত পড়বেন। দ্বিতীয় হলো– আয়াতে কারিমা– لَّا إِلٰـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـٰلِمِينَ পড়বেন। এ তদবির হযরত ইউনুস (আ.)কে শেখানো হয়েছিল। তিনি যখন মহাবিপদে বন্দী ছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ইউনুস (আ.)কে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর বিপদ দূর হলো এবং এমন উন্নত পরিবেশ লাভ করলেন যে, সবখানে শুধু ইউনুস (আ.)-এর জয় জয়কার। পরাজয়ের কোন নামগন্ধও ছিল না। আমাদের বিশ্বাসে ত্রুটি আছে, দুর্বলতা আছে। যে কারণে আমরা সম্পূর্ণ ধ্যান ও মনোযোগ দিতে পারছি না। আমি বলি, পরীক্ষামূলকভাবে করে দেখুন। ইনশাআল্লাহ! অবস্থার পরিবর্তন হবে। এ হলো আল্লাহর দেয়া সংবাদ; অন্য কারো দেয়া ব্যবস্থাপত্র নয় যে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে। সুতরাং حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ফজরের নামায শেষে একশ' বার পড়ে নিবেন এবং لَّا إِلٰـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى

كُنتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ রাতে ঘুমুতে যাবার আগে পড়ে নিবেন। সকালের দোয়া বিপদকে নেয়ামতে পরিবর্তন করে দিবে। আর সন্ধ্যার এই দোয়া দুঃখকে আনন্দে এবং ব্যর্থতাকে সফলতায় পর্যবসিত করবে। সারা জীবনের জন্য এ দুটি জিনিসেরই প্রয়োজন। এর সঙ্গে পার্থিব তদবির ও ব্যবস্থাও গ্রহণ করুন। তবে শুধু তদবির ফলদায়ক হবে না। তদবিরকে কার্যকরী করা আল্লাহ তায়ালার কাজ। কারণ, তদবির মানুষের কাজ। আর মানুষ কর্তা নয়। আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কর্তা। তদবিরকে সাহায্য দান করা তাঁরই কাজ। ছুরির মধ্যে কেটে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে। তবে আল্লাহ যদি তা বন্ধ করে দেন, তাহলে ছুরি কিছু কাটতে পারবে না। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর গলায় ছুরি লাগানো হয়েছিল এবং ধারালোও ছিল। গলা কেটে যাওয়ার কথা। অথচ ছুরির কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয়া হল। কোন কাজ হলো না। ছুরির মধ্যে কেটে ফেলার ক্ষমতা আল্লাহই দিয়ে থাকেন। ইবরাহিম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আগুনের কাজ হলো জ্বালানো। তবে আল্লাহর কুদরত কাজ করে, আগুন নয়। তার জ্বালানোর ক্ষমতা বন্ধ করে দেয়া হলো। আর সে আগুন বাগানের রূপ ধারণ করল। আল্লাহ তায়ালা যিনি প্রকৃত কর্তা, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা দরকার। আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছায় ঠাণ্ডা হয়। আল্লাহ যদি পানিকে আগুনে পরিণত করে দেন, তাহলে আমরা কিছুই করতে পারব না। যেভাবে ছোরা কাটে না। আল্লাহর ইচ্ছাই কাটে।

তাই মুশকিল আসান আর বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য যেমন পার্থিব তদবির ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তেমনি সবচে' বড় ও সর্বাত্মক তদবির হলো– আল্লাহ তায়ালার দেয়া ব্যবস্থাপত্রকে ব্যবহার করতে থাকা। সব সময় আমল করতে থাকা। আশা করি, কিছুদিনের মধ্যে প্রত্যেকে তা অনুভব করতে পারবেন। পরিবর্তন হচ্ছে, মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি দিন।

শরীয়তের আদেশে পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ নিহিত

উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়া বিভিন্ন সময় যেসব কথা আরজ করা হয়েছে, সেগুলো দীনি ব্যাপারে ও কল্যাণকর এবং পার্থিব বিষয়েও উপকারী। শরীয়তের এমন কোন নির্দেশ নেই যেখানে পরকালের সঙ্গে ইহকালীন কল্যাণ নিহিত নেই। যদিও আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিনি যে, পার্থিব কল্যাণ কি কি রয়েছে।

বেশিরভাগ দীনি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আপনি যখন আমল করবেন, পরকালীন কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইহকালীন কল্যাণও পেতে থাকবেন।

মেসওয়াক সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন এবং হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে। এর পার্থিব উপকার হলো– মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, মুখে সুগন্ধ সৃষ্টি হবে। অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পরকালে উপকার হবে এই– মৃত্যুর সময় কলেমা নসিব হবে। এই হলো মেসওয়াকের তাসির বা কর্মফল।

এ প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, এতে রহস্য কি– এর ব্যাখ্যা এখানে উদ্দেশ্য নয়। মৃত্যুর সময় কিভাবে মুখ দিয়ে কালেমা উচ্চারিত হবে– বিষয়টি অনেক দীর্ঘ। তবে এ কথা বলতে চাচ্ছি, এর মধ্যে উভয় ধরনের উপকারিতা রয়েছে। মুখের সুগন্ধি– এটা পার্থিব উপকার। আর কালেমা নসিব হওয়া– পরকালীন ও রূহানী উপকার।

হযরত উমর (রা.) শাহাদাতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তিনি মারাত্মক আহত, রোগগ্রস্ত। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তখন এক যুবক তাঁকে দেখার জন্য আসল। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন বললেন– এ যুবককে ডেকে নিয়ে এসো। তার লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির নিচে ছিল। মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। বললেন–

يَافَتَى اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَاِنَّه اَنْقى لِثَوْبِكَ وَاَتْقى لِرَبِّكَ

হে যুবক! তোমার লুঙ্গি গোড়ালির উপরে উঠাও। তা হলে কাপড়ের জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে।

ইহ ও পরকালীন উভয় উপকারিতা বলে দিলেন। এভাবে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– صُوْمُوْا تَصِحُّوْا 'রোযা রাখ, স্বাস্থ্য ঠিক কর।' রোযার পার্থিব উপকারিতা হলো স্বাস্থ্য লাভ এবং পরকালীন উপকার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই আমি আরজ করছিলাম– যেখানে অন্যান্য পার্থিব তদবির গ্রহণ করা হবে, সেখানে আধ্যাত্মিক তদবির থেকে উদাসীন থাকবে না। তা হলে ইনশাআল্লাহ পার্থিব কল্যাণও লাভ হবে।

তাছাড়া দীনি ও দুনিয়াবী তদবিরের মধ্যে কোন বিরোধ ও সংঘাত নেই। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে সঠিক। সুতরাং এটা কোনো বড় কাজ নয়। সকালে দশ-পনের মিনিট বসে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ একশ' বার পড়ে নিবেন এবং রাতে শোয়ার সময় পাঁচ মিনিট ব্যয় করে আয়াতে কারিমা পড়ে নিবেন। ইনশাআল্লাহ! এর ফল দেখতে পাবেন।

আমি এ কয়েকটি কথার মাধ্যমে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। নিজের মহব্বত ও ভালবাসা প্রকাশ করতে চাই। আর দোয়ার জন্য এ দাবী করছি না, তবে বলতে চাই– দোয়া করা ছাড়া অন্য কোন কাজের যোগ্যও আমি নই। ইনশাআল্লাহ! দোয়া থেকে উদাসীন থাকব না। দোয়া সব সময় করব এবং এখানকার বুযুর্গানকেও বলব, তাঁরা সকলেই আপনাদের জন্য দোয়া করবেন। দোয়া করা হবে, অন্যদিকে আপনারা তদবিরও করবেন। উভয় তদবির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক। তখন সমস্যা সমাধান না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ! সব ধরনের সমস্যা সমাধান হবে, শেষ হবে।

দ্বিতীয় বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এ বাক্য ক'টির সাথে আমি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আপনাদের থেকে দোয়া আরজ করছি– আপনারা দোয়াতে আমাকে ভুলে যাবেন না। পার্থিব জিনিস শেষ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে শেষ ও বিচ্ছিন্ন হয় না মানুষ। যদিও পরপারে চলে যায়, তবুও দোয়া সেখানে পৌঁছতে থাকে। তাই আপনারাও আমাকে ভুলবেন না।

বাকি রইলো এই কথা, আরেক বার এখানে আসা। এ ব্যাপারে আরজ করছি– মাওলানা উমর দীন সাহস হারাচ্ছেন কেন? আমি অমুক স্থান থেকে এখানে আসব; বরং সাহস করুন, আমি ভারত থেকে এখানে আসব। এর কি প্রয়োজন যে, আমি কম দূরত্বে গিয়ে এখানে ফিরে আসব?

নিঃসন্দেহে এ আপনাদের মহব্বতের কথা। সামান্য দূরে গিয়ে পুনরায় এখানে ফিরে আসব। কিন্তু নীতি হলো– এখানে ডাক্তার আছেন। তিনি আমার কথার সত্যতা ও বাস্তবতা স্বীকার করবেন। ক্ষুধা থাকা অবস্থায় খাবার ত্যাগ করা উচিত। যদি উদরপূর্তি করে আহার করে ফেলে, তাহলে খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকবে না। এজন্য কিছু ক্ষুধা রেখে দিতে হয়। যেন দ্বিতীয় বার আহার গ্রহণের আগ্রহ থাকে। ঘন ঘন খাবার গ্রহণ পাকস্থলী দুর্বল ও খারাপ হয়। মাঝখানে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত। সুতরাং আপনি সাহস করে এ কথা বলুন– আমরা ভারত থেকে আনার ব্যবস্থা করবো। অমুক জায়গা থেকে নিয়ে আসা খুব একটা সাহসের কথা নয়। আমি ইনশাআল্লাহ, হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব। নিষ্কর্মা তো আছি। তবে এখানে আসার জন্য তৈরি থাকব। আল্লাহ তায়ালা উপস্থিতিকে উপকারী করে দিন, যেন আপনাদের জন্য কিছু বলার তাওফিক হয়।

এই কথার সঙ্গে, আমি আমার ভাই-বোনদের এবং সকল মুসলমান নাগরিকের শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁরা তাদের ভালবাসা ও আদর আপ্যায়নের মাধ্যমে আমার অন্তরকে কিনে নিয়েছেন, তাদের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহর তায়ালা এ মহব্বতকে স্থায়ী করে দিন এবং এ মহব্বতকে ইহ-পরকালীন মঙ্গল, কল্যাণ ও শুভ ফলাফলের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة السلام على سيد المرسلين .

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

